ইমাম আওযাঈ ঃ জীবন-দর্শন ও ইসলামী আইন চর্চা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ

গবেষক
মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-বাংলাদেশ
নভেম্বর- ২০০৮
জিলহাজ্জ- ১৪২৯

Dhaka University Institutional Repository

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ঃ জীবন-দর্শন ও ইসলামী আইন চর্চা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ

গবেষক
মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ

Dhaka University Library
436786

436786

DULAP

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-বাংলাদেশ
নভেম্বর- ২০০৮
জিলহাজ্জ- ১৪২৯

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা
কে
যাঁদের আশিস্ আমার লেখনীকে
রেখেছে চলমান,
অসংখ্য কল্যাণ দাও তাঁদের জীবনে
ওহে আল্লাহ্! মহীয়ান।

436786

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত "আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনঃ জীবন-দর্শন ও ইসলামী আইন চর্চা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এ শিরোনামে কোথাও এম.ফিল ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য তা উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

১৮/১১/০৮

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

436786

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর শাহী দরবারে লাখো-কোটি শুক্‌রিয়া ও সাইয়্যিদুল মুরসালীন, রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর শানে দরূদ ও সালাম জ্ঞাপনপূর্বক আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনঃ জীবন-দর্শন ও ইসলামী আইন চর্চা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম।

এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করিনি।

এম. কে. সিদ্দিকী
১৮/১১/০৮
(মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী)
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
রেজিঃ নং- ২০০
শিক্ষাবর্ষ- ২০০৩-২০০৪ইং।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শুরুতেই সকল স্তুতিবাদ ও কৃতজ্ঞতাবাদ জ্ঞাপন করছি নিখিল স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের। যিনি তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাকে এই মহৎ ও দূরহ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের তাওফীক দিয়েছেন। অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভক্তিভরে দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারী, দো-জাহানের বাদশাহ্, নাজাতের কান্ডারী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর উপর। কিয়ামতের কঠিন দিনে যাঁর সুপারিশ আমাদের একান্ত কাম্য। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ফিক্হ্ তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রের সকল সংকলকদের। যাঁদের অসংখ্য-অগণিত ত্যাগের বিনিময়ে মুসলিম বিশ্ব আজ ইসলামী আইন শাস্ত্রের জ্ঞানের সাথে সুপরিচিত।

অতঃপর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট অনুষদ ও বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী এবং কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে। যাঁদের কারণে আমি এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের সুযোগ পয়েছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই এ গবেষণাকর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দেশ-বরেণ্য শিক্ষাবিদ, বিদ্যানুরাগী, গবেষক, বিদগ্ধ পন্ডিত, আল্-কুরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার সাহসী সৈনিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুযোগ্য ও সুদক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের প্রতি। যাঁর সঠিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। বলা যায় আমার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা জীবনের প্রায় ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পরামর্শ শিক্ষায় আমাকে অনেক শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। সর্বশেষ প্রেরণা যুগিয়েছে এ অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে।

অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার হাজারো ভীড়ে তিনি তাঁর সময়ের মূল্যবান মুহূর্তগুলো একটি চমৎকার মানসম্মত, সময়োপযোগী, মূল্যবান অভিসন্দর্ভ রচনার স্বার্থে ব্যয় করেছেন। এ অভিসন্দর্ভটিকে বর্ণে বর্ণে সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করতে তাঁর চরম ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করেছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরঋণী, চির কৃতজ্ঞ; যা কখনও শোধ হবার নয়।

অতঃপর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর আরবী সাহিত্য বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক (বর্তমানে সুপার নিউমেরারী অধ্যাপক, আরবী সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক- এর প্রতি। যাঁর মূল্যবান পরামর্শ, সহযোগিতা, নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা এ সন্দর্ভটি সুচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমাকে সাহস যুগিয়েছে। যিনি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পাশে থেকে তরঙ্গায়িত নদীতে নৌকার সঠিক হাল ধরার কাজ করেছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। (তুলাল্লাহু হায়াতাহু)।

পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আম্মাজান মিসেস আকলিমা খাতুন-এর প্রতি। যাঁর স্নেহধন্য দোয়ায় আমি সাহসে, শক্তিতে পুষ্ট হয়েছি। এজন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ স্যার- এর প্রতি। যিনি তাঁর মূল্যবান সময়ের একাংশ এ অভিসন্দর্ভটির সৌন্দর্যবর্ধনে ও প্রাণ- খোলা দোয়ার নিমিত্তে ব্যয় করেছেন।

আমার অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাসগুলো অবলোকন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন স্যারকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

প্রচুর সহযোগিতা, দূর্লভ গ্রন্থ এবং তথ্য- উপাত্তের সন্ধান দানের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. গোলাম মাওলা ও অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. নূরুল আলম স্যারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও পরামর্শ আমাকে গবেষণাকর্মটি সামনে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। এক্ষণে তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে আমি বিভিন্ন লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা নিয়েছি। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, আল্-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

লাইব্রেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে। সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সুধীজনদের প্রতি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

আমার গবেষণাকর্মে আন্তরিক পরামর্শ ও সহযোগিতা দানের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগং এর লেকচারার, বন্ধুবর হাফেজ মুহাম্মদ আরশাদুল হাসান শামীম ও সিটি রয়েল কলেজের লেকচারার বন্ধুবর মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আকাশকে আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অতি আন্তরিকতার সাথে ও অক্লান্ত শ্রম ব্যয় করে, রাতের ঘুমকে উপেক্ষা করে এবং দিবসের ব্যস্ততাকে ফেলে রেখে এই অভিসন্দর্ভকে নিখুত, ঝকঝকে ও উন্নত মানের কম্পিউটার কম্পোজ করার ও মান বৃদ্ধির কৃতিত্বের দরুন আমি মোঃ রেজাই রাব্বি ভাইয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যেদের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। যাঁরা দীর্ঘদিনব্যাপী এ গবেষণাকর্মের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করে আমাকে গবেষণার সুযোগ করে দিয়েছেন; বিভিন্নভাবে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিয়ে কাজের গতিবেগ সঞ্চারণ করেছেন। আমার গবেষণার জন্য তাঁদের ত্যাগই ছিলো মূলতঃ আমার প্রেরণার উৎস। এজন্য তাঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতার দৃঢ় বন্ধনে চিরদিন আবদ্ধ থাকবেন।

অসংখ্য সুহৃদ, সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী, শুভাকাংখী ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন যারা অপরিসীম ভালোবাসা, আত্ম-ত্যাগ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে এ গবেষণাকর্মটিকে ত্বরান্বিত করতে সাহস যুগিয়েছেন; তাদের সবাইকে প্রাণ উজাড় করা শ্রদ্ধা, স্নেহ ও সৌহার্দ্য জানিয়ে মহান আল্লাহর নিকট সকলের উত্তম প্রতিদানের আরয রেখে এবং অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এ অভিসন্দর্ভটি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে কবুলিয়াতের প্রার্থনা করছি। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ্। মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

গবেষক,

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

সংকেত	বিবরণ
অনু	অনুবাদ
খ্রিঃ	খ্রিস্টীয় সন
হিঃ	হিজরী সন
আ.	আলাইহিস্ সালাম
র.	রাহ্মাতুল্লাহি 'আলায়হি
রা.	রাদিয়াল্লাহু আন্হু
সা.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মৃ.	মৃত/মৃত্যু
জ.	জন্ম
ইং	ইংরেজী
পৃ.	পৃষ্ঠা
খ.	খন্ড
সং	সংস্করণ
খৃ. পূ.	খৃষ্টপূর্ব
তা. বি.	তারিখ বিহীন
ড.	ডক্টর
ডা.	ডাক্তার
দ্র.	দ্রষ্টব্য
মাওঃ	মাওলানা
মোঃ	মুহাম্মদ
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইবি	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক
বাং	বাংলা
বা.এ.	বাংলা একাডেমী
Adi	Adition
Ed.	Edited by
OP. Cit.	Oper Citao
P.	Page
Trs.	Translation
Vol.	Volume
Pub.	Publisher

প্রতিবর্ণায়ন
(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়ন সমস্যাটি বহু প্রাচীন। সমস্যাটি এ যাবতকাল কোন সুপরিকল্পিত ও সার্বজনীনভাবে সমাধানের মুখ এখনো দেখা যায়নি। আশা করা যায় অচিরেই বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ পন্ডিতদের স্বার্থক পদক্ষেপে এর সমাধানের সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করবে। তবে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের গবেষকগণ আরবী বর্ণমালার বৈচিত্রময় উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যিনি যেটাকে যথাপোযুক্ত মনে করেছেন তিনি তার গবেষণাকর্মে সে নিয়ম অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। তবে বহুল প্রচলিত আরবী বা উর্দূ শব্দসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা বানান রীতিতে লেখা হয়েছে।

ا -	অ	ط -	ত	ـِـ --	ি	يَا -	ইয়া
ب -	ব	ظ -	য	ـُـ --	ু	يِ -	য়ি
ت -	ত	ع -	'	اَ --	া	يِىْ -	য়ী
ث -	ছ	غ -	গ	ـُوْ --	ৌ	يُ -	ইয়ু
ج -	জ	ف -	ফ	ـِىْ --	ী	يُوْ -	ইউ
ح -	হ	ق -	ক	اَ --	আ	عَ -	'আ
خ -	খ	ك -	ক	ا --	আ	عَا -	'আ
د -	দ	ل -	ল	اِيْ --	ঈ	عِ -	'ই
ذ -	য	م -	ম	اُ --	উ	عِيْ -	'ঈ
ر -	র	ن -	ন	اُى --	ঊ	عُ -	'উ
ز -	য	و -	ও	وَ -	ওয়া	عُوْ -	'ঊ
س -	স	ه -	হ	وِىْ -	বী,ভী		
ش -	শ	ء -	'	وُ -	উ		
ص -	স	ى -	য়	وُوْ -	ঊ		
ض -	দ	ـً --	--া	يَ -	ইয়া		

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎসর্গ	ঃ	....	i
প্রত্যয়নপত্র	ঃ	....	ii
ঘোষণাপত্র	ঃ	....	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ	....	iv-vi
সংকেত বিবরণী	ঃ	....	vii
প্রতিবর্ণায়ন	ঃ	....	viii
সূচীপত্র	ঃ	....	ix-xii
ভূমিকা	ঃ	....	১
প্রথম অধ্যায়	ঃ	আহ্মাদ মুল্লাজীউন ও ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা.....................	৮-১৬০
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	আহ্মাদ মুল্লাজীউন পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ক্রমধারা..........	৮-২০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	আহ্মাদ মুল্লাজীউন ও সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা.................	২১-৮৯
		• আকবরের জন্ম ও প্রাথমিক জীবন................................	২১-২৩
		• বাদশাহ্ আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস ও তার যোগসূত্র........	২৩-২৮
		• অসৎ আ'লিমদের প্রভাব...	২৮-৩২
		• ভন্ড সূফীদের প্রভাব..	৩২-৩৪
		• হিন্দুদের প্রভাব..	৩৪-৩৮
		• জৈনদের প্রভাব...	৩৯
		• পারসিকদের প্রভাব..	৩৯-৪০
		• খৃস্টানদের প্রভাব..	৪১-৪২
		• মুক্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব..	৪৩-৪৬
		• দ্বীন-ই-ইলাহী ও ইসলাম...	৪৭-৫৫
		• বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের ফিত্না........................	৫৫-৬২

Dhaka University Institutional Repository

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	• হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (রহ.) এর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বিপ্লবী কর্মসূচী..	৬২-৮৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	**আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের সময়ে মোগল সম্রাটগণ..................**	৮৯-১৬০
	• মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ...	৯১
	▪ সম্রাট শাহ্‌জাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খিঃ)..................	৯১-১১৯
	▪ আবুল মুজাফ্‌ফর মুহীউদ্দীন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ গাজী (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ).........	১২০-১৫১
	• মোগল সাম্রাজ্যের পতন যুগ....................................	১৫২
	▪ বাহাদুর শাহ্ বা শাহ্ আলম (প্রথম) (১৭০৭-১৭১২ খ্রিঃ)..	১৫২-১৫৩
	▪ মু'ইযুদ্দীন জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-১৭১৩ খ্রিঃ)..........	১৫৩
	▪ ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রিঃ)......................	১৫৩-১৫৪
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	**আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জীবন-দর্শন**	১৬১-২৪৩
	• মুখবন্ধ..	১৬১-১৬৩
	• নাম ও বংশ পরিচয়...	১৬৩
	▪ নাম ও উপনাম..	১৬৩-১৬৫
	▪ বংশ..	১৬৫
	▪ নামের শেষে ব্যবহৃত উপাধি..............................	১৬৬
	▪ পূর্ব পুরুষের বাসস্থান.......................................	১৬৭
	• জন্ম..	১৬৭-১৭০
	• শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা..................................	১৭১
	• উচ্চশিক্ষা ও সনদ লাভ..	১৭১
	• প্রখর স্মৃতিশক্তি...	১৭২-১৭৪
	• বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ......................	১৭৪-১৭৬
	• লেখনী জগতে মুল্লাজীউনের পরিবারের অবদান................	১৭৭
	• হজ্জব্রত পালন...	১৭৮-১৭৯
	• রাজ-রাজাদের সংস্পর্শে থাকার কারণ..........................	১৭৯-১৮০
	• বিস্ময়কর স্বপ্ন..	১৮০

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	পৃষ্ঠা
• বাদশাহ্ আলমগীর ও বাহাদুর শাহের শিক্ষক	১৮১-১৮৭
• সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে দাক্ষিণাত্যে	১৮৭-১৯০
• বাদশাহ্ আলমগীরের জানাযা এবং ইবাদতের বহিঃ প্রকাশ.....	১৯০-১৯১
• আহ্মাদ মুল্লাজীউনের প্রতি সম্রাট শাহ্ আলমের অভ্যর্থনা এবং তাঁর সাথে রাজ-কার্যে..	১৯১-১৯৩
• গুপ্তচরের ভূমিকায় দুঃসাহসিক এক মহাপুরুষ....................	১৯৩-১৯৫
• তাসাওউফে দীক্ষিত এবং সূফী খিরকাহ্ লাভ....................	১৯৫-১৯৬
• তাসাওউফে দীক্ষিত হওয়ার কারণসমূহ..........................	১৯৬-১৯৯
• ব্যতিক্রমধর্মী এক সূফী সাধক....................................	২০০-২০১
• আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্র.................	২০১-২০২
• আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সময়ে ভারতবর্ষ..........................	২০২-২০৬
• মুল্লাজীউনের সময়কার রাজা-বাদশাহ্গণ........................	২০৬-২১৬
• দেশ-বিদেশ ভ্রমণে মুল্লাজীউন..................................	২১৬-২১৮
• মুল্লাজীউনের মাতৃভাষার রহস্য উদ্ঘাটন.........................	২১৮-২২০
• মুল্লাজীউনের চিন্তাধারায় বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাব....	২২০-২২৩
• আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর মাযার যিয়ারত..............	২২৩-২২৪
• কুমিরের সাথে সংঘর্ষ..	২২৪-২২৫
• ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতকের এক বিস্ময়কর মনীষী...............	২২৬-২২৮
• আহ্মাদ মুল্লাজীউনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব.................	২২৮-২৩০
• বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি..	২৩০
• আহ্মাদ মুল্লাজীউনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য..........................	২৩০-২৩৭
• মুল্লাজীউনের মৃত্যু ও দু'কবরের রহস্য...........................	২৩৭-২৪২
• শেষ কথা..	২৪৩
তৃতীয় অধ্যায় ঃ **ইসলামী জ্ঞান চর্চায় আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অবদান....**	২৪৪-৩১৯
• প্রাককথন..	২৪৪-২৪৭
• শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও জ্ঞান বিতরণে আত্মনিয়োগ...........	২৪৭-২৪৯
• সম্রাট আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহের শিক্ষাগুরু হিসেবে আবির্ভাব..	২৪৯-২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	পৃষ্ঠা
● আল্-ফাত্ওয়া আল্ হিন্দীয়াহ্তে মুল্লাজীউনের অবদান.........	২৫৫-২৬০
● আহ্মাদ মুল্লাজীউনের রচনাবলী এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্য..........	২৬০-২৬৩
▪ আত্-তাফ্সীরাতুল্ আহ্মাদিয়্যাহ্ ফী বায়ানিল আয়াতি'শ শার'ইয়্যাহ্ মা'আ তা'রিফাতিল মাসায়িল আল্-ফিক্হিয়্যাহ্..	২৬৩-২৬৫
▪ নূরুল আন্ওয়ার ফী শারহীল্ মানার.........................	২৬৫-২৬৮
▪ মানাকিবুল আওলিয়া..	২৬৯
▪ আদাব-ই-আহমাদী..	২৬৯
▪ খুতাবুল জুমা'-ই ওয়াল্ আ'ইয়াদ...........................	২৬৯
▪ মুজ্দাওয়াজাহ্ (জোড় ছন্দ প্রকরণ)........................	২৭০
▪ দেওয়ানে শে'র (কবিতা গুচ্ছ)..............................	২৭০
▪ "আস্-সাওয়ানিহ্" জামী এর "আল্-লাওয়াইহ"..........	২৭০
▪ ক্বাসিদা (সাত চরণের পঙ্ক্তি/কবিতামালা)................	২৭০-২৭১
▪ আল্-সুওয়ালাতু আল্-আহ্মাদিয়্যাহ্ ফী রাদ্দিল মালাহিদাহ্..	২৭১
▪ আশ্রাকুল আব্সার ফী তাখ্রীজে আহাদীসে নূরিল্ আন্ওয়ার..	২৭১
▪ নূরুল আন্ওয়ার ফী শারহীল্ আব্সার......................	২৭১
▪ আন্ওয়ারুল ফুরকান..	২৭২
▪ আস্-সাফ্রু (ভ্রমণ বৃত্তান্ত).....................................	২৭২
▪ জিমাউল্ ইল্মে (জ্ঞান-পিপাসা)..............................	২৭৩
● আহ্মাদ মুল্লাজীউনের কাব্য প্রতিভা...............................	২৭৩-৩১৯
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইসলামী আইন চর্চায় আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অবদান...	৩২০-৩৭৫
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী আইনের লালন ও বিকাশে মুল্লাজীউন..............	৩২০
● শুরুর কথা..	৩২০-৩২২
● ইসলামী আইনের মৌলিক গ্রন্থাবলী রচনা.........................	৩২২-৩২৭
● শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ....................................	৩২৮-৩২৯

Dhaka University Institutional Repository

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	● আল্‌-ফাত্‌ওয়া আল্‌-হিন্দীয়াহ্‌তে মুল্লাজীউনের অবদান.........	৩৩০
	● ধর্মপোদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন................................	৩৩০-৩৩২
	● কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন..	৩৩৩
	● বিদ্যালয় স্থাপন ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন................	৩৩৩-৩৩৪
	● শির্‌ক ও বিদ্‌আতের মূলোৎপাটন.................................	৩৩৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	**ইসলামী আইন বিষয়ে আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা**..	৩৩৫
	● তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদী..	৩৩৬
	■ তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদী লেখার বাসনা..........................	৩৩৬
	■ তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদীর বৈশিষ্ট্যাবলী..........................	৩৩৬-৩৩৭
	■ তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদীর নমূনা গ্রন্থাবলী.......................	৩৩৭-৩৩৯
	■ তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদীতে আলোচনায় স্থান পাওয়া সূরা, আয়াত ও বিষয়সমূহ..	৩৩৯-৩৪০
	■ তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদী থেকে নির্গত বিধান সমূহ.............	৩৪১-৩৫৬
	■ তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদীর কিছু নমূনা...........................	৩৫৭-৩৬১
	● নূরুল-আন্‌ওয়ার ফী শারহীল্‌ মানার..............................	৩৬২
	■ উৎস ও সময়কাল..	৩৬২-৩৬৪
	■ নামকরণের স্বার্থকতা...	৩৬৪
	■ ভাষারূপ ও বৈশিষ্ট্য...	৩৬৪-৩৬৫
	■ আলোচ্য বিষয়..	৩৬৫
	■ 'নূরুল-আন্‌ওয়ার' কালজয়ী অমর গ্রন্থ হলো কী করে; তার খতিয়ান এবং প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য....................	৩৬৫-৩৬৬
	■ 'নূরুল-আন্‌ওয়ার' এর ব্যাখ্যা-গ্রন্থসমূহ......................	৩৬৭-৩৭০
উপসংহার ঃ		৩৭১-৩৭৪
গ্রন্থপঞ্জী ঃ		৩৭৫-৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকাঃ

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের সকল প্রশংসা ও নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর প্রতি দরূদ ও সালাম'।

"আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনঃ জীবন-দর্শন ও ইসলামী আইন চর্চা" শীর্ষক বিষয়টি ইসলামী শিক্ষার চলমান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা, ইসলাম অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোনো ধর্ম নয়, বরং বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করতে গিয়েই 'কুরআন' ও 'সুন্নাহ্' এর ভিত্তিতে উদ্ভব হয় 'ফিক্‌হ' তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রের। যদিও এ শাস্ত্রের সূচনা হয় হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এর যুগে; তারপরও কালের অগ্রগতির সাথে সাথে এ শাস্ত্রের ধারাও দ্রুত এগিয়ে চলে ক্রমবিকাশের পথে।

এ অগ্রগতির পথে তুলনাহীন মেধা ও মননের সমন্বয় সাধন করে ইসলামী আইন তথা ফিক্‌হ শাস্ত্রকে যুগ জিজ্ঞাসার জবাবে যথার্থ করার লক্ষ্যে যে সকল মনীষী খ্যাতি লাভ করেছেন; তাঁদের মধ্যে আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ ইবনে আবু সাঈদ মুল্লাজীউন অন্যতম। ইসলামী আইন শাস্ত্রের উন্নতি ও বিস্তার লাভে এ মহামনীষীর অবদান আজও ভাস্করের ন্যায় দেদীপ্যমান।

এই মহান জ্ঞান সাধক যখন ভারতের কোলে আবির্ভূত হন, তখন সমগ্র ভারতবর্ষ ছিলো মর্ত্যের স্বর্ণপুরী এবং বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সভ্যতায় এখানকার মুসলমানরা ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ক চর্চা ছিলো ব্যাপক। এ প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়াম হান্টার তাঁর "The Indian Musalamns" শীর্ষক গ্রন্থে বলেন-

> "ভারতবর্ষ আমাদের শাসনাধীনে আসার আগে মুসলমানরা
> শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়; শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিলো।"

এই নশ্বর পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁরা নিজেদের শ্রম-সাধনা দিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন। এর ফলে তাঁরা মানুষের হৃদয়ে চির অমর হয়ে আছেন, থাকবেন আজীবন। যাঁদের কাছে পৃথিবী ও মানুষ ঋণী; যাঁদের অবদান শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রীক নয় বরং ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র তথা ব্যক্তির সামগ্রীক জীবনে। যাঁদের অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার বিকশিত

Dhaka University Institutional Repository

আলো ইসলামী শরীয়াতের গন্ডীর মধ্যে থেকে যুগ সমস্যার সমাধান দিয়েছে এবং উন্মোচন করেছে ধর্মের নতুন দিগন্ত; আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁদেরই একজন।

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অবাধ বিচরণ ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তথা কুরআন, হাদীস, তাফসীর, আকাঈদ (ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত বিদ্যা), মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), তাসাওউফ (আধ্যাত্মবাদ), বালাগাত (বাক্যালংকার শাস্ত্র), নাহু (বাক্য প্রকরণ ও শব্দের শেষ অক্ষরের স্বরচিহ্ননির্ণয় শাস্ত্র), সরফ (শব্দ প্রকরণ বিদ্যা), ফিক্‌হ (ইসলামী আইন-শাস্ত্র), উসূল-ই-ফিক্‌হ (ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি) এবং আরবী ও ফার্সী সাহিত্যে।

আল্লামা শায়খ মুল্লাজীউন অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ হলো- তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ ও তাফসীরবিদ। তবে তিনি আমদের নিকট ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ হিসেবেই বেশী খ্যাত। মুসলিম বিশ্বে তিনিই প্রথম কুরআন থেকে আহ্‌কাম সম্পর্কিত ৫০০ টি আয়াত চয়ন করে সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলো যেহেতু শরীয়াতের আহ্‌কাম, সেজন্য তা যেমন তাফসীর বিষয়ক তেমনি তা ফিক্‌হ বিষয়ক ও বটে।

ইমাম তাহাভী ছিলেন হানাফী মাযহাবের ইমাম। তিনি হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইমাম মালিকের (রহ.) মুয়াত্তায় যেমন কিছু ইসলামী আইন বিষয়ক হাদীস আছে, তেমনি তাহাভী শরীফেও হানাফী মাযহাবের সমর্থনে হাদীস আছে। কিন্তু তাতে বিস্তারিতভাবে ফিক্‌হ বিষয়ক কোনো মাস্‌আলার বিবরণ নেই। অধিকন্তু হানাফী মাযহাবকে টিকিয়ে রাখতে হলে যে উসূল বা মূলনীতির প্রয়োজন, তা ইমাম তাহাভী রচনা করেননি।

এই কাজ প্রথমে করেছেন ইমাম বাযদুভী। দ্বিতীয়বার করেছেন- 'আল-মানার' এর লেখক আল্লামা আবুল বারাকাত আহ্‌মাদ নাসাফী, যা 'উসূল-ই-ফিকহ' (ইসলামী আইনের মূলনীতি) এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে আল্লামা আহ্‌মাদ নাসাফী ইসলামী আইনের যে নীতিমালা রচনা করেছেন; তার বিস্তারিত রূপ দিয়ে জনসাধারণের বোধগম্যের আওতাভূক্ত করেছেন আল্লামা মুল্লাজীউন। কাজেই ইমাম তাহাভীকে যেমন হানাফী মাযহাবের হাদীস বিষয়ক ইমাম বলা চলে, তেমনি আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনকেও হানাফী মাযহাবের আইন বিষয়ক ইমাম বলা চলে। সে জন্যই

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেছেন-

> "শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী যেমন ভারতবর্ষে হাদীস শাস্ত্রের যুগ-স্রষ্টা; তেমনি আহ্মাদ মুল্লাজীউন ও ইসলামী আইন শাস্ত্র ও ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতির যুগ-স্রষ্টা।"

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী-আহ্মাদ মুল্লাজীউন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আরও বলেনঃ

> "মুল্লাজীউনের আগমন হয়েছিলো ঐ যুগে, যখন ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও মর্যাদা লাভের মূল চাবিকাঠি ছিলো ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ চর্চা।"

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন মাত্র ২১ বছর বয়সে 'তাফ্সীরে আহ্মাদী' রচনা করার মধ্য দিয়ে গোটা জগতকে তাঁর নিকট ঋণী করে গিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় জীবনের শেষ ভাগে লিখে গিয়েছে চিরকালীন এক অমর ও অক্ষয় গ্রন্থ 'আল্-মানার' এর ব্যাখাগ্রন্থ 'নূরুল-আনওয়ার'। তাঁর রচিত এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি বর্তমান মুসলিম সমাজে একটি প্রামাণ্য আইন শাস্ত্র হিসেবেই বিবেচ্য।

সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) সময় আবুল ফযল ও ফৈজী যেমন বিস্ময়কর দু'জন মনীষী ছিলেন, তেমনি ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতকেও দু'জন কালজয়ী বিস্ময়কর মণীষীর আবির্ভাব ঘটেছিলো। এদের মধ্যে একজন হলেন আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন (১৬৩৭-১৭১৭ খ্রিঃ), আর অপরজন হলেন আল্লামা শাহ্ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২ খ্রিঃ)। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ যুগের এক একজন আদর্শ পথিকৃত। তাঁরা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও বিরল ব্যক্তিত্ব।

ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টীয় এয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী আইন শাস্ত্র ও এর মূলনীতি তথা 'ফিক্হ' ও 'উসূল-ই-ফিক্হ' শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করাই ছিলো পান্ডিত্য ও সামাজিক মর্যাদা লাভের মূল চাবিকাঠি। আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন সে সময়ের একজন যুগোপযোগী চিন্তানায়ক। তাই তিনি এ দিকটাকে তাঁর জীবনে প্রাধান্য দেন।

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ। তাঁর চিন্তাধারা ইমাম আল-গাযালী ও ইবনুল আরাবীর সাথে অনেকটা মিলে যায়। মুল্লাজীউন ছিলেন ইসলামী আইন শাস্ত্র (ফিক্‌হ) এর অন্যতম উদ্ভাবক। তাঁর ছিলো অনেক উদ্ভাবনী শক্তি। ইসলামী আইন শাস্ত্র অনেক পূর্বে উদ্ভাবিত হলেও এর মূলনীতি উদ্ভাবনে মুল্লাজীউনের ছিলো বিশেষ অবদান। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের নিকট তিনি এ ব্যাপারে সমাদৃত। কারণ এসব অঞ্চলে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীই মানুষের জ্ঞান-চর্চায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন রচিত 'নূরুল-আন্‌ওয়ার' গ্রন্থটি ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতিমূলক একটি গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। ইসলামী শরীয়তে এ গ্রন্থটি একটি মাইল-ফলক। শায়খ মুল্লাজীউনের বিচরণ ছিলো মানব জীবনের সমস্যা সমাধানের পথে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও রাজনীতিতে তিনি ছিলেন সে যুগের ভারতবাসীদের জন্য জীবন্ত এক আদর্শ। যে সব মণীষীগণের অবদানে জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে, যাঁদের চিন্ত ও চেতনায় সমাজ জীবন আবর্তিত হয়েছে, যাঁদের প্রচেষ্টায় শরয়ী আহকামের বিধি-বিধান সহজতর হয়ে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে; আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁদে মধ্যে অন্যতম।

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের কর্মবহুল জীবনের উপর বাংলাদেশে ইতোপূর্বে কোনো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। যদিও এদেশে মুল্লাজীউনের জীবনীর উপর যৎসামান্য কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি সেগুলো থেকে তাঁর বিশাল কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। তাই এ বিষয়ে যথাযথ আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনায় উৎসাহিত হই। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত বিষয়টি নিয়ে গবেষক মহলে যার সাথেই কথা বলেছি সবাই বিষয়টিকে মুসলিম উম্মাহর জন্য অতীব জরুরী একটি বিষয় বলে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

এখন আমার গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে কিছু তথ্য পেশ করছি। অভিসন্দর্ভটিকে আমি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। অধ্যায়ের শিরোনামগুলো হচ্ছেঃ
(১) আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ও ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, (২) আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জীবন-দর্শন, (৩) ইসলামী জ্ঞান চর্চায় আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অবদান, (৪) ইসলামী আইন চর্চায় আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অবদান।

পরিশেষে সার্বিক গবেষণা অভিসন্দর্ভের উপর একটি উপসংহার উপস্থাপন করেছি।

প্রথম অধ্যায়টিকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে-আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ক্রমধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে- আহ্মাদ মুল্লাজীউন ও সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে বাদশাহ আকবরের জন্ম ও প্রাথমিক জীবন, বাদশাহ আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস ও তার যোগসূত্র, অসৎ আলিমদের প্রভাব, ভন্ড সূফীদের প্রভাব, খৃস্টানদের প্রভাব, হিন্দুদের প্রভাব, মুক্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব, দ্বীন-ই-ইলাহী ও ইসলাম, বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের ফিতনা, হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আফে সানী (রহ.) এর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বিপ্লবী কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে- আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সময়ের মোগল সম্রাটদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ও পতনযুগের কয়েকজন বাদশাহ যথাক্রমে সম্রাট শাহ্জাহান (১৬২৭-১৬৮৫ খ্রিঃ), সম্রাট আওরঙগজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ), বাহাদুর শাহ বা শাহ আলম (প্রথম) (১৭০৭-১৭১২ খ্রিঃ), জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৭১৩ খ্রিঃ), ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রিঃ) প্রভৃতি সম্রাটদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আহমাদ মুল্লাজীউনের জীবন-দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে মুল্লাজীউনের নাম ও বংশ পরিচয়, জন্ম, শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও সনদ লাভ, প্রখর স্মৃতিশক্তি, বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ, লেখনী জগতে মুল্লাজীউনের পরিবারের অবদান, হাজ্জ্বব্রত পালন, রাজ-রাজাদের সংস্পর্শে থাকার কারণ, বিস্ময়কর স্বপ্ন, বাদশাহ আলমগীর ও বাহাদুর শাহের শিক্ষক, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে দাক্ষিণাত্যে, বাদশাহ আলমগীরের জানাযা এবং ইবাদাতের বহিঃ প্রকাশ, মুল্লাজীউনের প্রতি সম্রাট শাহ আলমের অভ্যর্থনা এবং তাঁর সাথে রাজ-কার্যে, গুপ্তচরের ভূমিকায় দুঃসাহসিক এক মহাপুরুষ, তাসাওউফে দীক্ষিত এবং সূফী খিরকাহ্ লাভ, তাসাওউফে দীক্ষিত হওয়ার কারণসমূহ, ব্যতিক্রমধর্মী এক সূফী সাধক, মুল্লাজীউনের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্র, মুল্লাজীউনের সময়ে ভারতবর্ষ, মুল্লাজীউনের সময়কার রাজা-বাদশাহগণ, দেশ-বিদেশ ভ্রমণে মুল্লাজীউন, মুল্লাজীউনের

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষার রহস্য উদঘাটন, মুল্লাজীউনের চিন্তাধারায় বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাব, আব্দুর কাদির জিলানী (রহ.) এর মাযার যিয়ারত, কুমিরের সাথে সংঘর্ষ, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতকের এক বিস্ময়কর মণীষী, মুল্লাজীউনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, মুল্লাজীউনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মুল্লাজীউনের মৃত্যু ও দু'কবরের রহস্য প্রভৃতি জীবনের খুঁটি-নাটি বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী জ্ঞান চর্চায় আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও জ্ঞান বিতরণে আত্মনিয়োগ, সম্রাট আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহের শিক্ষাগুরু হিসেবে আবির্ভাব, আল্-ফাত্ওয়া আল্-হিন্দীয়াহ্তে মুল্লাজীউনের অবদান এবং মুল্লাজীউনের রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ইত্যাদি। এছাড়াও আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের কাব্য প্রতিভা সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টিকে দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে- ইসলামী আইনের লালন ও বিকাশে মুল্লাজীউনের অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে ইসলামী আইনের মৌলিক গ্রন্থাবলী রচনা, শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ, আল্-ফাত্ওয়া আল- হিন্দীয়্যাহ্তে অবদান, ধর্মোপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন, কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন, বিদ্যালয় স্থাপন ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন এবং শির্ক ও বিদ্আতের মূলোৎপাটন ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে- ইসলামী আইন বিষয়ে আহ্মাদ মুল্লাজীউনের রচিত গ্রন্থাবলী তথা 'তাফসীরে আহ্মাদী' ও 'নূরুল-আন্ওয়ার ফী শারহীল্ মানার' এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাফসীর আহমাদী লেখার বাসনা, তাফসীরে আহমাদীর বৈশিষ্ট্যাবলী, তাফসীরে আহ্মাদীর নমূনা গ্রন্থাবলী, তাফসীরে আহমাদীতে আলোচনায় স্থান পাওয়া সূরা, আয়াত ও বিষয়সমূহ, তাফসীরে আহমাদী থেকে নির্গত বিধান সমূহ এবং তাফসীরে আহ্মাদীর কিছু নমূনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও 'নূরুল-আন্ওয়ার' এর উৎস ও সময়কাল, এর নামকরণের স্বার্থকতা, ভাষারূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচ্য বিষয়, 'নূরুল-আন্ওয়ার'

Dhaka University Institutional Repository

কালজয়ী অমর গ্রন্থ হলো কী করে, তার খতিয়ান এবং প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য এবং 'নূরুল-আন্ওয়ার' এর ব্যাখ্যা-গ্রন্থসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে।

"আহ্মাদ মুল্লাজীউনঃ জীবন-দর্শন ও ইসলামী আইন চর্চা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে ভাষার দুর্বোধ্যতা পরিহার করার সাথে সাথে চলিতরীতি ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে করে শিক্ষাবিদ, গবেষক ছাড়াও সাধারণ পাঠক মহল অনায়াসে তা থেকে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন।

গবেষক মাত্রই জানেন যে, অভিসন্দর্ভে বক্তব্যের পুণরাবৃত্তি দূষণীয়। আমার অভিসন্দর্ভটি রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় বার বার আমাকে এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে বলেছেন। আমিও অত্যন্ত সচেতনভাবে এ বিষয়টি পরিহার করার চেষ্টা করেছি। তারপরও আলোচনার ধারাবাহিকতা ও অপরিহার্য প্রাসঙ্গিকতায় দু'এক স্থানে পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তাই এ বিষয়টিকে পুনরাবৃত্তি না ভেবে সংশ্লিষ্ট স্থানের আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় অপরিহার্য স্মারক হিসেবে বিবেচনা করার প্রত্যাশা করছি।

পরিশেষে আল্লামা শায়খ আহ্মাদ ইবনে আবু সাঈদ মুল্লাজীউনের বিদেহী আত্মার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক মহামহীম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করছি। একই সাথে আমার পরিশ্রম সাধ্য এ অভিসন্দর্ভটি দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বোপরি ইসলামের মহান খেদমতে পেশ করছি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে দ্বীন ইসলামের পথে কবুল করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী

এম.ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ও ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ও ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ক্রমধারা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ও সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের সময়ে মোগল সম্রাটগণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আহ্মাদ মুল্লাজীউন ও ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আহ্মাদ মুল্লাজীউন পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ক্রমধারাঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামল নিঃসন্দেহে বিশ্বনন্দিত একটি গৌরবময় অধ্যায়। এ যুগে মুসলমানগণ শৌর্য-বীর্য, শাসন-প্রশাসন, সম্পদ-সম্ভার, মহানুভবতা, পরধর্মমত সহিষ্ণুতা, শিল্পবোধ, ইতিহাস সৃষ্টি, সাহিত্যানুরাগ, সংস্কৃতি প্রিয়তা প্রভৃতি বিষয়ে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তা নিখিল বিশ্বের ঐতিহাসিকবৃন্দ তথা ইতিহাসের পাঠকবর্গের নিকট আজও বিশ্বের বিস্ময় হয়ে আছে।

মানুষ পৃথিবীতে আসে আর যায়, এর মাঝে অনেক মানুষই অমর হয়ে রয়। এঁদের মাঝে যে ব্যক্তিটি স্বীয় প্রতিভা ও জ্ঞানের দ্যূতি ছড়িয়ে সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে গেছেন; তিনি হলেন জ্ঞানতাপস, সরলমনা আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন। যাঁর অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার বিকশিত আলো ইসলামী শরীয়াতের গন্ডিতে থেকে যুগ-সমস্যার সমাধান দিয়েছে; উন্মোচন করেছে ধর্মের নতুন দিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় যাঁর ছিলো স্বচ্ছন্দ পদচারণা। আমরা আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের জীবন-দর্শন ও ইসলামী আইন চর্চায় তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিকভাবে মুল্লাজীউন পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ক্রমধারা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত জরীপ নিম্নে উপস্থাপন করছিঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের দশম এবং একাদশ/ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার একটি দমন পীড়নের প্রতিফলন ঘটায়। এঁদের মাঝে, 'মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (র.)' ইসলামী বিশ্বাসের উপর বিভিন্ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। মুজাদ্দিদ-ই- আলফে সানী ভারতে মোগল শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। তুঘলকের মুসলিম শাসনামলের পূর্ববর্তী, সাইয়্যিদ এবং লোদী রাজবংশ একটি বৈদেশিক আক্রমনের ওজর প্রস্তুত করে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রীঃ) সেই সময়ে বিরাজমান অবস্থার পরিপূর্ণ সুবিধা পেতে সক্ষম হন। দূর্বল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও আদর্শের বিশ্বাসঘাতকতা ভারতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্থ করেছিলো।

১৩৮৮ সালে সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের মৃত্যুর পর দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার খুবই দূর্বল হয়ে পড়ে। ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন অযোগ্য। তারা ছিলেন নীতিবোধহীন আদর্শের হাতে সাক্ষী গোপাল মাত্র, যাদের স্বার্থান্বেষী ষড়যন্ত্র দিল্লীর মসনদের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদারদের মধ্যে গৃহযুদ্ধকে বৃহদাকারে উস্কে দেয়।[১]

দিল্লী সাম্রাজ্যের এ ধরণের বিশৃঙ্খল অবস্থায়, কেন্দ্রীয় এশিয়ার আমীর তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮-৯৯ খ্রীঃ) এবং দিল্লীতে বেপরোয়া হত্যাকান্ড চালান। দিল্লীতে ১৫ দিন অবস্থানের পর, তৈমুর ১৩৯৯ খীষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করেন এবং খিজির খান সাইয়্যিদকে মুলতান, লাহোর এবং দিপালপুরের সরকারের প্রতি নিয়োগ প্রদান করেন।[২] পরিশেষে, তৈমুর তুঘলক সাম্রাজ্যের ধ্বংস সম্পন্ন করেন।

দূর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ নিয়ে, খিজির খান তুঘলক বংশের শেষ শাসক দৌলত খানকে পরাজিত করেন (১৪১৪ খ্রীঃ), এবং একজন সুলতান হিসেবে দিল্লীর মসনদে আরোহন করেন। এভাবে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক এর প্রতিষ্ঠিত (১৩২৫ খ্রীঃ) রাজবংশ শেষ হয়ে যায়।

খিজির খান এবং তার দূর্বল উত্তরাধিকারীগণ ভারতকে শাসন করেন মাত্র ৩৭ বছর, যা ছিলো ১৪১৪-১৪৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত। সাইয়্যিদ রাজবংশের সর্বশেষ শাসক আলাউদ্দীন আলম শাহ

[১]. Majumder, R.C:, *An Advanced History of India*, 3rd Edition, Macmillan S.T. Martings Press, London: 1949, p. 327.
[২]. Ibid, p. 328.

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন তার পিতার চেয়ে অধিক অদক্ষ। তিনি ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাহ্‌লুল লোদীকে দিল্লীর মসনদ ছেড়ে দেন।

একজন শাসক হিসেবে বাহ্‌লুল লোদী তুলনামূলকভাবে ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলক (১৩৮৮ খ্রীঃ) থেকে শুরু করে তার পূর্ববর্তী সবার মধ্যে সেরা ছিলেন। সাহসী, শক্তিশালী ও কৌশলী হওয়ায় তিনি ভারতে মুসলিম ক্ষমতার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। বাহ্‌লুলের মৃত্যুর পর (১৪৮৯ খ্রীঃ) তার দ্বিতীয় পুত্র সিকান্দার শাহ্‌ বাদশাহ্‌ হন। তিনি নিঃসন্দেহে এই রাজবংশের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সামর্থবান ছিলেন। এই রাজবংশের সর্বশেষ সুলতান ছিলেন ইব্রাহীম লোদী। তাঁর ৯ বছরের শাসনামলে (১৫১৭-১৫২৬ খ্রীঃ), ভারত উচ্চপদস্থদের আকাঙ্খা, অসৎ উদ্দেশ্য, আদর্শের অসন্তোষ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। দিল্লী সাম্রাজ্য শুধুমাত্র নামেই বিদ্যমান ছিলো। একজন খুবই ক্ষমতাবান আদর্শ, দৌলত খান এবং ইব্রাহীম লোদীর একজন চাচা আলম খান এই সুযোগে বাবরকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ জানায়।

তৈমুরের বংশধর বাবর, এই সুযোগ নিলেন এবং ইব্রাহীম লোদীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন এবং তাকে পানিপথের ঐতিহাসিক প্রান্তরে ২১ এপ্রিল, ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত করেন। বাবর দ্রুত দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে নিলেন। এভাবেই পানি পথের যুদ্ধ ভারতে মোগল আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপন করে।[৩] সমগ্র ভারত শাসনের মাত্র ৪ বছর পর (১৫২৬-৩০ খ্রীঃ) বাবর ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। বাবর ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেন এভাবে যে, তিনি ছিলেন ভারতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অট্টালিকার ভিত স্থাপনের প্রথম স্থাপত্যবিদ।

বাবরের মৃত্যুর পর, তার ছেলে হুমায়ুন ২৩ বছর বয়সে ১৫৩০ সালে ভারতের মসনদে আরোহন করেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন শত্রুপক্ষীয় বাহিনীর মুখোমুখী হন।

---

৩. ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা খুব ভালভাবে বিবেচ্য হতে পারে যে, এটা 'ইসলামিক ও বিশ্ব ইতিহাসে একটি ধাপ' এ দৃষ্টিতে যে, যখন এর অনুসারীরা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে সফলতা অর্জন করছিলো; একই সময়ে এটা হচ্ছে ভারতে ইসলামের জন্য একটি জয়। কনস্টান্টিনোপল ১৪৫৩ সালে তুর্কীদের দ্বারা দখলকৃত হয়, মহৎ সুলায়মান (১৫২০-১৫৬৬) দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্যকে বর্ধন করেছিলেন; এবং পারস্যে, ইসমাঈল সাফাভী (১৫০০-১৫২৪) সাফাভী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। (R.C. Majumder, *An Advanced History of India,* Ibid, p. 418. (Foot-note))

Dhaka University Institutional Repository

পানিপথ এবং গোগরায় বাবরের বিজয় আফগান প্রধানদের পরিপূর্ণ ধ্বংস সাধন করতে পারেনি। তারা নিজেদের শের শাহ (১৪৭২-১৫৪৫ খ্রীঃ) এর নেতৃত্বাধীনে সংগঠিত করেন, যারা নব প্রতিষ্ঠিত মোগল কর্তৃপক্ষকে উচ্ছেদ করে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন একটি গৌরবময়, সংক্ষিপ্ত শাসনপ্রণালী।[৪]

১৫৪০ সালে কনৌজ যুদ্ধে শেরশাহ্ হুমায়ুনকে পরাজিত করেন এবং হুমায়ুন পালাতে সক্ষম হন। এভাবে ভারতের সার্বভৌমত্ব পুনরায় আফগানদের নিকট চলে যায়। শেরশাহ্, প্রশাসনিক পদ্ধতিতে একজন জ্ঞানদীপ্ত স্থাপত্যবিদ, পাঁচ বছরের (১৫৪০-৪৫ খ্রীঃ) জন্য ভারত শাসন করেন এবং একটি দূর্ঘটনায় ১৫৪৫ সালে ইন্তেকাল করেন।[৫] হুমায়ুন গৃহত্যাগীর মত প্রায় ১৫ বছর (১৫৪০-৫৫ খ্রীঃ) জীবন যাপন করেন। তারপর, সুরদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের কারণে তিনি ভারতকে পুনরায় জয় করার একটি চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি সিকান্দার সুরকে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে সিরহিন্দ এর নিকট যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং লাহোর দখল করেন।[৬]

যদিও ভাগ্যের অনুকূল চক্রে হুমায়ূন তার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন, কিন্তু তিনি তার বিজয়ের সুফল বেশী দিন ভোগ করতে পারেন নি। তিনি ২৪ জানুয়ারী, ১৫৫৬ সালে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।

হুমায়ূনের পুত্র আকবর তখন তার অভিভাবক বৈরাম খানের সাথে পাঞ্জাবে ছিলেন। তিনি হুমায়ূনের উত্তরাধিকারী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত ছিলেন এবং ১৫৫৬ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে দিল্লীর মসনদে আরোহন করেন।[৭] যখন তিনি মসনদে আরোহন করেন, তখন সমগ্র দেশজুড়ে একটি ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রতিটি স্বাধীন রাজ্য ভারতের বিভন্ন অংশে ক্ষমতার জন্য বিবাদ শুরু করে।[৮]

---

৪. Majumder, R.C, *An Advanced History of India*, Ibid, p. 328.
৫. Ibid, p. 432.
৬. Ibid, p. 438.
৭. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, Allahabad: 1939, p. 252.
৮. Ibid, p. 252.

হুমায়ুন তার মৃত্যুর পূর্বে, ভারতে তার হারানো ভূখন্ডের মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধার করেছিলেন। শূররা তখনো শেরশাহের সাম্রাজ্যের বড় অংশ দখলে রেখেছিলো। আগ্রা থেকে মালওয়া এবং জৌনপুর দেশটি আদিল শাহ এর সার্বভৌমত্বে বাধিত ছিলো, কাবুলের দিকের রাস্তায় দিল্লী থেকে ছোট রোহ্‌তা পর্যন্ত শাহ্ সিকান্দারের দখলে ছিলো এবং পর্বতের সীমানা থেকে গুজরাটের প্রান্ত পর্যন্ত ইব্রাহীম খানের হাতে ছিলো।[৯] ভারতের একজন প্রকৃত রাজা হতে এবং তার পিতার হারানো সাম্রাজ্য জয় করতে আকবরকে প্রমাণ করতে হয়, মসনদের জন্য তার প্রতিদ্বন্দ্বীগণের চেয়ে তিনি শক্তিশালী এবং বড়।[১০]

ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে, আকবর এবং শেরশাহের প্রতিনিধিদের মধ্যে কাউকেই পছন্দের কিছু ছিলো না, শুধু ছিলো তরবারী। যদিও, আকবরের ঐতিহ্য ছিলো বিপদজনক প্রকৃতির, তখনকার ভারতে একটি সাম্রাজ্য গঠনের কাজ ছিলো প্রকৃতপক্ষেই কঠিন কাজের একটি। আকবরের সিংহাসনে আরোহনের পরপরই আদিল শাহ্ শুরের সক্ষম সেনাপতি এবং মন্ত্রী হিমু মোগল বিরোধে অগ্রসর হন। তিনি দিল্লীর মোগল গভর্ণর তারদী বেগকে পরাজিত করে প্রথম আগ্রা অধিকারে আনেন, যাকে দিল্লী রক্ষার ব্যর্থতার জন্য বৈরাম খানের নির্দেশে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

রাজা 'বিক্রমাজিত' বা 'বিক্রমাদিত্য' উপাধী ধারণ করে।[১১] হিমু ভারতে নিজেকে এবং হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে একটি বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে ১৫৫৬ সালে ঐতিহাসিক পানি পথের প্রান্তরে আকবর ও বৈরাম খানের মুখোমুখি হন, কিন্তু তিনি পরাজিত হয়ে ধরা পড়েন এবং তাকে হত্যা করা হয়।

পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল ছিলো চরম। শেষোক্ত জনের পক্ষে একটি রায় প্রদানের মাধ্যমে এটা ভারতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় আফগান-মোগল লড়াইকে আরও কাছাকাছি আনে। বিজয়ীরা দ্রুত দিল্লী ও আগ্রা অধিকার নিয়ে নেয়। সিকান্দার শুর নিজেকে তাদের নিকট যে,

---

৯. Majumder, R.C, *An Advanced History of India*, op. cit. p. 438.

১০. Smith, V.A. : *Akbar the Great Mughal*, Delhi: 1962, p. 23.

১১. "Himu assumed the title of Raja Vikramjit or Vicromaditya which had been borne by Several of the most renowned Hindu monarchs in ancient times, and so entered the field as a competitor for the throne of Hindustan against both Akbar and Sikandar Sur." (See, V.A. Smith, *Akbar The Great Mughal*, Ibid, p. 28).

Dhaka University Institutional Repository

১৫৫৭ সালে সমর্পণ করলেন এবং একটি জায়গীর মঞ্জুর করলেন পূর্ব প্রদেশে, যে কারণে তিনি দ্রুত আকবর দ্বারা বহিস্কৃত হন এবং একজন পলায়নকারী হিসেবে বাংলায় (১৫৫৮-৫৯) মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদ আদিল ১৫৫৬ সালে বাংলার গভর্ণরের বিরুদ্ধে মঙিঘর এ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। ইব্রাহীম শুর একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ানোর পর উড়িষ্যায় আশ্রয় পান, সেখানে ১০ বছর (১৫৬৭-৬৮) পর তাকে হত্যা করা হয়। এভাবে, সেখানে আর কোনো শুর প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না, যে ভারতের সার্বভৌমত্বে আকবরের দাবীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। পরবর্তীতে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে মোগল বিরোধী আফগান বিদ্রোহ ছিলো কম বেশী বিচ্ছিন্ন এবং মোগল শ্রেষ্ঠত্বে যা ছিলো মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।

সুতরাং, এটি দেখা যায় যে, ফিরোজ শাহ্ তুঘলক এর মৃত্যুর পর আকবরের দিল্লীর মসনদে আরোহন (১৩৮৮-১৫৫৬ সাল), ভারতে মুসলিম শাসনের দীর্ঘ একশ আটষট্টি বছরে সিকান্দার শাহের আটাশ বছর (১৪৮৯-১৫১৭) এর শাসনামল ছাড়া তখন কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছিলো না। ভারত তখন উচ্চাভিলাষ, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ এবং আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা ছিলো উন্মত্তপ্রায়, এবং দিল্লী সালতানাত শুধুমাত্র নামেই বিদ্যমান ছিলো।

সুতরাং, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, তখন ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সকল দিক থেকে একটি জটিল প্রতিচ্ছবির মতো অন্ধকার উপহার দেয়।

এই সময়ে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমিরী (রহ.) (৫৩৬-৬৩৩ হিজরী) এবং খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার ক্বাকী (রহ.) (৫০৫-৬৩৩ হিজরী) এর মতো কোনো মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ভারতে জন্মগ্রহণ করেননি, যারা তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারতেন। 'মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী' (রহঃ) (১৫৬১-১৬২৪ খ্রীঃ) এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) (১৭০৩-১৭৬৩ খ্রীঃ) এর মতো কোনো সুবিদিত ধর্মীয় সংস্কারকও জন্মগ্রহণ করেননি, যারা মুসলমান জাতিকে তাদের নিদ্রাবস্থা থেকে জাগ্রত করতে পারতেন।

বাস্তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীয়া ছিলো বিরোধী সংস্কৃতি, বিশেষ করে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি হীনভাবে অনুগত। এই সময়ের প্রখ্যাত আলীমগণ যেমন মালিক মুহাম্মাদ জায়সী, রিজকুল্লাহ মুস্তাকী, মিয়া তাহা এবং মুহাম্মাদ গোর গোয়ালিয়ার্ভ ছিলেন হিন্দু প্রথায় তাদের লব্ধ বিষয়ের

Dhaka University Institutional Repository

কারণে বিখ্যাত, কিন্তু, ইসলামী শরীয়ায় নয়।[১২] সে সময়ে লিখিত বিখ্যাত বইসমূহ, যেমন- 'ওয়াকেআতী মুশতাকী;' 'আফসানা-ই-শাহান' এবং 'তারিখ-ই-দাউদী'; তৎকালীন ভারতের মুসলিম সমাজের ভুল পথনির্দেশনা এবং অনৈতিকতার একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করে।[১৩] তৎকালীন ভারতের মুসলমানদের এই সামাজিক এবং নৈতিক অবক্ষয়; এর পেছনে ছিলো একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব, যা ইতিহাসে প্রতিফলিত।

বড় বিষয় ছিলো প্রাচীন ভারতের সভ্যতাকে উপলব্ধি করণের সামর্থ্য যে, এই দেশের প্রাথমিক আক্রমনকারী- গ্রীক, সাকাগণ এবং হুনগণ তার জনসংখ্যার পরিবেষ্টনীর মধ্যে আত্তীকৃত হয়েছে এবং সম্পূর্ণভাবে তাদের পরিচয় হারিয়েছে। কিন্তু, ভারত আক্রমণকারী তুর্কী-আফগানদের সাথে এমনটি ঘটেনি।[১৪]

নির্দিষ্ট সামাজিক এবং ধর্মীয় ধারণায় মুসলমান অনধিকার প্রবেশকারীগণের মনোনিবেশ, যা মৌলিকভাবে ভারতের তাদের থেকে ভিন্ন ও এই দেশে অন্তর্ভূক্ত এবং মূল অধিবাসীগণের দ্বারা লংঘনকারীগণের খাপ খাওয়ানো সম্ভবপর হয় না। নবাগত এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক কখনো কখনো তিক্তকর হতো। কিন্তু, যখনই দুই ধরণের সভ্যতা একে অপরের খুব কাছাকাছি আসতো শতাব্দীকাল যাবত, উভয়ে তখন পারস্পারিকভাবে প্রভাবিত হতো।

প্রকৃত বিষয়, বিখ্যাত মুসলিম পন্ডিতগণ এবং সাধুগণ মধ্যযুগীয় সময়ে ভারতে বাস করতেন এবং শ্রম দিতেন, এবং তারা ইসলামী দর্শন এবং মরমীবাদের ধারণা সমূহের প্রচারে সহায়তা করেন। পারস্পারিক সহনশীলতার শুভ ধ্যান-ধারণার অভিব্যক্তি পাওয়া যায় মুসলিম সাধুগণের জন্য হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা এবং হিন্দু সাধুগণের প্রেক্ষিতে সংগতিপূর্ণ মুসলিম চর্চা বৃদ্ধিতে।[১৫]

---

১২. (a) Khaliq Ahmad Nizami, *Salatini Delhi Ka Madhahibi Rujhanat*, Edara-i-Adabiyat, Delhi : 1990 p. 451.
(b) Md. Aslam, *Din-i-Ilahi Aur Uska Pasmanzar*, Mayarif Press, Delhi: 1969, p. 26.

১৩. (a) Khaliq Ahmad Nizami, op.cit., p. 451.
(b) Md. Aslam, op. cit., p. 26.

১৪. Majumder, R.C, op.cit., p. 394.

১৫. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

এটা ছিলো পারস্পারিক বোঝাপড়ার জন্য ধ্যান-ধারণার বাইরে, যা কাশ্মীরে যাইনুল আবেদীন এবং বাংলায় হুসেইন শাহ এর মুসলিম আদালতে সংস্কৃত-হিন্দু ধর্ম সাহিত্যে পঠিত এবং অনূদিত। উপরন্তু, মুসলিম আদালত এবং মুসলিম প্রচারক এবং সাধুগণ হিন্দু দর্শনের পঠনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যেমন- ইয়োগা এবং বেদান্ত, ঔষধ বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষতত্ত্ব। হিন্দু জ্যোতিষীগণ একইভাবে মুসলিম কারিগরী দিকগুলো ধার করেন। অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশে মুসলিম গণনা, পঞ্জিকার কিছু বিষয় এবং রাশিচক্র বিদ্যার একটি শাখা এবং ঔষধে ধাতব এসিড ইত্যাদির জ্ঞানকে বলা হয় তাজিক।

মালিক মুহাম্মাদ জায়সী'র পদ্মিনির মতো কিছু মুসলিম লেখকও হিন্দু জীবন এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখেন, এবং হিন্দু লেখকগণ ও পারস্য ভাষায় মুসলিম সাহিত্য বিষয়ক ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখেন, যেমন- 'রাই-ভানা ম্যান' এর ঘটনাপঞ্জি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য এবং সহযোগিতার মানসিকতা অনুপস্থিত ছিলো না। মুসলিম রাষ্ট্রে বিশাল সংখ্যক হিন্দু চাকুরী করতেন, যারা প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় বিখ্যাত হন। গ্রামের স্থানীয় প্রধান এবং হিসাবরক্ষকগণ স্থানীয় প্রশাসনের বিদ্যমান চালিকা শক্তি ছিলো। যদিও এই অফিসিয়াল নিয়োগ হয় মূলতঃ রাজনৈতিক প্রয়োজনে, তথাপি হিন্দু এবং মুসলিমের মধ্যে সাদৃশ্যের উন্নতি নিঃসন্দেহে তারা সহজ করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে যেমন, পোশাক-পরিচ্ছদ, কলা এবং শিল্প, সংগীত এবং চিত্রকলা, খেলাধূলা এবং ক্রীড়ায়-দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্তীকরণ এভাবেই অগ্রগামী হয় যে; যখন বাবর ভারতে আসেন, তিনি তাদের বিচিত্র জীবনের ধারা দেখে নোটিশ প্রদানে বাধ্য হন।[১৬]

রামানুজা ছিলেন ভক্তি প্রথার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জন্মেছিলেন শ্রী প্রেমবুদরে, মাদ্রাজ থেকে ২৬ মাইল দূরে; ১২শ শতাব্দীর শুরুর প্রথমার্ধে।[১৭] অন্য হিন্দুর সাথে তুলনায় রামানুজা ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং তাঁর ধর্মীয় শিক্ষণে তিনি জোর দেন এক ঈশ্বর এ।[১৮] রামানুজা নিজের পদ্ধতিতে হিন্দুদের বহুদেববাদী বিষয়কে পাশ কাটিয়ে গীতা ব্যাখ্যা করেন।[১৯] রামানুজার মিশনারী

---

১৬. Majumder, R.C, Ibid, pp-394-396.

১৭. Sree Nawas Aengar, *The teachings of Sree Ramanuja Achariya,* Nawal Kishore Press, Lucknow: 1956, p. 45.

১৮. Ibid, pp, 263-275.

১৯. Regarding the Hindu religious book Gita, Various Muslim Scholars expressed their good views, Eminent Muslim Scholar Shah Abdul Aziz Dehlavi (R.) says: The study of

Dhaka University Institutional Repository

কাজ-কর্ম নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বিশালভাবে প্রভাবিত করে এবং তারা বহুদেববাদ ত্যাগ করে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করে।[২০]

রামানুজা তার জীবনের বড় অংশ কাটান দক্ষিণ ভারতে তার মিশনারী কাজ-কর্মে এবং তার লক্ষ্য ছিলো, তার একজন বড় শিষ্য রামানন্দ দ্বারা উত্তর ভারতে ধর্ম প্রচার করা। রামানন্দ ছিলেন ভক্তি প্রথার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।[২১]

রামানন্দ ১৪০০ সালে প্রাগে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি প্রায় সারা জীবনই বেনারস এ কাটান। তিনি বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তিনি তার জীবন ভারতের হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের লোকদের মঙ্গলার্থে উৎসর্গ করেছিলেন।[২২] রামানন্দ অনেক শিষ্য রেখে গেছেন, যার মধ্যে কবীর ছিলেন বিখ্যাত।

কবীর হিন্দুত্ববাদ এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্যের ধ্যান-ধারণা পোষণে সর্বাত্মক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তার জীবন ব্যাপৃত ছিলো অস্পষ্ট বিষয়ের নিরন্তন চর্চায়, এবং তার জন্ম তারিখ অনিশ্চিত।[২৩] তিনি হয় চৌদ্দতম শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে সমৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি একজন ব্রাহ্মণ বিধবার ঘরে জন্ম নেন, যিনি তাকে বেনারসের একটি পুকুরের পাড়ে রেখে চলে যান এবং তাকে একজন মুসলিম হস্তশিল্পী এবং তার স্ত্রী পেয়ে তুলে নেন।[২৪]

Gita indicates that its author Sree Krishna Chandra was one of the Awliya of Allah. (*Rud-e-Kawthar,* Sk. Muhammad Ikram, Civil Steam Press, Lahore: 1958, p. 569)

২০. Sharma, D.S, *The Renissance of Hinduism*, Benaras: 1944, p. 41.

২১. Farquhar, J.N, *Outline of the Religious Literature of India,* India Office Library, London: 1915, p. 323.

২২. Tara Chand, Dr., *The influence of Islam on Indian Culture,* Bani Shilpa Prokashoni, Calcutta: 1987, p. 143.

২৩. See, Majumder, R.C, op. cit., (Foot note). For different Opinions Vide Tara-Chand, *Influence of Islam on Indian Civilization*, pp-146-47, According to Macauliffe and Bhandakar, 1398 A.D. is the date of his birth, but according to West Coff, Farquhar, Burns and Other is 1400 A.D.

২৪. Sharma, D.S, op.cit., p. 52.

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুবাদ বা ইসলামের ধর্মীয় আচারের ফলপ্রসূতায় অথবা বাহ্যিক সৌজন্যতায় কবীর বিশ্বাস করতেন না; তার নিকট পাপ মোচনের উপায় ছিলো সকল ভন্ডামী, কুটিলতা, ভাওতাবাজী এবং নিষ্ঠুরতা থেকে আত্মার মুক্তির সাথে ভজন অথবা ভক্তিমূলক উপাসনা।[২৫]

কবীর এমন একটি ধর্ম প্রচার করতেন যার ভিত্তি ছিলো পারস্পারিক ভালোবাসা এবং একতা; পারস্পারিক কুটিলতার পাশাপাশি ভন্ডামী এবং নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগের মাধ্যমে।[২৬] তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম ব্যক্তি, যিনি হিন্দুবাদ ও ইসলাম এ দু'টি বিশাল সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিক মিল পোষণের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

সারা ভারতে হিন্দু-মুসলিম একতার জন্য কাজ যারা করতেন, তারা ভীষণভাবে কবীরের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২৭] প্রকৃতপক্ষে, কবীর একটি ভালোবাসার ধর্মের প্রচারনা করেন, যা সকল শ্রেণী ও মতবাদের মধ্যে একতা বৃদ্ধি করেছিলো।[২৮] না হিন্দু না মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কবীর একেশ্বরবাদ দর্শন ধারণ করতেন।[২৯] সুলতান সিকান্দার লোদী (মৃত্যু ১৫১৭ সাল) তাকে বেনারস থেকে বহিস্কার করেন; যার কারণে কবীর তার বাকী জীবন একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরেফিরে কাটান এবং ১৫১৮ সালে গুর্খাপুর এর কাছের একটি গ্রামে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩০]

সে সময়ের আরেকজন মহান প্রচারক ছিলেন শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং উপনিষদের নির্মল একেশ্বর মতবাদের প্রবক্তা গুরু নানক। নানক তার বিখ্যাত "গ্রন্থসাহেব"-এ কবীরের শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করেন।[৩১] নানক ১৪৬৯ সালে তালওয়ান্দীর ক্ষত্রীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক নানকানা লাহোর মহানগরী থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং নানক তার সারা জীবন ব্যয় করেন হিন্দুবাদ এবং ইসলামের সকল ভালো কিছুর ভিত্তিতে চিরন্তন সহনশীলতায় তার গভীর বিশ্বাস প্রচারণায়।

---

২৫. Majumder, R.C, op.cit, p. 399.
২৬. Tara Chand, Dr.; OP. Cit., PP-150, 163.
২৭. Qanungo, K.R., *Dara Shikwah,* Onuradha Prokashoni, Calcutta: 1935, p. 336.
২৮. Majumder, R.C, op. cit., p. 398
২৯. Abul Fadl, *Ain-i-Akbari*, Nawal Kishore Press, Lucknow: 1869, p. 145.
৩০. Farwuhar, J.N, op.cit., p. 332.
৩১. Yousuf Hussain, Dr., *GlimPles of the Mediaeval Indian Culture*, Cambridge University Press, New York: 1964, pp-27-28.

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব বিষয় হিসেবে, তার লক্ষ্য ছিলো ধর্মীয় ঘাতকে নিস্পন্ন করা। কবীরের মতো তিনিও পরমেশ্বরের একতা প্রচার করতেন এবং হিন্দুবাদ ও ইসলাম উভয়ের উগ্রতার দোষ দিতেন। যখন একটি মধ্যপন্থা বাতলাতেন, তখন নানক তার অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করতেন ভন্ডামী, স্বার্থপরতা এবং মিথ্যাকথন পরিত্যাগ করতে।

আকবর শিখধর্মের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন; যার কারণে তিনি একদা শিখ ধর্মের গুরু অমরদাসের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৩২] এ ভ্রমণে তিনি গুরু সাহেবকে একটি গ্রাম উপহার দেন, সেখানে পরে গুরু রামদাস অমৃতসরে 'দরবার সাহেব' প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৩]

ভক্তি-প্রথার বাণী ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টিতে অনেক দূর অতিক্রম করেছিলো। মুসলমানগণ হিন্দু শিক্ষা গ্রহণে ঝুঁকেছিলো। রিজ্‌কুল্লাহ্ মুস্তাকি এবং মিয়া তাহা এক্ষেত্রে বিখ্যাত।[৩৪]

মুহাম্মদ গাওস গোয়ালিয়ারি 'অমৃতকুন্ডু' নামে একটি বই হিন্দি থেকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং এর নাম দেন 'বাহরুল হায়াত,' যার মধ্যে ইয়োগার বসার অবস্থানও বিস্তারিতভাবে আলোচিত।[৩৫] তার অনেক হিন্দু শিষ্যও ছিলো। এমনকি তানসেনের পিতা মুকরান্দ পান্ডের তার উপর ভীষণ আস্থা ছিলো। [৩৬] ভক্তি প্রথার প্রভাব ছিলো এমন, মহান সাধক শেখ আব্দুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহঃ) এর ছেলে শেখ রুকন উদ্দীন সচরাচর ভক্তি প্রথার একজন সাধক অনন্তকার এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হন।[৩৭] অনন্তকার বাবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।[৩৮]

---

৩২. Sree Nawas Achariya, *The Mughals and Portuguese*, Madras: 1927, p. 59.
৩৩. Udham Singh, *Tarikh Darbar Saheb*, Amritsar, Gujranwala: 1912, p. 16.
৩৪. Khalia Ahmad Nizami, op.cit., p. 451.
৩৫. Muhammad Gaoth Goaliary, *Bahrul Hayat*, Lucknow: 1947. The micro-film of the book is with Muhammad Aslam, the Writer of Din-i-Ilahi Aur Uska Pasmanzar, p. 147 (Foot note).
৩৬. Al-Dahabi, *Aj-Kal Mosiqi*, Delhi, 1956, p. 87.
৩৭. Shaikh Rukunuddin; *Lataif-e-Qudusi*, Delhi: 1311 A.H. p.74. Professor Khaliq Ahmad Nizami instead of Anantakar mentioned the name of Balnath. But in 'Latif-e-Qudusi', the name of Anantakar is repeatedly mentioned. *Salatini Delhi ka Madhahibi Rujhanat*, p. 451.
৩৮. Shaikh Rukunuddin, *Latif-e-Qudusi*, Ibid, p. 74.

Dhaka University Institutional Repository

আকবরের রাজত্বকালে, যখন তার আদেশে হিন্দু ধর্মীয় বইসমূহ ফার্সীতে অনূদিত হয়েছিলো, তখন মুসলিম পন্ডিতদের একটি দল ছিল; যারা হিন্দু সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দ্বারা মানসিকভাবে খুবই প্রভাবিত হন।[৩৯]

আকবর সত্যের সন্ধানে মাঝে মাঝে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী জদরুপ এর সাক্ষাৎ করতেন। যখন আকবর 'খানদেশ অভিযান' থেকে ফিরছিলেন, তখনও তিনি 'উজ্জাইনি' এর নিকট জদরুপের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৪০]

বাদশাহ জাহাঙ্গীরও তার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন। তার পরামর্শ অনুযায়ী বাদশাহ জাহাঙ্গীর একটি 'সের' এর ওজন স্থির করলেন ছত্রিশ ড্যাম।[৪১] জদরুপের অনুরোধের কারণে, যখন তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ হয়, তখন বাদশাহ জাহাঙ্গীর তার ছেলে খসরুকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।[৪২] সুতরাং, এটা পরিস্কার যে, আকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়ের উপর হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের একটি স্থায়ী প্রভাব ছিলো।

'সুল্‌হ-ইকুল' তথা চিরন্তন সহনশীলতার নীতি ভারতে এমন এক পরিবেশ তৈরী করেছিলো যে, যখন অমৃতসরের 'দরবার সাহেব' এ গুরু অমরদাস 'হর মন্দির' এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অভিপ্রায় করেন, তখন তিনি লাহোরের হযরত মিয়া মীর নামক একজন আদর্শ সূফীকে আমন্ত্রণ জানান। যিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বাদশাহ আকবরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।[৪৩]

সে সময়ে কিছু হিন্দু সাধকও তাদের হিন্দু বিশ্বাসের সাথে ইসলাম ধর্ম সত্য বলে বিবেচনা করেন; এবং তারা এও বিশ্বাস করতো যে, আসলে রাম ও রহিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[৪৪]

প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানরা ভারত জয় করেছিলো এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করে দীর্ঘ চারশত বছর শাসন করে। দেশটিকে সার্বিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবেই বিচেনা করা হতো এবং এভাবে, রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম প্রভুত্বকারী হিসেবে ছিলো। কিন্তু, বাদশাহ আকবর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিপরীতমুখী স্রোতের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন;

---

৩৯. Badauni, *Muntakhabut Tawarikh*, Vol-II, Maktaba Salfia, Calcutta: 1915, p. 269.
৪০. Nuruddin Jahangir, *Tujuk-i-Jahangiri*, Hanif Book Library, Aligarh: 1864, p. 176.
৪১. Nuruddin Jhangir, *Tujuk-i-Jahangiri*, Ibid, p. 121.
৪২. Kamgar Hossaini, *Mathir-i-Jahangiri*, British Museum, London: 1979, p-121.
৪৩. Udham Sing, op. cit., p. 84
৪৪. Shaikh Ahmad (R), *Maktubat Imam Rabbani*, Vol-i, Asrare Karimi Press, Lucknow: 1877, Maktub No. 167.

Dhaka University Institutional Repository

'সুল্‌হ্‌-ই-কুল' নীতি উপস্থাপিত হলো এবং এভাবে ভারতে ইসলামের কর্তৃত্ব নেমে এলো 'দারুল ইসলাম' থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে।[৪৫]

আকবর সচরাচর প্রত্যেক ধর্মের আদর্শের সাথে 'ইবাদাত খানা'য় সাওয়াল-জাওয়াবে ধৈর্য্যের সাথে অংশগ্রহণ করতেন এবং তিনি প্রত্যেক ধর্মের প্রতি এতটাই উদার মনোভাব পোষণ করতেন যে, সব ধর্মাবলম্বীরাই তাকে নিজ নিজ মতাদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে গণ্য করতো।[৪৬]

বাদশাহ্‌ আকবরের এই 'সুলহ্‌-ই-কুল' নীতির কারণে, এই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম এবং মুসলমানদের স্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; যা এখনো পুরুদ্ধারের অপেক্ষায়।[৪৭]

সুতরাং, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস এমন অবস্থায় ছিলো, যা এর প্রচলিত ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তব প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন ঘটায়।

মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (রহঃ) ছিলেন একক ব্যক্তিত্ব, যিনি জেগে ওঠেন এবং আকবরের 'দ্বীন-ই-ইলাহী' এর প্রচারণার বিরুদ্ধে বীরের মতো যুদ্ধ করেন। আর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' হলো বিভিন্ন উপাদানের বাইরে পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে আংশিকভাবে নেয়া, আংশিক ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে এবং একটি নির্দিষ্ট ব্যপ্তিতে যা খ্রীস্টের বাণী থেকে তার উদ্দেশ্যে খাপ খাওয়া একটি নতুন ধর্মীয় অঙ্গন।[৪৮]

যদিও সে সময়ে কিছু সত্যসন্ধানী ওলামা এবং সূফী ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন, যারা সত্যিকার অর্থেই ইসলামকে ভালোবাসতেন; তথাপি মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (রহঃ) ই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন কু-প্রথাকে নির্মূল করে ইসলামকে প্রকৃত অর্থে অর্থবহ করার লক্ষ্যে ইসলামী শরীয়াতের ঝান্ডাকে সমুন্নত করার জন্যে দৃঢ় মনোবল নিয়ে তৎকালীন ইসলাম বিরোধী সরকারী নীতির বিরুদ্ধে মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ইসলামের সত্য বিশ্বাসকে পুনর্জীবিত করতে কঠোর চেষ্টা করেন।[৪৯]

---

৪৫. Muhammad Aslam, op. cit., p. 151.
৪৬. Majumder, R.C., op. cit., p. 452.
৪৭. Muhammad Aslam, op. cit., p. 151.
৪৮. Majumder, R.C., *An Advanced History of India*. op. cit., p. 452.
৪৯. Maududi, *A Short History of the Revivalist Movement in Islam*, India office Library, Lahore: 1963, pp. 76-77.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ও ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ও সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থাঃ

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন একটি নাম, একটি ইতিহাস। ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বিশ্ব ইতিহাসে বিস্ময়কর এক মনীষা। যিনি স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সমধিক আলোচিত ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী ও তদীয় পুত্র সাবেক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রী রাজীব গান্ধীর নির্বাচনী এলাকা উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী আমেথী পরগণায় আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ বছরেরও অধিককাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আহমাদ মুল্লাজীউন আজ আর পৃথিবীতে নেই। কিন্তু, তিনি যে অমর কীর্তি রেখে গেছেন, তার জন্য আজো তিনি মানুষের হৃদয়ে মুকুরে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন। তিনি যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন, তা আজো বিশ্ব মুসলিমের জীবন চলার পাথেয় হয়ে আছে। গোটা বিশ্ব ঋণী হয়ে থাকবে তার কাছে আজীবন।

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় যার ছিলো সরব পদচারণা। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস, সূফী এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ শিক্ষা গুরু। আমরা আল্লামা আহ্‌ম্যাদ মুল্লাজীউনের জীবন-দর্শন ও ইসলামী আইন চর্চায় তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিকভাবে আহ্‌ম্যাদ মুল্লাজীউন ও তার সমসাময়িক ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান নিম্নে উপস্থাপন করছিঃ

১। আকবরের জন্ম ও প্রাথমিক জীবনঃ

উপমহাদেশে মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসে মোগল শাসনামল নিঃসন্দেহে বিশ্বনন্দিত একটি গৌরবময় অধ্যায়। মোগল বাদশাহ্‌গণ শৌর্য-বীর্য, শাসন-প্রশাসন, সম্পদ-সম্ভার, মহানুভবতা,

Dhaka University Institutional Repository

পরধর্মমত সহিষ্ণুতা, শিল্পবোধ, ইতিহাসে সৃষ্টি, সাহিত্যানুরাগ, সংস্কৃতি প্রিয়তা প্রভৃতি বিষয়ে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তা নিখিল বিশ্বের ঐতিহাসিকবৃন্দ তথা ইতিহাসের পাঠকবর্গের নিকট আজো বিশ্বের বিস্ময় হয়ে আছে। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মোগল বাদশাহগণের মধ্যে বাদশাহ্ আকবরই ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সমধিক প্রশংসিত। তার যে সকল কীর্তিকলাপ তাকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে, সেগুলোর মধ্যে তার নব প্রবর্তিত 'দ্বীন-ই-ইলাহী' অন্যতম।

বলা বাহুল্য, তার এই মতবাদের প্রচার উপমহাদেশের তদানীনন্তন মুসলিম ক্বাওম ও দ্বীন ইসলামের জন্য যে সুদূরপ্রসারী হুমকির পটভূমি রচনা করে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (রহঃ) এর ন্যায় করিৎকর্মা, আপসহীন, নির্ভীক ও কামিয়াব সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। বাদশাহ আকবরের এই সর্বনাশা 'দ্বীন-ই-ইলাহী' প্রচার ও তার পরিণতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কনৌজর যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট পরাজিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াবার পর যখন অমরকোটের রাণা প্রসাদের রাজ্যে আশ্রয় নেন, তখন ১৫৪২ খৃস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর আকবর জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা হামিদা বানু বেগম ছিলেন সিন্ধুর শাইখ আলী আকবর জামীর কন্যা।[৫০]

সুদীর্ঘ ১৫ বছর ১৫৪০-৫৫ খৃঃ পর্যন্ত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার পর শুর শাসকদের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে হুমায়ুন ১৫৫৫ খৃস্টাব্দে সেরহিন্দের নিকটে সিকান্দার শুরকে পরাজিত করে লাহের দখল করেন। সে বছরই তিনি দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। কিন্তু, তিনি বেশীদিন তার জীবনব্যাপী সংগ্রামের সুফল ভোগ করতে পারেননি। ১৫৫৬ খৃস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী হুমায়ুন দিল্লীতে তার পাঠাগরের সিঁড়ি থেকে পড়ে ইন্তেকাল করেন।[৫১]

হুমায়ুনের মৃত্যুকালে মাত্র ১৩ বছর বয়সের কিশোর আকবর তার অভিভাবক বৈরাম খানের সাথে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কালানুর শহরে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া

---

৫০. Smith, V.A., *Akbar the Great Mughal*, op.cit., pp. 10-11.
৫১. Majumder, R.C., *An Advanced History of India*, op. cit., p. 438.

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র তার বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর সুচতুর বৈরাম খান অবিলম্বে জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবরকে ১৫৫৬ খৃস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।[৫২]

১৫৬০ খৃস্টাব্দে আকবরের বয়স যখন ১৮ বছর, তখন তিনি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তার গৃহশিক্ষক মীর আব্দুল লতিফের দ্বারা অভিভাবক বৈরমে খানকে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠানঃ

"আপনার সততা ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভরশীল হয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যের দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করে আমি শুধু আমোদ-প্রমোদেই লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু, এখন আমি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনি এতোদিন যে বাসনা পোষণ করে এসেছেন, সে অনুযায়ী এটা বাঞ্ছনীয় যে, আপনি পবিত্র হাজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা হন। আপনার ভরণ-পোষণের জন্য হিন্দুস্থানের পরগণাগুলি হতে একটি যথোপযুক্ত জায়গীর দেয়া হবে এবং ঐ জায়গীরের রাজস্ব আপনার প্রতিনিধির মাধ্যমে আপনার নিকট প্রেরিত হবে।"[৫৩]

এভাবে আকবর সভাসদদের সমস্ত পার্শ্ব-প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে রাজ্যের শাসনভার একান্ত ভাবে নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং ভারতে মোগল সাম্রাজকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন।

২। বাদশাহ্ আকবরের প্রাথমিক ধর্ম বিশ্বাস ও তার যোগসূত্রঃ

বাদশাহ্ আকবরের 'দ্বীন-ই-ইলাহী' সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে সংক্ষেপে তার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, বাদশাহ্ আকবরের পিতা ও পিতামহগণ নাসিরুদ্দীন উবায়েদ আহ্রার (রহঃ) এর ভক্ত ছিলেন, যিনি নকশ্বন্দীয়া ত্বরীক্বার একজন বিশিষ্ট ওলী ছিলেন। তুর্কীস্তান, ফারগানা, মা-ওরাউন্ নাহার ও খোরাসানের অধিবাসীরা তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। বাবরের প্রপিতামহ আবু সাঈদ প্রায় পদব্রজে তার দরবারে যাতায়াত করতেন।[৫৪]

---

[৫২]. Smith V.A., op.cit., p. 22.
[৫৩]. Elliot, *History of India as told by its own Historians*, London: 1875, p. 264.
[৫৪]. আমীন আহমাদ, *হাফ্ত ইক্লিম*, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডনঃ ১৯৫৭, পৃ. ৫৩১।

Dhaka University Institutional Repository

বাবরের পিতা 'উমর শেখ মীর্জা' খাজা উবায়েদ আহরার (রহঃ) এর খুবই ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। খাজা সাহেব তাকে খুবই স্নেহ করতেন, সেজন্য তিনি তাকে প্রায়ই 'আমার পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন।[৫৫]

বাবরের জন্ম-মুহূর্তে 'উমর শেখ মীর্জা' খাজা সাহেবের দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং তাকে সেখানেই এ সুখবর শোনানো হয়। পুত্রের জন্ম সংবাদে খুশী হয়ে মীর্জা সাহেব খাজা সাহেবের কাছে এ মর্মে আবদার করেন যে, তিনি যেন নবজাতকের একটি নাম রেখে দেন। তার অনুরোধে খাজা সাহেব নবজাতকের নামকরণ করেন- যহীর উদ্দীন মুহাম্মদ।[৫৬] এমনকি উমর শেখ মীর্জার অনুরোধে খাজা সাহেব বাবরের আক্বীকা অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন।[৫৭]

বাবরের জীবনস্মৃতি তুযুকের বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি খাজা সাহেবের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, এবং এ কারণেই তিনি নক্‌শবন্দীয়া ত্বরীকার শাইখদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বাবর স্বীয় কন্যা গুলবদন বেগমকে নুরুদ্দীন মুহাম্মাদ এর সাথে বিবাহ দেন, যার পূর্বপুরুষ ছিলেন খাজা বাহাউদ্দীন নকশ্‌বন্দ (রহঃ)।[৫৮]

তাঁদের ঔরসে সালিমা সুলতানা বানু জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বৈরাম খানের সাথে তার বিবাহ হয়। বৈরাম খানের মৃত্যুর পর বাদশাহ আকবর নকশ্‌বন্দীয়া খান্দানের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সালিমা সুলতানা বানুকে বিবাহ করেন। বাদশাহ আকবরের এক বোন সখিনা বানুকে নকশ্‌বন্দীয়া ত্বরীকার অন্যতম সূফী খাজা হাসান নক্‌শবন্দীর সাথে বিবাহ দেয়া হয়। আকবরের অপর বোন বখ্‌শী বেগমকে খাজা শরফুদ্দীন হুসাইনের সাথে বিবাহ দেয়া হয়, যিনি খাজা নাসির উদ্দীন উবায়েদ আহ্‌রারের পুত্র ছিলেন।[৫৯]

---

৫৫. যহীর উদ্দীন বাবর, *তুযুকে বাবরী,* বোম্বেঃ ১৩০৭ হি., পৃ. ৬।
৫৬. ফয়জী সিরহিন্দী, *আকবর নামা,* ১ম খন্ড, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডনঃ ওরিয়েন্টাল-১৬৯, পৃ. ৮৭, (তা.বি.)।
৫৭. Abdul Ghani, Dr., *A History of Persian Language and Literature at the Mughal Court,* Vol-i, Matba Karimiyah, Ilahabad: 1930, p.7.
৫৮. নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর, *তুযুকে জাহাঙ্গীরী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।
৫৯. মুহাম্মদ হুমায়ুন আযাদ, *দরবারে আকবরী,* লাহোরঃ ১৯৪৭, পৃ.৭৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

খাজা শরফুদ্দীনের পিতা খাজা মুঈন উদ্দীন (রহঃ) একবার হিন্দুস্থান সফরে আসলে আকবর তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান।[৬০] একইরূপে খাজা আ'ব্দুশ শহীদ যার পূর্বপুরুষ ছিলেন খাজা বাক্বী বিল্লাহ (রহঃ), ভারত ভ্রমণে আসলে বাদশাহ্ আকবর তাঁকেও আন্তরিক শ্রদ্ধা জানান।[৬১]

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাদশাহ্ আকবর, তাঁর পিতা ও পিতামহদের সূফীগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিলো। 'মাখ্দুম-উল-মুলক' মাওলানা আব্দুল্লাহ সুলতানপুরী তাঁর সময়ের একজন বিশিষ্ট আ'লিম ছিলেন।[৬২]

তার বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে শেরশাহ্ শুর তাঁর আমলে তাঁকে 'সদর-ই-ইসলাম' খেতাবে ভূষিত করেন। শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম শাহ্ যখন সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে একই সাথে সিংহাসনে বসতেন।[৬৩]

দ্বিতীয়বার হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পর তিনি আব্দুল্লাহ সুলতানপুরীকে 'শাইখুল ইসলাম' খেতাবে ভূষিত করেন। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে বৈরাম খান তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তাঁকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার একটি বিশেষ ভাতা প্রদান করতেন। বৈরাম খানের পতনের পরেও আকবর তাঁর প্রতি একইরূপে সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর মর্যাদা ও দেয় ভাতাদি অক্ষুন্ন রাখেন।[৬৪]

"উলামা ও মাশাইখ্দের মহৎ সংস্পর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আকবর দৈনিক পাঁচবার যথারীতি সালাত আদায় করতেন এবং শারীয়াতের অন্যান্য হুকুম আহকামও মেনে চলতেন। তিনি অনেক সময় আযান দিতেন এবং মাঝে মাঝে সালাতে ইমামতী ও করতেন। এছাড়া তিনি সাওয়াবের আশায় কখনও কখনও মসজিদ ও ঝাড়ু দিতেন।"[৬৫]

---

[৬০]. নিজামুদ্দীন আহমদ, *তারীখে আল্ফী*, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডনঃ ইতিহাস-১১৪, পৃ. ৪৬২,।
[৬১]. আব্দুল কাদির বদায়ূনী, *মুনতাখাবুত্ তাওয়ারীখ*, ২য় খন্ড, কলকাতাঃ ১৮৬৫, পৃ. ১৭১।
[৬২]. কিউল রাম, *তাযকিরায়ে উমারা*, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লন্ডনঃ ওরিয়েন্টাল- ১৬৯, পৃ. ১১২ (তা. বি.)।
[৬৩]. শাহনেওয়াজ খান, *মাআসিরুল উমারা*, ৩য় খন্ড, কলকতাঃ ১৮৮৮, পৃ. ২৫২।
[৬৪]. শিব্লী নু'মানী, *শিয়ারুল আজম*, ৩য় খন্ড, জাফর বুক ডিপো, লাহোরঃ পৃ. ৪০ (তা. বি.)।
[৬৫]. শাহনেওয়াজ খান, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৬১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম জীবনে বাদশাহ্ আকবর রীতিমত পাঁচবার জামাআ'তে সালাত আদায় করতেন এবং এজন্য তিনি সপ্তাহের সাত দিনের জন্য সাতজন ইমাম নিয়োগ করেন। বাদায়ূনী ও ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[৬৬]

প্রতি বছর হাজ্জের মওসুমে বাদশাহ আকবর একজনকে 'আমীর-ই-হাজ্জ' নিযুক্ত করতেন এবং বলতেন, যে কেউ তাঁর সাথে হাজ্জে গমন করবে, তার সমুদয় খরচ সরকার বহন করবে। এছাড়া প্রতিবছর তিনি পবিত্র কা'বা ঘরের জন্য এবং তাঁর প্রতিবেশীদের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, হাজীদের বিদায় মুহূর্তে ইহরামের কাপড় পরতেন, মস্তক মুন্ডন করতেন, তাকবীর পাঠ করতেন এবং হাজীদের সাথে খালি মাথায় নগ্নপদে বহুদূর পর্যন্ত গমন করতেন।

নবী করীম (সা.) এর প্রতি বাদশাহ আকবরের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিলো, তা নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়। যখন শাহ আবু তুরাব হাজ্জ্ব সমাপনান্তে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি সেখান থেকে এমন একখন্ড পাথর আনেন, যার উপর মহানবী (সা.) এর পদচিহ্ন বিদ্যমান ছিলো। এই সংবাদে আকবর তাঁর সংবর্ধনা জ্ঞাপনার্থে দীর্ঘ আট মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং আমীর উমারা ও আ'লিমদের ও তিনি সাথে নিয়ে যান।[৬৭]

বাদশাহ আকবর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরিবার পরিজনের প্রতিও খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যার ফলে তিনি তাঁর যমজ সন্তানের নাম রাখেন- হাসান ও হুসাইন।[৬৮]

ইসলাম ও ইসলামী সাহিত্যের প্রতিও বাদশাহ্ আকবরের গভীর অনুরাগ ছিলো। প্রতি রাতে শোয়ার পূর্বে নকীব খানের কাছ থেকে তিনি ধর্মীয় গ্রন্থাদির কিছু অংশ শ্রবণ করতেন।[৬৯]

আবুল ফযল তাঁর দরবারী জীবনের প্রথম দিকে আ'য়াতুল কুরসীর তাফসীর লিখে বাদশাহ আকবরকে উপহার দিলে তিনি খুবই খুশী হন এবং তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীকালে উক্ত গ্রন্থটি স-সম্মানে রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হয়।

একই সময়ে মোল্লা আব্দুল ক্বাদীর বাদায়ূনী চল্লিশ হাদীসের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। তাতে আহার্য বস্তু ও তীর নিক্ষেপের উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা ছিলো। বাদশাহ্ আকবর উক্ত গ্রন্থটিও রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ দেন।

---

[৬৬]. আব্দুল কাদির বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড পৃ. ২২৭।
[৬৭]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৯,২৫১ ও ৩১০।
[৬৮]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
[৬৯]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষেপে এটাই ছিলো বাদশাহ্ আকবরের প্রথম জীবনের ধর্মীয় অনুভূতি, যা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে যায়; যার ফলশ্রুতিতে তিনি ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যার ক্ষতি এখনো পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি বিভিন্ন প্রভাবাধীনে গড়ে উঠেছিলো। পৃথিবীর ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী ছিলো সন্দেহ, সংশয় ও অনুসন্ধানের যুগ এবং আকবর ছিলেন ঐ যুগের একজন প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি। [৭০] সে যুগ ছিলো ধর্মান্দোলনের যুগ, সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতার যুগ। কবীর, নানক, শ্রী চৈতন্য, রামানন্দ প্রমুখ ব্যক্তি সে সময় বিশ্বপ্রেম, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন। এই সকল ধর্মনেতার আদর্শ, উদারতা, সহিষ্ণুতা আকবরের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তার রাজপুত পত্নীদের প্রভাবও তাঁর উপর নেহাত কম ছিলো না। তিনি শুধু যুগধর্মের শিক্ষানবিসই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এর অবিকল প্রতিরূপ।[৭১]

ভক্তি ও মাহ্দী আন্দোলন তখন জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। সহস্র বছরের শেষভাগে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য একজন 'মাসীহ্' পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন, এটাই ছিলো মাহদীপন্থীদের বিশ্বাস। এই উপমাহাদেশে জৈনপুরের জনৈক সাইয়েদ মুহাম্মদ এ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং নিজেকে তিনি সেই বিশেষ 'মাহ্দী' বলে ঘোষণা করেন। আফগানিস্তানেও অনুরূপ রাসনী আন্দোলন দেখা দেয়। রাসনীগণও একজন 'মাসীহ' বা উদ্ধার কর্তার আবির্ভাবে বিশ্বাস করতো। এই আন্দোলন সম্রাট আকবরের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং তিনিও একজন পয়গাম্বর এবং 'ধর্মপ্রবর্তক' হওয়ার সংকল্প করেন।[৭২]

তদুপরি শিয়া, সুন্নী, মাহ্দী ও সূফী সম্প্রদায়গুলোর দ্বন্দ্ব, পরস্পর বিদ্বেষ এবং আ'লিমদের ধর্মান্ধতা সম্রাট আকবরের মনে ব্যথার উদ্রেক করে। অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মদ্বন্দ্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি উদারপন্থী ও উন্নতমনা ছিলেন। তাঁর অন্তরে পরধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় ব্যাপারে চরম উদার ভাব সৃষ্টি হলে তিনি ক্রমেই সর্বধর্ম সারগ্রাহী

[৭০]. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, op. cit., p.289.
[৭১]. Majumder, R.C., *An Advanced History of India*, op. cit., p. 458.
[৭২]. কে, আলী, *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন, ঢাকাঃ ১৯৭৬, পৃ. ৬৪-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন ধর্ম একই স্থানে পৌছবার বিভিন্ন পথ মাত্র এবং সর্ব ধর্মের সার গ্রহণ করা ছিলো তাঁর ধর্মের মূলনীতি। ক্রমে হিন্দু, জৈন, পারসিক ও খৃস্ট ধর্মের সার ও মূল কথা কী, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।[৭৩]

এই উদ্দেশ্যে তিনি ফতেহপুর সিক্রিতে ৯৮৩ হিজরীতে একটি 'ইবাদতখানা'[৭৪] নির্মাণ করেন। সেখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মণীষীগণ একত্রিত হয়ে পরস্পর আলা-আলোচনা ও তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতেন। সম্রাট আকবর তা শুনতে খুবই পছন্দ করতেন।

সম্রাট আকবরের এই ইবাদাতখানায় গোয়ার জেসুইট ধর্মযাজক ফাদার রিডল্ফ একুইভিডা, ফাদার এন্টোনিও মনসারেট সহ হিন্দু, জৈন দার্শনিকগণ ও বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ ধর্মালোচনায় যোগদান করতেন। আ'লিমগণের ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও আলোচনা আকবরের অনুসন্ধিৎসু মনকে শান্ত করতে পারলো না। তাই তাঁর কৌতূহলী মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো এবং সত্য কী, তা অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করলেন। তিনি প্রত্যেক ধর্মের মূলতত্ত্ব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং প্রত্যেক ধর্মের প্রতি এমন অনুরক্তি প্রকাশ করতেন যে, জনসাধারণ তাঁর ধর্ম সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা করার অবকাশ পেলো। আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে এসে ক্রমে তিনি এক স্বতন্ত্র ধর্মচিন্তায় লিপ্ত হন।

'মাখদুম-উল-মুলক' ও 'আবদ-উন-নবী'র মধ্যে ঘৃণ্য বিবাদের ফলে তিনি খুবই ব্যথিত হন এবং উভয়কে ধর্মনেতা হিসেবে অনুপযুক্ত মনে করেন। এর ফলে তাঁর ধর্ম সংক্রান্ত বিদ্রোহী মনে সত্যানুসন্ধানের তীব্রতা ও ইচ্ছা আরও প্রবল হয়ে উঠে। রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হয়েও তিনি ধর্মনেতা হতে পারেন বলে শাইখ মুবারকের পরামর্শ সম্রাট আকবরের মনে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৭৫]

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সম্রাট আকবর কাদের দ্বারা, কীরূপে, কতটুকু প্রভাবিত হয়ে নতুন ধর্মমত প্রচারে উদ্bুদ্ধ হন।

৩। অসৎ আ'লিমদের প্রভাবঃ

৯৮৩ হিজরীতে ইবাদাতখানা তৈরীর পর, সম্রাট আকবর আ'লিমগণকে ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সেখানে আসার জন্য অনুরোধ করেন। প্রত্যেক শুক্রবার জুমআ'র সালাতের পর তিনি আ'লিমদের সাথে ধর্মীয় আলোচনার উদ্দেশ্যে সেখানে বসতেন। অনেক সময় সম্রাট আকবর 'ইয়াহুয়া' 'ইয়া হাদী' যিকিরে সারারাত্রি সেখানে অতিবাহিত করতেন। অতি প্রত্যুষে তিনি

---

[৭৩]. এ,কে,এম, আব্দুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৭৩, পৃ. ২৬১।
[৭৪]. ইবাদতখানা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর ও আলোচনা, দ্রষ্টব্যঃ *তবকাত-ই-আকবরী*, Elliot, ৫ম খন্ড, পৃ. ৯০-৯১।
[৭৫]. আব্দুল আলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদাতখানা থেকে বের হয়ে একটি পাথরের উপর উপবেশন করে অবনতমস্তকে ইবাদাত ও মুরাকাবায় লিপ্ত হতেন।

বস্তুত দেখা যায় যে, সম্রাট আকবর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইবাদাতখানা নির্মাণ করেন এবং আ'লিমগণকে ধর্মীয় আলোচনার উদ্দেশ্যে সেখানে আসার জন্য দাওয়াত করতেন। একবার তিনি শায়খ মুহাম্মদ গাওসের পুত্র শায়খ জিয়াউল্লাহকে সেখানে দাওয়াত করেন এবং তাঁর সম্মানে ভোজের ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার আকবর সাইয়্যিদ, শায়খ, উলামা ও আমীরদিগকে ইবাদাত খানায় দাওয়াত করতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাদশাহ্ আকবরের এই সদিচ্ছা অধিকাংশ দুনিয়াদার আ'লিমদের হটকারিতায় বিফলে পর্যবসিত হয়। তারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এবং বাদশাহের নৈকট্য লাভের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন এবং পরস্পর অসংলগ্ন বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। এই কারণে তিনি বাদায়ূনীকে বলেনঃ

> "ভবিষ্যতে যদি কোনো আ'লিম অসংযতভাবে এরূপ অসংলগ্ন
> কথা-বার্তা বলে, তবে তাকে ইবাদাতখানা থেকে বহিস্কৃত করা হবে।"

কিন্তু বাদশাহ্ আকবরের এ নির্দেশ দুনিয়াদার উলামাদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি; বরং তারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যপূর্ববৎ কাজে লিপ্ত থাকেন। এটা আকবরের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।[৭৬]

অসৎ আ'লিমদের অন্যতম 'মাখ্দুম-উল-মূলক' স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যাকাত না দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি অভিনব পন্থা আবিস্কার করেন। বছরের শেষের দিকে তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি স্বীয় স্ত্রীর নিকট অর্পণ করতেন এবং তা শেষ হবার পূর্বেই আবার ফিরিয়ে নিতেন। একইভাবে শাহী দরবারের অন্যতম প্রভাবশালী আ'লিম শায়খ 'আব্দ-উন্-নাবী' যাকে বাদশাহ্ আকবর অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন; যাকাত না দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনিও একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন। এ কারণে বাদশাহ্ তার প্রতি খুবই রুষ্ট হন এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে তাঁকে জোরপূর্বক মক্কায় পাঠিয়ে দেন।[৭৭]

---

৭৬. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২০০।
৭৭. বাদায়ূনী প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদতখানায় আ'লিমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল ছিলো মাখ্‌দুম-উল-মুলকের নেতৃত্বে এবং অন্যদল শাইখ আব্‌দ-উন-নাবীর। এঁরা একজন অন্যজনকে বোকা এমনকি ধর্মত্যাগী বলতেও দ্বিধাবোধ করতো না।[৭৮]

'মাখ্‌দুম-উল-মুলক' ও শাইখ 'আব্‌দ-উন-নাবী' যখন পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও আত্মকলহে ব্যস্ত, সে সময় তাজ-উল-আরিফীন নামেক খ্যাত; শাইখ তাজউদ্দীন ইবাদাত খানায় আগমন করেন এবং 'যমীন-বুস' নামে আকবরের জন্য সিজদাহ্ প্রথার প্রচলন করেন।

হাজী ইব্রাহীম নামক জনৈক ব্যক্তি এ মর্মে একটি জাল হাদীস আকবরের নিকট বর্ণনা করে যে, একদা কোনো এক সাহাবীর ছেলে দাঁড়ি মুন্ডিত অবস্থায় নবী করীম (সা.) এর খেদমতে হাজির হলো। তাকে দেখে মহানবী (সা.) বললেন 'বেহেশ্‌তের অধিবাসীদের চেহারা এরূপ হবে।' এ ঘটনা সম্রাট আকবরকে দাঁড়ি মুন্ডনে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি একে বৈধ ঘোষণা করেন।[৭৯]

ইবাদাতখানার আলোচনায় যখন কোনো আ'লিম কোনো বিষয় সম্পর্কে হালাল হওয়ার ফাত্‌ওয়া দিতেন, তখন অন্যজন তাকে হারাম বলে আখ্যায়িত করতেন। এ সমস্ত অনৈতিক কার্যাবলী বাদশাহ আকবরকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে এবং তিনি তাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান হারিয়ে ফেলেন।

এই সুযোগে চতুর ও জ্ঞানী শাইখ আবুল ফযল বাদশাহ আকবরের উপর গভীর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন, এবং তার চরম নৈকট্য লাভের মাধ্যমে তাকে নতুন ধর্ম প্রচারে প্ররোচিত করেন। বাদশাহ আকবর আবুল ফযলকে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আ'লিম হিসেবে সম্মান করতেন। ইবাদাতখানার আলাপ-আলোচনার সময় সত্যান্বেষী আ'লিমগণ যখন ইমাম বাক্বিল্লানী, ইমাম হালওয়ারী, ইমাম গাযালী এবং ইমাম রাযীর ন্যায় মুজতাহিদগণের কোনো বক্তব্য উদ্ধৃত করতেন, তখন আবুল ফযল বলতেনঃ

> "আমার সামনে ঐ সমস্ত মিষ্টান্ন বিক্রেতা ও
> চর্মকার ইত্যাদির কথা বলবেন না।"

তিনি নিজেকে তাদের চাইতে উত্তম মনে করতেন।

---

৭৮. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

৭৯. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইমামদের অনুসারীদেরকে কঠোর বাক্যে আক্রমণ করে পূর্ণদরবারে আবুল ফযল বলতেনঃ তারা অন্ধ অনুকরণের নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।[৮০] এভাবে আবুল ফসল এবং তাঁর অনুসারীরা বাদশাহ আকবরকে ইমামদের অনুসরণ না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং তা থেকে তাঁকে মুক্ত করে ইবাদাতখানার দরজা সবজাতি ও ধর্মের লোকদের জন্য খুলে দেবার বন্দোবস্ত করেন।

এই সময় মোল্লা মুহাম্মদ নামক জনৈক ইরানী আ'লিম ইবাদাতখানায় উপস্থিত হয় এবং হযরত আলী (রা.) ব্যতীত 'খুলাফা-ই-রাশেদা'র অন্য তিন খলীফার সমালোচনায় মুখর হয়। সে আকবরের নিকট পূর্ববর্তী ইসলামের ইতিহাস অভিনব পদ্ধতিতে বর্ণনা করতে থাকে এবং সালাত, সাওম, ওহী ও মুজিযাকে কুসংস্কার হিসেবে আখ্যায়িত করে। এভাবে হাদীস নয়, তথাকথিত যুক্তিই তাঁদের নিকট ধর্মের একমাত্র বুনিয়াদ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

আবুল ফযল বাদশাহ আকবরকে এ মর্মে অবহিত করেন যে, ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্য রক্ষার তাকীদে মদ পান করা যেতে পারে। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী সকলের মদ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য বাদশাহ আকবর তাঁর প্রাসাদের নিকট মদের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। নববর্ষের ভোজে বাদশাহ আকবর উলামা, কাযী ও মুফতীগণকে মদ পানের জন্য উৎসাহিত করতেন। শাইখ-উল-ইসলামের পৌত্র খাজা ইসমাঈল নামক জনৈক বিখ্যাত আ'লিম এ সময় মাত্রাতিরিক্ত মদপানের ফলে মৃত্যুবরণ করেন।

বাদশাহ আকবরের সময় মোল্লা শিরী নামক জনৈক প্রখ্যাত আ'লিম সংস্কৃত গ্রন্থাদি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। যখন তিনি অবহিত হন যে, বাদশাহ প্রত্যহ সূর্যের দিকে তাকিয়ে তার এক হাজার নাম জপ করেন, তখন তিনি বাদশাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে সূর্যের প্রশস্তি সূচক এক হাজার লাইনের একটি কবিতা রচনা করেন।

কাসী 'আব্দ-উস-সামী' বাদশাহ আকবরের সময়ের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি মদ্যপ ও জুয়াড়ী ছিলেন এবং সুদ ঘুষ ও অন্যান্য অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম বৈধ মনে করতেন।[৮১]

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৎ আ'লিমগণ ইবাদাতখানা পরিত্যাগ করেন। শাইখ সেলিম চিশ্তীর পুত্র শাইখ বদরুদ্দীন ও নিরাশ হৃদয়ে আকবরের দরবার পরিত্যাগ করে প্রথমে

---

[৮০]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২৫৯।
[৮১]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২২১, ৩০১, ৩০৯, ৩১৪, ৩৩৬ ও ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আজমীর, পরে গুজরাট এবং অবশেষে মক্কায় গমন করেন এবং জীবনের বাকী অংশ সেখানেই অতিবাহিত করেন।

বাদশাহ আকবরও সত্যান্বেষী আ'লিমদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করবার ইচ্ছায় তাঁদের সকলকে রাজধানী শহর দিল্লী থেকে বহিস্কার করেন এবং 'মাহ্যির নামা'র বা অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্বের ঘোষণার মাধ্যমে অবশিষ্টগণের বাক-স্বাধীনতা হরণ করেন।[৮২]

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহঃ) বলেনঃ

> "আকবরকে সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করবার জন্য দুনিয়াদার অসৎ আ'লীমরাই দায়ী। তিনি তাদেরকে 'দীনের চোর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো পার্থিব শান-শাওকাত, মান-মর্যাদা ও ধন-দৌলত হাসিল করা।"[৮৩]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই আল্ফে সানী (রহঃ) আরও বলেনঃ

> "পূর্ববর্তী সময়ে দুনিয়াদার আ'লিমদের মতানৈক্য মুসলিম মিল্লাতকে দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিপতিত করেছে।"[৮৪]

৪। ভন্ড সূফীদের প্রভাবঃ

দুনিয়াদার অসৎ উলামা ব্যতীত ভন্ড সূফীরাও বাদশাহ আকবরের মানসিক পরিবর্তন ও নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সময়ের অধিকাংশ সূফী 'ওয়াহ্দাতুল উজূদ' বা 'হামা-উস্ত' 'সবই তিনি'- এর ধারক-বাহক ও প্রচারক ছিলেন।

এই সময়ের অন্যতম সূফী ছিলেন শাইখ আমান উল্লাহ পানিপথী। তিনি 'ওয়াহদাতুল উজূদ' সম্পর্কে বহু বই লিখে দ্বিতীয় ইবনে আরনাবী হিসেবে খ্যাত হন।[৮৫]

> "শাইখ আমান উল্লাহ্ পানিপথীর সম্পর্ক ছিলো 'মালামতিয়া সিলসিলার সাথে, যারা শরীয়াতের বিধান-মালার বাইরে ছিলো এবং এজন্য তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন না।"[৮৬]

---

[৮২]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২১২।
[৮৩]. হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফে সানী (র.), *মাকতূবাতে ইমামে রাব্বানী*, ১ম খন্ড, মাকতূব নং-৩৩, লক্ষ্ণৌঃ ১৮৭৭ইং।
[৮৪]. মুজাদ্দিদ আল্ফে সানী (র.), প্রাগুক্ত, মাকতূব নং- ৫৩ (তা. বি.)।
[৮৫]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় শাইখ আমান উল্লাহের অন্যতম শিষ্য শাইখ তাজউদ্দীন ও ভারতের একজন প্রখ্যাত সূফী ছিলেন। তিনি আকবরের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন এবং প্রায়ই রাত্রিবেলায় তিনি একান্তে তাঁর সহিত সূফীবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাঁদের মূখ্য আলোচনার বিষয় ছিলো- 'ওয়াহ্দাতুল উজূদ' সম্পর্কে। তিনি বলতেনঃ

> "অবিশ্বাসীরা চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে না,
> বরং পরে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

উক্ত শাইখ শরীয়াতের বিধি-বিধানের ভাষ্যে পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি বলতেন; 'যুগের সুলতানই পরিপূর্ণ মানুষ,' কাজেই তাঁর সম্মুখে 'যমীন বুস্' বা সিজদা করা বৈধ। তাঁর অভিমত ছিলো- 'আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই নাই।' এজন্য যখন তিনি আকবরকে দেখতেন, তখন তাঁকে সিজদা করতেন।[৮৭]

কাজেই এটা স্পষ্ট যে, আমান উল্লাহ্ পানিপথী ওত াঁর ভক্ত অনুরক্তগণ আকবরের সময় ইসলামী মূল্যবোধের অবমাননার জন্য প্রধানত দায়ী ছিলেন, বরং তাঁরা শরীয়াতের ধ্বংস সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এজন্য হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহঃ) এ সমস্ত তথাকথিত সূফীদেরকে দায়ী করে বলেছেনঃ

> "এই সময়ের অধিকাংশ জাহিল সূফীরা ছিলো অসৎ আ'লিমদের
> ন্যায়। তাদের এই ফিৎনা সুদূরপ্রসারী ছিলো।"[৮৮]

'ওয়াহ্দাতুল উজূদ' মতবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আকবর মনে করতে থাকেন যে, বহুভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেতে পারে এবং সর্ব ধর্মের বুনিয়াদ একই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মতবাদের অনুসারীদের ধারণা ছিলোঃ

> "সমস্ত সৃষ্টিতেই আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রকাশ বিদ্যমান। সুতরাং, তারকা
> পূঁজার ও অর্থ হলো আল্লাহর ইবাদাত। এই মতবাদের ফল ছিলো
> সহনশীলতা এবং সর্ব ধর্ম ও মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।"[৮৯]

---

[৮৬]. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ), *আখ্বারুল আখ্য়ার,* দিল্লীঃ ১৩৩২ হি. পৃ. ৪২।
[৮৭]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫৮-২৫৯।
[৮৮]. মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাকতূব নং-৪৭ (তা. বি.)।
[৮৯]. Dr. Tarachand, *The influence of Islam on Indian Culture*, op. cit., p. 57.

Dhaka University Institutional Repository

এই যুগের অন্যতম সূফী আখন্দ দরয়ূজার লেখনীতে জানা যায় যে, এই ফিতনার যুগে মানব-রূপী শয়তান চরিত্রের লোকেরা তাদের পিতা ও পিতামহের আসনে সমাসীন হয়।[৯০]

উক্ত চরিত্রের সূফী পরিচয়ধারীরা সাধারণ মানুষের সত্যধর্ম ও সত্যপথ থেকে বিভ্রান্ত করতে জঘন্য ভূমিকা পালন করে, যাদের সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহঃ) এর বক্তব্য পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আখন্দ দরয়ূজা, তাঁর 'তায্‌কিরাতুল আবরার ওয়াল আশরার' গ্রন্থে এই ধরণের বহু ভন্ড সূফীর নামোল্লেখ করেছেন, যারা প্রথমে নিজেরাই গুমরাহ্ হয় এবং পরে অন্যদেরকে গুমরাহ্ করে। এদের অন্যতম ছিলেন তথাকথিত পীর আব্দুর রহ্‌মান, যিনি পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাসী ছিলেন না।[৯১]

৫। হিন্দুদের প্রভাবঃ

নতুন ধর্মমত প্রচারে বাদশাহ্ আকবরের উপর হিন্দুদের বিরাট প্রভাব ছিলো। যৌবনে তিনি রাণী যোধবাই ও অন্যান্য হিন্দু ও রাজপুত রমণীদের পানি গ্রহণ করেন, যার ফলে হিন্দুদের সাথে অবাধ মেলামেশার কারণে তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস ফার্সী ভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দেন।[৯২] কালক্রমে 'হিন্দু-মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের' একটি দল গড়ে ওঠে।

এতদ্ব্যতীত রাজা বীরবল, পুরুষোত্তম ও দেবী নামক ব্রাহ্মণ বাদশাহ্ আকবরের মানসিক পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। দেবী তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। দেব-দেবী, অগ্নি, চন্দ্র-সূর্য ও তারকা পূঁজার পদ্ধতি শিক্ষা দেয় এবং ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, রাম-সীতা ও মহামায়া প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীদের প্রতি ভক্তিবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

---

[৯০]. আখুন্দ দরয়ূজা, *ইরশাদুত্ তালেবীন*, দিল্লীঃ ১৮৮৮, পৃ. ২৯৯।

[৯১]. আখুন্দ দরয়ূজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

[৯২]. মুহাম্মদ আসলাম, *দ্বীনে ইলাহী আওর উস্‌কা পাস্ মান্‌যার*, নদওয়াতুল মুসান্নেফীন, লাহোরঃ ১৯৬৯, পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের প্রভাবে বাদশাহ্ আকবর জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হন এবং পুনর্জন্ম ব্যতীত স্বস্তি ও শান্তি অসম্ভব বলে মনে করেন। বাদশাহ্ আকবর তাঁর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' এর অনুসারীদের জন্য 'জন্মান্তরবাদে' বিশ্বাসী হওয়া জরুরী মনে করতেন।[৯৩]

হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদেরকে বাদশাহ্ আকবর খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তাদের জন্য তিনি আগ্রার নিকটে 'যোগীপুরা' নামক একটি শহর তৈরী করে দেন। সেখানে যোগীরা বসবাস করতো এবং সরকারী খরচে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতো ও অন্যান্য প্রয়োজনাদি সরবরাহ করা হতো। আকবর মাঝে মাঝে সেখানে গমন করতেন এবং সারারাত তাদের সাথে বেদ-বেদান্ত সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হিন্দু যোগীরা আকবরকে রাম, কৃষ্ণ ও অন্য হিন্দু দেবতাদের অনুরূপ একজন দেবতা হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং বাদশার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পুরাকালের নামে সংস্কৃত কবিতা নিজেরা রচনা করে। এতে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে এমন একজন দিগ্বিজয়ীর আবির্ভাব ঘটবে, যিনি ব্রাহ্মণদের সম্মান করবেন এবং ন্যায়পরায়ন হবেন।[৯৪]

আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লেখ করেছেন যে, 'বাদশাহ্ আকবর গরুকে শক্তির উৎস হিসেবে মনে করতেন। সেজন্য তিনি সর্বান্তকরণে গরুকে সম্মান করতেন। এরফলে তিনি গরু কুরবানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তার গোশ্‌ত ভক্ষণের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। কেননা, হিন্দুরা গরুর পূঁজা করতো এবং গো-মাংস পবিত্র বলে মনে করতো।'[৯৫]

হেরেমের রাজপুত ও হিন্দু রমণীদের প্রভাবে বাদশাহ্ আকবর গোশ্‌ত ভক্ষণ পরিহার করেন এবং দীর্ঘ সাত মাস তাঁর রন্ধনশালায় কোনোরূপ গোশ্‌ত রান্না হয়নি।[৯৬]

সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আবুল ফজল বলতেন যে, 'যদি সূর্য উচ্চ মর্যাদার না হতো, তবে এর উল্লেখ কুরআনে কেন এসেছে?'[৯৭]

রাজা দেবচাঁদ বলতেন, 'আল্লাহর দরবারে গরু খুবই সম্মানিত। অন্যথায় গরুর কথা কুরআনের প্রথম দিকে কিছুতেই উল্লেখ হতো না।'

---

[৯৩]. বাদায়ূনী, ২য় খন্ড, পৃ. ২১২, ২৫৭ ও ২৬৯।
[৯৪]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।
[৯৫]. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪৯।
[৯৬]. আবুল ফজল, *মহা-ভারতের ভূমিকা*, নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্মৌঃ ১৯৮৬, পৃ. ১৩ ।
[৯৭]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সূর্য-পূঁজা পরবর্তীকালে বাদশাহ আকবরকে অগ্নি-পূঁজার দিকে আকৃষ্ট করে। তিনি তাঁর দরবারে শিখা অনির্বাণ জ্বালাবার নির্দেশ দেন এবং এটার তদারকের ভার তিনি আবুল ফজলের উপর ন্যস্ত করেন।

শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বাদশাহ্ আকবরের এরূপ মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে বলেনঃ

> "যদি কোনো ব্যক্তি 'কালিমা-ই-তাওহীদ' পাঠের পর নবী করীম (সা.) এর শরীয়াতের বিপরীত কোনো কাজ করে, যদি মূর্তি-পূঁজার জন্য মস্তক অবনত করে, যদি ব্রাহ্মণদের ন্যায় পৈতা ধারণ করে, তবে নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি কাফির।"[৯৮]

বাদশাহ্ আকবর সম্পর্কে শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেনঃ

> "সে মুরতাদ হয়েছে এবং যিন্দীকদের পথ অনুসরণ করছে।"[৯৯]

বাদশাহ্ আকবরের সময় দর্শনার্থী হিসেবে পরিচিত একদল লোক ছিলো, যারা প্রত্যুষে সম্রাটের মুখ দর্শন না করে হাত-মুখ ধৌত করতো না এবং খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করতো না। আকবর সূর্যের নাম জপ শেষ করে যখন প্রাসাদের বারান্দায় এসে দঁড়াতেন, তখন তারা বাদশার সম্মুখে সিজদায় পড়ে যেতো।[১০০]

রাজা ভগবান দাসের কন্যার সাথে আকবর তাঁর পুত্র সেলিমের বিবাহের সময় সম্পূর্ণ হিন্দু রীতি-নীতিতে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন করেন।[১০১]

হিন্দু সমাজে সুদ দেয়া-নেয়া কোনো দোষের ব্যাপার নয়। তাদের প্রভাবে আকবর সুদ প্রথা, পাশা-খেলা, জুয়া ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ ঘোষণা করেন। রাজ দরবারে জুয়া খেলার জন্য আলাদা গৃহ নির্মাণ করা হয় এবং জুয়াড়ীদের সরকারী কোষাগার থেকে সুদের টাকার ধার দেয়ারও বন্দোবস্ত করা হয়।[১০২]

---

৯৮. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), *আশ্'আতুল্ লুম'আত*, নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৩০২ হি., পৃ. ৩৬।
৯৯. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.), *আনফাসুল্ 'আরেফীন*, আম্মিন কোম্পানী, দিল্লীঃ ১৮৯৮, পৃ. ১৫৪।
১০০. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৪।
১০১. কিওল রাম ও বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১।
১০২. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সমাজের প্রথা অনুযায়ী নিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ সংগত নয়। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আকবর এ নির্দেশ জারি করেন যে, 'ভবিষ্যতে কেনো মুসলমান তার চাচাতো, মামাতো, খালাতো ও ফুফাতো বোনকে বিবাহ করতে পারবে না।'[১০৩]

হিন্দু সমাজে একাধিক বিবাহ বৈধ নয়। তাদের প্রভাবে আকবর এ নির্দেশ জারি করেন যে, কোনো ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতে পারবে না এবং আইন হলো- 'একজন নর, একজন নারীর জন্য।'

বাদশাহ আকবের হিন্দু স্ত্রীগণ যেহেতু পর্দাপ্রথা অনুসরণ করতো না, সেহেতু তিনি এরূপ নির্দেশ দেন যে, ভবিষ্যতে কোনো মুসলিম রমণী পর্দা করে বাইরে যেতে পারবে না।

বাদশাহ আকবর আরবী ভাষা তথা কুরআন ও হাদীস শিক্ষার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন এবং বৈষয়িক দৃষ্টিতে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা উপযোগী, যেমন- জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এই কারণে অধিকাংশ আ'লিম দেশত্যাগ করেন। ফলে দেশে আ'লিমদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।[১০৪]
এমনকি ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ কর্মীদের সংখ্যাও হ্রাস পায়, যার ফলে আকবরের সময়ের অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা সিরহিন্দের জন্য কয়েক বছর যাবত কোনো কাযী নিয়োগ সম্ভবপর হয়নি।[১০৫] বস্তুত এটা স্পষ্ট যে, শরীয়াতের জ্ঞান অন্বেষণের পথ রুদ্ধ হওয়া এই অবস্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

এছাড়া বাদশাহ আকবরের সময় হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতোটাই বেড়ে যায় যে, তারা নিঃশঙ্কচিত্তে মসজিদ ধ্বংস করে মন্দির নির্মাণ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত 'মুজাদ্দি-ই-আল্‌ফে সানী' বলেনঃ

> "হিন্দুস্থানের কাফিরগণ নির্দয়ভাবে মসজিদসমূহ
> ধ্বংস করে তদস্থলে নিজেদের মন্দির তৈরী করেছে।"

---

[১০৩]. মহব্বত ইবন ফায়েজ, *আখবারে মহব্বত*, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডনঃ ওরিয়েন্টাল নং- ২১৭১৪, পৃ. ৮৯ (তা. বি.)।
[১০৪]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৫৯।
[১০৫]. মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাকতুব নং-১৯৫ (তা. বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহঃ) আরো বলেনঃ

"থানেশ্বরের নিকট কুরুক্ষেত্রে 'হাওজ' নামক স্থানে একটি মসজিদ ও কবরস্থান ছিলো। হিন্দুরা তা ধ্বংস করে সেখানে মন্দির নির্মাণ করেছে। এছাড়া হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেও মুসলমানরা ইসলামের অধিকাংশ অনুশাসন সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয় না।"[১০৬]

'হিন্দুদের একাদশী উৎসবের সময় পানাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানগণ দিনের বেলায় রুটি বানাতে এবং তা বিক্রি করতে পারতো না। অপরপক্ষে, পবিত্র রমযান মাসে প্রকাশ্যে রুটি প্রস্তুত করা এবং তা বিক্রির উপর ইসলামের খাতিরে আদৌ নিষেধ করা হয় না।'[১০৭]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহঃ) বলেনঃ

"ইসলাম এমন এক করুণ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, কাফিরগণ প্রকাশ্যভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্নাম রটনা করছে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে কুফরী হুকুম আহকাম প্রচার করছে এবং অলি গলি ও বাজারে হিন্দুদের প্রশংসা করছে। কিন্তু মুসলমাণগণ ইসলামের বিধি নিষেধ প্রচারে অক্ষম এবং শরীয়াতের হুকুম আহকাম পালনের জন্য তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে।"[১০৮]

তিনি আরো বলেনঃ

"পূর্ববর্তী বাদশাহের[১০৯] সময় থেকে 'দার-উল-ইসলাম'[১১০] এ কাফিরগণ প্রকাশ্যভাবে জোরপূর্বক কুফরী আচার অনুষ্ঠান করছে এবং মুসলমানরা ইসলামের হুকুম আহকাম প্রচারে অক্ষম হয়ে পড়েছে। যদি কেউ এটা করতে চায়, তবে তাকে কতল করা হয়।"[১১১]

এই ছিলো বাদশাহ আকবরের শাসনামলে হিন্দুদের প্রভাবে মুসলমানদের অবস্থা। হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্ফে সানী (রহঃ) এ সম্পর্কে আরো বলেনঃ

> "হিন্দুস্থানের বুকে গরু কুরবানী করা ছিলো ইসলামের
> একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দুরা হয়তো জিযিয়া প্রদানে সম্মত হতে পারে,
> কিন্তু, গরু কুরবানীতে তারা আদৌ রাজী নয়।"[১১২]

---

[১০৬]. মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাকতুব নং-৯২।
[১০৭]. মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (র.), প্রাগুক্ত।
[১০৮]. মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাকতুব নং-৬৫।
[১০৯]. বাদশাহ আকবরের শাসনামলে।
[১১০]. মুসলিম বাদশাহ শাসিত হিন্দুস্থানে।
[১১১]. মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাকতুব নং-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬। জৈনদের প্রভাবঃ

ষোড়শ শতাব্দীতে আগ্রায় জৈনদের একটি বড় কেন্দ্র ছিলো। বাদশাহ আকবর সর্বপ্রথম সেখানে তাদের সাহচর্যে আসেন।[১১৩] হিরনাজিয়া শূরী ও জয়চন্দ্র শূরী নামক দুইজন জৈন আচার্যের প্রভাবে আকবরের নতুন ধর্মচিন্তা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হিরনাবিজয়া শূরীকে তাঁর দরবারে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সম্মানে আকবর বন্দীদের মুক্তি দেন, খাঁচায় আবদ্ধ পাখীদের ছেড়ে দেন এবং কিছুদিনের জন্য সকল ধরণের প্রাণী বধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এগারো বছর পর সিদ্ধাচন্দ নামে অপর একজন জৈন আচার্য লাহোরে আকবরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং স্ব-ধর্মীদের জন্য বাদশাহের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করেন। তার অনুরোধে সম্রাট তাদের অন্যতম তীর্থস্থান 'সাত রঞ্জিয়' পাহাড়ের তীর্থকর রহিত করেন এবং জৈনদের অন্যান্য পবিত্র স্থান তাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে বাদশাহ আকবরের গোশ্ত ভক্ষণ পরিহার এবং কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেয়ার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করা মূলত জৈন আচার্যদের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি ছিলো।[১১৪]

৭। পারসিকদের প্রভাবঃ

পারসিক ধর্মগুরুরা ও বাদশাহ আকবরের ইবাদত খানায় ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 'দাস্তর মিহারজি রাণা; যিনি গুজরাটে অবস্থান করতেন; সম্রাটকে জোরাথুস্ত্রীয় ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করেন।[১১৫]

আবুল ফজল বলেনঃ

> "১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে 'দাস্তর মিহারজি রাণা' আকবরের ইবাদাতখানায় আগমন করেন। তিনি ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। তাই, বাদশাহের সাথে আলোচনাকালে তার কোনো দোভাষীর প্রয়োজন হতো না। আকবর তার দ্বারা এতোটাই প্রভাবান্বিত হন যে, তিনি অগ্নিকে সমস্ত সৃষ্টির উৎস মনে করেন এবং তাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতে থাকেন।"[১১৬]

---

১১২. মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (র.), প্রাগুক্ত, মাকতূব নং-৮১।
১১৩. Sree Istawa, Dr. A.L., *Akbar The Great*, Vol. 1, Sikha Prokashoni, Calcutta: 1877, p. 262.
১১৪. Ishwari Prasad, op. cit., p. 292.
১১৫. (i) Ishwari Prasad, Ibid, p. 293, (ii) Sree Istawa, Ibid. p. 248.

Dhaka University Institutional Repository

৬। জৈনদের প্রভাবঃ

ষোড়শ শতাব্দীতে আগ্রায় জৈনদের একটি বড় কেন্দ্র ছিলে। বাদশাহ্ আকবর সর্বপ্রথম সেখানে তাদের সাহচর্যে আসেন।[১১৩] হিরনাজিয়া শূরী ও জয়চন্দ্র শূরী নামক দুইজন জৈন আচার্যের প্রভাবে আকবরের নতুন ধর্মচিন্তা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হিরনাবিজয়া শূরীকে তাঁর দরবারে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁর সম্মানে আকবর বন্দীদের মুক্তি দেন, খাঁচায় আবদ্ধ পাখীদের ছেড়ে দেন এবং কিছুদিনের জন্য সকল ধরণের প্রাণী বধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এগারো বছর পর সিদ্ধাচন্দ নামে অপর একজন জৈন আচার্য লাহোরে আকবরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং স্ব-ধর্মীদের জন্য বাদশাহের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করেন। তার অনুরোধে সম্রাট তাদের অন্যতম তীর্থস্থান 'সাত রঞ্জিয়' পাহাড়ের তীর্থকর রহিত করেন এবং জৈনদের অন্যান্য পবিত্র স্থান তাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে বাদশাহ্ আকবরের গোশ্‌ত ভক্ষণ পরিহার এবং কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেয়ার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করা মূলত জৈন আচার্যদের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি ছিলো।[১১৪]

৭। পারসিকদের প্রভাবঃ

পারসিক ধর্মগুরুরা ও বাদশাহ্ আকবরের ইবাদত খানায় ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 'দাস্তর মিহারজি রাণা; যিনি গুজরাটে অবস্থান করতেন; সম্রাটকে জোরাথুস্ত্রীয় ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করেন।[১১৫]

আবুল ফজল বলেনঃ

> "১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে 'দাস্তর মিহারজি রাণা' আকবরের ইবাদাতখানায় আগমন করেন। তিনি ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। তাই, বাদশাহের সাথে আলোচনাকালে তার কোনো দোভাষীর প্রয়োজন হতো না। আকবর তার দ্বারা এতোটাই প্রভাবান্বিত হন যে, তিনি অগ্নিকে সমস্ত সৃষ্টির উৎস মনে করেন এবং তাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতে থাকেন।"[১১৬]

---

১১২. মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (র.), প্রাগুক্ত, মাকতূব নং-৮১।

১১৩. Sree Istawa, Dr. A.L., *Akbar The Great*, Vol. 1, Sikha Prokashoni, Calcutta: 1877, p. 262.

১১৪. Ishwari Prasad, op. cit., p. 292.

১১৫. (i) Ishwari Prasad, Ibid, p. 293, (ii) Sree Istawa, Ibid. p. 248.

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বলেনঃ

> "বাদশাহ্ আকবর পারসিক ধর্মগুরুদের দ্বারা এতোই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি শিক্ষা করেন এবং আবুল ফজলকে তাঁর দরবারে পবিত্র শিখা অনির্বাণ প্রজ্বলিত রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।"[১১৭]

তাদের প্রভাবেও আকবর সূর্য পূঁজা শুরু করেন।কারণ, আকবর মনে করতেন- 'সূর্য হলো সমস্ত আগুনের উৎস।'[১১৮] আকবর আরো বলতেন- 'বাতি প্রজ্বলিত করবার মূল উদ্দেশ্য হলো সূর্যের স্মরণ মাত্র। আর যে সূর্যকে ভালোবাসে, তার উচিত দীপ-জ্বালানোর মাধ্যমে উহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা'।[১১৯]

ঐতিহাসিক বাদায়ূনী আরো বলেনঃ

> "বাদশাহ্ আকবর প্রদীপ জ্বালাবার সময় দন্ডায়মান হয়ে উহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা সভাসদদের জন্য বাধ্যতামূলক করেন।[১২০] তাদের প্রভাবের ফলেই আকবর মৃতদেহকে ইসলামী কায়দায় দাফন করাকে অপছন্দ করতে থাকেন।"

আকবর চন্দ্র হিজরী পঞ্জিকার পরিবর্তে সৌর পঞ্জিকা প্রবর্তন করেন। কোনো কোনো পন্ডিতের মতানুসারে এই পরিবর্তন ছিলে আকবরের ইসলাম থেকে জোরোথুস্ত্রীয় ধর্মের প্রতি মানসিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ।[১২১] এ মতের সমর্থনে তাদের যুক্তি হলে, আকবর মুসলমানদের পোশাকের চাইতে পারসিকদের পোশাক পরতে বেশী পছন্দ করতেন।

পারসিক ধর্মযাজকগণ বাদশাহ্ আকবরের দরবারে কেবল সম্মানিতই ছিলেন না, বরং তিনি তাঁদের জন্য রাজকীয় জায়গীর ও লাখেরাজ সম্পত্তি ও বরাদ্দ করেন।[১২২]

---

১১৬. আবুল ফজল, *মহাভারতের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
১১৭. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬১।
১১৮. আবুল ফজল, *আইনে আকবরী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭।
১১৯. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।
১২০. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬১, ৩৪১।
১২১. আবুল ফজল, *আইনে আকবরী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৫।
১২২. Sree Istawa, op. cit, p. 250.

Dhaka University Institutional Repository

৮। খৃস্টানদের প্রভাবঃ

ধর্মীয় ব্যাপারে বাদশাহ্ আকবরের অনুসন্ধানী মন তাঁকে খৃষ্টানদের সাহচর্যে আনে। ফতেহ্পুর সিক্রীর ইবাদাতখানায় ধর্মালোচনায় যোগদান করবার জন্য বাদশাহ্ আকবর খৃস্টান ধর্মযাজকদের আমন্ত্রণ জানান। বাদশাহ্ তাঁদের ও খৃস্ট ধর্মমতের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।[১২৩]

বাদশাহ্ আকবরকে খৃস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে গোয়া থেকে পর পর তিনটি মিশন রাজ-দরবারে আগমন করে। ১৫৭৯ খৃস্টাব্দে ফাদার রুডলফ একুয়াভিভা ও ফাদার মনসরেটের নেতৃত্বে একটি মিশন সর্বপ্রথম ফতেহ্পুর সিক্রীতে পৌছে।
আকবর তাঁদের সাথে স্বীয় প্রাসাদে সাক্ষাৎ দান করেন এবং খুবই সৌজন্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিন বছর পর কোনো ফল লাভ ব্যতীতই এই মিশন গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করে।[১২৪]

১৫৯০ খৃস্টাব্দে ডোম লিও গ্রীমোন নামে একজন খৃস্টান মিশনারী আকবরের সাথে লাহোরে সাক্ষাৎ করেন। তার মাধ্যমে আকবর গোয়ার রেকটরের কাছে আরো একটি মিশন পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে একটি পত্র প্রেরণ করেন। প্রথম মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার ফলে গোয়ার রেকটর আর কোনো মিশন রাজ দরবারে প্রেরণে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ডোম লিও গ্রীমোনের বর্ণনায় আকবরের মানসিক পরিবর্তনের সংবাদে আশ্বস্ত হয়ে ১৫৯১ খৃস্টাব্দে ফাদার এডওয়ার্ড লিটোন ও ক্রিস্টোফোর ডি-ভোগারের নেতৃত্বে একটি মিশনারী দলকে আকবরের দরবারে প্রেরণ করেন।

সম্রাট আকবর তাঁদেরকে খুবই সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং স্বীয় প্রাসাদের একাংশ তাঁদের অবস্থানের জন্য বরাদ্দ করেন। তাঁরা শাহজাদা ও অন্যান্য আমীরের ছেলেদের পর্তুগীজ ভাষা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন যে, সম্রাট খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবেন না; কাজেই তারা বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।[১২৫]

---

[১২৩]. Ishwari Prasad, op. cit., p. 301.
[১২৪]. Edward Makligon, *The Jesuits and The Great Mughal*, London: 1932, pp. 25-26.
[১২৫]. (i) Edward Makligon, Ibid, p. 48 (ii) Ishwari Prasad, op. cit, p.303.

Dhaka University Institutional Repository

১৫৯৪ খৃস্টাব্দে সম্রাট আকবর আরো একটি মিশন প্রেরণের জন্য গোয়ার রেকটরকে অনুরোধ করেন। সেই হিসেবে জিরোম জেভিয়ারের নেতৃত্বে একটি মিশন ১৫৯৫ খৃস্টাব্দে লাহোরে আকবরের সাথে মিলিত হয়। বাদশাহ্ তাঁদেরকে খুবই সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণের জন্য তাঁদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। গীর্জা নির্মাণের জন্য আকবর তাঁদেরকে সরকারী অনুদান ও প্রদান করেন।[১২৬]

বস্তুতঃ ১৫৮০ থেকে ১৬০৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খৃস্টান মিশনারীরা আকবরের মানসিক পরিবর্তনের জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করে। পরপর তিনটি মিশন আকবরের দরবারে তাঁকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। যদিও তাঁরা তাঁদের এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে সফলকাম হতে পারেনি, তথাপি এটা স্পষ্ট যে, আকবর খৃস্টান ও খৃস্টধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রভাবে আকবরের মনে কুরআন ও মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হয়।[১২৭]

বাদশাহ আকবরেরনির্দেশে আবুল ফজল পবিত্র ইনজীল ফার্সী ভাষায় অনুবাদের সময় 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি' এর পরিবর্তে- 'যীশু খৃষ্টের নামে শুরু করছি' ব্যবহার করেন।[১২৮]

খৃস্টানদের প্রভাবে মহানবী (সা.) এর প্রতি সন্দিহান হওয়াতে বাদশাহ আকবর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'এই পবিত্র বাণী পরিবর্তন করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আকবারু খালিফাতুল্লাহ' এই বাণীর প্রবর্তন করেন।[১২৯]

মহানবী (সা.) এর প্রতি শত্রুতা পোষণ হেতু আহমাদ, মুহাম্মদ, মুস্তাফা ইত্যাদি ধরণের নাম রাখা আকবরের নিকট দূষণীয় ছিলো। এ ধরণের নাম পরিবর্তন করে তিনি 'রহমত' রাখেন। এছাড়া আকবর সালাত আদায় করা এবং আযান দেয়ার প্রথাও রহিত করেন।[১৩০] ঐতিহাসিক স্মিথ ১৫৮২ খৃস্টাব্দে লিখিত মন্সেরেটের একটি পত্রের সূত্রে আকবর সম্পর্কে বলেনঃ

---

১২৬. মুহাম্মদ তোফায়েল, *নুকূশে লাহোর*, নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, লাহোরঃ ১৯৬২, পৃ. ৬৮৩।
১২৭. Dojerok, *Akbar and the Jesuits*, Darul Kutubul Ilmiya, Beirut, Lebanon: pp. 11-23. (N.D).
১২৮. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬।
১২৯. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।
১৩০. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩, ৩১৪।

Dhaka University Institutional Repository

The king is not a Muhammadan'.[১৩১]

৯। মুক্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবঃ

মুক্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরাও আকবরের মানসিক পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এঁদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা ছিলেন-শাইখ মুবারক, আবুল ফয়েজ, ফৈযী, আবুল ফজল ও রাজা বীরবল।

এঁদের মধ্যে আবুল ফজলই প্রধানত আকবরের মানসিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। বস্তুতঃ আবুল ফজল ছিলেন একজন নাস্তিক। তার লেখনীতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা তিনি বাদায়ূনীকে বলেনঃ

> "আনন্দ-স্ফূর্তির জন্য আমি কয়েকদিন অবিশ্বাসীদের
> উপত্যকায় বিচরণ করতে চাই।"[১৩২]

খাজা উবায়দুল্লাহ (রহঃ) এর বর্ণনামতে, আবুল ফজলের বিপথে গমনের জন্য শরীফ আমলীই মুখ্যত দায়ী। শরীফ আমলী ছিলেন মাহমুদ পাস্খানীর শিষ্য। তিনি ছিলেন মুক্ত-বুদ্ধি সম্প্রদায়ের নেতা।[১৩৩]

হিজরী দশম শতকে তিনি তাঁর প্রচারণার হিন্দুস্থান ও ইরানের বহুলোককে প্রভাবান্বিত করেন, যার ফলে ইরানের শাসক শাহ্ আব্বাসের রাজ-সিংহাসন হুমকির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় ১০০২ হিজরীতে শাহ্ আব্বাস তাঁর সিংহাসনের নিরাপত্তার উদ্দেশ্য এই দলের অসংখ্য অনুগামীকে হত্যা ও বন্দী করেন।[১৩৪]

এই সময় মুক্ত বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতা পালিয়ে হিন্দুস্থানে আসেন, যাদের মধ্যে শরীফ আমলী ছিলেন অন্যতম। হিন্দুস্থানে আগমনের পর তিনি আবুল ফজলের নৈকট্য লাভ করেন। আবুল ফজলের মাধ্যমে শরীফ আমলী বাদশাহ আকবরেরও কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন।

---

[১৩১]. Smith V.A., *Akbar the Great Mughal*, op. cit., p. 155.
[১৩২]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।
[১৩৩]. খাজা আব্দুল্লাহ্, *মাব্লিগুর রিজাল*, নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, লাহোরঃ ১৯৫৭, পৃ. ৩২ (আলিফ দ্রষ্টব্য)।
[১৩৪]. ইস্কান্দার মুন্শী, *তারীখে 'আলম আরাই আব্বাসী,'* ২য় খন্ড, তেহরান, ইরানঃ (তা. বি.) পৃ. ৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

অল্পদিনের মধ্যে তিনি বাদশাহের উপর এমন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন যে, আকবর তাঁকে পীরের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন।[১৩৫]

শরীফ আমলীর মাধ্যমে এই দলের বহুলোক আকবরের রাজ-দরবারে চাকুরী প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে 'ওকু-ই-নিশানবিরী' ও 'তাশবিহী কাশী' নামক দুইজন বিখ্যাত কবিও ছিলেন। আবুল ফজল প্রায়ই তাঁদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। এঁরাও বাদশাহ আকবরের মানসিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো।[১৩৬]

'তারীখ-ই-আলম আরা-ই-'আব্বাসী' গ্রন্থের লেখক ইস্কান্দার মুনশী বলেনঃ

> "শাইখ মুবারকের পুত্র শাইখ আবুল ফজল হিন্দুস্থানের অন্যতম জ্ঞানী লোক, যিনি আকবরের দরবারে বহু খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি মুক্ত-বুদ্ধিবাদীদের অনুসারী ছিলেন এবং বাদশাহ তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে শরীয়াতের সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হন।"[১৩৭]

মুক্ত-বুদ্ধিজীবীদের ধারণা এ সৃষ্টি জগতের সবকিছুই প্রকৃতির দান। এতে মহান আল্লাহর কিছুই করার নেই। তাঁরা বিবর্তনবাদেও বিশ্বাসী ছিলো। তারা পবিত্র কুরআনকে মুহাম্মদ (সা.) এর সৃষ্টি বলে মনে করতো এবং শরীয়াতের বিধানকে আ'লিমদের আবিস্কৃত মতবাদ বলে ধারণা করতো।

এই মতবাদের অনুসারীরা সালাত সম্বন্ধে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। কাউকে সালাত আদায় করতে দেখলে তারা বলতোঃ

> "আল্লাহ আসমানে অবস্থান করেন, এরূপ বিশ্বাস করা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে যমীনে সিজদাহ করা কি কোনো বুদ্ধিমানের কাজ?"[১৩৮]

একইভাবে তারা হাজ্জ্ব পালনকালে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত গমনকারীদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বলতোঃ

---

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।
১৩৬. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২০৫৬, ৩৭৯।
১৩৭. ইস্কানদার মুনশী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৩৫।
১৩৮. খাজা আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

"তাদের কী হারিয়েছে, যার জন্য তারা বারবার যাতায়াত করছে?"[১৩৯]

হাজ্জের অন্যতম বিধান কুরবানী সম্পর্কে তারা বলতোঃ

"এই পশুদের অপরাধ কী? যারা কথা বলতে পারে না,
তাদেরকে তোমরা কেন হত্যা করছো?"[১৪০]

এতদ্ব্যতীত তারা পবিত্র রমজান মাস সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বলতোঃ

"এটা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মাস। এমনকি তারা তাদের মাও
বোনকে বিবাহ্ করাটাকেও অবৈধ মনে করতো না।"[১৪১]

তাদের বিশ্বাস মতে, মাহমুদ পাসখানী পর্যন্ত এ পৃথিবীর বয়স ছিলো আট হাজার বছর, এবং এই সময়ের জন্য নেতৃত্ব ছিলো আরবদের। এখন মাহমুদ পাসখানীর অভ্যুদয়ের পর আরব নেতৃত্বের অবসান হয়েছে এবং এখন থেকে পরবর্তী আট হাজার বছর পর্যন্ত নবী আসবেন অনারবদের মধ্যে।[১৪২]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহ্সিন ফানী এদের সম্পর্কে বলেনঃ

"এদের একটি বিশেষ দু'য়া ছিলো, যা তারা সূর্যের দিকে মুখ করে
পড়তো। এটাও কথিত আছে যে, এই সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি যখন
পরস্পর মিলিত হতো, তখন তারা সালামের পরিবর্তে বলতো আল্লাহ্,
আল্লাহ্। তাদের ধারণানুযায়ী দ্বীন-ই-ইসলামের বিধান আর কার্যকরী নেই,
কাজেই মাহমুদ পাস্খানীর অনুসরণ ব্যতীত আর কোনো গত্যন্তর নাই।"[১৪৩]

এতদ্ব্যতীত মুক্ত-বুদ্ধিজীবীগণ মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তরে গমনে বিশ্বাস করতো এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতো। এছাড়া তারা নবুওয়াত, রুওয়্যাত, সৃষ্টি রহস্য ও হাশর নশরে সন্দিহান ছিলো এবং এতদ্ সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো।[১৪৪]

---

১৩৯. প্রাগুক্ত।
১৪০. প্রাগুক্ত।
১৪১. প্রাগুক্ত।
১৪২. মুহ্সিন ফানী, *দাবিস্তানে মাযাহিব*, দারুল কুতুবিল আলামিয়্যাহ, বৈরূত, লেবাননঃ ১৪১৪ হি., পৃ. ৩০১।
১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।
১৪৪. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩০৭।

Dhaka University Institutional Repository

এদের ধারণা ছিলো, দ্বীন-ই-ইসলামের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, কাজেই এখন একটি নতুন দ্বীনের প্রয়োজন। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা বাদশাহ আকবরকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত করে। তাদের প্রভাবে বাদশাহ আকবর 'তারীখ-ই-আল্‌ফী' ও 'আল্‌ফী সিক্কা'র প্রচলন করেন।[১৪৫]

মুক্ত-বুদ্ধিজীবীগণ 'মুক্তির অনুসারী' হিসেবে ধর্মীয় বিধি-বিধানকে অবিশ্বাস করতো। এজন্য তাদের প্রভাবে আকবরও 'যুক্তি অনুসারী' হয়ে ওঠেন। ফলে তিনি তাঁর ধর্মের অনুসারীদের বলতেনঃ

> "যদি ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চায়,
> তবে সে যেন সে সম্পর্কে মোল্লাগণকে জিজ্ঞাসা করে। আর আমরা
> তো কেবল সেই সব ব্যাপার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করি, যা যুক্তির সাথে
> সামঞ্জস্যপূর্ণ।"[১৪৬]

উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ আকবর প্রথম জীবনে একজন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলিম থাকা সত্ত্বেও বিভিন্নরূপে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের সমন্বয়ে 'দ্বীন-ই-ইলাহী' ধর্মমত প্রচার করেন। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. ঈশ্বরী প্রসাদ রায় স্বীয় গ্রন্থ "A short History of Muslim Rule in India"তে লিখেছেনঃ

> "The Success or failure of the 'Din-i-Ilahi' as a
> cult is not a matter of importance. Politically it
> produced wholly beneficial results."

অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির বিবেচনায় "দ্বীন-ই-ইলাহী'র সাফল্য অথবা ব্যর্থতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হয়ে রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটা সর্বতোভাবে লাভজনক ফল উৎপাদন করেছিলো।[১৪৭]

---

১৪৫. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।
১৪৬. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।
১৪৭. Dr. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, op. cit., p. 418.

Dhaka University Institutional Repository

১০। দ্বীন-ই-ইলাহী ও ইসলামঃ

বিভিন্ন ধর্মীয় ও মতবাদের প্রভাবে বাদশাহ্ আকবরের মানসিক পরিবর্তনের ক্রমধারা ঐতিহাসিক স্মিথের বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেনঃ

"১৫৫৬-১৫৭৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট আকবর ছিলেন একজন অত্যন্ত আগ্রহশীল, কট্টর সুন্নী মুসলিম। ১৫৭৪-১৫৮২ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাঁর ভাবপ্রবণ মনে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং তখন তাকে একজন সন্দেহবাদী, প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী, যুক্তিবাদী মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অবশেষে ১৫৮২-১৬০৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে তিনি ইসলাম ধর্মকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে সর্ব-ধর্ম- সার 'দ্বীন-ই-ইলাহী' ধর্ম প্রচার করেন।"[১৪৮]

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা-কালিমা, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ্ব। বাদশাহ্ আকবর ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে এর সবকিছু অস্বীকার করেন এবং কালিমা তায়্যিবার পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' এর মূলমন্ত্র ছিলোঃ 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবারু খালিফাতুল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই, আকবর আল্লাহর খলীফা।[১৪৯] আবুল ফজল মহাভারত ফার্সী ভাষায় অনুবাদের সময় এর ভূমিকায় বাদশাহ্ আকবরকে 'খালিফাতুল্লাহ্' বা আল্লাহর খলীফা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৫০]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে বাদশাহ্ আকবর মুহাম্মাদ, আহমাদ, মাহমুদ, মুস্তাফা ইত্যাদি নামের লোকদেরকে অপছন্দ করতেন। আর এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বলেনঃ

> "যদি কোনো শাহী কর্মচারীর নাম ইয়ার মুহাম্মদ, মুহাম্মদ খান হতো, তবে বাদশাহ তাকে অন্য নামে আহবান করতেন। তিনি হুযুর (সা.) এর নাম মুখে উচ্চারণ করাকে ও অপছন্দ করতেন।"[১৫১]

অপরপক্ষে বাদশাহ্ আকবর তাঁর পৌত্রদের নাম সাসানীয় বাদশাহদের নামের অনুকরণে হাওশংগ, তাহ্মুরাছ এবং রোমাসান্গার রাখেন।[১৫২]

---

১৪৮. Smith, V.A., *Akbar the Great Mughal*, op. cit. p. 348.
১৪৯. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।
১৫০. আবুল ফজল, *আইনে আকবরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
১৫১. আবুল ফজল, *আকবর নামা*, ২য় খন্ড, শিখা প্রকাশনী, কলিকাতাঃ ১৮৭৪, পৃ. ৩১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো সালাত। সম্রাট আকবর শাহী মহল ও দরবারে সালাত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বলেনঃ

> "সেখানে কেউ প্রকাশ্য সালাত আদায় করতে সাহস পেত না।[১৫৩] দেওয়ানখানার ঐ মসজিদ, যেখানে আকবর এক সময় আযান ও দিতেন; সেখানে সালাত আদায় বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় উহা বিরান হয়ে যায়। হিন্দুরা এই সুযোগে মসজিদ ও খান্‌কাকে আস্তাবলে ও পাহারাদারদের কক্ষে রূপান্তরিত করে।"[১৫৪]

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হলো সিয়াম। খাজা উবায়দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেনঃ

> "আবুল ফজল ও তার অনুসারীরা মাহে রমযানকে 'ক্ষুধা তৃষ্ণার মাস' বলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতো।"[১৫৫]

মাহে রমযানের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে আকবরের মনোভাব 'তায্‌কিরাতুল মূলূক' গ্রন্থের প্রণেতা শাহ্ রফিউদ্দীন সীরাজী প্রকাশ করে বলেনঃ

> "বাদশাহ আকবর তাঁর সভাসদবর্গকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁরা যেন মাহে রমযানে পূর্ণ দরবারে প্রকাশ্যে পানাহারকরেন। যদি তাঁদের কারো পানাহারের ইচ্ছা না থাকে, তবে তিনি যেন কমপক্ষে মুখে পান পুরে দরবারে আসেন। যদি এরূপ না করা হয়, তবে তাকে রোযা রাখার অপরাধে পাকড়াও করা হবে।"[১৫৬]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহঃ) এর বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ

> "হিন্দুদের একাদশীর সময় মুসলমানদের আদৌ পানাহারের অনুমতি ছিলো না। কিন্তু মাহে রমযানে হিন্দু এবং সমমনা মুসলমানদের নির্দ্বিধায় খাওয়া দাওয়ার অনুমতি ছিলো।"[১৫৭]

---

[১৫২].প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৫৮।
[১৫৩]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৫।
[১৫৪]. প্রাগুক্ত।
[১৫৫]. খাজা আব্দুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫।
[১৫৬]. রফিউদ্দীন শিরাজী, *তাযকিরাতুল মুলূক*, রশিদিয়া কুতুবখানা, ভারতঃ (তা. বি.), পৃ. ২৩১।
[১৫৭]. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র.), *মাকতূবাতে ইমামে রাব্বানী*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, মাকতূব নং-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হলো যাকাত। সম্রাট আকবর একটি শাহী ফরমানের মাধ্যমে তাঁর কর্মচারীদেরকে মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত উসূল না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। 'রুকআতে আবুল ফজল' এ আকবরের এই ফরমানটির উল্লেখ আছে।[১৫৮]

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হলো হাজ্জ্ব। বাদশাহ্ আকবর হাজ্জে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বলেনঃ

> "এই সময় বাদশাহ্ আকবরের নিকট হাজ্জ গমনের জন্য
> অনুমতি প্রার্থনা করা মৃতুকে আহ্বান করার মতো ছিলো।"[১৫৯]

বাদশাহ্ আকবর ইসলামী 'আকাঈদ ও ইবাদাত' সম্পর্কিত সব কিছুকেই মনগড়া মনে করতেন। ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বলেনঃ

> "আকবর নবুওয়াত, আল্লাহ্র দীদার, সৃষ্টি রহস্য ও হাশর
> নশর ইত্যাদির ব্যাপারে বিদ্রুপ করতেন এবং এগুলোর
> ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন।"[১৬০]

ঐতিহাসিক বাদায়ূনী আরো বলেনঃ

> "আকবরের সময় সালাম, সাওম-এমনকি ঐ সমস্ত ব্যাপার,
> নবুওয়াতের সাথে যার সম্পর্ক, উহার নাম দেয়া হয় 'অন্ধবিশ্বাস'।
> এ সমস্ত ব্যাপারকে অবাস্তব ব্যাখ্যা দেয়া হয় এবং দ্বীনের মূলভিত্তি
> 'ইলম-ই-ইলাহী' কে অগ্রাহ্য করে সাধারণ জ্ঞানের প্রাধান্য দেয়া হয়।"[১৬১]

বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়াতের উৎস হলো চারটি। যথা-কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাত-ই-রাসূলুল্লাহ্ (সা.), ইজমাএবং ক্বিয়াস। কিতাবুল্লাহ্ বা কুরআনকে আকবর আল্লাহ্র ওহী হিসেবে বিশ্বাস করতেন না। এ সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

> "আবুল ফজল আমার পিতার মগজে এটা ঢুকিয়ে দেয় যে, কুরআনে-হাকী
> আল্লাহ্র ওহী নয়; বরং এটা নবী কারীম (সা.) কর্তৃক রচিত।"[১৬২]

---

[১৫৮]. আবুল ফজল, *রুক্'আয়ে আবুল ফজল*, মাকতাবাতু মাজিদিয়্যাহ, পাকিস্তানঃ ১৯৮৩, পৃ. ৬২।
[১৫৯]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত; ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৯।
[১৬০]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।
[১৬১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরীয়াতের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাত-ই-রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। যে ব্যক্তি হুযুর (সা.) এর নাম মুখেউচ্চারণ ও শ্রবণ করতে পছন্দ করতো না, তার নিকট সুন্নাত-ই-রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর গুরুত্ব ও মর্যাদা আর কী হতে পারে? কাজেই আকবর মহানবী (সা.) এর অনেক কাজ কর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন। আকবর হুজুর (সা.) এর মুযিজা এবং মী'রাজকে অস্বীকার পূর্বক বলতেনঃ

> "এটা কীরূপে বিবেকসমম্মত হতে পারে যে, একব্যক্তি তার জড়দেহ নিয়ে তার শয্যা থেকে আসমান গমন করলো এবং সেখানে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে নব্বই হাজার কথা-বার্তা বলে ফিরে এসে দেখলো, তার শয্যা তখনও গরম।"[১৬৩]

ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় উৎস হলো 'ইজমা-ই-সাহাবা' বা সাহাবীদের ঐকমত্য। যে ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অপ্রিয়, তার নিকট তাঁর সাহাবীদের মর্যাদা আর কী হতে পারে? সাহাবা-ই-কিরাম (রা.) এর বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর আকবরের ঘোর আপত্তি ছিলো। যেমন- উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফ্ফীনের যুদ্ধ ইত্যাদি।[১৬৪] কাজেই, তাঁদের ইজমার কোনো মর্যাদা আকবরের নিকট ছিলো না।

ইসলামী শরীয়াতের চতুর্থ উৎস্য হলো-ক্বিয়াস, আকবর ও তাঁর অনুসারীরা একে অস্বীকার করে বলতেনঃ

> "দ্বীন-ইসলামের মাসআলা-মাসায়িল, ফিকাহ-তত্ত্ববিদ আ'লিমদের সৃষ্টি। কাজেই, এর উপর আমল করা আদৌ জরুরী নয়।"

'উলামা-ই-দ্বীন' ও 'আইম্মা-ই-আহ্লী সুন্নাহ্' সম্পর্কে আবুল ফজল বলতেনঃ

> "তোমরা কি আমার নিকট অমুক মিস্টান্ন বিক্রেতা, অমুক মুচি বা চামারের উদ্ধৃতি দ্বারা দলীল পেশ করতে চাও?"[১৬৫]

---

[১৬২]. নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর, *মাছিরুল উমারা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৭।
[১৬৩]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৬।
[১৬৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮-৩১৮।
[১৬৫]. খাজা আব্দুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীন-ইসলাম পরিত্যাগের পর আকবর 'চল্লিশ-রত্ম' নামে একটি পরামর্শ সভা গঠন করেন। তারা 'বিবেক ও যুক্তি তর্কে'র মাপকাঠিতে সবকিছুকে বিচার করতো। যদি তা তাদের বিবেক সম্মত হতো, তবে তাকে 'নত্ত আইনে-ইলাহী' তথা 'দ্বীন-ই-ইলাহী'র নতুন আইন হিসেবে গ্রহণ করতো। অন্যথায় তাকে বিবেক বর্জিত বলে পরিত্যাগ করতো।[১৬৬]

এই পন্ডিত-মূর্খ তথাকথিত বিবেকের অনুসারীরা আরো বলতোঃ

> "যদি এটা ধরে নেয়া হয় যে, শুকর উহার কুৎসিত কদাকার
> চেহারার জন্য হারাম; তবে ব্যাঘ্র উহার সুন্দর চেহারা ও
> সাহসিকতার জন্য হালাল হওয়া উচিত।"[১৬৭]

ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের পর বাদশাহ্ আকবর হালাল হারামের ব্যবধান উঠিয়ে দেন। তিনি মদ্যপানকে বৈধ ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বলেনঃ

> "আকবর বলতেন যে, শরাব যদি শরীরের উপকারের জন্য
> ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়, তবে তা হালাল। অবশ্য শর্ত হলো,
> উহা পানে নেশাগ্রস্ত হয়ে কোনোরূপ ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি না করা।"[১৬৮]

সম্রাট আকবর যিনা তথা ব্যভিচারকে বৈধ বলে মত দেন। ঐতিহাসিক মুহব্বত ইব্নে ফয়েজ ও বাদায়ূনী বলেনঃ

> "বাদশাহ্ আকবর শহরের বাইরে 'শয়তানপুর' নামে
> পতিতাদের জন্য একটি বস্তি প্রতিষ্ঠা করেন।"[১৬৯]

সম্রাট আকবর জুয়া বৈধ ঘোষণা করেন এবং তাঁর নির্দেশে 'শয়তানপুর' একটি জুয়ার ঘর স্থাপিত হয়। এই স্থানের জুয়াড়ীদেরকে রাজ ভান্ডার থেকে সুদে টাকা ধার দেয়া হতো। এভাবে আকবর সুদও হালাল বলে ঘোষণা করেন।[১৭০]

---

[১৬৬]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।
[১৬৭]. আবুল ফজল, *আইনে আকবরী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩০২।
[১৬৮]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০১।
[১৬৯]. মহব্বত ইব্নে ফয়েয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
[১৭০]. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হারাম। ইসলামের সাথে শত্রুতাবশতঃ আকবর রেশ্মী বস্ত্র পরিধান করাকে হালাল ঘোষণা করেন। এজন্য তিনি নিজে উহা পরিধান এবং তাঁর আমীর উমরাহ্গণকে উহা পরিধান করতে উৎসাহিত করতেন।[১৭১]

বাদশাহ্ আকবর দাঁড়ি মুন্ডনকে বৈধ ঘোষণা করেন এবং মুসলমান বাদশাহ্দের মধ্যে আকবরই সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি, যিনি দাঁড়ি মুন্ডন করেন।[১৭২]

বাদশাহ্ আকবর শরীয়াতের বিধান বাতিল করে বিবাহ্ শাদীর ব্যাপারে নিজস্ব আইন জারি করেন। এ সম্পর্কে আবুল ফজল বলেনঃ

> "আল্লাহ্কে খুশী করবার জন্য আকবর এ বিধান জারি করেন যে, ষোল বছর পূর্ণ হবার আগে কোনো ছেলের এবং চৌদ্দ বছরের পূর্বে কোনো মেয়ের বিবাহ্ দেয়া চলবে না।"[১৭৩]

আবুল ফজল আরো বলেনঃ

> "বাদশাহ্ আকবর এ নির্দেশ ও জারি করেন যে, এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা চলবে না এবং বন্ধ্যা স্ত্রী লোককে বিবাহ্ করা যাবে না।"[১৭৪]

এতদ্ব্যতীত বাদশাহ্ আকবর এ বিধান ও জারি করেন যে, কোনো পুরুষ নারী অপেক্ষা বার বছর কম বয়স্ক হলে, সে পুরুষ ঐ নারীর সাথে সহবাস করতে পারবে না।[১৭৫]

আবুল ফজল আরো বলেনঃ

> "বাদশাহ আকবর এ হুকুমও জারি করেন যে, কোনো কম বয়স্ক যুবক, অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোককে বিবাহ্ করতে পারবে না।"[১৭৬]

---

[১৭১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।
[১৭২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।
[১৭৩]. আবুল ফজল, *আইনে আকবরী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩০২।
[১৭৪]. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯২।
[১৭৫]. বাদায়ুনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৯১।
[১৭৬]. আবুল ফজল, *আইনে আকবরী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাব্বত ইব্‌নে ফায়েয এবং বাদায়ূনী বলেনঃ

> "বাদশাহ্ আকবর এরূপ ফরমান ও জারি করেন যে, ভবিষ্যতে কোনো মুসলমান তার খালাতো, ফুফাতো, মামাতো এবং চাচাতো ভগ্নিকে বিবাহ করতে পারবে না।"[১৭৭]

খাত্‌না সম্পর্কে বাদশাহ্ আকবর এরূপ নির্দেশ প্রদান করেন যে, বার বছরের পূর্বে কোনো ছেলের খাত্‌না দেয়া চলবে না।[১৭৮] এ সম্পর্কে আবুল ফজল বলেনঃ

> "বাদশাহের এরূপ নির্দেশ দেবার কারণ এই ছিলো যে, নাবালেগ ছেলেদের উপর শরীয়াতের বিধান কার্যকরী হতে পারে না। এজন্য তিনি ব্যাপারটি বালিগ হওয়ার পর তাদের ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করেন।"[১৭৯]

ইসলামী শরীয়াতে পর্দা প্রথার যে বিধান আছে, বাদশাহ্ আকবর উহা উপেক্ষা করে পর্দা প্রথা রহিত করেন এবং এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, ভবিষ্যতে মহিলাগণকে মুখমন্ডল খোলা রেখে বের হতে হবে।[১৮০]

কা'বা ঘরের অবমাননার উদ্দেশ্যে বাদশাহ্ আকবর এ নির্দেশ জারি করেন যে, মৃতের দাফনের সময় এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যেন তার মাথা পূর্বদিকে এবং পদদ্বয় পশ্চিম দিকে থাকে। ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বলেন ঃ

> "বাদশাহ্ আকবর নিজের শয়নের সময় স্বীয় পদদ্বয়কে কিবলার দিকে রেখে শয়ন করতেন।"[১৮১]

সর্বোপরি, 'দ্বীন ই-ইলাহী'র অনুসারীদেরকে কতগুলো নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্ম-বিশ্বাসের রীতি-নীতি পালন করতে হতো। তাদেরকে সম্রাটের উদ্দেশ্যে চারটি জিনিস তথা ধন, জীবন, সম্মান এবং ধর্ম বিসর্জন দিতে হতো। যারা উহা গ্রহণ করতো, তাদেরকে 'চেলা' বলা হতো। তাদেরকে নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতি দিতে হতো।

---

১৭৭. মহব্বত ইবনে ফায়েয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
১৭৮. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭৬।
১৭৯. আবুল ফজল, *আইনে আকবরী,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩০২।
১৮০. বাদায়ূনী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৯১।
১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বলেন ঃ

> "আমি অমুকের পুত্র অমুক, এ যাবৎ বাপ-দাদার ধর্মের অনুসারী ছিলাম।
> এখন উহা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে পরিত্যাগ করে বাদশাহ্ আকবরের
> 'দ্বীন-ই-ইলাহী' গ্রহণ করছি এবং এই ধর্মের খাতিরে জান, মাল,
> ইয্যত ও পূর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।"[১৮২]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীন ইসলামের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে আকবর এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য এ সময়টি ছিলো খুবই মারাত্মক, বাদশাহ্ আকবরের শাসনামলের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) বলেনঃ

> "মুসলমানরা ইসলাম প্রচার করতে পারতো না। যদি কেউ উহা
> প্রচারে সচেষ্ট হতো, তবে তাকে হত্যা করা হতো।"[১৮৩]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্ফে সানী (রহ.) আরো বলেনঃ

> "কোনো মুসলমান ইসলামের নির্দেশাবলী পালন করলে
> তাকে হত্যা করা হতো।"[১৮৪]

বাদশাহ্ আকবরের এহেন কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে তার সময়ের একজন বিজ্ঞ আ'লিম, মোল্লা মুহাম্মদ য়াযদী তার সম্পর্কে বলেনঃ

> "আকবর মুরতাদ হয়ে গেছে, কাজেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
> করা সমস্ত মুসলমানের উপর ফরজ।"[১৮৫]

---

[১৮২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।
[১৮৩]. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাকতূব নং-৪৬।
[১৮৪]. প্রাগুক্ত, মাকতূব নং- ৮১।
[১৮৫]. Sir Wolsely Haig, *Cambridge History of India*, Vol-iv, (Edited by Sir Richard Burn), Chand and Company, New Delhi: 1971, p. 126.

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ফতোয়াটির বিষয় উল্লেখ করে বিনসেন্ট এ. স্মীথ স্বীয় গ্রন্থ 'Akbar, the Great Mughal' এ লিখেছেন-

> "Early in 1580 A.D. Mulla Muhammad Yazdi, a theologian, who had been in intimate converse with Akbar, ventured to issue a formal ruling (Fatwa) in his capacity as Qadi of Jaunpur, that rebellion against the innovating Emperor was lawful."[186]

একইভাবে এই ফতোয়াটির সমর্থনে ড. ঈশ্বরী প্রসাদ রায় স্বীয় গ্রন্থ 'A short History of Muslim Rule in India' তে লিখেছেনঃ

> "The Qadi of Jaunpur, Mulla Muhammad Yazdi had issued a Fatwa (Solemn declaration) early in 1580 A.D. declaring it lawful for Muslims to take up arms against the Emperor, whose measures threatned the very existence of Islam in India."[187]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ্ আকবরের প্রচারিত ধর্মমত, 'দ্বীনই-ইলাহী' এর কারণে, এ উপমহাদেশ থেকে দ্বীন-ইসলাম চিরতরে উৎখাতের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই বিশেষ অবস্থায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় দ্বীনের হেফাজতের জন্য এমন একজন মুজাদ্দিদ কে প্রেরণ করেন, যিনি ইসলামী দরদ ও আবেগ-ভরপুর অন্তঃকরণে হুকুমাতের ধর্মদ্রোহীতা ও বেদ্বীন কার্যকলাপকে ধ্বংস করে তদস্থলে আল্লাহ্ তা'য়ালার কানূন ও দ্বীনী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করেন।

<u>১১। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের ফিত্না ঃ</u>

বাদশাহ আকবরের মৃত্যুর পর নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর ১০১৪/১৬০৫ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। পিতার আমলের ইসলামের জন্য ক্ষতিকর সমস্ত ব্যবস্থাকে তিনি বলবৎ রাখেন। তাঁর সময়ে বাদশাহ্কে সিজ্দা করার প্রথাও প্রচলিত ছিলো। জাহাঙ্গীর স্বীয় পিতার ন্যায় সূর্যকে তাযীম করতেন এবং সূর্যের বিভিন্ন নাম তাসবীহ্রূপে জপতেন। জ্যোতিষীগণের উপর তাঁর ছিলো

---

১৮৬. Smith V.A., *Akbar the Great Mughal*, op. cit., p.185.
১৮৭.Dr. Ishwari Prasad, op.cit, p. 382.

Dhaka University Institutional Repository

গভীর বিশ্বাস এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কোনো কাজ করবার পূর্বে শুভাশুভ লক্ষণ যাচাই করতেন। তিনি আগুনকে 'আল্লাহর নূর' বলে বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের কারণে তিনি নিয়মিত 'প্রদীপ পূঁজা' করতেন। 'দশহারা' ও 'দিপালী' উৎমসবে তিনিও পিতার ন্যায় যোগদান করতেন এবং 'রাখী-বন্ধনের' প্রতীক গ্রহণ করতেন। তিনি নিজেও শরাব পান করতেন এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন।

মোটকথা, দ্বীনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতায় তিনি তাঁর পিতার চাইতে একটুও পেছনে ছিলেন না। আর তাঁর পরিষদবর্গও পিতৃযুগের পরিষদবর্গের ন্যায় তাঁর মনোরঞ্জনের চেষ্টাই করতেন। অবশ্য দেশ-শাসন, প্রজা সাধারণের সুখ শান্তি বিধান ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কতিপয় জনহিতকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।[১৮৮]

এতদসত্ত্বেও বাদশাহ জাহাঙ্গীর মায্হাবী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর পিতার ব্যতিক্রম ছিলেন না। উপরন্তু তাঁর আমলে হযরত মুজাদ্দিদ-ই আল্ফে সানী (রহঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি নতুন ফিত্না দেখা দেয় এবং এই ফিত্নার উৎসমূলে ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

নূরজাহান বাদশাহ জাহাঙ্গীরের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। আর এ সম্পর্কে স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীর বলেন ঃ

> "আমার রাজত্ব এখন নূরজাহান এবং তার গোষ্ঠীর হাতে। আমি
> রাজত্ব তাদের দিয়ে দিয়েছি। প্রত্যহ আধাসের গোশ্ত এবং
> এক সের শরাব ব্যতীত আর কিছুই আমি চাই না।"[১৮৯]

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ইসলামীয়া সম্প্রদায়ভূক্ত ইরানের বাদশাহের উযীর খাজা মুহাম্মদ শারীফের দৌহিত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন শীয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ স্তম্ভস্বরূপ। এ সময় বিশেষভাবে শীয়া ও সুন্নী সম্প্রদায় দ্বন্দ্ব তীব্ররূপ ধারণ করে। উপরন্তু খুতবার মধ্যে 'খুলাফা-ই-রাশেদীন' এর সমালোচনা ঐ সময়ের সবচেয়ে বেশী মতবিরোধের কারণ ছিলো। এই সময়ে ইরানে শীয়াদের প্রভাব এতো বেশী ছিলো যে, সুন্নীদেরকে সেখানে বলপূর্বক ইমামীয়া মাযহাবভূক্ত করা হতো।[১৯০]

---

[১৮৮]. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া, *'উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাযী*, আমিন কোম্পানী, দিল্লীঃ ১৯৩১, পৃ. ১২১।
[১৮৯]. নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর, *তুযুকে জাহাঙ্গীরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।
[১৯০]. মোঃ হুসাইন আযাদ, *তারীখে ফিরিশ্তা*, ৩য় খন্ড, আসরারে করিমী প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯৫৯, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, এই ইরানী শিয়াগণ যখন দেখলো, নূরজাহান ভারত সম্রাজ্ঞী তথা রাজক্ষমতার অধিকারিণী এবং তাঁর ভ্রাতা আসফ খান তাঁর সহকারী, তখন তারা সুন্নীদের কোনঠাসা করে শীয়া মতবাদ প্রচারের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। হযরত মুজাদ্দিদই-আল্‌ফে সানী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, যার ফলে নূরজাহানের চক্রান্তে বাদশাহ তাঁকে সিজ্‌দাহ না করার অভিযোগে হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্‌ফে সানী (রহঃ) কে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দ করে রাখার জন্য নির্দেশ দেন।[১৯১]

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে সানী (রহঃ) এর উপর যে বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন, তা তাঁর পুত্রের নিকট লিখিত নিম্নোক্ত মাকতূব (পত্র) থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি লিখেছেনঃ

"প্রিয় বৎস! বিগত জামানার অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে যখন কোনো 'উলূল আসম' (মহাসম্মানিত) পয়গম্বর প্রেরণ করা হতো; সেই সময়ের পরিবেশের সাথে বর্তমান জামানার হুবহু মিল রয়েছে, কিন্তু এই উম্মত সমস্ত উম্মাতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাদের নবী খাতেমুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)। এই উম্মতের 'উলামাগণকে বনী ইসরাঈলের নবীগণের মর্তবা দান করা হয়েছে এবং ঐ সমস্ত নবী (আ.) এর স্থলে এদেরকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক শতবর্ষ অতিবাহিত হবার সময় এ উম্মতের উলামাগণের মধ্যে একজনকে মুজাদ্দিদ নির্ধারিত করা হয়, যিনি শারীয়াতে মুহাম্মাদীকে পূনর্জীবিত করেন। বিশেষ করে একহাজার বছর অতিবাহিত হবার পর বিগত উম্মাতগণের মধ্যে কোনো 'উলূল-আসম' পয়গাম্বরের প্রেরিত হবার সময় হতো এবং কেবল নবীর দর্জার উপর যথেষ্ট মনে করা হতো না। কাজেই এ সময় 'উম্মাতইমুহাম্মাদী (সা.) এর মধ্যে এরূপ এজন বড় শানদার মুজাদ্দিদের প্রয়োজন, যিনি 'আরিফে কামিল' এবং 'উলূল-আসম' নবীর নায়েব বা প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা রাখেন।"[১৯২]

দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদ হবার স্বপক্ষে তাঁর নিম্নোক্ত মাকতূবটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেনঃ

"পীর মুরীদি করবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়নি এবং আমাকে পয়দা করবার উদ্দেশ্য কেবল সৃষ্ট জীবের শিক্ষা দীক্ষার পূর্ণতা দান করা নয়। বরং এটা একটি ভিন্নতর ব্যাপার এবং

---

[১৯১]. জামিল রেজা, *হযরাতুল কুদুস*, মাক্‌তাবাতুল ইস্‌তিকামাহ্‌, কায়রো, মিশরঃ ১৯৩৯, পৃ. ১১৭।
[১৯২]. শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাকতূব নং- ১৯৮ (তা. বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

একটি ভিন্ন ধরণের কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে আমাকে পয়দা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে; সে ফায়েয প্রাপ্ত হবে, নতুবা না। তাকমীল ও ইরশাদের কর্মটি এ কার্যক্রমের মোকাবেলায় রাস্তার উপর পরিত্যক্ত বস্তু সদৃশ। নবী (আঃ) গণ কর্তৃক ধর্মের প্রতি দাওয়াত ও আল্লাহর সাথে তাদের বাতিনী সম্পর্কটিও এই ধরণের। যদিও নবূয়াতের সিলসিলা শেষ হয়েছে, কিন্তু নবূওয়াতে কামালাত ও এর বৈশিষ্ট্যরাজি রাসূল (সা.) এর পূর্ণ অনুসরণ ও উত্তরাধিকার সূত্রে নাসীব হয়ে থাকে।"[১৯৩]

বস্তুতঃ হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্‌ফে সানী (রহ.) তাঁর বিপ্লবী তাজদীদের (সংস্কারের) কাজ বাদশাহ্ আকবরের সময় থেকেই শুরু করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আকবরের সময় ছিলো তাঁর ব্যক্তিগত প্রস্তুতি গ্রহণের সময় এবং জাহাঙ্গীরের সময় তিনি প্রকাশ্যে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো চল্লিশের অধিক।

দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদ হিসেবে হযরত শায়খ আহমাদ সিরহিন্দীর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'শরহে রিসালা'য় যা লিখেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ

> "বাদশাহ্ হুমায়ূনের পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে
> যিন্দীকিয়াতের আক্বীদা পোষণ করেন; ফলে অজ্ঞতা ও গুমরাহীর
> পতাকা সমুন্নত হয়। ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ও বাতিলের অনুসারীগণ চতুর্দিক
> থেকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং দেশে এক বিরাট ফিত্‌নার সৃষ্টি হয়।
> অতঃপর আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।
> তিনি শরাব পানে বিশেষভাবে অভ্যস্থ ছিলেন। তাঁর আমলে হিন্দুগণ
> মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং রাফিজীদের প্রভাব ও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।
> যার ফলে দ্বীন-ইসলাম বিপন্ন হয়।"[১৯৪]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্‌ফে সানী (রহ.) এর আবির্ভাবকালীন সময় এমন ছিলো না, যখন হিন্দুস্থানে আর কোনা বিশিষ্ট পীর মাশায়িখ ও আ'লিম ছিলেন না। বরং সম্রাট আকবর ও

---

[১৯৩]. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, মাকতূব নং- ৬।
[১৯৪]. শাহওয়ালী উল্লাহ, *শরহে রিসালাহ,* ১ম খন্ড, মাকতাবাতে থানভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৮৯৭, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সেখানে 'আউলিয়া-ই-কিরাম' ও হাক্কানী আ'লিমদের এরূপ সমাবেশ ঘটেছিলো, যার কোনো দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে ছিলো না। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন ঃ

> "এই সময়ে কেবলমাত্র দিল্লী শহরেই মাওজুদ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাইয়িদ আব্দুল ওয়াহাব বুখারী, শাহ মুহাম্মাদ খিয়ালী, শায়খ আব্দুল আযীম চিশতী, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, খাজা বাক্বী বিল্লাহ (রহ.), যিনি হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এর মুর্শিদ। এই বুযুর্গদের প্রত্যেকেই কারামাত সম্পন্ন ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইমাম সদৃশ ছিলেন। তাঁদের লিখিত অসংখ্য গ্রন্থ ও মাওজুদ ছিলো।"

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ আরো বলেনঃ

গঙ্গুহে শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী (র.) তাঁর আওলাদগণ মাওজুদ ছিলেন। এ বুযুর্গগণ সকলেই শারীয়াত ও মারেফাতের জ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ আব্দুন নাবী গঙ্গুঁহী (র.) বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, যিনি আকবর কর্তৃক নিহত হন। তাছাড়া আকবরবাদে ছিলেন মাওলানা সাইয়িত রফিউদ্দীন (র.), যিনি সে যুগের অন্যতম বুযুর্গ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। অনুরূপভাবে আমীর আবুল আলী উলুবী (র.) ছিলেন আকবরাবাদ। তিনি উলুবিয়া নাক্‌শবন্দীয়া ত্বরীকার যবরদস্ত পীর ছিলেন। এছাড়া গোয়ালীয়রে ছিলেন শাহ্ মুহাম্মাদ গাওছে গোয়ালীয়রী, নারজুলে ছিলেন শায়খ নিমাম নারনুলী (র.)।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) উপরোক্ত বুযুর্গদের মর্যাদা ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উলেখ করেছেনঃ

> "এই বুযুর্গগণ এরূপ ছিলেন, যাঁদের নামের ওসীলায় বরকত হাসিল করা যেত এবং যাঁদের নাম স্মরণ করলে আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত নাযিল হবার আশা করা যেত।"[১৯৫]

---

[১৯৫]. প্রাগুক্ত.

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় এ সমস্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বুযুর্গ থাকা সত্ত্বেও এই উভয় শাসকের রাজত্বকালে দ্বীন-ইলাম বিরোধী শাহী ফিত্না, বে-দ্বীনী কার্যকলাপ, দুনিয়াদার আলিম, সুফী, রাফিজী ও মুশরিকদের ফিত্না, বিভিন্ন মাযহাবের ধর্মীয় আধিপত্য, রাশি রাশি বিদ্'আতের প্রচলন, দ্বীন-ইসলাম বিরোধী রুস্মাত আক্বীদা ও আল্লাহ্কে অস্বীকার, দ্বীন-ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করবার ও দ্বীনের শেয়ার প্রভৃতি রহিত করবার জন্য অন্য বিবিধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, আল্লাহ্ তা'য়ালার কিতাবের ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাতের শিক্ষা ও আদর্শে তাঁরা দ্বীন-ইসলামকে রক্ষা করতে সাহসী হননি।

পক্ষান্তরে, এই বদ-দ্বীনি সয়লাবের বিরুদ্ধে যিনি একাকী হিমালয়ের মতো রুখে দাঁড়ান, তিনি শায়খআহ্মাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.)। আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ থেকে তিনি এ মহান দায়িত্ব আনজাম দেন এবং দ্বিতীয় সহস্র বছরের মুজাদ্দিদরূপে গায়বী মদদে এই সমস্ত বদ-দ্বীনি কার্যকলাপের আমূল সংস্কারপূর্বক দ্বীন-ইসলামকে সতেজ ও পরিবেশকে কলুষমুক্ত করে স্বীয় দায়িত্ব পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেন।

এই প্রসঙ্গে 'হিন্দুস্থানের তিনজন মুজাদ্দিদ' শীর্ষক আলোচনায় হযরত মুজাদ্দি-ই-আল্ফে সানী (রহ.) সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মন্তব্যটি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ

"বাস্তব কথা এই যে, সাধারণভাবে সকলকে দ্বীনের প্রতি আহবান করা এবং নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সাথে আহবান করা দুইটি ভিন্নতর ব্যাপার। এটা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক দাওয়াতদানকারী এ পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হবে। দাওয়াতদানকালে হাজার হাজার আলিম ও কামিল ব্যক্তি মাওজুদ থাকেন। কিন্তু দ্বারোদঘাটনকারী ব্যক্তি কেবলমাত্র উক্ত সময়ের মুজাদ্দিদই হয়ে থাকেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বাদশাহ ও হকপন্থী মাশায়িখগণ থেকে কি হিন্দুস্থান খালি ছিলো? বরং অসংখ্য বড় বড় আ'লিম ও মাশায়িখ মাওজুদ ছিলেন। কিন্তু উক্ত যুগের ইসলাহ (সংশোধন) ও তাজদিদী (সংস্কার) কার্য কারো দ্বারা সম্পন্ন হয়নি। একমাত্র শায়খ আহ্মাদ সিরহিন্দী (রহ.) এর পাক হাস্তি (পবিত্র ব্যক্তিত্ব) এই বিরাট কার্যের জিম্মাদারী গ্রহণ করে।"

Dhaka University Institutional Repository

এটা সুবিদিত যে, উক্ত সময়ে বড় বড় আ'লিম ও খানকার পীরগণ ছিলেন। মুন্‌তাখাবুত তাওয়ারীখ, তরকাতে আকবরী, রওযাতুল উলামা এবং আখ্‌বারুল আখিয়ার প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে দেখা যায় যে, এই সময়ে হিন্দুস্থানে আ'লিম পীর ছাড়া কিছুই ছিলো না এবং খানকাহ ও মাদ্রাসা ব্যতিরেকে কোনো শহর ও গ্রাম ছিলো না।"[১৯৬]

তৎকালীন উলামাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ খুবই বিখ্যাত ছিলেন। যথাঃ শায়খ আলী মোত্তাকী, শায়খ জালাল থানেশ্বরী, মোল্লা মাহমুদ জৌনপুরী, মাওলানা ইয়াকুব কাশ্মিরী, মোল্লা কুতুবুদ্দীন শাহ্‌লভী, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, মোল্লা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটী, মাওলানা ইলাহ্‌দাদ জৌনপুরী। এঁরা স্ব স্ব কর্মকান্ডে নিজেদের সময় ব্যয় করতেন। তাঁরা এই তাজদিদী কার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে তৎপর হননি।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এর মুর্শিদ হযরত খাজা বাক্বী বিল্লাহ (রহ.)। হযরত মুজাদ্দি-ই-আল্‌ফে সানীর (রহ.) ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেনঃ

"আমি আলোক নই বরং চকমকি, আমি আগুন বের করে দেই।"

কিন্তু আলো হচ্ছে শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী।"[১৯৭]

'উলামাই-হিন্দকা শানদান মাযী' গ্রন্থের প্রণেতা মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ মিয়া হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এর তাজদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আলোকপাত করে বলেছেন ঃ

"আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে কেবল হিন্দুস্থানেই নয় বরং কাবুল, তুর্কীস্থান ও খুরাসানে দ্বীন-ইসলামের অবস্থা খুবই নাজুক ছিলো। সকলেই দ্বীনের দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতো, কিন্তু কেউ উহার তাজদীদের জন্য সচেষ্ট হতো না। হিন্দুস্থানে সবচে বড় মুসীবাত ছিলো এই যে, আম ও খাস সকলের উপর তাসাউফের রঙ এতো গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো, যা অবর্ণনীয়। কিন্তু প্রকৃত তাসাউফের পবিত্রতা মূর্খতা ও বিদ্'আতের সংমিশ্রণে একেবারেই কলুষিত হয়ে পড়েছিলো। বরং এক প্রকারের খেয়াল খুশী ও স্বেচ্ছাচারিতাকে ত্বরীক্বতের গোপন তথ্যের আখ্যায় আখ্যায়িত করে লোকদেরকে ধোঁকা দেয়া হতো। সাধারণ লোকেরা শারীয়াতের শিক্ষা পরিত্যাগ

---

[১৯৬]. আবুল কালাম আযাদ; *তায্‌কিরাহ,* ২য় খন্ড, নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, ভারতঃ (তা. বি.), পৃ. ২০৯।
[১৯৭]. খাজা বাক্বী বিল্লাহ, *মাকতুবাতে খাজা বাক্বী বিল্লাহ (র.),* মাতবা'উ মুজ্‌তাবায়ী, দিল্লীঃ ১৮৯৮, পৃ. ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

করায় গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়। একদিকে তথাকথিত পীর ও মাশায়িখদের খানকার বেড়াজাল সারাদেশকে আবদ্ধ করে রেখেছিলো; অপরদিকে আকবরী শাসনের প্রভাবে চতুর্দিকে বিদ্'আত বিস্তার লাভ করে এবং এই কর্মে 'উলামায়ে ছু' (অসৎ আলিম) ও দুনিয়াদার সূফী নামধারীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই ফিত্নাকে প্রতিরোধ করবার মতো শক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালা একমাত্র হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহঃ) কে প্রদান করেন।"[১৯৮]

১২। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) এর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বিপ্লবী কর্মসূচীঃ

ইমাম-ই-রাব্বানী মুজাদ্দিদ-ই- আল্ফে সানী (রহঃ) এর রাজনৈতিক মদাদর্শ এরূপ ছিলোঃ দেশের বাদশাহ্ জনগণের জন্য রূহ্ বা আত্মা সদৃশ। এমতাবস্থায় রূহের ইসলাহ্ বা সংশোধনের মাধ্যমে শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংশোধন হয়ে থাকে। বস্তুতঃ হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) তাঁর মুজাদ্দিদী জীবনের বিপ্লবী সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের প্রাক্কালে এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, মৌলিকভাবে তিনটি ধারায় আকবরী ফিত্নার সয়লাব প্রবাহিত। উক্ত তিনটি ধারা ছিলোঃ

১। বাদশাহের আমীর-উমরাহ্গণঃ

তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর বিশেষ গতি এঁদের অনেককে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে হিন্দুত্বের প্রিয়পাত্র বানিয়ে ফেলেছিলো।

২। 'উলামা-ই-ছু' বা অসৎ আ'লিমঃ

এদের একমাত্র অভিলাষ ছিলো পার্থিব স্বার্থ লাভ করা। এজন্য তারা রাজ্যের কর্ণধার ও আমীর উমরাদের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত থাকতো এবং প্রয়োজনবোধে তারা শরীয়তের বৈধ জিনিসকে অবৈধ এবং হারামকে হালাল বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতো না।

৩। ভন্ড ও গুম্রাহ্ তথাকথিত সূফীগণঃ

এই দলের অভিমত ছিলো 'শারীয়াত আওর হায়, ত্বরীক্বাত আওর' অর্থাৎ শরীয়াতের সাথে ত্বরীক্বাতের কোনো সংশ্রব নেই, বরং ত্বরীক্বাতের পূর্ণতা লাভ করলে শরীয়াতের পাবন্দী বা

[১৯৮]. সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণ তাদের জন্য আর দরকার হয় না। এতে কামিল ব্যক্তি আল্লাহ্ হতে পারে এবং আল্লাহর বেটাও।

ফিত্নার এই উৎস পরস্পর সংলগ্ন। মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) এদের গতি ও চিন্তাধারাকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য পূর্ণশক্তি ও হিকমাতের মাধ্যমে স্বীয় মুজাদ্দিদী খিদমাত সম্পাদন করে কামিয়াব হন।

তিনি তাঁর মুজাদ্দিদ সুলভ তীক্ষ্ম জ্ঞান দ্বারা এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, উপরোক্ত তিনটি ধারার ফিত্নার সংস্কার সাধন হলেই বাদশাহ এবং দেশের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংশোধিত হয়ে যাবে। কেননা, তাঁর মতে শরীরের সাথে যেমন রূহের সম্পর্ক, ঠিক তেমনটি বাদশাহের সাথে দেশের জনসাধারণের সম্পর্ক বিদ্যমান। 'উলামা-ই-ছু' ও ভন্ড-দরবেশগণ স্বীয় স্বার্থের মায়াজালে বাদশাহ্কে আবদ্ধ করে দ্বীন-ইসলামের সমূহ্ ক্ষতিসাধন করে। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

> "দ্বীন-ইসলামকে কেবলমাত্র বাদশাহ্, দুনিয়াদার আ'লিম
> ও ভন্ড সূফীগণ বরবাদ করেন।"[১৯৯]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহঃ) তাঁর বিপ্লবী সংস্কার কর্মসূচীর সূচনাতে রাজ্যের আমীর উমরাহ্গণের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করেন, যার ফলে তাঁদের অধিকাংশই হযরত শায়খ আহ্মাদ সিরহিন্দীর (রহ.) নিকট মুরীদ হয়ে তাঁর হালকাভুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁদের সাথে যে পত্র বিনিময় করেন, তাতে মুর্শীদের ন্যায় বেপরোয়া ও বেনিয়াযীর শান পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত পত্রে বাতিল আক্বীদা পরিত্যাগের জন্য তাঁদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্ফে সানী (রহঃ) এই সমস্ত উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী রাজকর্মচারীদেরকে অতি সতর্কতার সাথে তা'লিম ও তারবিয়াত বা শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করেন এবং তাঁদের ভুল আ'ক্বীদাগুলো সংশোধন করে সত্যিকার ইসলামী আদর্শের অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলেন। অন্যদিকে তিনি এঁদের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতায় সরকারী শাসনমন্ত্রের গতিও নিয়ন্ত্রিত করেন। কেননা, রাজ-দরবারে এঁদের অবাধ গমনাগমন ছিলো এবং তাঁদের প্রভাব

---

[১৯৯]. মাওলানা মানযুর নু'মানী, *তায্কিরায়ে মুজাদ্দিদে আল্ফে সানী (র.)*, দায়েরাতুল মা'আরিফিন নিযামিয়্যাহ, হায়দারাবাদঃ ১৩৩৭ হি., পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপত্তি ছিলো যথেষ্ট পরিমাণে বেশী। কাজেই, এরূপ মনে করা সঙ্গত হবে যে, আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সকল সুন্নী সরকারী কর্মচারী ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদের বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলনের সদস্য ও কার্যকরী কর্মপরিষদ।

এই সময় অধিকাংশ মুসলিম দেশের আমীর, হাকীম, আ'লিম ও মাশায়িখগণ হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন এবং সকল দিক থেকে দলে দলে লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য আগমন করতে থাকে। তিনি সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হন এবং তাঁর দরবার এরূপ মর্যাদা ও গৌরব লাভ করে যে, সেখানে কেউ মুখ খুলতে সাহস পেত না। এ সময় হযরত মুজাদ্দিদ শায়খ রফিউদ্দীনকে খলীফা বানিয়ে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের সৈন্যদের মধ্যে ইসলাহী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

বস্তুতঃ কোনো সম্রাটের শুদ্ধি বা সাম্রাজ্যের সংস্কার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইসলামের নীতি অনুযায়ী এটা ধর্মের অন্যতম প্রধান খিদমাত। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর রহমতে কামিয়াবী হাসিল করেন। তাঁর এই গৌরবময় রক্তপাতহীন বিরাট বিপ্লবী সংস্কার কর্মধারার কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণ জানা যেতে পারে। অবশ্য তাঁর মাক্‌তূবাত শরীফই তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূল দলীল হিসেবে এখনো বিদ্যমান, যার আলোকে তাঁর বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলনের রূপরেখা পরবর্তীতে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

হযরত মুজাদ্দিদের মাক্‌তূব (পত্র) গুলো পাঠ করলে জানা যায় যে, বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেকেই সুন্নী মতবাদের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই হযরত মুজাদ্দিদের নিকট মুরীদ হয়ে তাঁর হালকাভূক্ত হন। শাহী দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথাঃ আব্দুর রহীম খান খানান, খান জাহান, খান আযম, সদর জাহান, মীর্জা দারা, কালীজ খান, নওয়াব শায়খ ফরীদ, হাকিমী ফত্‌হুল্লাহ, শায়খ আব্দুল ওহাব, সৈয়দ মাহমুদ, সৈয়দ আহমাদ, খিজির খান লোধী, মীর্জা বদীউজ্জামান, জাব্বারী খান, সিকান্দার খান লোধী প্রমুখ।

এঁদের নামে লিখিত পত্রাবলীই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এঁদের কেউ কেউ অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী উচ্চ-পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক রাজকর্মচারী ছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের

Dhaka University Institutional Repository

স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বিশেষভাবে আব্দুর রহীম খান খানান বাদশাহ্ আকবরের সময় থেকেই এতোবেশী প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে; যেনো মনে হতো, তিনি যেন অর্ধ-রাজত্বের মালিক। তিনি সম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে সব সময়ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। অনুরূপভাবে উল্লেখিত অন্যান্য কর্মচারীও বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং বাদশাহ্ আকবেরর রাজত্বকাল থেকেই তাঁরা বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[২০০]

আকবরের মৃত্যুর পর হিজরী ১০১৪ সালের ৮ই জমাদিউস্-সানী জাহাঙ্গীর দিল্লীর মসনদে আরোহন করেন। তিনি মৃত পিতার মতের অনুসারী হলেও কার্যতঃ উদার মনোভাবাপন্ন মুসলমান ছিলেন। এ সময় হযরত মুজাদ্দিদের বয়স ছিলো ৪৩ বছর। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথেই হযরত মুজাদ্দিদ তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। বাদশাহের মনোভাবের কথা উল্লেখপূর্বক তাই তিনি তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট মুরীদ শায়খ ফরীদের নিকট এ মর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। নিম্নে পত্রটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলোঃ

> "আজ ইসলামী রাজত্বের উন্নতি ও মুসলমান বাদশাহের সিংহাসনে আরোহণের খোশ- খবর খাস ও আম (বিশেষ ও সাধারণ) লোকের কানে পৌঁছেছে। বাদশাহের মদদগার ও সাহায্যকারী হওয়া এবং শারীয়াত প্রচার ও মাযহাবকে শক্তিশালী করতে তাকে পথ প্রদর্শন করা মুসলমানগণ নিজেদের উপর কর্তব্য বলে মনে করে এই সাহায্য ও শক্তি বৃদ্ধি মুখেই হোক অথবা বাহুবলে।"[২০১]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের এই সময়কে তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূল্যবান সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনিও তাঁর অনুগত বিশিষ্ট আমীর উমরাদের দ্বারা ইসলাহী কার্যক্রমের নমুনাস্বরূপ কতিপয় মাক্তূবের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো, যাতে হযরত মুজাদ্দিদের ধর্মের প্রতি আবেগ ও অনুরাগ এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি ও তৎকালীন অবস্থার প্রতি বিশেষ আলোকপাত রয়েছে।

---

[২০০]. মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, *তারীখে দাওয়াত ও আযীমত*, ৪র্থ খন্ড, মাকতাবাতে থানভী, দেওবন্দ্ঃ (তা. বি.) পৃ. ৮৭।

[২০১].শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাক্তুব নং-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

খান আযম ছিলেন বাদশাহ্ আকবরের উমরাহ্গণের অন্যতম। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও তিনি একজন বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্ফে সানী (রহ.) তাঁকে লিখছেনঃ

> "সত্য সংবাদদাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ
> ইসলাম এর প্রারম্ভকালে যেমন অপরিচিত ছিলো, অচিরেই তা
> পুনরায় অপরিচিত হয়ে যাবে। কাজেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত
> করবার লক্ষ্যে যারা অন্যের চোখে অপরিচিত ও অপছন্দনীয় হয়,
> তাদের জন্য খোশ্-খবর "।

বর্তমানে ইসলাম ধর্মের অসহায়তা ও করুণ অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে সে, কাফিরগণ প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দোষারোপ করছে। তারা মুসলমানদের বদনাম করছে এবং নির্ভয়ে কুফরী হুকুম-আহ্কাম জারী করে বাজার, রাস্তাঘাট ও অলি-গলিতে নিজেদের প্রশংসা করছে। অপরপক্ষে মুসলমানদের জন্য ইসলামের হুকুম আহকাম প্রচার করা নিষেধ। শরীয়াতের হুকুম-আহ্কাম পালনের জন্য তাদের উপর দোষারোপ ও বদনাম করা হচ্ছে।

'সুব্হানাল্লাহী ওয়া বিহামদিহী'। এরূপ কথিত আছে যে, 'শারীয়ত তরবারির ছাঁয়ার নীচে।' কেননা, প্রকৃতপক্ষে শরা-শরীয়াতের খুবী (সৌন্দর্য) বাদশাহ্দের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আফসোস! এখানে ব্যাপারটি বিপরীত। এটা কতোই না হৃদয়বিদারক!

বর্তমানে আপনার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা অনেক বেশী। আমরা এই ধর্মযুদ্ধে দূর্বল এবং পরাজিত। কেবল আপনার মুখের দিকে আশান্বিত হয়ে চেয়ে আছি। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আপনাকে এই ধর্মযুদ্ধে সাহায্য করেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ 'লোকে যখন পাগল বলে, তখনই পূর্ণ ঈমান অর্জিত হয়।' আসলে এই পবিত্র পাগলামির উদ্দেশ্য হচ্ছে, দ্বীনের সাহায্য ও ইসলামের প্রতি আন্ত রিক দরদ। এটা আপনার ফিত্রাত্ বা স্বভাবের মধ্যে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। আল্হাম্দুল্লিাহ্!

বর্তমান সময়টি এরূপ যে, যখন অল্প কাজের বিনিময়ে অধিক ফল লাভ করা যায়। 'আস্হাবে কাহা্ফ্' বা গুহাবাসীগণ তাঁদের যামানায় কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হিজরত করেছিলেন। এজন্য তাঁদের এই কাজটি আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দ হয়। শত্রুর

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণকালে সিপাহী অল্প-স্বল্প কষ্ট করলেও তারা বড়ই বিশ্বাসের পাত্র হয়। এখন আপনার সামনে জিহাদের যে সুযোগ এসেছে, এটাই 'জিহাদ-ই-আকবর' বা সব চাইতে বড় জিহাদ। একে গাণীমাত মনে করে এ কাজে অধিক সচেষ্ট হোন।"

অতঃপর হযরত খাজা আহ্রার (রহ.) কী প্রকারে বাদশাহ্ ও আমীরগণের দরবারে গমন করে তাঁদেরকে স্বীয় চরিত্র বলে বশীভূত করে সংশোধন করতেন, এর দৃষ্টান্ত প্রদানের পর হযরত মুজাদ্দিদ লিখেছেনঃ

> "নক্‌শবন্দীয়া ত্বরীকার বুযুর্গদের সাথে মহব্বত স্থাপন করার
> দরুন আল্লাহ্ পাক আপনাকে এক প্রকারের প্রভাব ও দৃঢ়তা
> দান করেছেন। সমসাময়িক ব্যক্তি ও বন্ধুগণের দৃষ্টিতে আপনার
> মধ্যে ধর্মীয় মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে, এজন্য আপনি চেষ্টা
> করুন, যাতে মুসলমানদের মধ্যে কুফরী হুকুম-আহ্কাম ও মাযহাবী
> উদাসীনতা সৃষ্টি না হতে পারে এবং তারা যেন এই খারাপ কাজ
> থেকে দূরে থাকতে পারে।"

বিগত রাজত্বে (আকবরের শাসনামলে) এরূপ মনে করা হতো, যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ধর্মের সাথে তাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ আছে। বর্তমানে এই (জাহাঙ্গীর) রাজত্বে প্রকাশ্যভাবে এরূপ শত্রুত দেখা যায় না। যদিও শত্রুতা থাকে, তবে তা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার ফলস্বরূপ। যাহোক, এই ভয় ও অবশ্য আছে যে, উহা থেকে ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় ব্যাপারে শত্রুতার সৃষ্টি হবে এবং মুসলমানদেরকে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে"।[২০২]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের দরবারের একজন অন্যতম সদস্যকে ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্দশা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে আফসোস প্রকাশ পূর্বক লিখেছেনঃ

"প্রায় এক শতাব্দী অতিবাহিত হতে চললো, ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্দশা ও অসহায়তা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কাফিরগণ ইসলামী মুলুকে প্রকাশ্যভাবে কুফরী হুকুম আহ্কাম জারী করেও সন্তুষ্ট নয় বরং তারা চেষ্টা করছে, যাতে ইসলামী আহ্কাম একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং ইসলাম ও মুসলমানীর কোনো নাম-নিশানা বাকী না থাকে। ব্যাপারটি এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে,

[২০২]. প্রাগুক্ত, মাক্‌তুব নং-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

কোনো মুসলমান ইসলামের কোনো শেয়ার বা রীতি-নীতি প্রকাশ করলে তাকে হত্যা করা হয়। হিন্দুস্থানে গরু জবেহ্ করা ইসলামের একটি বড় শেয়ার। কাফিরগণ জিযিয়া কর দিতে রাজী হতে পারে, কিন্তু তারা কখনও গরু কুরবানীতে রাজী হবে না। বর্তমান বাদশাহের (জাহাঙ্গীরের) রাজত্বের প্রারম্ভে যদি ইসলামী হুকুম আহ্কাম প্রচলিত হয় এবং মুসলমানগণও তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তবে উত্তম। অন্যথায় যদি এ ব্যাপারে অধিক বিলম্ব করা হয়, তবে মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় অনুশাসনগুলো ঠিকভাবে পালন করা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। পানাহ্!! আবার পানাহ্!!! দেখা যাক, কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি এই সৌভাগ্যের জন্য প্রস্তুত এবং কোন্ বাহাদুর উক্ত দৌলত লাভে সক্ষম।"[২০৩]

মুফতী সদরে জাহান একজন মর্যদাসম্পন্ন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাইয়িদ বংশজাত ছিলেন এবং আকবরের সময় দীর্ঘকাল প্রধান মুফ্তীর দায়িত্ব পালন করেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ও তাকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত রাখেন। দ্বীনের তাজদীদের কাজে শরীক হ্বার জন্য হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্ফে সানী (রহ.) তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে লিখছেনঃ

"কথিত আছে, 'লোকেরা বাদশাহের ধর্মের অনুসরণকারী'। এজন্য সর্বসাধারণের সংশোধনের জন্য বাদশাহের সংশোধন খুবই জরুরী। বিগত জামানার (আকবরের সময়) কার্যকলাপ এর জ্বলন্ত নযীর।

বস্তুতঃ এখন রাজত্বের মধ্যে একটি বিপ্লব এসেছে এবং দ্বীনের দুশমনদের সক্রিয়তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তথা আমীর উমরা ও উলামাদের উপর দায়িত্ব কর্তব্য এই যে, তারা যেন দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং ইসলামের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তম্ভগুলোকে পুণরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কেননা, অহেতুক বিলম্বে অধিক পরিমাণ অমঙ্গল অনিবার্য। আমাদের ন্যায় গরীবের অন্তঃকরণ বিলম্বের কারণে খুবই পেরেশান। যামানার দুঃখ-কষ্টের ছাপ এখনো মুসলমানদের অন্তরে আঁকা আছে। ঘটনাবলী যেন এর প্রতিকারের পরিপন্থী না হয় এবং ইসলাম যেন এর থেকেও অসহায় অবস্থা প্রা্ত না হয়। বাদশাহ্ যে পর্যন্ত সুন্নাতে নববীর উন্নতির জন্য আগ্রহশীল না হন এবং বাদশাহের প্রিয়পাত্রগণও

---

২০৩. প্রাগুক্ত, মাক্তূব নং- ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করা থেকে দূরে রেখে নশ্বর জীবনকে প্রিয় মনে করেন, এমতাবস্থায় বেচারা মুসলমানের উপর সময় বড়ই কঠিন ও সংকীর্ণ হবে।"[২০৪]

বৈরাম খানের ভাগিনা খান জাহান ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যার প্রাধান্য রাজত্বের অধিকাংশ আমীর-উমরাহ্দের উপর ছিলো। হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) দ্বীনের তাজদীদের কাজে শরীক হবার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। উক্ত পত্রটি মাক্তূবাত শরীফের দ্বিতীয় খন্ডে ৬৭নং মাক্তূবরূপে সংকলিত আছে। এতে তিনি ইসলামের সমুদয় আকাঈদ ও ইবাদাত বড়ই চিত্তাকর্ষক ও সুন্দররূপে বর্ণনা করেছেন।

পত্রপাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি খান জাহানকে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত হবার তাকীদ দিচ্ছেন। এ পত্রের শেষাংশে তিনি লিখছেনঃ

"বর্তমান বাদশাহ (জাহাঙ্গীর) সপ্ত পুরুষ থেকে মুসলমান এবং আহ্ল-ই-সুন্নাতুল জামাতের অন্তর্ভূক্ত ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী। কিছু বছর হলো কিয়ামতের নিকটবর্তী এবং নবুওয়াতের সময় থেকে দূরবর্তী এ যামানার কিছু আ'লিম স্বীয় অন্তরের কলুষ থেকে উৎপন্ন লোভের বদ্‌বখ্‌তীর দরুণ বাদশাহ এবং আমীরগণের নৈকট্য হাসিল ও খোশামোদ করে মজবুত ধর্মের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি ও আপত্তি উত্থাপন করে সরল ও নির্বোধ লোকদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে।

এই মহীয়ান বাদশাহ যখন আপনার কথা ভালোভাবে শ্রবণ ও গ্রহণ করতে পারেন বলে প্রমাণ হয়; তখন এটা বড় দৌলত হবে যে, আপনি প্রকাশ্যে বা ইশারা ইঙ্গিতে আহ্ল-ই-সুন্নাতুল জামা'তের আক্বীদাগুলোর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ 'কালিমা-ই-হক্ব' তথা 'কালিমা-ই-ইসলামকে' তাঁর কানে পৌঁছে দেন এবং যতদূর সম্ভব 'আহ্ল-ই-হক্ব' এর কথাগুলো তাঁর সম্মুখে পেশ করেন। আর সব সময় এরূপ সুযোগ প্রাপ্তির জন্য আশান্বিত থাকুন, যাতে মাযহাব ও মিল্লাতের বিষয় আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। কুফর যে বাতিল, এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং সত্য; আর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই কুফরী পছন্দ করেন না। নির্ভীকচিত্তে এর অসারতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনতিবিলম্বে এদের মিথ্যা মা'বুদগুলির অসারতা প্রমাণপূর্বক মা'বুদ বরহক' সত্য মা'বুদকে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত দরকার।

---

[২০৪]. প্রাগুক্ত, মাক্তূব নং- ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ কাফিরদের ধর্ম বাতিল এবং মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি হক্ব ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী। একমাত্র সরলপথ হচ্ছে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও খুলাফা-ই-রাশেদীদের প্রদর্শিত পথ বা ত্বরীকা।"

হযরত মুজাদ্দিদ--ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) আরো বলছেনঃ

"এখন আমি প্রকৃত ব্যাপার বিধৃত করছি যে, বাদশাহ হলেন আত্মাসদৃশ এবং অন্য সকল মানুষ শরীর-স্বরূপ। আত্মা সুস্থ্য থাকলে যেমন শরীর ভালো থাকে, তদ্রুপ আত্মা রোগাক্রান্ত হলে শরীর ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই, বাদশাহের ইসলাহ্ বা সংশোধনের উপরে রাজ্যের প্রজাদের ইসলাহ্ নির্ভরশীল। বাদশাহের ইসলাহ্ হচ্ছে যে, সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যে প্রকারেই হোক 'কালিমা-ই-ইসলাম' কে যেন তাঁর নিকট প্রচার ও প্রকাশ করা হয়। কালিমা-ই-ইসলামের পর সুন্নী জামাত পন্থীদের আক্বীদাগুলো সময় সুযোগমত বাদশাহের কানে পৌঁছা দরকার এবং বাতিল মাযহাব পন্থীদের রদ বা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। এই সম্পদ হস্তগত হলে নবী (আ.) গণের মীরাস বা সম্পত্তি হস্তগত হয়। আপনি এই সম্মান বিনাকষ্টে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। কাজেই এর কদর বা সম্মান করুন।"[২০৫]

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরে সময়ের বিশিষ্ট আমীর কালীজ খানের নামে লিখিত এক মাকতূবে (পত্রে) হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্‌ফে সানী (রহ.) তাকে পরহেযগারী এখ্‌তিয়ার ও দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে লিখছেনঃ

"দ্বিতীয়ত আপনাকে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে, লাহোরের ন্যায় বড় শহরে আপনার ব্যক্তিত্বের দরুন শরীয়াতের অনেক হুকুম-আহ্‌কাম প্রচলিত হয়েছে। এতে দ্বীন-ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ও শরীয়াতের সাহায্য হয়েছে। এই শহরটি হিন্দুস্থানের সকল শহরের মধ্যে কুতুবে ইরশাদের মর্যাদা রাখে। এই শহরের খায়ের ও বারকাত হিন্দুস্থানের সকল শহরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই শহরে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার হলে অন্য সকল শহরে ও স্থানে এর প্রচলন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আপনাকে সাহায্য করুন।"[২০৬]

---

[২০৫]. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, মাকতূব নং- ৬৭।
[২০৬]. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাক্‌তূব নং-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) অন্য এক মাকতূবে দ্বীনের সাহায্যকারীদের কথা বর্ণনা করে লিখছেনঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে সদা সর্বদা এমন এক জামাত থাকবে, যারা জয়ী হয়ে সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের বিপক্ষ দল কিয়ামতে পর্যন্ত তাদের কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না'।"[২০৭]

হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) খান জাহানকে অন্য এক পত্রে দ্বীন-ইসলামের তাজদীদের কাজে নিজেকে নিয়োগ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে লিখছেনঃ

"......... নশ্বর দুনিয়ার মিষ্টতা ও নিয়ামাতগুলো ভালো মনে হয়, যদি তন্মধ্যে দ্বীনের তাবলীগ ও আমাল থাকে। অন্যথায় এটা ধ্বংসাত্মক প্রাণহরণকারী হলাহল সদৃশ, যা চিনির সহিত মিশ্রিত এবং যদ্বারা অন্ধ ও অজ্ঞ লোককে প্রতারিত করা হয়ে থাকে। পার্থিব মিষ্টতার প্রাণসংহারী বিষের সংশয় যদি হাকীমে মুতলাক-জাল্লা শানুহুর বিষ সংহারকের দ্বারা করা হয় অর্থাৎ শরীয়তের-আহ্‌কামের তিক্ততা ও মিষ্টতা দ্বারা যদি এর প্রতিরোধ করা হয়। তবে অতি সহজ ও সহজের উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ সামান্য সংস্কারের দ্বারা চিরসুখের স্থান হাসিল করা সম্ভব হয়। যাহোক, ছোট বাচ্চাদের মতো বাদাম ও আখরোটের লালসার শিকার না হয়ে প্রত্যেক অবস্থায় বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা সহকারে কর্মসম্পাদন করা উচিত। সামনে এখন যে খেদমাত আছে, তা যদি শরীয়াত-ই- মুস্তাফা (সা.) এর অনুসরণের সহিত সম্পাদন করা হয়, তবে এ খেদমাত নবী (আ.) গণের খেদমতের অনুরূপ হবে এবং এর দ্বারা ইসলাম আরো গৌরবান্বিত হবে। আমাদের ন্যায় ফকীরগণ যদি বছরের পর বছর ব্যাপী জীবন বিসর্জন দিয়েও চেষ্টা করে, তাহলেও আপনাদের ন্যায় বাহাদুরদের সমকক্ষ হতে পারবে না।"[২০৮]

দ্বীনের কাফেলায় শরীক হয়ে তাজ্‌দীদের কাজে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) তাঁর অন্যতম মুরীদ বিশিষ্ট উমরাহ্ শায়খ ফরীদকে একটি নাতিদীর্ঘ পত্রে লিখছেনঃ

---

[২০৭]. প্রাগুক্ত, মাক্‌তূব নং- ৭৬।
[২০৮]. প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, মাক্‌তূব নং-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষের আত্মার সাথে তার দেহের যেরূপ সম্পর্ক, ঠিক অনুরূপ সম্পর্ক বাদশাহ ও তাঁর রাজত্বের প্রজাদের সহিত বিদ্যমান। আত্মা ভালো থাকলে যেমন দেহ ও ভালো থাকে, ঠিক তেমনি আত্মার মধ্যে গোলযোগ শুরু হলে শরীরের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এভাবেই রাজত্বের মঙ্গল ও কল্যাণ বাদশাহের ভালো হওয়ার উপর নির্ভর করে এবং বাদশাহ্ খারাপ হলে রাজত্বের অমঙ্গল অপরিহার্য।

আপনি জ্ঞাত আছেন যে, বিগত যামানায় (আকবরের সময়ে) মুসলমানদের উপর দিয়ে কী কী মুসীবাত গেছে। অতীতে কাফিরগণ জয়ী হয়ে দারুল ইসলামে কুফরী হুকুম আহ্কাম জারী করতো। অপরপক্ষে, সেখানে মুসলমানগণ ইসলামী হুকুম- আহকাম জারী করতে অপারগ ছিলো। এমনকি, তারা ইসলামী হুকুম জারী করতে সচেষ্ট হলে তাদের কতল করা হতো।

বড়ই আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার মাহবুব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বেইয্যাত ও অপদস্থ এবং তাঁর প্রতি অবিশ্বাসীগণ সম্মানী ও বিশ্বাসভাজন। মুসলমানগণ আহত হৃদয়ে ইসলামের জন্য শোক উদযাপন করতো এবং শত্রুগণ হাসি তামাসা করে তাঁদের যখমের উপর লবণ ছিটিয়ে দিতো। হিদায়তের সূর্য গুমরাহীতে ঢাকা পড়েছিলো এবং সত্যের আলো মিথ্যার পর্দায় ঢাকা পড়েছিলো। আজ ইসলামী রাজত্বের উন্নতি এবং মুসলমান বাদশাহ্ (জাহাঙ্গীরের) সিংহাসনে আরোহণের সু-খবর সর্বশ্রেণীর লোকের কানে পৌছেছে। বাদশাহর মদদগার ও সাহায্যকারী হওয়া এবং শারীয়াত প্রচার ও ধর্মকে শক্তিশালীকল্পে তাঁকে পথ প্রদর্শন করা মুসলমানগণ নিজেদের উপর কর্তব্য বলে মনে করেছে এই সাহায্য ও শক্তি যোগানো মুখেই হোক অথবা বাহুবলে সবচেয়ে বড় সাহায্য হচ্ছে কিতাব, সুন্নাত ও ইজ্মা-ই-উম্মতের ত্বরীকা অনুযায়ী শরীয়াতের মাসয়ালা- মাসায়িলগুলো বর্ণনা করা এবং প্রয়োজনীয় আক্বীদাগুলো প্রকাশ করা, যাতে কোনো বিদ'আত ও গুমরাহী মধ্যখানে উপনীত হয়ে পথভ্রষ্ট না করতে পারে এবং কর্ম পন্ড না করে। শরীয়াতের ব্যাপারে এই প্রকারের সাহায্যই হচ্ছে আখিরাতের নাজাত কামনাকারী হক্বপন্থী আলিমগণের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। দুনিয়াদার আলিমগণ এই নিকৃষ্ট দুনিয়াকে সর্বোতভাবে কামনা করে। তাদের সঙ্গলাভ মারাত্মক হলাহল সৃদশ এবং তাদের সৃষ্ট ফিত্না- ফাসাদ সংক্রামক ব্যাধির মতো।

Dhaka University Institutional Repository

কবির ভাষায়ঃ

ভোগ-বিলাসের সুখ-সায়রে যে আলিম রয় নিতি,
পথহারা সে, কাহারে দানিবে সুপথের পরিচিতি?

বিগত যামানায় যে সমস্ত মাসীবাত ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আপতিত হয়েছিলো, তার অন্যতম কারণ ছিলো এই দলের অপকর্ম। প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ (আকবর) কে এরাই গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করেছিলো। গুমরাহীর ৭২টি পথ অবলম্বনকারীদের পরিচালনাকারী ও পেশ ইমাম হচ্ছে এই সমস্ত নিকৃষ্ট আ'লিমগণ। আলিম ব্যতিরেকে এরূপ লোক বিরল, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদের গুমরাহীর প্রভাব অন্য লোক পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই যুগে সূফীদের পোশাক পরিহিত অধিকাংশ মূর্খ লোক আ'লিম সেজেছে এবং তাদের প্রচারিত ফিত্নাফাসাদ সংক্রামক ব্যাধির মতো। কোনো ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও সে যদি শরীয়াতের ব্যাপারে কোনো প্রকার সাহায্য না করে এবং এরফলে ইসলামী বিধানগুলো বাস্তবায়নে ত্রুটি ঘটে, তবে এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে। এই নিঃস্ব ফকীর ও নিজেকে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারীদের দলভূক্ত করে এ ব্যাপারে চেষ্টা করতে চায়। কেননা, কথিত আছেঃ 'যে কোনো সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সে তাদেরই দলভূক্ত।' এই হাদীসের মর্মানুযায়ী এই ফকীর ঐ সমস্ত বুযুর্গের জামাতের অন্তর্ভূক্ত হতে চায়। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে বিক্রি করার কথা প্রচারিত হলে একজন বৃদ্ধা রমণীও কিছু রশি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো, সেও যেন হযরত ইউসুফ (আ.) এর খরিদ্দারদের মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং তার সামর্থ্য ছিলো অতটুকুই।

এ ব্যাপারে আমি নিজেকে উক্ত বৃদ্ধা রমণীর মতোই মনে করছি। ইন্শা আল্লাহ্ ফকীর শীঘ্রই আপনার নিকট হাজির হওয়ার খাহেশ রাখে। আপনার নিকট এটাই কামনা করি যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন আপনাকে বাদশাহ্র পুরোপুরি নৈকট্য দান করেছেন, এমতাবস্থায় আপনি প্রকাশ্যে ও গোপনে পূর্ণভাবে রাসূল (সা.) এর শারীয়াতের প্রচারকার্যে সচেষ্ট হবেন এবং মুসলমানদেরকে এই দুরাবস্থা থেকে অব্যাহতি প্রদান করবেন।"[২০৯]

---

[২০৯]. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাকতূব নং- ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) শায়খ ফরীদকে পুনরায় লিখছেনঃ

"সৃষ্টির সেরা আম্বিয়া (আ.) গণ মানুষকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দ্বীনের তথা শারীয়াতের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং তাঁদের সমস্ত জীবন এ কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। এ সমস্ত বুযুর্গ প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো শরীয়াতের হুকুম আহ্‌কাম মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। কাজেই শারীয়াতের প্রচলন করা, বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে, যখন ইসলামের রীতি-নীতি ধ্বসে পড়েছে, তখন এর হুকুমগুলোর কোনো একটিকে জীবিত করার চেষ্টা করাই সর্বোত্তম কাজ। শারীয়াতের কোনো একটি বিধান প্রচলনের মোকাবেলায় কোটি কোটি টাকা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা সমান নয়। কেননা, এ কাজটি সৃষ্টির সেরা নবী (আ.) গণের অনুসরণের পর্যায়ভূক্ত এবং একাজ করার অর্থ হলো-ঐ সমস্ত বুযুর্গের সাথে শরীক হওয়ার সমতুল্য।"[২১০]

একইরূপে, অপর এক পত্রে হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে সানী (রহ.) শায়খ ফরীদকে লিখছেনঃ

"আল্লাহ্‌ তা'য়ালার দরবারে দু'য়া এই যে, 'আহ্‌ল-ই-বাইত' এর বুযুর্গ আওলাদগণের মাধ্যমে শরীয়াতের হুকুম আহকামগুলো প্রচার লাভ করুক। এটাই হচ্ছে প্রকৃত কাজ। এটা ব্যতীত অন্য সবই মূল্যহীন। গুমরাহীর এই তুফানের মধ্যে দুরবস্থাগ্রস্ত মুসলমানদের নাজাতের আশা আজো নবী কারীম (সা.) এর 'আহল-ই-বাইত' এর কিশ্‌তীর উপর নির্ভর করছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ

'আমার আহ্‌ল-ই-বাইতের উদাহরণ হযরত নূহ (আ.) এর কিশ্‌তীর অনুরূপ। যারা এতে আরোহণ করেছে, তারা নাজাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যারা উহা থেকে দূরে রয়েছে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।'

কাজেই এ সৌভাগ্য হাসিল করবার জন্য স্বীয় উচ্চ হিম্মতকে পূর্ণভাবে মিল্লাতের পুনর্জীবিতকরণ ও শারীয়াতের প্রচলন কার্যে নিয়োজিত করা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্‌ তা'য়ালার ফযলে বুযুর্গী ও সম্মান এবং শান-শওকাত সমস্ত কিছুই আপনি লাভ করেছেন। এর সাথে যদি এই নিয়ামতটি প্রাপ্তির সুযোগ লাভ হয়, তবে সৌভাগ্যের ময়দানে আপনিই সর্বাগ্রে সফলতা লাভ

[২১০]. প্রাগুক্ত, মাক্‌তূব নং- ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

করবেন। এই অধম দ্বীনের সাহায্য ও শারীয়াতের প্রচলন সম্পর্কে এক শ্রেণীর কথা পেশ করবার জন্য আপনার নিকট হাজির হবার ইচ্ছা পোষণ করে।"[২১১]

উপরোক্ত পত্রগুলির দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রা.) বাদশাহের সংশোধনের আগে সরকারী কর্মচারীদের ইসলাহীর প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভব করেন। কেননা, তাঁর ধারণানুযায়ী সেই যুগে প্রচলিত সমস্ত প্রকার ফিত্না-ফাসাদের অন্যতম কারণ ছিলো সরকারী শাসনতন্ত্র পরিচালনাকারী এই সমস্ত জাঁদরেল আমলাগণ।

বস্তুতঃ হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) কর্তৃক সংগঠিত সংস্কার আন্দোলন এর মধ্যে শায়খ ফরীদ ছিলেন শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাঁর মনোবল বৃদ্ধির জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) তাঁর নিকট সর্বমোট ২২ খানি পত্র লিখেছেন। তন্মধ্যে দ্বীনের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব তুলে ধরে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) তাঁকে শারীয়াতের বিধি-বিধান প্রচার ও প্রসারে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এক মাক্তূবে তাঁকে লিখছেনঃ

"আজকাল ইসলাম বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত। এখন এর শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি পয়সা ব্যয় করা কোটি কোটি টাকা খরচের চাইতেও উত্তম। দেখা যাক, কোন্ বাহাদুর এ বড় সম্পদটি লাভ করেন। সাধারণতঃ দ্বীনের প্রচার ও এর শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে কোনো সময় যে কোনা ব্যক্তি অগ্রসর হলে উহা উত্তম। কিন্তু বর্তমান অসহায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ন্যায় আহ্ল-ই-বাইতের বাহাদুরদের পক্ষে দ্বীন প্রচার ও ধর্মে সাহায্য করা খুবই শোভনীয় এবং এটা আপনাদের মতো লোকদেরই বিশেষ কাজ।

কেননা এই ধর্মরূপ মহাধনটি আপনাদেরই গৃহের বস্তু। আপনাদেরই বদৌলতে অন্য সকলে এই সম্পদ হাসিল করেছে। এই মহা খিদ্মাতের সুষ্ঠু সম্পাদনই হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ (স্রা.) এর হাকিকী বা সত্য-ত্বরীকার উত্তরাধিকারিত্ব। এটাই সেই সময়, যার সম্পর্কে রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

আজ এই সময় যদি তোমরা আদেশ ও নিষেধের (আমর ও নেহী) এক-দশমাংশ ও পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর এমন এক সময় আসবে, যখন এক-দশমাংশ সম্পাদন করলেই লোকেরা নাজাত পাবে।"

---

[২১১]. প্রাগুক্ত, মাক্তূব নং- ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

এই দীর্ঘ পত্রের শেষাংশে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) আরো লিখছেন ঃ

"বর্তমানে ইসলামের বাদশাহ্‌র (জাহাঙ্গীর) মনোযোগ কাফিরদের দিকে নেই। তাই এখন মুসলমানদের জন্য জরুরী হচ্ছে কুফরী রুস্‌মাতের বা রীতি-নীতির দোষ-ত্রুটিগুলো পূর্ণরূপে বাদশাহের গোচরীভূত করা। এ ব্যাপারে আপনি প্রয়োজনবোধে কোনো আ'লিমকে সঙ্গী করে নেবেন। শরীয়াতের হুকুম-আহ্‌কাম জারী করবার জন্য কোনো কারামাত প্রকাশ করা জরুরী নয়। যদি লোককে বুঝাবার জন্য এবং দ্বীনের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য কোনো জামাতকে কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাও প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্য বটে। নবী (আঃ) গণ কি কষ্ট ভোগ করেন নাই? হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

'আমাকে যত কষ্ট দেয়া হয়েছে, অন্য কোনো নবীকে তত কষ্ট দেয়া হয়নি।"[২১২]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এই ধরণের অসংখ্য পত্র মাঝে মাঝে বাদশাহের দরবারীগণকে লিখেছেন। মাক্‌তূবাত শরীফে এরূপ বহু মাকতূবাতের নযীর আছে। এ সকল পত্রে কেবলমাত্র বাদশাহের নিকট 'কালিমা-ই-হক্ব' পৌছাবার জন্য এবং তাঁকে সৎপথে আনয়ন করবার জন্য বলা হয়নি বরং ঐ সমস্ত মাকতূবে তিনি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও বিশদভাবে কুফর, শিরক, কাফিরদের রুসমাতের খন্ডন ও উহার দোষ বর্ণনা এবং ইসলাম ও শেয়ারে ইসলামসহ ইসলামের তালীম বা শিক্ষাগুলোর সমর্থন ও ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন, যা একজন বুদ্ধিমান ও ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি ইসলাহ ও তাঁর আক্বীদার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। এই মাকতূবগুলো পাঠ করলে অনুমিত হয় যে, তিনি বাদশাহের ঐ সমস্ত সহচর ও প্রিয়পাত্রদেরকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত্ব করেছিলেন, যারা রাজ্যের মধ্যে সমধিক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং এঁদের মাধ্যমে তিনি স্বীয় বক্তব্য সব সময় বাদশাহের কানে পৌছাতে সক্ষম হন।

এই হিক্‌মাত বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তিনি বিরাট কামিয়াবী হাসিল করেন। যার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাদশাহের খেয়ালী ঝোঁকের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয় এবং দুর্দশাগ্রস্ত ইসলামের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। অবশেষে ব্যাপারটি এ পর্যায়ে আসে যে, একদা শায়খ ফরীদ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হতে এই আদেশ লাভ করেনঃ

২১২. প্রাগুক্ত, মাকতূব নং- ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

"দরবারের জন্য এরূপ চারজন দ্বীনদার আ'লিম মনোনীত করুন,
যারা শারীয়াতের মাসয়ালা মাসায়িলগুলো লোকদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন;
যার ফলে শারীয়াতের খিলাফ কোনো কাজ যেন না হতে পারে।"[২১৩]

এই খবর হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহঃ) এর নিকট পৌঁছলে তিনি খুবই আনন্দিত হন। কিন্তু তিনি তাঁর মুজাদ্দিদ সুলভ দূরদৃষ্টিতে তখনই অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, এই সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যেও অতি সূক্ষ্ম আশঙ্কা লুক্কায়িত আছে। তাঁর চিন্তাধারায় বাস্তব ঘটনাবলীর পূর্ণ চিত্র মাওজুদ ছিলো এবং এই হাক্বীকত ও তাঁর সম্মুখে ছিলো যে, বাদশাহ্ আকবরকে কতিপয় নাফ্‌স -পুরস্ত (নাফ্‌সের পূজারী) দুনিয়াদার আলিম ইসলাম হতে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাকে ধর্মচ্যুত করে। আল্লাহ্ না করুন, এই ধরণের আলিম পুনরায় বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের দরবারে সমবেত হলে, সমস্ত মেহনাত বরবাদ হয়ে যাবে। এজন্য তিনি কাল বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ শায়খ ফরীদ ও সদরে জাহানের নিকট দুইখানি পত্র লেখেন। শায়খ ফরীদের পত্রে তার দু'য়া করার পর এই সু-সংবাদ প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করে তাকে ব্যাপারটির সূক্ষ্ম দিক অনুধাবন করবার জন্য ইঙ্গিত করে লিখেছেনঃ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার। মুসলমানদের জন্য এটা থেকে বড় খুশী আর কী হতে পারে এবং দুঃখগ্রস্তদের জন্য (দ্বীনের ব্যাপারে) এটা হতে বড় খোশ-খবর আর কী হতে পারে। যেহেতু এ ফকীর এই উদ্দেশ্যে আপনার দিকে চেয়ে রয়েছে, সেজন্য কতিপয় জরুরী বিষয় সম্পর্কে বলা ও লিপিবদ্ধ করা অতিশয় দরকার বলে মনে করে। এজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি অবগত আছেন যে, গরজওয়ালা ব্যক্তি পাগল হয়ে থাকে। আমি আরয করছি যে, মান-মর্যাদা ও ধন-দৌলতের প্রতি একেবারে লোভ নাই এবং শারীয়াত প্রচলন ও দ্বীনের পুনরুজ্জীবন ব্যতিরেকে যাদের কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, এলুপ আলিম বিরল। এটা বাস্তব সত্য যে, আলিমদের মধ্যে চাকুরী ও মান-সম্মানের প্রত্যাশা থাকলে সকলেই স্ব-স্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বুযুর্গী প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হবে। এমতাবস্থায় আসল উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবে। বিগত বাদশাহের (আকবরের) যুগে এরূপ দুনিয়াদার আলিমদের মতবিরোধই দুনিয়ার বুকে মুসীবাত

[২১৩]. মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদ্‌ভী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩১৩।

Dhaka University Institutional Repository

এনেছে এবং এখনো এ আশঙ্কা আছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন নিকৃষ্ট আলিমদের ফিত্না ও খারাবী হতে আমাদের রক্ষা করেন।

প্রকৃতপক্ষে, যদি চারজনের পরিবর্তে একজনও হাক্কানী আলিম নির্বাচিত হন,তবে বড়ই সৌভাগ্যের কথা। কেননা, তাঁর সংসর্গ পরশমণি তুল্য। যদি কোনো খালিছ আল্লাহ্ ওয়ালা আলিম না পাওয়া যায়, তবে বিশেষ চিন্তা ও যাচাই-বাছাইয়ের দ্বারা যাকে ভালো মনে হয়, তাকে নির্বাচন করবেন। মানুষের মুক্তি যেভাবে আলিমগণের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। একইভাবে এই দুনিয়ার ভালো-মন্দ তাঁদের আচার-আচরণের উপর নির্ভরশীল। শ্রেষ্ঠ আলিমগণ সৃষ্টির সেরা এবং নিকৃষ্ট আলিমগণ মানবকুলের কলঙ্ক। কেননা, মানব জাতির হেদায়েত ও কল্যাণ তাঁদের উপর নির্ভর করে। একজন বুযুর্গ ইবলিসকে বেকার বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ ব্যাপার কি? তখন উত্তরে সে বলেঃ এ সময়ে একশ্রেণীর আলিম আমার কাজ সম্পন্ন করছে। কাজেই মানুষকে পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ করার জন্য তারাই যথেষ্ট।

আমার উদ্দেশ্য হলো, এ ব্যাপারে খুবই চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কেননা, ব্যাপারটি নাগালের বাইরে গেলে আর প্রতিকার সম্ভব হবে না।"[২১৪]

হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে সানী (রহ.) একই ব্যাপারে সদরে জাহানকে সে পত্রখানা লেখেন, উহাও উল্লেখযোগ্য। পত্রে আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রশংসা ও তাঁকে দু'য়া করবার পর লিখছেন ঃ

"এরূপে শ্রবণ করছি যে, ইসলামের প্রতি ঝোঁক হওয়ার কারণে বাদশাহ্ এখন কিছু আলিম চাইছেন। (আল্‌হামদুলিল্লাহ্) আপনি সবিশেষ অবগত আছেন যে, বিগত যুগে (আকবরের সময়) যে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছিলো, উহা ছিলো দুনিয়াদার আলিমদের কম্‌বখ্‌তির ফল। এ ব্যাপারে আশা এই যে, আপনি ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দ্বীনদার 'আলিম' নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। অসৎ আলিম দ্বীনের জন্য চোরস্বরূপ। মানুষের নিকট হতে ইয্যাত, সম্মান, সর্দারী ও বুযুর্গ হাসিল করা হচ্ছে তাদের আন্তরিক আশা। তাদের ফিত্না হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। অবশ্য তাঁদের মধ্যে যারা উত্তম, তারা হচ্ছেন মানবশ্রেষ্ঠ।কিয়ামতের দিন আল্লাহর রাস্তায় তাদের

---

[২১৪]. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাক্তূব নং- ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

লেখনীকে শহীদগণের রক্তের সহিত ওজন করা হবে এবং তাদের লেখনীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট হচ্ছে নিকৃষ্ট আলিম এবং শ্রেষ্ঠ হচ্ছে- শ্রেষ্ঠ আলিম।"[২১৫]

উপরোক্ত পত্রগুলো দ্বারা এটা সহজেই অনুমিত যে, হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) তাঁর মুজাদ্দিদসুলভ অসামান্য দূরদর্শিতর মাধ্যমে অতি সহজেই হুকুমাতের গতি কুফর, বদ-আক্বীদা ও রীতি-নীতি হতে ফিরিয়ে ইসলামের দিকে আনয়ন করেন। তিনি সর্বপ্রথম হুকুমাতের অধিকাংশ আমীর-উমরাহদের ইসলাহের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, পরে এদের মাধ্যমে বাদশাহের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) এরূপ সরকারী ঘাঁটি বিজয়ের পর তাঁর দৃষ্টি দুনিয়াদার আলিম ও গুমরাহ সূফীদের প্রতি নিবদ্ধ করেন। তাঁর প্রথম আঘাতেই এদের অনেক শক্তি শেষ হয়ে যায়। কেননা, হুকুমাতের গতি তাদের মন-মানসিকতার অনুরূপ থাকায় তাদের ফিত্না বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক্ষণে, হুকুমাতের ধারা বদলে যাবার ফলে এই বাতিল শক্তিদ্বয় ও দূর্বল হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত তিনি তাদের গুমরাহীর বিরুদ্ধে আলাদাভাবে জিহাদ ঘোষণা করেন।

তৎকালীন সময়ে 'উলামা-ই-ছু' তথা অসৎ আলিমগণ গুমরাহীর দুইটি দ্বার খুলে রেখেছিলো। যথা ঃ

১। যোগ্যতা ও আল্লাহ ভীতি না থাকা সত্ত্বেও ইজ্তিহাদের দাবী, কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে হেরফের করে নতুন আক্বীদা ও ধারণার আবিস্কার এবং উহার রেওয়াজ ও প্রচার। আবুল ফজল, ফৈজী ও তাদের পিতা শায়খ মুবারক সর্বপ্রথম আকবরকে এই পথে আনয়ন করেন, যার বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে।

২। 'বিদ্'আত-ই-হাসানা' বা উত্তম বিদ'আতের নামে শারীয়তের মধ্যে নিত্য নতুন জিনিসের আমদানী।

দ্বীন-ইসলামের উপর যে সমস্ত আঘাত 'উলামা-ই-ছু' বা অসৎ আলিমদের পক্ষ থেকে এসেছিলো, এর অধিকাংশই এ দু'টি দ্বারের মাধ্যমে আগমন করে। এজন্য হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) এই দুইটি ধ্বংসাত্মক ধারার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেন। তাঁর রচিত মাক্তূবাত শরীফে এই

---

[২১৫]. প্রাগুক্ত, মাকতূব নং- ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

দুইটি বিষয়ের বিরুদ্ধে লিখিত ৫০টি মাক্তূব মাওজুদ আছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কতিপয় মাক্তূবের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো।

শায়খ ফরীদের কাছে লিখিত একটি পত্রে এ পর্যায়ে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) লিখছেনঃ

"'আহ্‌ল-ই-সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'ত' এর মতানুযায়ী স্বীয় আক্বীদানে সংশোধন করা, শরীয়াতের হুকুম-আহ্‌কাম যাদের উপর প্রযোজ্য, তাদের উপর প্রথম ফরয। কাজেই যাদের উপর শারীয়াতের হুকুম প্রযোজ্য, তাদের প্রথম কর্তব্য 'আহ্‌ল-ই-সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'ত' এর আলিমদের মতানুযায়ী স্বীয় আক্বীদা সংশোধন করা। কেননা, এই বুযুর্গদের নির্ভুল মতাবলীর অনুসরণের উপরই আখিরাতের নাজাত বা মুক্তি নির্ভর করে। তারা ঐ দল, যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের ত্বরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বুযুর্গগণ কিতাব ও সুন্নাহ্‌র নির্ভরশীল ও গ্রহণযোগ্য ইল্‌মগুলি গ্রহণ করেছে। কেননা, প্রত্যেক বিদ'আতী ও ওমরাহ্‌ ব্যক্তি স্বীয় বাতিল মতবাদকে নিজের খেয়াল অনুযায়ী গ্রহণ করে থাকে। কাজেই তাদের অনুসরণ করা অনুচিত।"[২১৬]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এর অন্যতম মুরীদ শায়খ আমানুল্লাহ্‌কে লেখা এক পত্রে এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আপনাকে সত্য হিদায়াত দান করুন এবং সিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর সুদৃঢ় রাখুন। আপনার জানা উচিত যে, তারাক্কীর প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ আক্বীদা অন্যতম। একে সুন্নাতপন্থী আলিমগণ কিতাব ও সুন্নাহ এবং সাল্‌ফ-ই-সালেহীনের কার্যাবলী দ্বারা উপলব্ধি করেছেন। আহ্‌ল-ই-সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'তের অধিকাংশ আলিম কুরআন ও হাদীসের অর্থ সেরূপে করেছেন, উহা গ্রহণ করতে হবে এবং উহা খুবই জরুরী। যদি এরূপ মনে করা হয়, যে সমস্ত আলিম কোনো ব্যাপারে তাদের লব্ধ জ্ঞান দ্বারা যে অর্থ গ্রহণ করেছেন, তা কাশ্‌ফ ও ইলহামের বিপরীত। এমতাবস্থায় কাশ্‌ফ ও ইলহামপ্রাপ্ত জ্ঞান নয় এবং ঐ সমস্ত আলিমদের মতামতই গ্রহণীয়।"

প্রত্যেক বিদ্‌আতী ও গুমরাহ ব্যক্তি আক্বীদাগুলোকে নিজ ধারণা অনুযায়ী কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে বের করে থাকে। বস্তুতঃ কুরআন মাজীদের শান হচ্ছেঃ

[২১৬]. প্রাগুক্ত, মাক্তূব নং- ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

'ইউ দিল্লু বিহী কাসিরাও ওয়া ইয়াহ্‌দি বিহী কাসিরা'

অর্থাৎ, এর দ্বারা অনেকে গুমরাহ্ ও অনেকে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। (সূরা বাক্বারাহ্)

আমার দাবী হক্বপন্থী আলিমগণের হৃদয়ঙ্গমকৃত অর্থই নির্ভরযোগ্য এবং উহার বিপরীত কারো হৃদয়ঙ্গমকৃত অর্থ নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত দাবী এজন্য যে, আলিমগণ এই অর্থগুলোকে সাহাবা-ই-কিরাম ও সাল্‌ফ-ই-সালেহীনের ফয়যাতের করুণা হতে হাসিল করেছেন। এজন্য চিরন্তন নাজাত ও সাফল্য তাদের সাথেই জড়িত এবং প্রকৃতপক্ষে এঁরাই আল্লাহ্‌র দল এবং আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী।"[২১৭]

অপরপক্ষে বিদ্'আতে হাসানার মতবাদ, যার অন্তরালে নাফ্‌সের পূজারী আলিমগণ স্বীয় নাফসানী খাহেশগুলোকে ধর্মের অংশ হিসেবে বানিয়ে রেখেছিলো। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এর দৃষ্টিতে এটা খুবই মারাত্মক ও বিপদজ্জনক ছিলো। সেজন্য তিনি এই মতবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং নির্ভীকচিত্তে সম্পূর্ণ মুজাদ্দিদ সুলভ বিচারে কোনো বিদ'আত 'হাসানা' হওয়ার পর্যায়ভূক্ত নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এই সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) মুফতী খাজা আব্দুর রহমানকে একটি পত্রে লিখছেন ঃ

"এই ফকীর বড়ই বিনয়ের সহিত আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট এই দু'য়া করে যে, দ্বীনের মধ্যে যে সমস্ত নতুন বিষয় আমদানী করা হয়েছে, যা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর খলীফাগণের (রা.) সময় মাওজুদ ছিলো না, যদিও উহা আলোর ন্যায় উষাকালীন শুভ্রতার মতো পরিদৃষ্ট হয়, তবুও এই ফকীরকে যেন তিনি উহাতে জড়িত না করেন। ...... তারা বলে থাকে যে, বিদ্আত দুই প্রকারেরঃ বিদ্'আতে হাসানা ও বিদ'আতে সাইয়িআ। এই ফকীর উক্ত বিদ্'আতদ্বয়ের মধ্যে কোনোটিতেই সৌন্দর্য ও নূরানীয়াত অবলোকন করে না। বরং এতে অন্ধকারও কদর্মতা ব্যতীত কিছুই অনুভব করে না। কেননা, সাইয়েদুল বাশার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ 'যারা আমার দ্বীনের মধ্যে এরূপ কিছু আমদানী করে, যা উহাতে নেই, উহা বর্জনীয়'। কাজেই যা বর্জনীয়, তাতে সৌন্দর্য কী প্রকারে হতে পারে? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেছেনঃ

'তোমরা নিজেদেরকে নতুন আমদানীকৃত বিষয়গুলো হতে রক্ষা কর;

কেননা প্রত্যেক নতুন আমদানীকৃত বস্তুই বিদ্'আত এবং প্রত্যেক বিদ্'আতই গুমরাহী।'

---

[২১৭]. প্রাগুক্ত, মাক্‌তূব নং- ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই, যখন প্রত্যেক নতুন আমদানীকৃত বিষয়ই বিদ্'আত এবং প্রত্যেক বিদ্'আত গুমরাহী, এমতাবস্থায় বিদ্'আতের মধ্যে সৌন্দর্যের কী অর্থ আছে।"[২১৮]

এ ব্যাপারে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) তাঁর অন্যতম মুরীদ মীর নূ'মানের কাছে লিখিত এক পত্রে বলছেনঃ

"সুন্নাতের রওশন 'নূরকে' বিদ্'আতের অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে এবং নতুন আমদানীকৃত বিষয়াদি রাসূল (সা.) এর দ্বীনের সৌন্দর্যকে বিকৃত করে ফেলেছে। এটা থেকেও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কেউ কেউ এই নতুন আমদানীকৃত জিনিসগুলোকে 'বিদ্'আতে হাসানা' মনে করে এবং এর দ্বারা দ্বীনের পরিপূরণ করতে চায়। তারা এগুলো পালনের জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত ও করে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দান করুন। কিন্তু তারা জানে না যে, দ্বীন-ইসলাম এই বিদ্আতগুলোর পূর্বেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে ও পূর্ণ নিয়ামাতপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করেছে। কুরআনের ভাষায় ঃ

'আল্ ইয়াউমা আক্মালতু লাকুম দ্বিনাকুম ওয়া আত্মামতু আলাইকুম্
নি'মাতী ওয়ারাদীতু লাকুমুল্ ইসলামা দ্বীনা'

অর্থাৎ, আজ আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং স্বীয় নিয়ামাত রাজী ও তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম এবং দ্বীন-ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।

সুতরাং এই বিদ'আতগুলির দ্বারা দ্বীনের পরিপূর্ণতা অনুসন্ধান করা প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াত শারীফের মর্মকে অস্বীকার করারই শামিল।"[২১৯]

বাদশাহ আকবরের সময় গুমরাহ সূফীগণ ছিলেন মাসহাবী ফিত্নার তৃতীয় উৎস। হযরতন মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) এদের বিরুদ্ধে তাঁর বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত করেন। এই সময়ের অধিকাংশ সূফী 'ওয়াহ্দাতুল উজূদ' মতবাদের অনুসারী হওয়ায় 'ইত্তেহাদ' বা আল্লাহর সাথে একত্রিত হওয়া এবং 'হুলুল' অর্থাৎ আল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করা এই মতবাদে বিশ্বাস করতো। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) এদের বিরুদ্ধে ও কঠোর সংগ্রাম করেন এবং

---

[২১৮]. প্রাগুক্ত, মাক্তূব নং -৮৬।
[২১৯]. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, মাক্তূব নং -২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভীকচিত্তে এরূপ আক্বীদা পোষণকারীদের মুলহিদ ও যিন্দীক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি এ সম্পর্কে শায়খ আব্দুল আযীম জৌনপুরীকে এক পত্রে লিখেছেনঃ

"মুমকিনকে (সৃষ্ট বস্তু) 'ওয়াজীব' (আল্লাহ্) মনে করা এবং উক্ত মুমকিনের কার্যাবলী ও গুণাবলীকে আল্লাহর কার্যাবলী ও গুণাবলী হিসেবে মনে করা খুবই বেয়াদবী বরং এটা আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম ও গুণাবলী অস্বীকারের শামীল।"

অতঃপর তিনি উক্ত পত্রে মূল বিষয়টি তথা 'ওয়াহ্দাতুল উজূদ' বা 'একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান' এই মতের সংশোধন ও তৎসহ্ উহাতে শায়খ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী ও অন্যান্যের মতামত বিশ্লেষণ করবার পর শেষের দিকে লিখছেনঃ

"'ইত্তেহাদ' (একত্রিত হওয়া) ও আইনিয়াত (হুবহু আল্লাহর মত হওয়া) তো দূরের কথা, এই দুনিয়ার কোনো জিনিসের সহিত আল্লাহর কোনো সামঞ্জস্য নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা সমস্ত সৃষ্টি জগত হতে অমুখাপেক্ষী এবং তিনি এটা থেকে দূরে-বহু দূরে। আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সৃষ্টি জগতের অনুরূপ ও মুত্তাহিদ মনে করা, এমনকি আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে সম্পর্কিত করা, এই ফকীরের নিকট বড়ই বেদনাদায়ক এবং কষ্টকর। আসল ব্যাপার হলো, তারা আল্লাহ্ তা'য়ালা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, উহা হতে তিনি অবশ্যই পাক-পবিত্র ও মহান।"[২২০]

তিনি এ সম্পর্কে মীর সাইয়্যিদ মুহিববুল্লাহ মানিকপুরীকে এক পত্রে লিখেছেনঃ

"খবরদার, কখনো সূফীদের এরূপ বেহুদা কথায় মুগ্ধ হবে
না এবং সে আল্লাহ নয়, তাকে আল্লাহ্ মনে করবে না।"[২২১]

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) একদিকে যেমন এই বিপথগামীদের দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং এরূপ আক্বীদা পোষণকারীদের মুলহিদ ও যিন্দীক আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন; অপরদিকে 'ওয়াহদাতুল উজূদ' বা 'হামা উস্তের' মতবাদ পোষণকারী বড় বড় বুযুর্গ মাশায়েখদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেছেন যে, এরূপ শব্দ হতে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টি জগতে যা কিছু বিদ্যমান, উহার সবই আল্লাহর কুদরতের বিকাশ মাত্র। অথবা এরূপও বলা যেতে পারে

---

[২২০]. প্রাগুক্ত, মাক্তূব নং -১।
[২২১]. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাক্তূব নং -২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

যে, আল্লাহ তা'য়ালার উজূদ বা অস্তিত্বই আসল এবং বাকী সব সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব 'জিল্লী' বা ছায়া মাত্র।

এই মর্মে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) হাজী মুহাম্মাদ মু'মিনের পুত্র মুহাম্মাদ সাদিকের নিকট এক পত্রে লিখছেনঃ

"মুহতারাম সূফীদের মধ্যে যারা 'ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ' মতবাদে বিশ্বাসী এবং 'হামা-উস্ত' বা 'সবই তিনি' বলে থাকেন, এটা হতে তাদের উদ্দেশ্য এরূপ কখনই নয় যে, সমস্ত মাখলুক সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন! বরং তারা 'তান্‌জীহ' অর্থাৎ পবিত্রতার মারতবা হতে নীচে নেমে 'তাশ্‌বীহ' করার স্থানে উপনীত হয়েছে এবং ওয়াজীবকে মুম্‌কিনের অর্থাৎ স্রষ্টাকে সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত করেছে। এর সবই কুফর, ইলহাদ ও গুমরাহীর অন্তর্ভূক্ত। বরং 'হামা-উস্তের' অর্থ হলো 'সবই নিস্ত' বা কিছুই নাই; একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই মাওজুদ। তিনি বড়ই মহান ও পবিত্র।"[২২২]

এতদসম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) মাকসূদ আলী তাবরীযীর নিকট লিখিত এক পত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মানসুর হাল্লাজ বলেছিলেনঃ 'আনাল হাক্ব' বা 'আমিই সত্য' বা আল্লাহ। হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (রহ.) এর জবান হতে বের হয়েছিলঃ 'সুবহানী মা আ'জামা শানী' অর্থাৎ 'আমি কত পবিত্র এবং আমার শান কত মহান!'

এবং তিনি আরো বলেন ঃ

'লিয়ায়ী আরাফা'উ মিন লিয়ায়ে মুহাম্মাদ'

অর্থাৎ 'আমার পতাকা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পতাকা হতে উচ্চ।'

অতঃপর মুজাদ্দিদ (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

"যেভাবে বাহ্যিক শারীয়াতের মধ্যে ইসলাম ও কুফর আছে, অনুরূপভাবে ত্বরীকতের মধ্যেও ইসলাম ও কুফর বিদ্যমান। শারীয়াতের মধ্যে কুফ্‌র যেমন ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য, তেমনি ত্বরীকতের মধ্যেও কুফ্‌র খুবই খারাপ এবং ইসলাম পূর্ণ পরিপক্ক। 'কুফর ত্বরীকত' বলা হয় 'জম'আর বা সমন্বয়ের মাক্বামকে এবং এই মাক্বামে হক্ব ও বাতিলের তারতম্য উঠে যায়। কেননা,

[২২২]. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, মাক্‌তূব নং -৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই মাক্বামে সালিক (আল্লাহর পথে বিচরণকারী) ভাল মন্দরূপে আয়নাগুলোর মধ্যে একমাত্র তার মাহবুবের বা প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য দেখে থাকে। কাজেই সালিক ভালো মন্দ পূর্ণতা ও অপূর্ণতাকে তাওহীদের ছায়া এবং বিকাশ ছাড়া আর কিছুই অবলোকন করে না। ফলে সে সকলের সাথে সন্ধির মাক্বামে থাকে এবং সকলে সত্য পথে আছে বলে মনে করে; কখনও কখনও সে বিকাশকে আইন মনে করে সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ মনে করে এবং প্রতিপালকের প্রতিপালক মনে করে। এই প্রকারের ফুল 'জম'আর বা সংমিশ্রণের মাক্কামে ফুটে থাকে।"

ত্বরীকতের কোনো মাশায়েখ আল্লাহর মুহব্বতে বিভোর হয়ে মাঝে মধ্যে এরূপ শরীয়াত বিরোধী অসঙ্গত উক্তি করেছেন। তাঁরা সকলেই কুফ্রে ত্বরীকতের মাক্কামে আছেন এবং এটা কুফ্র ও বেতমীযীর মাক্বাম। কিন্তু যে সমস্ত বুযুর্গ প্রকৃত ইসলামের নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা এ ধরণের বাক্যালাপ হতে পবিত্র। তাঁরা জাহেরী ও বাতেনীভাবে নবী (আ.) গণের অনুসরণ করেন এবং তাঁদেরই সহচর হয়ে থাকেন। কাজেই, যে ব্যক্তি শরা-বিরোধী কথা বলেএবং সকলের সাথে দোস্তী রাখতে চায় ও সকলে হক্ব পথে আছেন বলে ধারণা করে এবং আল্লাহ্ ও সৃষ্টবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করে না ও দুইয়ের উজূদের বিশ্বাসী নয়, এরূপ ব্যক্তি যদি 'মাক্বামে জম্আ' পর্যন্ত পৌছে থাকে এবং 'কুফ্রে-ত্বরীকত' হাসিল করে, তবে এরূপ ব্যক্তিআল্লাহ্র নিকট মাকবূল। এমতাবস্থায় তার বেহুশ অবস্থার অসঙ্গত উক্তিগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করে শারীয়াত সঙ্গত অর্থ করতে হবে। যেমন, 'আনাল হক্ব' এর অর্থ হচ্ছে- 'আমি মাওজুদ নেই বরং একমাত্র হক্বই মাওজুদ।'

যদি কেউ এরূপ হাল (অবস্থা) হাসিলের পূর্বে এবং কামালিয়াতের (পূর্ণতার) প্রথম ধাপে পৌছানো ব্যতিরেকে এই ধরণের অসঙ্গত কথা বলে এবং সকলকে সত্য পথের উপর বলে বিশ্বাস করে ও হক্ব বাতিলের মধ্যে পার্থক্য না করে, তবে এরূপ ব্যক্তি যিন্দীক ও মুলহিদ। শারীয়াতকে বাতিল করাই এর উদ্দেশ্য। বিশ্বের রহমতস্বরূপ নবী (আঃ) গণের দাওয়াতকে মিটিয়ে দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য। কাজেই এ শ্রেণীর শরার খেলাফ উক্তিগুলো হক্বপন্থী ও বাতিল পন্থী উভয় শ্রেণীর ব্যক্তি হতেই প্রকাশ হয়ে থাকে। হক্বপন্থীদের উপর এটা 'আব-ই-হায়াত' এবং বাতিলপন্থীদের জন্য এটা ধ্বংসাত্মক বিষ স্বরূপ। যেমন, নীল দরিয়ারপানি বনী ইসরাঈলের জন্য সুমধুর ছিলো; কিন্তু কিবৃতীদের জন্য উহা ছিলো রক্ত-সদৃশ।

Dhaka University Institutional Repository

এই মাক্বামে অধিকাংশ সালিকের পদস্থলন হয়। অনেক মুসলমান 'আরবাবে শুক্র' বা বেহুঁশ অবস্থা প্রাপ্তগণের উক্তিগুলো অনুসরণ করে সৎপথ হতে বিচ্যুত হয়ে গুমরাহ্ হয়ে যায় এবং স্বীয় দ্বীনকে বরবাদ করে। এরা জানে না যে, এই শ্রেণীর উক্তিগুলো কবুল হওয়া কতিপয় শর্তের সাথে সম্পৃক্ত, যা বেহুঁশী অবস্থা প্রাপ্তগণের মধ্যে মাওজুদ আছে, কিন্তু এদের মধ্যে তা নেই। এই শর্তগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া আর সব কিছুকে ভুলে যাওয়া এবং এটাই কবুল হওয়ার মাক্বাম। হক্বপন্থীগণ শুকর ও মস্তী এবং বেতমীযী হওয়া সত্ত্বেও সামান্য পরিমাণ ও শরা-বিরোধী কাজ করেন না। মানসূর হাল্লাজ 'আনাল হক্ব' উক্তি করা সত্ত্বেও জেলখানায় শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় প্রতিরাতে পাঁচশত রাকআত নফল সালাত আদায় করতেন এবং জালিমদের প্রদত্ত হালাল খাদ্যও গ্রহণ করতেন না। পক্ষান্তরে, বাতিলপন্থীদের জন্য শারীয়াত পালন যেন কোহেকাফ বা ককেসাস পর্বতের ভার সদৃশ।[২২৩]

উল্লেখিত বুযুর্গ ওলীগণ কর্তৃক আল্লাহর মুহাব্বাতের জোশে শুক্র বা বেহুঁশী ও 'গালবায়ে হাল' বা হালের আতিশয্যবশত বর্ণিত উক্তিগুলো দ্বারা আকবরী আমলের গুমরাহ্ ত্বীরকতপন্থীগণ প্রমাণ করতে চেষ্টা করতো যে, 'শারীয়াত আওর হায়, ত্বরীকত আওর'- অর্থাৎ 'শারীয়াত ও ত্বরীকত দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস।'

ত্বরীকত পন্থীগণের কোনো কোনো সময় রিয়াযাত (সাধনা) করাকালীন বিচিত্র ও আশ্চর্য ধরণের কাশ্‌ফ বা বিশেষ দর্শন লাভ হয়ে থাকে। কেউ কেউ এতে নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করে একেই আল্লাহ্-প্রাপ্তির শেষ ধাপ মনে করতো। এই শ্রেণীর ধোকাবাজ, বেশরা ফকীরকে সাধারণ লোক পীরের মর্যাদায় সমাসীন করাতো। এদের দ্বারা কেবল সাধারণ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে সত্যিকার ভালো লোকও গুমরাহ্ হতো।"

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) 'ওয়াহ্দাতুল উজূদ' মতবাদীদের এই শ্রেণীর শব্দের অন্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও করেছেন। নমুনাস্বরূপ নিম্নে একটি মাক্‌তুবের অংশ বিশেষ পেশ করা হলো। এ সম্পর্কে শায়খ সূফীকে লিখিত এক মাক্‌তূবে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) বলছেনঃ

"কতিপয় 'সূফী-ই-কিরাম' হতে মুহব্বতের প্রভাব প্রেমিকের দৃষ্টি হতে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর সব কিছুকেই বিলীন করে দেয় এবং প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদ অন্য কাউকেই নিরীক্ষণ করে না। এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তবিকপক্ষে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কেউই থাকে না। কেননা, এটা বাস্তব জ্ঞান ও শরা-বিরোধী ব্যাপার।"[২২৪]

---

২২৩. প্রাগুক্ত, মাকতূব নং -৯৫।
২২৪. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাক্‌তূব নং -৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) একদিকে 'ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ' বা 'হামা-উস্ত' মতবাদ পোষণকারী বুযুর্গগণের উক্তিগুলোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদিকে উহার ঐ সমস্ত খারাবী ও যিন্দীকসুলভ মতবাদকে পরিস্কারভাবে 'ইলহাদ' ও 'কুফর' বলে বর্ণনা করেছেন।

এই শ্রেণীর তথাকথিত গুমরাহ্ সূফীদের একটি বাতিল আক্বীদা এটাও ছিলো যে, মা'রিফাত হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদাত জরুরী। মা'রিফাত হাসিল হলে আর শারীয়াতের হুকুম- আহ্‌কাম পালনের প্রয়োজন নেই।

এই সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) শায়খ বদীউদ্দীনকে এক পত্রে লিখেছেনঃ

"অনেক মূর্খ ও সূফী নামধারী মুলহিদের ধারণা এই যে, একমাত্র খাস খাস লোকগণ আল্লাহ্ তা'য়ালার মা'রিফাত হাসিল করবার জন্য আদিষ্ট। তাদের বক্তব্য হলো, শারীয়াত প্রতিপালনের আসল উদ্দেশ্য হলো মা'রিফাত হাসিল করা। মা'রিফাত হাসিল হলে আর শারীয়াত প্রতিপালনের প্রয়োজন হয় না। তারা তাদের দাবীর সমর্থনে কুরআন মাজীদের এই আয়াত পেশ করে থাকেঃ

'ওয়া বুদ্, রব্ব্াকা হাত্তা ইয়া' তিয়াকাল ইয়াক্বীন'

অর্থাৎ, তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর, যতক্ষণ না তোমার ইয়াক্বীন বা দৃঢ় প্রত্যয় হয়। (পারা ৩০, সূরা হিজ্‌র)

প্রকৃতপ্রস্তাবে এর দ্বারা তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইবাদাতের শেষ সীমা মা'রিফাত হাসিলের উপর ন্যস্ত। আল্লাহ্ তা'য়ালা এদের অপদস্থ করুন, কেননা এরা অতি বড় জাহিল। আরিফগণের জন্য যে পরিমাণ ইবাদাতের প্রয়োজন, প্রারম্ভকারীদের জন্য এর একদশমাংশও প্রয়োজন নেই।"[২২৫]

অনুরূপভাবে এই সমস্ত ভন্ড-সূফীর ধারণা ছিলো যে, বাতিল দূরস্ত হলেই সর্ব উদ্দেশ্য সফল হয়। কাজেই সালাত, সিয়াম ইত্যাদি জাহিরী আমলগুলো আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য আবশ্যক। হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

---

[২২৫]. প্রাগুক্ত, মাকতূব নং- ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য সব কিছু হতে দীল শুন্য হওয়া এবং শারীয়াত কর্তৃক আদিষ্ট শারীরিক নেক আমলগুলো সম্পাদন ব্যতীত আত্মিক নিরাপত্তার দাবী নিছক মিথ্যা, যেমন এই দুনিয়ার শরীর ব্যতীত রূহের অস্তিত্ব অসম্ভব ও ধারণাতীত। বর্তমান যুগে অনেক মুলহিদ এ ধরণের দাবী করে থাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীব রাসূলুল্লাহে (সা.) এর তোফায়েলে এই সমস্ত বাতিল আক্বীদা হতে আমাদের হিফাযাত করুন।"[২২৬]

এই সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) ফতেহ্ খান আফগানীকে লিখিত এক পত্রে বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি জাহিরকে পরিত্যাগ করে কেবল বাতিনকে দূরস্ত করতে চায়, সে মুলহিদ বা কাফির। তার কোনো বাতিনী হাল হাসিল হলে উহা তার জন্য 'ইসতিদরাজ' বা ভেল্কিবাজী মাত্র। বাতিনী হালের বিশুদ্ধতা ও কবুলীয়াতের চিহ্ন হচ্ছে জাহিরীভাবে শারীয়াতের বিধানগুলো দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া।"[২২৭]

অনেক জাহিল ও অন্ধ সূফী সুন্নাত ও শারীয়াতের তরীকা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রিয়াযাত বা কঠোর সাধনা করে এবং এই কাজকে তারা আল্লাহ তা'য়ালার সহিত মিলিত হবার জন্য ওসীলাস্বরূপ মনে করে। বর্তমানেও এরূপ বহু সূফী দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এ সমস্ত সূফীদের সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"সুন্নাত তরীকা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে লোকগণ যে সমস্ত রিয়াযাত ও মুজাহাদা করে, এর কোনো মূল্য ও গুরুত্ব নেই। গ্রীক দেশীয় দার্শনিক ও হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণ ও মুনিঋষিগণ এরূপ ধ্যান-ধারণা করে থাকে; কিন্তু এর দ্বারা তাদের একমাত্র লোকসান ও ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।"[২২৮]

মোটকথা, 'ইলম-ই-তাসাউফ' সম্পর্কিত এই জাতীয় ইসলাহ ছাড়াও হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) দ্বীন সম্পর্কীয় বহু ব্যাপারে ইসলাহ করেন। এটা অতীব সত্য যে, হাজার

---

[২২৬]. প্রাগুক্ত, মাকতূব নং-৩৯।
[২২৭]. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, মাকতূব নং -৮৭।
[২২৮]. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, মাক্তূব নং- ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

বছরের আবর্জনা ও পাপ-পঙ্কিলতাকে তিনি দূরে নিক্ষেপ করে দ্বীন-ইসলামকে নতুনভাবে দুনিয়ার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এজন্যই তিনি মূলতঃ 'মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী' খেতাবে ভূষিত হন।

এই আলোচনার উপসংহারে হযরত মুজাদ্দিদ (রহ.) কর্তৃক খাজা শরফুদ্দীন হুসাইনীকে লিখিত একটি মাকতূবের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পেশ করা হলো; যাতে তাঁর তাজদীদী-যিন্দেগীর মূল সুর ঝংকৃত হয়েছে। তিনি লিখেছেনঃ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এবং তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম। প্রিয় বৎস! অবসর অতি অল্প। এটা বিশেষ জরুরী যে, যেন আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রদত্ত আয়ুকে বেহুদা কাজে নষ্ট না করা হয়, বরং পূর্ণ জীবন যেন তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় হয়। শারীয়াতের হুকুম-আহকাম পালন পূর্বক একাগ্রতা সহকারে জামা'তের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা দরকার। তাহাজ্জুদের সালাত যেন পরিত্যাক্ত না হয় এবং প্রাতঃকালীন তাওবাকে যেন পরিত্যাগ না করা হয়। খরগোসের নিদ্রায় অভিভূত হয়ো না এবং নশ্বর দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত হয়ো না। মৃত্যুকে স্মরণ রাখবে এবং আখিরাতের ভীতি-বিহ্বল অবস্থাকে সর্বদা সম্মুখে রাখবে। মোটকথা, দুনিয়া হতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্বক আখিরাতের দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করবে। প্রয়োজনমত দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রেখে অবশিষ্ট সময় আখিরাতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য বস্তুর আকর্ষণ হতে দীলকে মুক্ত রাখবে এবং জাহিরকে শারীয়াতের বিধান দ্বারা সুসজ্জিত রাখবে। এটাই প্রকৃত কাজ, বাকী সবই অর্থহীন।"[২২৯]

ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এর বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলনের এটাই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও মূলকথা।

[২২৯]. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, মাক্তুব নং-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ও ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের সময়ে মোগল সম্রাটগণঃ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) সুলতান ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মধ্যদিয়ে তিনশত বছরের অধিককালের সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে। ভারতের ইতিহাসে মোগলদের এ বিজয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ বিজয় ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল শাসনের সূচনা করেছিলো। সম্রাট বাবর ছিলেন এ বিজয় কৃতিত্বের অধিকারী। অবশ্য বাবরের পূর্বেও মধ্য-এশিয়ার তুর্কীরা ভারতে অভিযান করেছিলো।[২৩০]

সুলতানী আমলের প্রায় মধ্যভাগ (এয়োদশ শতাব্দীতে) চেঙ্গিস খান ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এর প্রায় এক শতাব্দী পরে (১৩৯৮ খ্রীঃ) ভারত আক্রমণকারী হিসেবে আবির্ভূত হন তৈমুর লঙ্গ। তাঁরা উভয়েই ছিলেন বাবরের পূর্বপুরুষ। ভারতবর্ষে এ দুই সামরিক নেতার অভিযানের ফল স্থায়ী হয়নি। অবশেষে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন বাবর। পশ্চিম এশিয়াতে বার বার ভাগ্যবিপর্যয়ে বিরক্ত হয়ে তিনি হিন্দুস্থানের দিকে ভাগ্য-পরীক্ষার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এ সময়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিলো গোলযোগপূর্ণ। বাবর এ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক পানিপথের প্রান্তরে তিনি সুলতান ইব্রাহীম লোদীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ইব্রাহীম লোদীর ঔদ্ধত্য ও কু-শাসনে রাজ্যের আমীর-ওমরাহগণ ক্ষুদ্ধ ছিলেন, সুলতানের আত্মীয়স্বজন ও তাঁর বিপক্ষে ছিলেন। অতএব, যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলো; তিনি যুদ্ধে পরাজিত হলেন। ভারত-ভূমিতে মোগলদের বিজয় পতাকা উড়লো; বাবর এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল শাসনের গোড়াপত্তন করলেন।[২৩১]

---

[২৩০]. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, op. cit. p. 375.

[২৩১]. Ray Chowdhury, *An Advanced History of India*, Oxford University Press, London: 1984, p. 524.

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন সম্রাট বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল শাসনামলেই ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মুল্লাজীর কার্যের ব্যপ্তীকাল ছিলো প্রায় পুরো মোগল আমল জুড়েই। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ও পতন যুগ উভয়টাই পেয়েছিলেন। আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিম্নে আমরা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সময়কার ভারতীয় উপমহাদেশের মোগল শাসনামলের স্বর্ণযুগ ও পতনযুগের বেশকিছু প্রভাবশালী শাসক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের প্রয়োজন মনে করছি।

মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগঃ

ভারতীয় উপমহাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের উৎকর্ষতার সূচনা হয় মূলতঃ সম্রাট আকবরের শাসনামল থেকেই এবং তা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে পরিপক্বতা লাভ করে সম্রাট শাহ্জাহান ও সম্রাট আওরঙ্গযেবের আমলে; যেটাকে ইতিহাসের ভাষায় আমরা মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলতে পারি। আহমাদ মুল্লাজীউন সম্রাট শাহ্জাহান ও আওরঙ্গযেবের শাসনকাল পেয়েছিলেন। নিম্নে আমরা সম্রাট শাহ্জাহান ও আওরঙ্গযেবের সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতের প্রয়াস পাবো।

সম্রাট শাহ্জাহান (১৬২৭-১৬৫৮)ঃ

উত্তরাধিকার লাভের জন্য সংগ্রামঃ

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হবার সাথে সাথে তাঁর পুত্র শাহজাহান ও শাহরিয়ারে মধ্যে উত্তরাধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম শুরু হলো। শাহ্জাহানকে তাঁর শ্বশুর আসফ খান সমর্থন করলেন এবং শাহরিয়ারকে সহায়তা দান করলে লাগলেন তাঁর শাশুড়ি নূরজাহান। নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানের কন্যা মমতাজকে শাহ্জাহান বিয়ে করেছিলেন। কাজেই আত্মীয়তার সূত্র ধরে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব জটিলতর হয়ে ওঠে। পিতার মৃত্যর সময় শাহজাহান ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। তাঁর শ্বশুর সেখানে সংবাদ জানিয়ে তাঁকে অবিলম্বে উত্তরাধিকার লাভের জন্য রাজধানীতে চলে আসতে বললেন। আসফ খান ইতোমধ্যে শাহজাহানের স্বার্থরক্ষা করার জন্য তৎপর হয়ে খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্সকে আপাতত শূণ্য সিংহাসনে বসালেন। অন্যদিকে নূরজাহানের প্ররোচনায় শাহরিয়ার লাহোরে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। আসফ খান বিরাট এক সৈন্যবাহিনীসহ লাহোরে উপস্থিত হয়ে শাহরিয়ারকে পরাস্ত এবং বন্দী করতঃ অন্ধ করে ফেললেন। অল্পসময়ের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে শাহজাহান ফিরে আসলেন এবং সম্ভাব্য সকল শত্রুকে পৃথিবী হতে চিরতরে বিদায় করলেন।[২৩২]

অতঃপর শাহজাহান ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'আবুল মুজাফ্ফর শাহাব উদ্দীন মুহম্মদ সাহিব কিরান-ই-সানি শাহজাহান বাদশাহ গাজী' এ বিরাট উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দাওয়ারবক্সকে পারস্যে চলে যেতে অনুমতি দান করা হলো। কিন্তু সেখানে তিনি বন্দী হন। নূরজাহান রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে বছরে দু'লাখ টাকা ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আসফ খান সম্রাটের মন্ত্রিপদে উন্নীত হলেন এবং মহব্বত খান আজমীরের শাসনকর্তার পদ লাভ করলেন।[২৩৩]

সিংহাসনে আরোহণ করার পর শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরী বলেন যে, সম্রাট মহানবীর (সা.) ইসলামী আইনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য মনোযোগ দেন।
প্রথমতঃ তিনি দিনপঞ্জী সংশোধন করে সৌরমাসের পরিবর্তে চান্দ্রমাসের হিসাব গণনার রীতি প্রবর্তন করেন। তিনি হিজরী সনের ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করারও নির্দেশ দেন।[২৩৪]
দ্বিতীয়তঃ সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় যে সিজদা করার প্রথা প্রচলিত হয়, তা সম্রাট শাহজাহান বন্ধ করে দেন; কারণ তিনি একে শারীয়াত বিরোধী বলে মনে করতেন। সম্রাট ও প্রজাসাধারণ, উচ্চ ও নীচের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য তিনি মহব্বত খানের পরামর্শ অনুযায়ী সিজ্‌দার পরিবর্তে 'জমিনবুচ' (মাটিতে চুম্বন দান) প্রথা চালু করেন।[২৩৫]

সম্রাট শাহজাহান এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, লোকেরা আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রথমে ডান হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করবে এবং পরে ঐ হাতের পৃষ্ঠ চুম্বন করবে।[২৩৬] উচ্চপদস্থ সৈয়দ, পন্ডিত, ধার্মিক, ফকির-দরবেশ ও আধ্যাত্মবাদীদের জন্য এ রীতি প্রযোজ্য ছিলো না। কিছুদিন পর সম্রাট

---

২৩২. S.M. Jaffar, *The Mughal Empire*, British Colombia Publications, Toronto, Canada: 1974, p. 217.
২৩৩. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, Joy- Durga Press, Kanpur: 1946, p. 435.
২৩৪. V.A. Smith, *Akbar the Great Mughal*, op. cit., p. 901.
২৩৫. Majumder and Dutta, *History of India*, Progoti Prokashoni, Calcutta: 1936, p. 730.
২৩৬ . V.A. Smith, *Akbar the Great Mughal*, op. cit. p. 407.

Dhaka University Institutional Repository

বুঝতে পারলেন যে, 'জমিনবুচ' সিজদারই নামান্তর। সুতরাং তিনি তা বন্ধ করে দেন। অতঃপর এর পরিবের্তে তিনি 'চাহার তসলিম' (চার বার মাথা নত করার পদ্ধতি) রীতি প্রবর্তন করেন।[২৩৭]

সম্রাট শাহজাহানের অভিষেক অনুষ্ঠানের কিছুদিন পরেই তাঁকে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। রাজত্বের প্রথম বছর তাঁকে জুঝহার সিংহের বিদ্রোহ দমন করতে হয়। তিনি ছিলেন বীরসিংহ বুন্দেলার পুত্র। আবুল ফজলকে হত্যা করার জন্য সেলিম তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। কাজেই এ বিদ্রোহী সর্দার আপাতত আনুগত্য স্বীকার করলেও ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুণরায় গোলযোগ সৃষ্টি করেন। তাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করা হয়।[২৩৮]

রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা খান জাহান লোদী বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। আহমদ নগরের সুলতানদের সাথে মিলিত হয়ে তিনি মোগল সাম্রাজ্যে নানা উৎপাত শুরু করলেন। সম্রাট বাহিনী কর্তৃক স্থান হতে স্থানান্তরে বিতাড়িত হয়ে অবশেষে তিনি কালিঞ্জরের উত্তরে অবস্থিত 'তালসিহাওদা' নামক এক জায়গায় পরাস্ত হন এবং ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে পুত্রগণসহ নিহত হন।[২৩৯]

<u>সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলঃ</u>

43678€

১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ২১ বছর বয়সে সম্রাট শাহজাহান অর্জুমন্দ বানু বেগমকে বিয়ে করেন। আর্জুমন্দ বানু 'মমতাজ মহল' নামেই অধিক খ্যাত। মমতাজ মহল দরবারের বিশেষ প্রভাবশালী অভিজাত আসফ খানের কন্যা ছিলেন। ফুফু নূরজাহানের ন্যায় তিনিও ছিলেন সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। প্রেম, সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি স্বামীর হৃদয়রাণী হয়ে বসেছিলেন। শাহজাহানের আরও স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মমতাজ মহলই প্রধানা মহিষীর স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি সম্রাটকে সকল অবস্থায় অনুসরণ করতেন এবং শাহজাহানের পলাতক জীবনের দুঃখ-বেদনার সাথী ছিলেন। শাসন বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শাহজাহান মমতাজের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এককথায়, সম্রাট তাঁর পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতেন না। রাজ-পরিবারের সকল মহিলাদের

---

২৩৭. Edwards and Garret, *Mughal Rule in India*, Cambridge University Press, New York: 1988, p. 372.
২৩৮. Ibid, p. 375.
২৩৯. Ibid, p. 378.

Dhaka University Institutional Repository

উপর তাঁকে প্রাধন্য দেয়া হয় এবং 'মালিকা-ই-জামান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[২৪০] মোগল সম্রাটের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে রাজকীয় সীল-মোহরের দায়িত্বে রাখা হয়েছিলো। পরে মমতাজ মহলের অনুরোধে এ কঠিন দায়িত্ব তাঁর পিতা আসফ খানের উপর অর্পিত হয়।

মমতাজ মহল ছিলেন সুশিক্ষিত, অত্যন্ত উদার ও ন্যায়পরায়ণা নারী। দরিদ্র, বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের দুঃখ দেখলে তাঁর কোমল হৃদয়ে করুণায় বিগলিত হতো। সাম্রাজ্যে এমন কোনো নিপীড়িত স্ত্রী পুরুষ ছিলো না, যারা মমতাজের করুণা লাভ করেনি। তিনি প্রচুর অর্থ দান করতেন এবং দরিদ্র ও অনাথা বালিকাদের বিয়ের জন্য অর্থ দিতেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মমতাজের ধর্মনিষ্ঠতা সম্বন্ধে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন ও রোজা রাখতেন।[২৪১]

বোরহানপুরের শিবির হতে সম্রাট শাহজাহান যখন খানজাহান লোদীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছিলেন, তখন মমতাজের চতুর্দশ সন্তানের (কন্যা) জন্ম হয়।[২৪২] এ সময় তিনি প্রসব বেদনায় খুব কষ্ট পান এবং তাঁর ধারণা হয় যে, তাঁর আয়ুস্কাল ফুরিয়ে এসেছে। কাজেই তিনি তাঁর কন্যা জাহান আরার মারফত সম্রাটকে ডেকে পাঠালেন। ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরীর মতে, সম্রাট শাহাজাহান তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর পার্শ্বে উপবেশন করলে মমতাজ মহল তাঁর প্রতি সকরুণ দৃষ্টি ফেলে অশ্রুসিক্ত নয়নে ধীরে ধীরে তাঁকে বললেন, তাঁর মৃত্যুর পর তিনি যেন সন্তান-সন্ততি ও বৃদ্ধ মাতা-পিতার যত্ন নেন। অতঃপর তিনি চক্ষু মুদলেন। সেদিন ছিলো ৭ই জুন, ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে (১৭ই জ্বিলকদ, ১০৪০ হিজরী)।[২৪৩]

মমতাজ মহলের মৃত্যুতে সম্রাট শাহজাহান অত্যন্ত বিহবল হয়ে পড়লেন। তাঁর মৃত্যুর মতো এতো বড় আঘাত তিনি আর কখনো পাননি। শাহজাহানের পত্নীর অভাব ছিলো না; কিন্তু মমতাজের স্থান আর কেউই পূরণ করতে পারেনি। মমতাজের অকৃত্রিম প্রেম ও প্রীতির অভাব তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন। মমতাজের মৃত্যুতে সম্রাট এতটাই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন যে, তিনি সাতদিন ঝরোকায় দর্শন দেননি এবং কোনো রাজকার্য পরিচালনা করেনি। তিনি প্রায়ই

২৪০. J.N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, Civil Steam Press, Lahore: 1978, p. 236.
২৪১. B.P. Saksena, *History of Shah Jahan*, Mallika Library, Madras: 1979, p. 119.
২৪২. Ibid, p. 121.
২৪৩. Ibid, p. 125.

Dhaka University Institutional Repository

বলতেন যে, সাম্রাজ্যের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত না হলে তিনি সংসারত্যাগী হতেন এবং সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করতেন। মমতাজের কবর জিয়ারত করতে গেলে তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো এবং তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন,

> "রাজত্বে কোনো প্রকার মধুরতা নেই, এখন আর আমার
> জীবনে কোনো মোহ নেই।"[২৪৪]

সম্রাট শাহজাহান প্রায় দু'বছর কোনো মূল্যবান পোশাক বা সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করেননি। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর মাথার কয়েকটি মাত্র চুল ধূসর হয়েছিলো, কিন্তু সম্রাজ্ঞীর মৃত্যর পর সম্রাটের সকল চুল সাদা হয়ে যায়। সম্রাট তাঁর প্রিয়তমার স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে দাম্পত্য প্রেমের অবিনশ্বর প্রতীক হিসেবে মমতাজের সমাধির উপর সু-প্রসিদ্ধ তাজমহল নির্মাণ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাজমহল গভীর প্রেমের এক অনির্বাণ সাক্ষী।[২৪৫]

শাহজাহান ও পুর্তুগীজগণঃ

সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে পর্তুগীজরা তাঁদের নিকট হতে কতকগুলো সুবিধা আদায় করে এবং হুগলীতে বসবাস করতে থাকে। তারা কতকগুলো বিশেষ প্রয়োজনীয় কারখানা নির্মাণ করে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করেছিলো। কিন্তু, শাহজাহানের সময়ে তারা এমন নির্লজ্জভাবে এ সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করতে লাগলো যে, তাদের এসব সুবিধার উপর সম্রাট শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন। প্রথমত ঃ রাষ্ট্রের রাজস্বের ক্ষতিসাধন করে তারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হতে অধিক পরিমাণে শুল্ক আদায় করতো।
দ্বিতীয়ত ঃ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের মাধ্যমে তারা লাভজনক ক্রীতদাস ব্যবসা চালাতো।
তৃতীয়তঃ ভারতীয়দের জোরপূর্বক তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করাতো। চতুর্থতঃ মমতাজ মহলের দু'জন যুবতী ক্রীতদাসীকে তারা বন্দী করে রেখেছিলো।[২৪৬]

---

২৪৪. M.L. Ray Chowdhury, *Religious Policy of the Mughal*, Matba Mujtaba- i-Delhi, India: 1318 A.H. p. 167.
২৪৫. A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Kutub Khana Rashidia, Delhi: 1962, p. 318.
২৪৬. A.B. Keith, *A Constitutional History of India*, Macdonal Evans Ltd., London: 1980, p. 234.

Dhaka University Institutional Repository

এসব কারণে সম্রাট শাহজাহান তাদের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এ ধরণের অনধিকার চর্চা ও ঔদ্ধত্যের জন্য সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বঙ্গের শাসনকর্তা কাসিম খানকে এ অবাঞ্চিত বিদেশীদের দমন করার জন্য আদেশ দিলেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে কাসিম খান পুর্তুগীজদের আক্রমণ করলেন এবং তিন মাস অবরোধের পর তারা পরাজিত হলো। তাদের দুর্গ ও কারখানা ধূলিসাৎ করা হয় এবং সৈন্যবাহিনীর কিছু সংখ্যক নিহত ও অবশিষ্টাংশ হুগলী নদীতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। অনেক পর্তুগীজকে হত্যা এবং কিছু সংখ্যককে বন্দী করে আগ্রায় প্রেরণ করা হয়।[২৪৭] এ যুদ্ধের ফলে পর্তুগীজদের অত্যাচার দমিত হয় এবং যে সব ভারতীয় তাদের অধীনে বন্দী ছিলো তারা মুক্তি পায়।

১৬৩০-১৬৩২ সালের দুর্ভিক্ষঃ

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে (১৬৩০-১৬৩২ খ্রীঃ) গুজরাট, খান্দেশ ও দাক্ষিণাত্যে এক মারাত্মক দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী মীর্জা আমীন কাজীনী বলেন-

> "চারদিকে চরম দুর্গতি দেখা দেয়; দোকানদার বাজারে ময়দার
> সাথে হাড়ের গুঁড়া মিশিয়ে বিক্রয় করে এবং দুঃস্থ লোকদের
> নিকট হালাল মাংস বলে কুকুরের মাংস বিক্রি করতে থাকে।
> দুর্ভিক্ষের সাথে সাথে মহামারী ও দেখা দেয়। এর প্রকোপ
> এমন বেড়ে যায় যে, গ্রামবাসীদের অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"[২৪৮]

সম্রাট শাহজাহান মানুষের কষ্ট নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও দুর্দশার তুলনায় তা যথেষ্ট ছিলো না।

শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতি ঃ

২৪৭. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, op. cit. p. 183.
২৪৮. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, op. cit. p. 162.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে বিজয়ের সংকল্প করেছিলেন। নিজের সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমায় অন্য স্বাধীন রাজ্যের অবস্থিতি তিনি সহ্য করতে পারলেন না এবং শীয়াদের আধিপত্য বিনষ্ট করার ব্যাপারকেও তিনি কর্তব্য হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। দেশের পরিস্থিতিও তাঁর এ উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলো এবং এ ব্যাপারে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী শাসক অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করেছিলেন। আহমদনগরের রক্ষাকর্তা মালিক অম্বরের মৃত্যু, সমগ্র দেশের পক্ষে আতঙ্কজনক দুর্ভিক্ষ, দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মালিক অম্বরের পুত্র ফতেখানের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি তাঁর বিজয়ের পথে সহায়ক হয়েছিলো।[২৪৯]

আহমদনগর আক্রমণের জন্য শাহজাহান সুযোগ খুঁজছিলেন। নিজামশাহী রাজ্যের শাসনকর্তা বিদ্রোহী সর্দার খানজাহান লোদীকে সাহায্য করায় সে সুযোগ অনায়াসেই এসে জুটলো। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটবাহিনী পারবেন্দার দুর্গ আক্রমণ করলেও অধিকার করতে সমর্থ হলো না; কিন্তু শীঘ্রই মোগলদের ভাগ্যে অন্যদিক হতে সুযোগ এসে দেখা দিলো। সুলতান মুর্তজা নিজামের প্রতি ব্যক্তিগত রোষবশতঃ তাঁকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে আহমদনগরের মন্ত্রী ফতেখান মোগল সম্রাটের সাথে গোপনে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন। তিনি সুলতানকে হত্যা করে যুবক শাহাজাহানকে সিংহাসনে বসালেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি শাহজাহানের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে মহব্বত খান দৌলতাবাদ দুর্গ আক্রমণ করলে তিনি তা রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়ালেন। সম্রাট বাহিনীর আবির্ভাব এবং প্রচুর উৎকোচের লোভে তিনি ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে দুর্গটি মোগলদের হাতে ছেড়ে দিলেন। আহমদনগর মোগলদের অধীনে চলে আসে এবং বালক-রাজা হোসেন শাহকে আজীবন বন্দী হিসেবে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করা হয়। ফতেখান মোগল বাহিনীতে যোগ দিয়ে অধিক বেতনে সম্রাটের অধীনে উচ্চপদ লাভ করেন। এভাবে আহমদনগরের নিজাম শাহী বংশের পতন ঘটে।[২৫০]

---

২৪৯. S.R. Sharma, *Mughal Govt. and Administration*, Bani Shipa Prokashoni, Calcutta: 1976, p. 236.
২৫০. Edwards and Garret, *Mughal Rule in India*, op. cit. p. 114.

Dhaka University Institutional Repository

শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলা রাজ-পরিবারের একজন বালককে সিংহাসনে বসিয়ে নিজাম শাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে আহমদনগর শাহজাহান ও বিজাপুরের আদিল শাহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়লো।[২৫১]

আহমদনগরের পতনের পর শাহজাহান গোলকুন্ডা ও বিজাপুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। এই দুই রাজ্যের শত্রুতা তিনি ভুলতে পারেন নি। তিনি যখন আহমদনগরের সুলতানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন আহমদনগরের সিংহাসনে বালক-রাজাকে বসাবার প্রচেষ্টাকে এ দুই রাজ্য সমর্থন জানিয়েছিলো।

শাহজাহান প্রথমত এই দুই শাসনকর্তার উপর লিখিত আদেশ জারি করেন। তিনি আদেশ করেন যে, মোগলদের প্রভুত্ব তাদের মেনে নিতে হবে, মোগল সম্রাটকে নিয়মিত কর প্রদান করতে হবে এবং শাহজী ভোঁসলকে তাঁরা কোনোরকম সাহায্য করতে পারবে না। গোলকুন্ডার শাসনকর্তা আদেশ মেনে নিলেও বিজাপুরের আদিল শাহ্ মোগল সম্রাটের স্বাধীনতা অস্বীকার করলেন এবং মোগল সম্রাটকে সাহসের সাথে প্রতিরোধ করার জন্য দন্ডায়মান হলেন। কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলো। মোগল বাহিনী চারদিক হতে আদিল শাহের রাজ্য আক্রমণ করলো এবং সুলতানকে এমন এক অবস্থার মধ্যে এনে ফেললো যে, সন্ধি ব্যতীত আর কোনো গত্যন্তর রইলো না। তিনি শাহজাহানের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে কর প্রদান করতে স্বীকার করলেন এবং শাহজী ভোঁসলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।[২৫২]

এ আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ সুলতানকে তাঁর পূর্বপুরুষের রাজ্যসহ আহমদনগরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয়া হলো। এরূপে ৪০ বছর (১৫৯৫-১৬৩৫ খ্রিঃ) সংগ্রামের পর দাক্ষিণাত্য সমস্যার সমাধান হলো। সম্রাট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল ও দক্ষিণ-ভারতে তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই শাহজাহান তাঁর তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গযেবের উপর দাক্ষিণাত্যের শাসনভার অর্পন করলেন।[২৫৩]

---

২৫১. Mohammad Noman, *Muslim India*, Islamic Publications Ltd., Lahore: 1987, p. 94.
২৫২. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, op. cit., p. 146.
২৫৩. Ibid, p. 147.

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতিঃ

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে কান্দাহার মোগলদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। ক্ষমতা অধিকারের পর শাহজাহান তা পুণরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কান্দাহারের শাসনকর্তা আলী মর্দা খানের সাথে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি এটি পুণরায় লাভ করলেন। আলী মর্দান পারস্যের শাসনকর্তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ঐ প্রদেশ মোগলদের কাছে সমর্পণ করেন। শাহজাহান তাঁকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিলেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের মিত্র বলে স্বীকার করে নিলেন।[২৫৪]

কান্দাহার পুণরুদ্ধারের পর শাহজাহান মধ্য এশিয়ার পিতৃ ভূমিগুলো দখল করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন।

আব্দুল হামিদ লাহোরী বলেন-

> "রাজত্বের প্রথম হতেই সম্রাটের মন তাঁর নিজস্ব আবাসভূমি অধিকার এবং পিতৃ-পুরুষ তৈমুরের আবাসভূমি ও রাজধানী সমরকন্দ অধিকারের সুযোগ লাভের উপর নিবিষ্ট ছিলো।"[২৫৫]

১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুরাদ মর্দানের অধীনে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। বিনা বাধায় তাঁরা বল্‌খ অধিকার করলেন; কিন্তু শীঘ্রই এক নতুন বিপদ এসে উপস্থিত হলো। শাহজাদা মুরাদের পার্বত্য অঞ্চল পছন্দ না হওয়ায় তিনি রাজধানীতে ফিরে আসলেন। তিনি চলে আসার পর উজবেকগণ শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং জনসাধারণের জীবন অতিষ্ট করে তুললো। আওরঙ্গজেব কর্তৃক অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ অত্যাচার চলতে থাকে। তিনি উজবেকদেরকে পরাজিত করেন এবং ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বল্‌খ নগরী পুনরাধিকার করেন।[২৫৬]

কিন্তু মোগলদের বিপদ এতে দূর হলো না। বল্‌খ অধিকৃত হবার সাথে সাথে বোখারা হতে আব্দুল আজিজের অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী মোগলদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। আওরঙ্গযেব স্থির বুদ্ধি ও আশ্চর্য সাহসের সাথে আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন এবং তৈমুরাবাদের

---

২৫৪. Ibid, p. 150.
২৫৫. S.M. Jaffar, *The Mughal Empire*, British Colombia Publications, Toronto, Canada: 1974, p. 317.
২৫৬. Elphinstone, *History of India*, Vol- iv, Eureka Publications Ltd., London: 1973, p.537.

Dhaka University Institutional Repository

দিকে অগ্রসর হলেন। আওরঙ্গযেবের সাহস ও চাতুর্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে বোখারার সুলতান সন্ধি প্রার্থনা করলেন। মোগল বাহিনী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। আওরঙ্গযেবও বৃথা সময় নষ্ট না করে হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নানা অসুবিধার মধ্যদিয়ে কাবুল এসে উপস্থিত হলেন। বল্‌খ ও বাদাখ্‌সানের সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করা আর সম্ভব হলো না। এরূপে শাহজাহানের পিতৃভূমি অধিকারের স্বপ্ন ব্যর্থ হলো।

মধ্য-এশিয়ায় মোগলদের ব্যর্থতার ফলে পারস্যের দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাস কান্দাহার পুণরাধিকার করার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলেন। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যভাগে তিনি কান্দাহর আক্রমণ ও অধিকার করলেন।[২৫৭] শাহজাহান আওরঙ্গযেব ও প্রধানমন্ত্রী শাদুল্লা খানকে কান্দাহারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবার জন্য আদেশ প্রদান করলেন। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মে শাহজাদা পারসিকদের আক্রমণ করলেন; কিন্তু পারসিকদের উন্নত সমর কৌশলের নিকট তিনি পরাজিত হলেন। আওরঙ্গযেবের ব্যর্থতায় অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ দিলেন। এরূপে কান্দাহার অধিকারের জন্য মোগলদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো। শাহজাহান তিনবার এটি অধিকার করার চেষ্টা করলেন; কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হলেন।[২৫৮]

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গযেবঃ

আহমদনগর, গোলকুন্ডা ও বিজাপুর অধিকার করার পর শাহজাহান তাঁর তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গযেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তিনি নিজে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হন। আওরঙ্গযেব তাঁর প্রথম শাসনকালে (১৬৩৬-৪৪ খ্রিঃ) ক্ষমতা, বুদ্ধি ও কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন। সাম্রাজ্যের শত্রুদের দমন করে তিনি খান্দেশ ও সুরাটের মধ্যবর্তী বাগনালা জেলা অধিকার করলেন এবং শাহজীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলেন।

কিন্তু আওরঙ্গযেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা অনবরত শাহজাহানের কর্ণে তাঁর বিরুদ্ধে বিষ ঢালছিলেন। এতে দাক্ষিণাত্যের শাসনকার্যের ব্যাপারে তিনি অসুবিধাবোধ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভ্রাতার অনধিকার চর্চার ফলে বিরক্ত হয়ে তিনি পদত্যাগ করলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. যদুনাথ সরকার বলেন-

---

২৫৭. Ibid, p. 541.

২৫৮. J.N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, op. cit. p. 814.

Dhaka University Institutional Repository

> "শাহজাদা তাঁর ভ্রাতার অনধিকার চর্চার প্রতিবাদ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি শাহজাহানের পক্ষপাতিত্বের জন্য কার্য হতে অবসর গ্রহণ করেন। এতে সম্রাট তাঁকে শাসনকার্য, জায়গীর ও ভাতা হতে বঞ্চিত করেন।"[২৫৯]

কিন্তু অল্পকালের মধ্যে শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহান আরার চেষ্টার ফলে পিতা-পুত্রের মধ্যে পুণরায় স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গযেব গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। মোগল প্রভুত্ব দূরীকরণের জন্য তিনি উক্ত পদে ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্য-এশিয়ায় মোগল বাহিনীর অকৃতকার্যতার পর আওরঙ্গযেব পুণরায় ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।[২৬০]

<u>উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বঃ</u>

ভারতীয় উপমহাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে আওরঙ্গযেবের নাটকীয় উপায়ে সিংহাসন লাভ অন্যতম। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শাহজাহান কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এক সপ্তাহ পরে গণ-অসন্তোষ নিরসনের জন্য তিনি ঝরোকায় দর্শন দেন। কারণ, কিছুদিন দরবারে অনুপস্থিত থাকায় চারদিকে গুজব রটেছিলো যে, সম্রাট আর জীবিত নেই। তখনও তিনি পীড়িত ছিলেন এবং চিকিৎসকগণ তাঁর নিরাময় সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। আরোগ্য লাভের কোনো আশা নেই ভেবে সম্রাট একটি উইল করে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে। তিনি উচ্চপদস্থ সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারীদেরকে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট হিসেবে গণ্য করতে নির্দেশ দেন। দারাশিকোকেও তিনি রাজোচিত ব্যবহার করতে অনুরূপ নির্দেশ দেন।[২৬১]

শাহজাহানের চার পুত্র ও দুই কন্যা ছিলো। দুই বোনের মধ্যে জাহান আরা দারার পক্ষ এবং রওশনআরা আওরঙ্গযেবের পক্ষ সমর্থন করতেন। চার পুত্রকে সম্রাট চারটি বিভিন্ন প্রদেশের

---

২৫৯. A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, op. cit. p. 164.
২৬০. Ray Chowdhury, *An Advanced History of India*, Princeton University Press, New Jersey, America: 1963, p. 312.
২৬১. Ibid, p. 315.

Dhaka University Institutional Repository

শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। দারাকে কাবুল ও মুলতানে, সুজাকে বাংলায়, আওরঙ্গযেবকে দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদকে গুজরাটে নিযুক্ত করা হয়। দারা ছিলেন পুত্রদের মধ্যে সকলের বড় এবং পিতার অত্যন্ত প্রিয়। তিনি পিতার অসুস্থ্যতার সময় তার শয্যাপাশে ছিলেন এবং সম্রাটের নামে রাজ্যশাসন করতে থাকেন।[২৬২]

কিন্তু সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে বিদুৎবেগে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, শাহজাহান আর ইহজগতে নেই এবং সম্রাটের প্রিয়পুত্র দারা জোরপূর্বক সিংহাসন দখল করেছেন। এতে শাহজাহানের চার পুত্র অল্পকালের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হলেন এবং সম্রাটের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুললেন।[২৬৩]

শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে এ সংঘর্ষের কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিলো।

প্রথমতঃ মোগল সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতি ছিলো না। 'জোর যার মুল্লুক তার'- এ নীতিই ছিলো উত্তরাধিকার লাভের প্রচলিত নিয়ম। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানকে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে সংগ্রাম করে সিংহাসন লাভ করতে হয়েছিলো। সুতরাং উত্তরাধিকারের জন্য সংগ্রাম মোগল সম্রাটের পক্ষে অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো। উত্তরাধিকারের কোনো সুনির্দষ্ট নীতি না থাকার ফলে শাহজাহানের অসুস্থ্যতা উত্তরাধিকার লাভের জন্য যুদ্ধের পক্ষে যথেষ্ট কারণ হয়েছিলো। দ্বিতীয়তঃ ভ্রাতাদের প্রতি দারার ব্যবহার ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ ছিলো। দারা তাঁর ভ্রাতাদের উজিরগণের নিকট হতে এ মর্মে আশ্বাস লাভ করেছিলেন যে, দূর প্রদেশে অবস্থানরত শাহজাদাদের নিকট তাঁরা সম্রাটের অথবা দরবারের কোনো খবর পাঠাবেন না। কেন্দ্রের সাথে সকল সংযোগ তিনি বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং পরিব্রাজক ও সংবাদ আদান প্রদানকারীদের বঙ্গদেশ, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের দিকে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দেয়া হলো। আওরঙ্গযেবের অধীনে বিজাপুরে সংগ্রামরত কর্মচারীদের তিনি রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য আদেশ দান করেছিলেন।[২৬৪] শাহজাদাগণ রাজধানীতে প্রবেশের পূর্বেই তাঁদেরকে আক্রমণ করার জন্য তিনি সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিলেন। দারাশিকোর এসব কার্যাবলী ভ্রাতৃসংগ্রামকে প্ররোচিত করেছিলো।

---

২৬২. W. Haig, *Cambridge History of India*, op. cit., Vol-iii, p. 437.
২৬৩. B.P. Saksena, *History of Shah Jahan*, op. cit., p. 318.
২৬৪. Ibid, p. 320-321.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ শাহ্জাহানের চার পুত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা ছিলেন পিতার প্রিয়পাত্র এবং উত্তরাধিকারের আইনসঙ্গত দাবীদার। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর সিংহাসন লাভের সুযোগ খুব কম ছিলো। তিনি ছিলেন দুর্বিনীত ও উদ্ধত প্রকৃতির; তাঁর চঞ্চল স্বভাব ও রুক্ষ মেজাজের জন্য দরবারের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে দারা অত্যন্ত উদার ছিলেন। তিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের কোনো পার্থক্য স্বীকার করতেন না। তাঁর উদার মতবাদ অনেকের, বিশেষকরে গোঁড়াপন্থী মুসলমানদের মনে বিরুদ্ধভাব ও ঘৃণার উদ্রেক করেছিলো। হিন্দুদের সাথে মিত্রতা ও শীয়া মতবাদের প্রতি অনুরাগ তাঁর সিংহাসন লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।[২৬৫]

দ্বিতীয় পুত্র ও বঙ্গের শাসনকর্তা সুজা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয় ছিলেন। মদ্যপানের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাঁর অনেক সৎগুণ নষ্ট করে দিয়েছিলো।[২৬৬]

সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের অভাব ছিলো; তিনিও প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়েছিলেন। তিনি চরিত্রহীন ও ঘোর মদ্যপায়ী ছিলেন এবং শাসকের চরিত্রে যেসব গুণ থাকা দরকার, তাঁর মধ্যে সেগুলোর অভাব ছিলো।[২৬৭]

তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গযেব সর্বাপেক্ষা গুণী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি অসাধারণ কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে সারল্য, ধর্মনিষ্ঠা, শান্ত প্রকৃতি ও প্রভূত জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিলো। বিনীত ও মধুর স্বভাবের জন্য তিনি রাজ-দরবারের সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। আওরঙ্গযেব সম্পর্কে ঐতিহাসিক Bernier বলেন-

"তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান রাজনীতিক, একজন মহান

---

২৬৫. S.R. Sharma, *Mughal Govt. and Administration*, op. cit., p.162.
২৬৬. Ibid, p. 184.
২৬৭. Habib and Nizam, *A Comprehensive History of India*, Vol-V, Bombay: 1935, p. 527.

নৃপতি এবং নানাবিধ ও অসাধারণ মেধার অধিকারী।”[২৬৮]

যদি আমরা সিংহাসনের অধিকার লাভের উপযুক্ততা বিচার করি, তাহলে শাহজাদা আওরঙ্গযেব যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। উত্তরাধিকারের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবেই কলহ উপস্থিত হয়েছিলো। এটাও স্বাভাবিক যে, যিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তিনি নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন করে অনুপযুক্তদের বুদ্ধির খেলায় পরাস্ত করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করবেন।

চতুর্থতঃ শাহজাহানের কাছে আওরঙ্গযেব যে দুর্ব্বহার লাভ করেছিলেন, তাও উত্তরাধিকার লাভের সংগ্রামের ব্যাপারে কম দায়ী ছিলো না। সম্রাট নিজেও জানতে যে, আওরঙ্গযেব তাঁর পুত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও ক্ষমতাবান; তথাপি দারার প্রতি সম্রাটের অন্ধ স্নেহ তাঁকে আওরঙ্গযেবের প্রতি বিরূপ হতে বাধ্য করেছিলো। পিতা ও পুত্রের মতানৈক্যের জন্য ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্য হতে আওরঙ্গযেবের অপসারণ, কান্দাহারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান নিষিদ্ধকরণ, মুলতানের শাসন ব্যাপারে রাজকোষ হতে সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থদানে অস্বীকৃতি, আওরঙ্গযেবের পুত্রের সাথে সুজার কন্যার বিবাহে বাধা প্রদান প্রভৃতির জন্য দারা বিশেষভাবে দায়ী ছিলেন।[২৬৯]

১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আওরঙ্গযেবের প্রতি শাহজাহানের নির্মম ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হয়নি। আওরঙ্গযেবের প্রতি শাহজাহানের ব্যবহারের মূলে দারার ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য। আওরঙ্গযেবের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রতি দারা মূলতঃ ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। একদিকে তিনি ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং অন্যদিকে সম্রাটের চোখে আওরঙ্গযেবের কৃতিত্ব ও সৎগুণকে হেয়প্রতিপন্ন করে তুলেছিলেন।

ভগ্নি জাহান আরার নিকট শাহজাদা আওরঙ্গযেব একবার লিখেছিলেন-

“যদি সম্রাট তাঁর সমস্ত ভৃত্যদের মধ্যে কেবল আমারই অপমানিত জীবন-যাপন ও অগৌরবের মৃত্যুবরণ দেখতে ইচ্ছা করে থাকেন, তা হলেও আমি তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে পারবো না। কিন্তু এ হীন জীবন-যাপন ও মৃত্যু দুই-ই অসম্ভব। আমি তাঁর প্রিয়পাত্র হতে পারিনি, তাই বলে ক্ষণস্থায়ী ও পার্থিব জিনিসের জন্য আমি দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারি না। কাজেই সম্রাটের অনুমতিক্রমে যাতে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি না হয় এবং অন্য লোকের (দারা) মনের শান্তি ব্যাহত না হয়, তার জন্য এ বিরক্তিকর জীবন-যাপন হতে মুক্তি নেয়া আমার উচিত। দশ

[২৬৮]. V.A. Smith, *Oxford History of India*, op. cit., p. 179.
[২৬৯]. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, op. cit., p. 234.

Dhaka University Institutional Repository

বছর পূর্বে আমি এ সত্য উপলব্ধি করেছিলাম এবং আমার জীবন বিপদাপন্ন বুঝতে পেরে অন্য লোকের ক্ষতির কারণ না হবার জন্য আমি পদত্যাগ করতে ইচ্ছা করলাম।"[২৭০]

কাজেই দেখা যায় যে, আওরঙ্গযেব ও দারার মধ্যে মনোমালিন্য ও আওরঙ্গযেবের প্রতি শাহ্জাহানের দুর্ব্যবহার এ উত্তরাধিকারের প্রশ্নের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। রাজধানীর সকল ঘটনার খবর জানিয়ে আওরঙ্গযেব ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সুজা ও মুরাদের সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এ ক্রমবর্ধমান মিত্রতা দারা ও শাহ্জাহান ভয়ের সাথে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁদের সংকল্প ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য শাহ্জাহান খাজা সারার মাধ্যমে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করে প্রত্যেকের নিকট গোপনে পত্র পাঠিয়েছিলেন। ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতাকে প্ররোচিত করে এ উত্তেজনামূলক পত্র দান করার ফলে সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং এ উত্তরাধিকারের সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিলো।[২৭১]

উত্তরাধিকার সংগ্রামের প্রধান ঘটনাবলীঃ

শাহ্জাদা দারা শিকোহ্ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য পিতার অসুস্থ্যতার কথা অন্যান্য ভাইদের নিকট গোপন রাখায় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে। সুজা, আওরঙ্গযেব ও মুরাদ পিতার অসুস্থ্যতার সংবাদ না পাওয়ায় মনে করলেন যে, সম্রাট আর বেঁচে নেই এবং দারা তাঁর মৃত্যু-সংবাদ গোপন রেখে রাজ্যশাসন করছেন। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে বাংলার শাসনকর্তা সুজা সর্বপ্রথম সিংহাসন লাভের চেষ্টা করেন। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কন করেন। আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হলে তিনি দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মান শিকোহ্ কর্তৃক বারাণসীর নিকটে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং বাহাদুরগড়ের যুদ্ধে তিনি পরাজয় বরণ করেন (ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৮ খ্রিঃ)। ফলে সুজা বঙ্গদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন।[২৭২]

এদিকে গুজরাটের শাসনকর্তা মুরাদ আহমদাবাদে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে জাহান আরা বেগমকে প্রদত্ত সুরাটবন্দর আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন। আওরঙ্গযেব এসব কার্যকলাপ

---

২৭০. A.B. Keith, *A Constitutional History of India*, op. cit., p. 147.
২৭১. B.P. Saksena, *History of Jahangir*, op. cit., p. 112.
২৭২. Ibid, pp.115-117.

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি মুরাদকে কূটকৌশলে নিজ দলভুক্ত করে নিলেন এবং উভয়ের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্য ভাগ করে নেয়ার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এ চুক্তির শর্তানুসারে ঠিক হলো- মুরাদ পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর ও আফগানিস্তান পাবেন এবং বাকী অংশ আওরঙ্গযেব লাভ করবেন। অতঃপর উভয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন। দুই ভ্রাতার সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী ধর্মাট নামক স্থানে উপস্থিত হলে সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে যশোবন্ত সিংহ ও কাসিম খান তাঁদেরকে বাধা প্রদান করলেন (১৬৫৮ খ্রিঃ)। কিন্তু আওরঙ্গযেবের যুদ্ধ-কৌশলের বিরুদ্ধে তাঁরা এঁটে উঠতে পারলেন না। যুদ্ধে আওরঙ্গযেবের জয় হলো। ধর্মাটের যুদ্ধে জয়লাভ করায় আওরঙ্গযেবের মর্যাদা বেড়ে গেল।[২৭৩]

ধর্মাটের যুদ্ধে দারার বাহিনীকে পরাস্ত করে আওরঙ্গযেব আগ্রার অনতিদূরে সামুগড়ের প্রান্তরে শিবিড় গড়লেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে দারা ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে সামুগড়ে আওরঙ্গযেব ও মুরাদের মোকাবেলা করলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চললো। এ যুদ্ধে রাজপুত নেতা রামসিংহ দারার পক্ষে যোগদান করেছিলেন। দারা, শিপির, শিকোহ, খলিলুল্লাহ্ খান ও রস্তম খান প্রাণপণে লড়েও যুদ্ধের গতি নিজেদের অনুকূলে আনতে পারলেন না। ফলে আওরঙ্গযেব যুদ্ধে জয়ী হলেন। সামুগড়ের বিজয় আওরঙ্গযেবের সামরিক কৃতিত্বেরই পরিচায়ক এবং এটি তাঁর সিংহাসন লাভের পথকে প্রশস্ত করে।[২৭৪]

সামুগড়ের যুদ্ধের পর আওরঙ্গযেব আগ্রায় গমন করে বাগেনুর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পিতা শাহজাহানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে একখানা পত্র পাঠান। এ পত্রে তিনি জানান যে, তাঁর শত্রুরা জোর করে তাঁকে এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছে। সম্রাট এসব ঘটনার একটি মীমাংসা প্রত্যাশা করছিলেন। তিনি আওরঙ্গযেবকে 'আলমগীর' নামে একটি তরবারি উপহার দিয়ে পাঠান এবং তাঁর সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আওরঙ্গযেবের বন্ধুগণ তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, সম্রাট তাঁকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করছেন। তাঁরা আওরঙ্গযেবকে আরও পরামর্শ দিলেন যে, তাঁর নিরাপত্তার জন্য সম্রাটকে

---

২৭৩. Abdul Aziz, *Mansabdari system and the Mughal*, India Office Library, London: 1958, p. 317.

২৭৪. P.E. Roberts, *History of British India*, Oxford University Press, London: 1984, p. 113.

Dhaka University Institutional Repository

বন্দী করা উচিত। আওরঙ্গযেব এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং শাহ্‌জাদা মুহম্মদকে রাজকীয় দেহরক্ষীদের অপসারণ করে আগ্রা দূর্গ অধিকার করতে পাঠালেন।[২৭৫] মুহম্মদ দূর্গ অবরোধ করলে রাজকীয় দেহরক্ষীরা তাঁকে বীরবিক্রমে প্রতিরোধ করে; কিন্তু যমুনার পানি সরবরাহ্‌ বন্ধ করে দেয়া হলে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

বৃদ্ধ সম্রাট হেরেমে বন্দী হন এবং তাঁর প্রিয় কন্যা জাহান আরাও পিতার বন্দী জীবনের শরীক হন। জাহানআরা বেগম পিতা ও পুত্রের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে দারাকে লিখিত সম্রাটের একখানা গোপনপত্র আওরঙ্গযেবের হস্তগত হলে পিতার প্রতি তাঁর সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। এ পত্রে দারাকে দিল্লীতে অবস্থান করতে বলা হয়েছিলো। সম্রাটের কপটতা ও দ্বৈত ভূমিকা সম্পর্কে আওরঙ্গযেব নিশ্চিত হন এবং সকল আপোষ-মীমাংসার সুপারিশ তিনি নাকচ করে দেন। অতঃপর ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আওরঙ্গযেব নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।[২৭৬] তিনি দরবার আহ্বান করেন এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁর অনুগত্য মেনে নেন।

আগ্রায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে আওরঙ্গযেব ভাবী শত্রুদের মোকাবেলায় আত্মনিয়োগ করেন। মুরাদের কার্যাবলী আপত্তিকর মনে হওয়ায় তিনি তাঁকে বন্দী এবং গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি কয়েকবার পলায়নের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে দেওয়ান আলী নকীকে হত্যা করার অপরাধে তাঁর বিচার করা হয় এবং কাজীর রায় অনুসারে তাঁর মৃত্যুদন্ড হয়।[২৭৭] ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর হতভাগ্য মুরাদকে কারাগার কক্ষে হত্যা করা হয়।

সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজয়ের পর দারা প্রথমে দিল্লী এবং তথা হতে পাঞ্জাবে এবং পরে গুজরাটে গমন করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা শাহনওয়াজ খান তাঁকে মুরাদের সংগৃহিত দশ লাখ টাকা দেন। এ টাকা দিয়ে দারা বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ্‌ করে সম্রাট আওরঙ্গযেবের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সে সময়ে রাজা যশোবন্ত সিংহ্‌ দারাকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করে আজমীরে গমন করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যশোবন্ত সিংহ

---

২৭৫. Ibid, p. 115.
২৭৬. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire*, Macmillan and Co. Ltd., London: 1937, p. 98.
২৭৭. J.N. Sarkar, *History of India*, Vol-I, Nawal Kishore Press, Lucknow: (N.D.) p. 561.

Dhaka University Institutional Repository

দারাকে কোনো সাহায্যই করলেন না। এদিকে আওরঙ্গযেব দারার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। এমতাবস্থায় দারাকে সম্রাট আওরঙ্গযেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হলো।[২৭৮]

১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'দেওয়াই' এর যুদ্ধে দারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করলেন। ভারতের কোনো স্থানে আশ্রয় না পেয়ে দারা স্ব-পরিবারে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করার পথে বোলান গিরিপথের অনতিদূরে 'দাদর' নামক স্থানে জিওয়ান খান নামে জনৈক আফগান দলপতির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এ জিওয়ান খানকে এক সময়ে দারা মৃত্যুদন্ড হতে রক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে, জিওয়ান খান তাঁর প্রতি প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু জিওয়ান খান বিশ্বাসঘাতকতা করে আওরঙ্গযেবের সৈন্যদের নিকট দারাকে ধরিয়ে দিলেন।[২৭৯]

১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে দারা ও শিপির শিকোহকে বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে আনা হলে প্রকাশ্য রাজপথে তাঁদের অপমানিত করা হলো। ভ্রাতৃহস্তে অপমানিত ও লাঞ্ছিত যুবরাজ দারার জন্য সেদিন দিল্লীবাসী নীরবে অশ্রুবিসর্জন করেছিলো। ফরাসি পরিব্রাজক Francois Bernier ছিলেন এ দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি এ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

> "আমি সর্বত্রই লোকজনকে ক্রন্দন ও দারার দুর্ভাগ্যের জন্য
> অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় শোক করতে দেখেছি।"[২৮০]

এভাবে লাঞ্ছিত করার পর দারাকে বন্দী করে রাখা হয়। অতঃপর দরবারের আলেমদের নিয়ে দারার বিচার শুরু হয়। আলেম-ওলামাদের বিচারে দারা ধর্মত্যাগী বলে বিবেচিত হন, যদিও তিনি ধর্মত্যাগী ছিলেন না। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে আগস্ট স্ব-ধর্ম ত্যাগের অপরাধে দারাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।[২৮১]

দারার পরাজয়ের পর পুত্র সোলায়মান শিকোহ গাড়োয়াল পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। পরে তিনি মোগল বাহিনীর হাতে ধৃত ও বন্দী হন এবং ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি

---

২৭৮. Ibid, p. 565.
২৭৯. A.B. Keith, *A Constitutiona History of India*, op. cit., p. 231.
২৮০. Ibn Hasan, *The Central Structure of the Mughal Empire*, India Office Library, London: 1973, p. 719.
২৮১. Ibid, p. 720.

Dhaka University Institutional Repository

মাসে তাকে সেলিমগড় দূর্গে আনা হয়। সেখান হতে সোলায়মানকে গোয়ালিয়র দূর্গে স্থানান্তরিত করা এবং এখানেই তিনি কিছুদিন পরে বিষপানে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮২]

দিল্লীতে অভিষেক অনুষ্ঠানের পর আওরঙ্গযেব শাহ্‌জাদা সুজাকে একখানি পত্র দেন। এ পত্রে তিনি দারা শিকোহকে জব্দ করার পর সুজাকে তাঁর ইচ্ছামত সাহায্য করবেন বলে জানান। কিন্তু সুজা আওরঙ্গযেবকে বিশ্বাস করতে না পেরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'খাজওয়ার' যুদ্ধে তিনি আওরঙ্গযেবের সেনাবাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে পুত্রসহ পলায়ন করেন। অতঃপর পলায়নরত অবস্থায় তিনি তাঁর বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। আওরঙ্গযেবের রাজ্যে আশ্রয় না পেয়ে তিনি আরাকানে পলায়ন করেন এবং সেখানে কিছুদিন পর মগদের হাতে নিহত হন। এভাবে উত্তরাধিকারের দাবা খেলায় আওরঙ্গযেব বুদ্ধির চালে জয়ী হন এবং তাঁর ভাইদের পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহন করেন।[২৮৩]

আওরঙ্গযেবের সাফল্যের কারণঃ

মোগল যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধে আওরঙ্গযেবের সাফল্যকে ভাগ্যের দান বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ এ বক্তব্য সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, শাহজাহানের দূর্বলতাই আওরঙ্গযেবের সাফল্যের অন্যমত কারণ।

আরোগ্য লাভ করার পর শাহজাহান যদি নিজের হাতে শাসনদন্ড ধারণ করতেন এবং তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত গুজব বন্ধ করতে পারতেন, তাহলে তিনি এ সমস্যার সমাধান করতে পারতেন এবং কূটনৈতিক বুদ্ধিকৌশল দ্বারা তিনি শাহ্‌জাদা দারাকে পরে সিংহাসন দান করতে পারতেন। ধরমাতের যুদ্ধের পর তিনি যখন পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারলেন, তখনই তিনি সভা আহবান করে সেনাপতি, অভিজাতবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিকট দারার সিংহাসন লাভের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে পারতেন। একথা বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি যখন জনপ্রিয় সম্রাট ছিলেন, তখন তাঁর আবেদন তাঁরা উপেক্ষা করতে পারতেন না। একবার সমর্থন পেলে এবং ক্ষমতা পুণরুদ্ধার করতে পারলে শাহ্‌জাদাগণ তাঁকে সিংহাসন হতে দূরে সরাতে পারতেন না।

---

[২৮২]. B.P. Saksena, *History of Shah Jahan*, op. cit., p. 415.
[২৮৩]. S.M. Jaffar, *The Mughal Empire*, op. cit. p. 217.

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তিনি পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি; উপরন্তু অবিবেচনাবশত দারাকে আওরঙ্গযেবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন।[২৮৪]

আওরঙ্গযেব একজন বড় কূটনীতিবিদ, সুদক্ষ সেনাপতি ও চতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি এবং সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করার কৌশল তাঁর ভ্রাতাদের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ছিলো। তাঁর কূটনীতিজ্ঞান এবং রণনৈপুণ্যের নিকট দারা, সুজা ও মুরাদের দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিলো না। দারার সৈন্য বিভাগ সুগঠিত ছিলো না। কাজেই তাদের মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলার অভাব ছিলো। অপরপক্ষে, আওরঙ্গযেবের সৈন্যবাহিনী সুগঠিত, সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল ছিলো। নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মুসলমানদের প্রবল সমর্থন তাঁর বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিলো। একজন ধার্মীক মুসলমান হিসেবে তিনি ইসলামকে রক্ষার দাবি বড় করে তুলে ধরেছিলেন এবং দারার স্বধর্মচ্যুতির ব্যাপারকে কাজে লাগিয়েছিলেন।[২৮৫]

আকবরের সময় হতে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ইসলামের গৌরবকে পুণরুদ্ধার করার জন্য একজন নেতার অনুসন্ধান করছিলেন। আওরঙ্গযেবকে ইসলামের রক্ষক মনে করে তাঁরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন এবং তাঁকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দান করেছিলেন। নম্র-প্রকৃতি ও চারিত্রিক উদারতার জন্য তিনি অনেকের হৃদয় জয় করেছিলেন। অপরপক্ষে দারার রুক্ষ মেজাজ ও ধর্মীয় মতবাদের জন্য অনেক লোক তাঁকে ত্যাগ করেছিলো। রাজপুতদের উপর দারার অত্যধিক নির্ভরতা অনেককে বিরূপ করেছিলো। রাজপুতগণ দারার পক্ষাবলম্বন করে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলো। ধার্মিক মুসলমানদের নিকট প্রমোদ-বিলাসী সুজা এবং মদ্যপায়ী মুরাদ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের অযোগ্য ছিলেন।[২৮৬]

শাহজাহানের শেষ জীবনঃ

সম্রাট শাহজাহানের শেষ জীবন খুব দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিলো। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে হতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (১৬৬৬ খ্রিঃ) আট বছর তিনি আগ্রায় 'শাহবুরুজ প্রাসাদে' বন্দী জীবন-যাপন করেছেন। রাষ্ট্র ও স্বীয় স্বার্থে আওরঙ্গযেব পিতাকে আগ্রার দূর্গে নজরবন্দী করে রাখেন। পিতার প্রতি পুত্রের এরূপ ব্যবহার আপাতঃদৃষ্টিতে খারাপ মনে হলেও বিশেষ অবস্থার

---

২৮৪. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, op. cit., p. 637.
২৮৫. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, op. cit., p. 318.
২৮৬. Tara Chand, *Influence of Islam on Indian Culture*, Bani Shilpa Prokashoni, Calcuttà: 1987, p. 119.

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে তা দূষণীয় ছিলো না। সিংহাসনে আরোহন করে আওরঙ্গযেব পিতাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মোকাবেলায় তাঁকে যা করতে হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।[২৮৭]

দারার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শাহজাহন আশা করতেন যে, দারা হয়তো পুণরায় ক্ষমতা লাভ করতে পারবেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শাহজাহানের সে আশা আর রইলো না; তখন তিনি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। প্রভাতে কুরআন পাঠ, মধ্যাহ্নে নিদ্রা এবং সন্ধ্যায় আগ্রার প্রাসাদের অলিন্দ হতে দূরে যমুনার তীরে মমতাজের সমাধির দিকে করুণ দৃষ্টিপাত ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ-এটাই ছিলো তাঁর অবশিষ্ট জীবনের দৈনন্দিন কর্মসূচী। এ দুর্ভাগ্যের সময় কন্যা জাহানআরা তাঁর সেবা-শুশ্রাষা করতেন। দীর্ঘ আট বছর বন্দী জীবন যাপন করে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারি শাহজাহান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২৮৮]

<u>শাহজাহানের শাসনব্যবস্থাঃ</u>

সম্রাট শাহজাহান প্রধানত পিতামহ আকবরের শাসনব্যবস্থাই অনুসরণ করেছিলেন। তবে সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে শাসনব্যবস্থার ও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো। ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরীর মতে, শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যসীমা পশ্চিমে সিন্ধুদেশ হতে পূর্বে আসামের সিলেট বা শ্রীহট্ট, উত্তরে আফগানিস্তানের 'বিস্ত' দূর্গ হতে দাক্ষিণাত্যের আউসা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। বল্খ ও বাদাখ্সান বিজিত হলে শাহজাহানের রাজ্যসীমা আরও বর্ধিত হয়েছিলো।

সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য ১৫টি সুবায় বিভক্ত ছিলো; কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালে সুবার সংখ্যা ছিলো ২২ টি। যথা- দিল্লী, আকবরাবাদ, আজমীর, লাহোর, দৌলতাবাদ, মালব, এলাহাবাদ, বেরার, খান্দেশ, আহমদাবাদ, অযোধ্যা, মুলতান, বিহার, তেলিঙ্গনা, উড়িষ্যা, থাট্টা, বাগলানা, বল্খ, কাবুল, কান্দাহার, বাদাখ্সান ও কাশ্মীর।[২৮৯] এ বিস্তৃত সাম্রাজ্য থেকে রাজস্ব আদায় হতো ৮৮০ কোটি দাম বা ২২ কোটি মুদ্রা। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো এবং এ শাসনব্যবস্থা সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলো।

---

২৮৭. Ibn Hasan, *The Central Structure of the Mughal Empire*, op. cit., p. 417.
২৮৮. Ibid, p. 421.
২৮৯. Ibid, p. 427.

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আকবর জায়গিরদারী প্রথা রহিত করেছিলেন; কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালে মনসবদারী প্রথার সাথে জায়গীরদারী প্রথাও প্রচলিত ছিলো। শাহজাহান উচ্চ কর্মচারীদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁদের নিযুক্তি বা পদচ্যুতি সম্রাটের ইচ্ছাধীন ছিলো। 'সামরিক শক্তি রাজশক্তির উৎস'-এ উদ্দেশ্যে শাহজাহান একটি বিরাট বাহিনী পোষণ করতেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিলো প্রায় সাড়ে চার লাখ এবং মনসবদারের সংখ্যা ছিলো আট সহস্র। এ সৈন্যবাহিনীর জন্য রাজকোষ হতে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হতো। সম্রাট শাহজাহান তাঁর সাধারণ প্রজাবর্গের সাথে ব্যবহারে অত্যন্ত সদয় ছিলেন। ঐতিহাসিক টেভারনিয়ারের মতানুসারে, তিনি প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন এবং তাদের কল্যাণে তিনি সতত যত্নশীল ছিলেন।[২৯০]

রাজস্ব ব্যবস্থাঃ

মোগল সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিলো ভূমি-রাজস্ব। শাহজাহান ভূমি-রাজস্ব আদায়ের সময়ে কর্মচারীদেরকে প্রজাবর্গের স্বার্থ ও কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে নির্দেশ প্রদান করতেন। অবশ্য তাঁর নির্দেশ যে সব সময়ে অনুসৃত হত, তা নয়। ভূমি-রাজস্ব ব্যতীত প্রজাদের নিকট হতে বহু প্রকার আবওয়াব বা সেস গৃহীত হতো। যথা-পণ্যকর, সম্পত্তি বিক্রয়কর, তীর্থকর প্রভৃতি; আবওয়ারের সংখ্যা কতো ছিলো তা ঠিক জানা যায়নি।[২৯১]

বিচার ব্যবস্থাঃ

বিচার বিভাগের পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিলো কাজী ও মীর আদল নামক কর্মচারীর উপর। সম্রাট শাহজাহানও বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজ্যের সর্বপ্রধান বিচারক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিচার তিনিই করতেন। রাজধানীতে প্রতি বুধবার বাদশাহ স্বয়ং বিচারকক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রজাবর্গের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। দারোগা সমস্ত অভিযোগ বাদশাহের নিকট উপস্থিত করতেন। বাদশাহ উলামাগণের সহায়তায় শরীয়তী বিধান অনুসারে বিচার-কার্য পরিচালনা করতেন। 'সুবাব-উৎতাওয়ারিখের' হিন্দু গ্রন্থকার ও শাহজাহানের বিচার-

---

২৯০. M.A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Hyderabad, India: 1972, p. 927.
২৯১. P.E. Roberts, *History of British India*, Vol-iv, op. cit. p. 574.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা ও ন্যায়বিচারের ভূঁয়সী প্রশংসা করেছেন।[২৯২] ঐতিহাসিক মানুচ্চিত্ত সম্রাট শাহজাহানের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন দন্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিলো। সাধারণ অপরাধেও অঙ্গচ্ছেদের বিধান ছিলো। গুরুতর অপরাধের জন্য প্রাণদন্ড এবং আজীবন কারাবাস হতো।[২৯৩]

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাঃ

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল ভারতের স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। তাঁর রাজত্বকালে মোগল শিল্পকলা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলো। শাহজাহান ছিলেন মোগল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-রসিক। শিল্প সৃষ্টি ছিলো তাঁর জীবনের সাধনা। বিভিন্ন নির্মাণ-কার্য দ্বারা তিনি দিল্লী নগরীর গৌরব ও শোভা বৃদ্ধি করেন এবং এর নামকরণ করেন শাহজাহানাবাদ।

সম্রাট শাহজাহান আগ্রায় ও দিল্লীর দূর্গে 'দিওয়ান-ই-খান', 'দিওয়ান-ই-আম' শীশমহল ও অঙ্গুরীবাগ নির্মাণ করেন; লাহোর দূর্গে ও তিনি 'দিওয়ান-ই-খাস' এবং 'দিওয়ান-ই-আম' নির্মাণ করেন। আগ্রার প্রাসাদ-দূর্গে মতি মসজিদ, আগ্রায় যমুনার তীরে তাজমহল এবং লাহোর দূর্গের মতিমহল, হীরামহল ও রঙমহল শাহজহানের আমলের শিল্পকীর্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রঙমহলে বিভিন্ন ঋতুতে ফুলের উৎসব, প্রতি সন্ধ্যায় আতসবাজির খেলা চলতো। শাহজাহানের গর্ব ছিলো যে, তিনি মর্তে স্বর্গ রচনা করেছেন। বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণ ও সম্রাট শাহজহানের নির্মিত হর্মমালার গঠন-নৈপুণ্য ও ঐশ্বর্যের সমারোহে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[২৯৪]

সম্রাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ মহলের সমাধি 'তাজমহল'। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বুরহানপুরে (দাক্ষিণাত্যে) সন্তান প্রসবকালে মমতাজ মহলের মৃত্যু হলে সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে এ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ আরম্ভ করেন। কুড়ি হাজার শিল্পী ও শ্রমিকের দীর্ঘ ২২ বছরের (১৫৩১-১৫৫৩ খ্রিঃ) পরিশ্রমে এ

---

২৯২. Ibid, p. 580.
২৯৩. Mohammad Noman, *Muslim India*, op. cit., p. 376.
২৯৪. W. Erskine, *History of India under Babur and Humayun*, Oxford University Press, London: 1951, p. 138.

Dhaka University Institutional Repository

সমাধিসৌধ নির্মিত হয়। এটা নির্মাণ করতে তিন কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিলো।[২৯৫] শাহজাহান এ সৌধ নির্মাণে বহু সুদক্ষ ভারতীয় ও বিদেশী শিল্পী নিযুক্ত করেছিলেন। তাজমহলের পরিকল্পনা করেন শিল্পী ইসফানদিয়ার রুমি; আর এর প্রধান স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ ঈশা সিরাজী। বাঙালি তরুণ শিল্পী বলদেব দাস ছিলেন তাজমহলের রূপকার। বাগদাদের একজন তরুণ শিল্পী প্রস্তরের উপর আরবী অক্ষর খোদিত করেন। দূর হতে অক্ষরগুলো দেখলে মনে হয় যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পদল। মসৃন শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত তাজমহলের মধ্যে যেন মমতাজ মহলের লাবণ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাজমহলের সে অপূর্ব সৌন্দর্য এখন আর নেই- জাঠগণ তাজমহলের বহু রত্ন ও মণিমানিক্য অপহরণ করেছে। কিন্তু তাজমহলের সৌন্দর্য খ্যাতি একটুও ম্লান হয়নি। আজও তাজমহল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং এখনও বহু বিদেশী প্রতি বছর কেবল তাজমহল দর্শনের উদ্দেশ্যেই আগ্রায় আগমন করেন।[২৯৬]

মোগল যুগে জনসাধারণের জন্য বহু 'জাম-ই-মসজিদ' বা জুম্মা মসজিদ নির্মিত হয়। এদের মধ্যে দিল্লী ও আগ্রার জাম-ই-মসজিদ বিখ্যাত। শাহজাহানের প্রিয় কন্যা জাহান আরা আগ্রায় বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে এক লক্ষ লোকের নামাজের উপযোগী একটি জাম-ই-মসজিদ নির্মাণ করেন। শাহজাহান অন্তপুরিকাদের জন্য আগ্রায় প্রাসাদ দূর্গের অভ্যন্তরে একটি শ্বেত পাথরের মসজিদ নির্মাণ করেন। এটাই বিখ্যাত মতি মসজিদ। দিল্লীর লালকেল্লাতেও এরূপ একটি মতি মসজিদ আছে। আগ্রা ও দিল্লীর প্রাসাদ দূর্গে নির্মিত 'দিওয়ান-ই-খাস' ও 'দিওয়ান-ই-আম' শাহজাহানের শিল্পকীর্তির অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন। এদের নির্মাণকার্যে ও অলঙ্করণে বিপুল অর্থ খরচ হয়েছিলো।[২৯৭]

শিল্প সাধনায় ও সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে শাহজাহান লালকেল্লার দিওয়ান-ই-খাসে উৎকীর্ণ করেছেনঃ

"আগর বর রূ- এ জমিন ফেরদৌস আস্ত।
হামিন আস্ত, হামিন আস্ত, হামিন আস্ত॥"[২৯৮]

---

২৯৫. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, op. cit., p. 79.
২৯৬. Ibid, p. 81.
২৯৭. Ibid, p. 83.
২৯৮. B.P. Sakesena, *History of Shah Jahan*, op. cit., p. 417.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে, তা এখানে, এখানে, এখানে। ভুবন বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন শিল্পানুরাগী শাহজাহানের অন্যতম শিল্পকীর্তি। শিল্পী বেবাদল খান সাত বছর পরিশ্রম করে (১৬২৮-১৬৩৫ খ্রিঃ) এ সিংহাসন খানি নির্মাণ করেন। এটি নির্মাণে এক কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়েছিলো। এ সিংহাসনখানি ছিলো দৈর্ঘ্যে সোয়া তিন গজ, প্রস্থে সোয়া দুই গজ এবং উচ্চতায় পাঁচ গজ। সিংহাসনের উপরে চারটি স্তম্ভোপরি স্থাপিত একটি কারুকার্যমন্ডিত চন্দ্রাতপ ছিলো। প্রতিটি স্তম্ভশীর্ষে একজোড়া মণিমুক্তা খচিত ময়ূর মুখোমুখি স্থাপিত ছিলো; এদের মধ্যস্থলে হীরা-পান্না মণিমুক্তাখচিত ফলবান বৃক্ষ। সিংহাসনে আরোহণের জন্য তিনটি মণি-মুক্তা খচিত সোপান ছিলো।[২৯৯]

১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠনকালে এ মযূর সিংহাসন ও লুণ্ঠন করেন এবং তা পারস্যে নিয়ে যান। বর্তমানে অবশ্য মযূর সিংহাসনের অস্তিত্বের কোনো সন্ধান জানা যায় না। জগত বিখ্যাত যে কোহিনূর মণি সম্রাট শাহজাহানের রাজমুকুটে শোভা পেত, নাদির শাহ সে কোহিনূর মণিও লুণ্ঠন করেন।[৩০০]

শাহজাহানের রাজত্বকালে বহু পুরাতন নগরীর সংস্কারকার্য সাধিত হয় এবং বহু নতুন নগরী নির্মিত হয়। এদের মধ্যে দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত শাহজাহানাবাদ বিখ্যাত। আলী মরদানের যমুনার খাল শাহজাহানের অন্যতম কীর্তি। ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

শাহজাহানের চরিত্রঃ

রক্তপাতের মাধ্যমে সিংহাসনে আরোহণ করলেও শাহজাহান একজন দয়ালু ও উদার শাসক ছিলেন। ঐতিহাসিক কাফী খান সম্রাটের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ

> "সংগঠন ও জনসাধারণের কার্যে, কৃষকদের জান-মাল রক্ষার্থে
> এবং মুনাফাখোর, শোষণকারী ও অত্যাচারীদের দমনে শাহজাহান
> সকল তৈমুর বংশীয় রাজাদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।"

---

২৯৯. Ibid, p. 320.
৩০০. Ibid, p. 321.

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁকে একজন আদর্শ মুসলিম শাসক, শারীয়াতের (ইসলামী অনুশাসন) একজন রক্ষক ও ভারতে ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণের নেতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দয়া, ধর্মভীরুতা ও প্রজাহিতৈষণাও উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে,

> "শাহজাহান প্রজাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেছিলেন এবং এজন্যই তাঁকে যথার্থই জনগণের জনক বলা হয়।"

সম্রাট শাহজাহানের মধ্যে আশ্চর্য দৈহিক শক্তি, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সাহসিকতা এবং সর্বোপরি অপূর্ব পরিচালন ক্ষমতা ছিলো। পূর্ব-পুরুষের ন্যায় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিলো। পুত্র হিসেবে তিনি তাঁর পিতার দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সত্য; কিন্তু শাহজাদা হিসেবে তিনি কর্তব্যপরায়ণ এবং স্বামী হিসেবে স্ত্রী মমতাজ বেগমের অনুরাগী ছিলেন। অবশ্য পিতা হিসেবে তিনি নীতিপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি। জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের প্রতি অনুরাগ ছিলো তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারনিয়ার ও মনুচির ন্যায় বিদেশী পর্যটকগণ তাঁকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও প্রমোদ বিলাসী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতানুসারে রাজ প্রাসাদের মধ্যে সু-সজ্জিত বাজার স্থাপন, রাষ্ট্রীয় ব্যায় বহু সংখ্যক নর্তকী প্রতিপালন এবং হেরেমে বহুসংখ্যক দাসী নিয়ুক্তিকরণ প্রভৃতি ছিলো সম্রাটের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও বিলাসিতার পরিচয়।[৩০১]

কিন্তু ইউরোপীয় পর্যটকদের এসব মন্তব্য মোটেই সত্য নয়। একজন ধার্মিক সম্রাটের বিরুদ্ধে তাঁদের এ অভিযোগ বিদ্বেষপ্রসূত ও অযৌক্তিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট শাহজাহান নিষ্ঠুর প্রকৃতির সুলতান ছিলেন না। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আত্মীয়-স্বজন ও ভ্রাতাদের প্রতি নিষ্ঠুর হতে হয়েছিলো। শাহজাহানের অবাধ্যতা এবং পিতার নিকট কৃত অপরাধের জন্য নূরজাহানের ষড়যন্ত্র কম দায়ী ছিলো না।[৩০২]

---

৩০১. J. Fergusson, *History of India and Eastern Architecture*, Lund Humphries, London: 1971, p. 372.
৩০২. Edwards and Garret, *Mughal Rule in India*, op. cit., p. 230.

Dhaka University Institutional Repository

শাহজাহানের কৃতিত্ব-বিচারঃ

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ। সিংহাসনে আরোহণের পর শাহজাহান পর্তুগীজ ও জলদস্যুদের দমন ও হুগলী অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেছিলেন। দক্ষিণে তিনি আহমদনগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন এবং বিজাপুর ও গোলকুন্ডা আয়ত্তে নিয়ে আসেন। সম্রাট বাহিনী আসামের আহমদের সাথেও যুদ্ধ করেছিলো এবং এর ফলে সাম্রাজ্য কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরীর মতে, শাহজাহানের সাম্রাজ্যে সিন্ধু হতে আসামের সিলেট বা শ্রীহট্ট জেলা এবং আফগান অঞ্চলের বিস্তৃত দূর্গ হতে দাক্ষিণাত্যের আউসা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।[৩০৩]

শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে শাহজাহান আকবরের গৃহীত নীতি গ্রহণ করেন এবং ন্যায়বিচার ও বদান্যতার জন্য প্রশংসা অর্জন করেন।

সম্রাট শাহজাহানের সময়ে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান ছিলো, রাজস্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলো এবং প্রজাবর্গ সুখী ও সমৃদ্ধশালী ছিলো। দু'একটি বিদ্রোহ ব্যতীত শাহজাহানের রাজত্বকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা কখনও ব্যাহত হয়নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বি,পি, সাকসেনা বলেনঃ

> "শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি ও
> প্রাচুর্যের শীর্ষে উন্নীত হয়েছিলো।"[৩০৪]

ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যে বহু বিদেশীর মন আকৃষ্ট হয়েছিলো এবং তাঁরা এদেশ সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। ফরাসী পর্যটক Travernier বলেন,

> "সম্রাট শাহজাহান রাজা হিসেবে প্রজাকে শুধু শাসন করা নয়,
> পরিবার ও সন্তানদের পিতার ন্যায় তিনি প্রজা শাসন করতেন।"[৩০৫]

সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফিখানও শাহজাহানের সু-শাসনের প্রশংসা করেছেন। ইতালির পর্যটক মনুচিত্ত কাফি খানের মন্তব্য সমর্থন করে শাহজাহানের শাসন ব্যবস্থাকে 'খুব উন্নত' বলেছেন।

---

৩০৩. B.P. Sakesena, *History of Shah Jahan*, op. cit., p. 811.
৩০৪. M.A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol-ii, op. cit., p. 912.
৩০৫. Ibid, p. 914.

Dhaka University Institutional Repository

এসব পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের মন্তব্য গ্রহণ করলে আমরা ড. স্মিথের এ মন্তব্য স্বীকার করে নিতে পারি না যে, শাহজাহানের শাসনব্যবস্থা প্রজাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও সম্পূর্ণ 'সহানুভূতিহীন' এক শাসন প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাসে শাহজাহান অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর আমলে মোগল শিল্প ও স্থাপত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলো। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের সমাধির উপর তিনি যে তাজমহল গড়ে গিয়েছেন, তা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বাপেক্ষা সুন্দর এক শিল্পকর্ম; দিল্লীর 'দেওয়ান-ই-আম' ও 'দেওয়ান-ই-খাস' এবং আগ্রার জাম-ই-মসজিদ ও মতি মসজিদ শিল্পোৎকর্ষ ও সৌন্দর্যের জন্য আজও পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে। ময়ূর সিংহাসনও শাহজাহানের সৌন্দর্যজ্ঞান এবং ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন ছিলো।[৩০৬]

সাহিত্য ও চিত্রবিদ্যা শাহজাহানের রাজত্বকালে যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করেছিলো। নিজে একজন সংস্কৃতিসেবী ও পন্ডিত ছিলেন বলে শিক্ষা ও শিক্ষিতের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। অনেক বিখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে যে সব বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'বাদশাহ্ নামা'র প্রণেতা আব্দুল হামিদ লাহোরী, অন্য একটি 'বাদশাহ্নামা'র রচয়িতা আমীর কাজীনী, 'শাহ্জাহান নামা'র লেখক ইনায়েত খান, 'আমল সালিহ্' গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মদ সালিত, আবুল কাসিম ইরানী ও মীর্জা জিয়াউদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময় শাহজাদা দারা শিকোহ্ও অনেকগুলো সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে 'সাকিনাতুল আউলিয়া', 'হাসনাতুল আরেফিন' ও 'রিসালাহ-ই-হকনামা' প্রধান ও বিখ্যাত।[৩০৭]

সঙ্গীতের প্রতি সম্রাট শাহজাহানের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিলো। তিনি নিজে ভালো গান গাইতে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এতোই মধুর ছিলো যে, অনেক শ্রোতাই তাঁর গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে পড়তেন।

---

৩০৬. B.P. Saksena, *Histroy of Shah Jahan*, op. cit., p. 710.
৩০৭. Tavernier, *Travels in India*, Eureka Publications Ltd., London: 1973, p. 437.

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রচুর উৎসাহ দান করতেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ পশ্চিম-এশিয়া ও ইউরোপের সাথে রপ্তানী ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলো।[৩০৮] সরকারী রাজকোষ এ সময় পরিপূর্ণ ছিলো। তাঁর ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিলো। এসব ব্যাপারে পর্যালোচনা করে বলা হয়,

> "শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের
> সর্বোচ্চ শিখার আরোহণ করেছিলো।"[৩০৯]

<u>সমালোচনাঃ</u>

ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদের এতো প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও শাহজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত অবনতির বীজ রোপিত হয়। শিল্পকলার প্রসার ও সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তিনি রাজকোষের অর্থ অকাতরে ব্যয় করেছেন। এতে অর্থ সংকট প্রকট আকার ধারণ করে এবং সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত পতনের পথ প্রশস্ত হয়। কান্দাহার ও মধ্য-এশিয়ায় দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধের ফলে লোক ও অর্থের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিলো। উপর্যুপরি তিনবার কান্দাহার অভিযানের অসাফল্যের ফলে মোগলদের অক্ষমতা ও দূর্বলতা বহির্বিশ্বে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে মারাঠাদের পুনর্জাগরণ ঘটে এবং ব্রিটিশের রাজ্যলিপ্সা দেখা দেয়।[৩১০]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বার্নিয়ারের মতানুসারে-

> "প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের কু-শাসনের ফলে কৃষক ও কারিগর
> শ্রেণীর মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দেখা দিয়েছিলো।
> বিরাট সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যয়বহুল সৌধাদি নির্মাণকার্যের
> ব্যয়ভার বহন করার জন্য কৃষকবর্গ ও কারিগর শ্রেণীর উপর
> অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়েছিলো। বিরাট অট্টালিকা ও স্মৃতিসৌধ
> নির্মাণের ব্যয়বাহুল্যের জন্য জাতীয় অর্থের যে অপচয় হয়, তা
> আর পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এ অর্থ সংক পরবর্তীকালে মোগল সাম্রাজ্যের
> পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"[৩১১]

---

৩০৮. V.A. Smith, *Oxford History of India*, op. cit., p. 409.
৩০৯. Ibid, p. 412.

৩১০. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, op. cit., p. 179.
৩১১. H.G. Keene, *The Fall of the Mughal Empire*, Cambridge University Press, New York, America: 1988, p. 518.

Dhaka University Institutional Repository

আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ)

আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহনঃ

সামুগড়ের যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব আগ্রা দখল করেন এবং ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবেলা করার জন্য তিনি অভিষেক উৎসবের দিন পিছিয়ে দিলেন। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুন তিনি অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে 'আবুল মুজাফফর মহীউদ্দীন মুহাম্মদ আরওঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ্ গাজী' এ বিরাট উপাধী ধারণ করে দ্বিতীয়বার অভিষেক উৎসব সম্পন্ন করলেন। দুই মাস ধরে এ অভিষেক উৎসব চলতে থাকে এবং সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণীর লোক এ উৎসবে আনন্দ উপভোগ করে।[৩১২]

অভিষেকের অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তির পরেই আওরঙ্গজেবের নামে খোতবা পড়া ও মুদ্রা অঙ্কিত হয়। অতঃপর তিনি ভারতে ইসলামকে পুনর্জীবিত করার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি সমস্ত শহরে মুতাসিব নিয়োগ করেন এবং মহানবীর (সা.) সুন্নাহ ও শারীয়তের আদর্শ অনুযায়ী মানুষের জীবন গঠনের নির্দেশ দেন। ফলে অনেক মুসলমান ভাং, মদ, জুয়াখেলা প্রভৃতি অসামাজিক কার্য হতে বিরত থাকে। এতদ্ব্যতীত আওরঙ্গজেবের দরবারে প্রচলিত অনেক অনৈসলামিক কার্যকলাপ, যেমন-নওরোজ বা নব বছর উৎসব পালন, ঝরোকা দর্শন, আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সৌর ইলাহী বছর গণনা, স্বর্ণ দ্বারা জন্মদিনে সম্রাটের ওজন গ্রহণ প্রথা, মুদ্রার উপর কালেমা ব্যবহার প্রভৃতি বন্ধ করে দেন।[৩১৩]

জনসাধারণের অসুবিধা দূর করবার জন্য তিনি অনেক অন্যায় কর উঠিয়ে দেয়ার আদেশ জারী করেন। শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য আওরঙ্গজেব সরকারী কর্মচারীদেরকে কাজে অবহেলার জন্য সতর্ক করে দেন। দুর্নীতি দমনের জন্য তিনি নতুন কর্মচারী নিযুক্ত করে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বদলির ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর সমর্থকদের এবং যেসব কর্মচারী ও অভিজাত তাঁর ভ্রাতাদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, তাদেরকেও নানাভাবে সন্তুষ্ট করেন। ফলে তাঁর শত্রুগণ শেষ পর্যন্ত মিত্র হয়ে দাঁড়ালো।

৩১২. A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India,* op. cit., p. 781.
৩১৩. Ibid, p. 785.

Dhaka University Institutional Repository

আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ শাসনকালকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) উত্তর ভারতে অবস্থান (১৬৫৮-১৬৮১ খ্রিঃ) ও (২) দাক্ষিণাত্যে অবস্থান (১৬৮১-১৭০৭ খ্রিঃ)। প্রথমভাগে উত্তর ভারতে তাঁর কার্য সীমাবদ্ধ ছিলে। কারণ সেখানে আওরঙ্গজেবকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এবং রাজপুতনার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো। দ্বিতীয়ভাবে দক্ষিণ-ভারতে তাঁর কার্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। ভারতের ইতিহাসে দক্ষিণ-ভারত তখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচিত হতো। এখানে বিজাপুর ও গোলকুন্ডার সুলতান এবং উদীয়মান মারাঠা জাতির বিদ্রোহ দমনে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো।[৩১৪]

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নীতিঃ

১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা দাউদ খান পালামৌ অধিকার করলে আওরঙ্গজেব মীর জুমলকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মীর জুমলা শাহ্জাদা সুজাকে বাংলা হতে আরাকান পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন। অতঃপর তিনি কুচবিহার ও আসামামের অহোম রাজার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মঙ্গোলীয় বংশের অহোমগণ তাদের আদিভূমি উচ্চ ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার (ভারতবর্ষের) কিয়দংশ অধিকার করে নিয়েছিলো। তারা ক্রমে পশ্চিমদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাদের সাম্রাজ্যে উত্তর-পশ্চিমে বারনদী ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কালাং নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিলে। এখানে তাঁরা হিন্দুদের প্রভাবাধীনে এসে পড়েছিলো এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলো।[৩১৫] জাহাঙ্গীরের আমলে 'কুচহাজো' বিজয়ের ফলে মোগল সাম্রাজ্য বারনদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ায় অহোমদের সাথে মোগলদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো। শাহ্জাহানের আমলে অহোমগণ মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব-সীমান্ত আক্রমণ করেছিলো। ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাদের সাথে এক সন্ধি হয়।

---

৩১৪. V.A. Smith, *Oxford History of India*, op. cit., p. 931.
৩১৫. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol-V, Nikhil Saha Press, Bombay, India: 1967, p. 924.

Dhaka University Institutional Repository

গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে অহোমগণ সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করলো এবং ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে গৌহটি অধিকার করে নিলো। মীর জুমলাকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে আওরঙ্গজেব অহোমদের শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁকে আদেশ দিলেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মীর জুমলা ঢাকা হতে এক সু-সজ্জিত বাহিনী নিয়ে আক্রমণকারীদের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে বহির্গত হলেন। কুচবিহার অধিকার করে তিনি আসামে প্রবেশ করলেন। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁর সৈন্যবাহিনী গড়গাঁও উপস্থিত হলো। গড়গাঁও ছিলো অহোমদের রাজধানী। অহোমগণ বাধা প্রদান করেও শেষ পর্যন্ত সম্রাট বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করলো।[৩১৬]

কিন্তু ভাগ্য অহোমদের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলো। প্রবল বর্ষা আরম্ভ হলে অহোমগণ শক্তি সঞ্চয় করে এবং সম্রাট বাহিনী অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও ঔষধপত্র এবং স্থানাভাবের জন্য খুব কষ্ট ভোগ করতে থাকে। মীর জুমলার সৈন্যশিবিরে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু এ দুরবস্থার সাথে সংগ্রাম করার মতো মনোবল মীর জুমলার ছিলো। বর্ষার শেষে তিনি নতুন শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন এবং অহোমদের সন্ধির আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন।

ঐতিহাসিক জে,এন, সরকার বলেন-

"এরূপে সামরিক অভিযান হিসেবে মীর জুমলার আসাম অভিযান সফল হয়েছিলো।" অহোম রাজা জয়ধ্বজ বার্ষিক কর এবং যুদ্ধের প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও দরঙ্গ প্রদেশের অধিকাংশ ছেড়ে দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু মোগলদের এ সাফল্য বেশী স্থায়ী হয়নি। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে মীর জুমলার মৃত্যুর পর অহোমগণ কামরূপ দখল করে নেয়।[৩১৭]

মীর জুমলার মৃত্যুর পর সম্রাট আওরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খান বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি বহুদিন এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শায়েস্তা খান পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের অত্যাচার হতে দক্ষিণ বঙ্গকে রক্ষা করেন। তিনি আরাকান রাজ্যের নৌশক্তি বিধ্বস্ত করে সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তাঁর দীর্ঘ আটাশ বছরব্যাপী শাসনকাল বঙ্গদেশের জন্য এক স্মরণীয় যুগ। তাঁর

৩১৬. Ibid, p. 937.
৩১৭. Ibid, p. 1132.

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসনে বঙ্গদেশ শান্তি ও সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। প্রবাদ আছে, তাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।[৩১৮]

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতিঃ

মোগলদের নিকট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সর্বদাই একটি মারাত্মক সমস্যা ছিলো। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী আফগান উপজাতীয়রা মোগল সম্রাটের নিকট বিপদের কারণস্বরূপ ছিলো। সম্রাট আকবরকেও এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। কৌশলে তাদের প্রভাবাধীনে নিয়ে আসলেও তাদেরকে তিনি শান্ত করতে পারেননি। কিছুদিনের জন্য তারা চুপ করেছিলো। গৃহযুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীয় শক্তি দূর্বল হয়ে পড়লে তারা পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণের পর পার্বত্য অধিবাসীসের অর্থদান করে বশীভূত করতে চেষ্টা করা হলে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো।

১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইউসুফজাই সম্প্রদায় তাদের নেতা ভাগুর অধীনে বিদ্রোহ শুরু করে দিলো। সিন্ধু অতিক্রম করে তারা মোগলদের অনেক ভূ-ভাগ অধিকার করলো। সুতরাং আওরঙ্গজেব তিনটি সৈন্যবাহিনীকে শত্রুদের প্রবলভাবে আক্রমণ করার জন্য আদেশ দিলেন। সিন্ধুর দক্ষিণ তীরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হয় এবং বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়ে সম্রাটের ভূ-ভাগ ত্যাগ করে চলে যায়। বিভিন্ন স্থানে মোগল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হলো এবং তারা উপজাতীয় এলাকা আয়ত্তে নিয়ে আসলো। আফগানদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য রাজা যশোবন্ত সিংহকে জামরুদে নিযুক্ত করা হলো।[৩১৯]

১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পুনরায় শান্তি ব্যাহত হতে শুরু করলো। আফ্রিদীরা তাদের সর্দার আজমল খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ আরম্ভ করে। আজমল খান 'রাজা' উপাধী ধারণ করে পাঠানদের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য আদশে দিয়েছিলেন। তাঁকে দমন করার জন্য মুহাম্মদ আমীন খানকে প্রেরণ করা হলে ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে আলী মসজিদের নিকট যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন। এতে প্রচুর লোক ও অর্থক্ষয় হয়েছিলো। কয়েক হাজার মোগল সৈন্য যুদ্ধে নিহত হলো

---

৩১৮. Mohammad Noman, *Muslim India*, op. cit., p. 732.
৩১৯. S.R. Sharma, *Mughal Govt. and Adminstration*, op. cit., p. 261

Dhaka University Institutional Repository

এবং বহুসংখ্যক ধৃত হয়ে ক্রীতদাস হিসেবে মধ্য-এশিয়ায় বিক্রির জন্য প্রেরিত হলো। এতে আজমল খানে সম্মান আরও বেড়ে গেল। কান্দাহার হতে আটক সমগ্র পাঠান এলাকা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে দিলো। খাটক উপজাতির বিদ্রোহের ফলে এ বিপদ আরও ঘনীভূত হলো। খাটক সর্দার খুসআল খান আজমল খানের সাথে যোগদান করে মোগলদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক করে তুললো। তাদের প্রতিরোধের জন্য সম্রাট প্রথমে মহব্বত খানকে পাঠালেন; কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। অতঃপর যশোবন্ত সিংহের সাথে সুজাত খানকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠালে তিনিও ব্যর্থ হন।

উপর্যুপরি পরাজয়ের পর এবার আওরঙ্গজেব নিজেই সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি পেশোয়ারের নিকট হাসান আদলে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে তিনি সাড়ে তিন বছর অবস্থান করেন। তিনি পুরস্কার, ভাতা, জায়গীর ও মোগল সৈন্যবাহিনীতে চাকরি দান করে অনেক উপজাতিকে বশীভূত করলেন। কাজেই বলা যায়, আওরঙ্গযেজব উপঢৌকন দান ও পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে প্ররোচিত করার নীতি গ্রহণ করে আফগান বিদ্রোহ দমন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোগলদের সম্মান ও প্রতিপত্তি রক্ষা করেছিলেন। ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে পরিস্থিতির উন্নতি হলো এবং ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট সুস্থ্য মনে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। আমীর খান কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। তিনি সেখানে এক কৌশলপূর্ণ মিলনাত্মক নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে আফগানগণ সম্রাটকে আর বিরক্ত করতে পারেনি।[৩২০]

সীমান্ত যুদ্ধে মোগলগণ মোটামুটি এক সার্থক পর্যায়ে উপনীত হয়। কিন্তু এতে সাম্রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছিলো। অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়া রাজনৈতিক অবস্থাও গুরুতর হয়ে পড়েছিলো। ঐতিহাসিক স্যার জে,এন, সরকার বলেন-

> "এ যুদ্ধের ফলে যোদ্ধা জাতি আফগানদেরকে রাজপুতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত মরুপ্রদেশ রাজপুতনার যুদ্ধে তারা অধিকতর নৈপুণ্য দেখাতে পারতো।"[৩২১]

---

৩২০. Tara Chand, *Influence of Islam on Indian Culture*, op. cit. p. 419.
৩২১. J. N. Sarkar, *Mughal Administration*, op. cit., p.736.

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে অধিকাংশ মোগল সৈন্য প্রেরিত হওয়ায় মারাটা ও রাজপুতদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ঘটলো। কাজেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধের পরিণাম মোগলদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি ও হিন্দু সম্প্রদায়ঃ

ধর্মীয় ক্ষেত্রে মোগল ভারতের সকল সম্রাট অপেক্ষা আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে অধিক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি জোরপুর্বক 'দার-উল-হারব' কে (অমুসলিমদের আবাসভূমি) 'দার-উল-ইসলাম' এ (ইসলামের আবাসভূমি) পরিণত করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে (১) হিন্দু মন্দির ও টোল ধ্বংস, (২) হিন্দু কর্মচারীদের পদচ্যুতি ও (৩) হিন্দুদের উপর জিযিয়া করের পুণঃপ্রবর্তন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।[৩২২] এ অভিযোগগুলো ব্যাখ্যা করলে এর সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধে বোঝা যাবে।

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন এবং তিনি ইসলামের আইনের বিরুদ্ধে কখনও কোনো কাজ করতেন না। পবিত্র কুরআনে আছে, "ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি নেই।" বারাণসীর শাসনকর্তার নিকট তিনি যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন তা হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর 'ওয়াকা-ই-আলমগীরী' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন-

"যেহেতু প্রজাদের উপকার সাধন এবং উচ্চ অথবা নিম্ন সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন আমাদের দৃঢ় উদ্দেশ্য, সেহেতু আমাদের পবিত্র আইন অনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে; পুরাতন মন্দিরগুলো বিনষ্ট করা হবে না। কিন্তু নতুন কোনো কিছুর সৃষ্টি করাও চলবে না।....... কোনো লোক অন্যায়ভাবে ব্রাহ্মণ অথবা সেখানকার হিন্দু অধিবাসীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা তাদের উপর কোনো হামলা করতে পারবে না। তারা পূর্বের ন্যায় স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত থাকতে পারে, অথবা আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের জন্য সুস্থ্য মনে প্রার্থনা করতে পারে।"[৩২৩]

---

৩২২. W. Haig, *Cambridge History of India*, Vol-vi. op. cit., p. 873.

৩২৩. Abdul Aziz, *Mansabdari System and the Mughal*, op. cit., p. 517.

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ফরমানের মধ্যেও সম্রাট আওরঙ্গজেবের সহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ভারতবর্ষ পরিদর্শন করতে আসলে তিনি সম্রাটের সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন-

" Every one is free to serve and Worship God is his own way."

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কার্য এবং স্রষ্টার উপাসনা করছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি ছিলো না। যে যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারতো। আসল কথা এই যে, মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর যে সব মন্দির নির্মিত হয়েছিলো এবং যেগুলো রাজদ্রোহ ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিলো, কেবল যে মন্দিরগুলো ধ্বংস করতে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন। কাজেই একথা সত্য যে, ধর্মীয় কারণে বা উৎপীড়ন করার জন্য তিনি কোনো মন্দির ধ্বংস করতে আদেশ দেননি।[৩২৪]

'মা-আসির-ই-আলমগীর' গ্রন্থে তাঁর বিরুদ্ধে অন্য এক অভিযোগে বলা হয়েছে যে, সম্রাট প্রাদেশিক সমস্ত শাসনকর্তদেরকে অবিশ্বাসীদের (অমুসলিমদের) বিদ্যালয় ধ্বংস এবং সর্বপ্রকার শিক্ষা, ধর্মীয় আচার পালনে বাধা প্রদান করতে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ গ্রন্থের রচয়িতা মুস্ত ামিদ খানের এসব মন্তব্য সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ সমর্থণ করেননি। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রতি এ ধরণের কোনো আদেশ সম্রাট দেননি।[৩২৫]

হিন্দু কর্মচারীদের বরখাস্ত করার অভিযোগ ও সত্য নয়। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ হিন্দু কেরানী, দেওয়ান ও রাজস্ব আদায়কারীকে শাসন বিভাগের নিরাপত্তার জন্য বরখাস্ত করা হয় এবং তাদের পদের মুসলমানদের নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে অন্য এক ফরমানে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেক সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান কর্মচারী থাকবে। এর ফলে একজন অন্যজনকে অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করতে পারতো।[৩২৬]

৩২৪. J.N. Sarkar, *Histroy of Aurangzeb*, Vol-v, op. cit., p. 834.
৩২৫. Ibid, p. 836.
৩২৬. Ibid, p. 838.

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগে বহু হিন্দু নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলো। রাজা যশোবন্ত সিংহ মোগলদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান করলেও এবং গৃহযুদ্ধের সময় সম্রাটের বিরুদ্ধে থাকলেও তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করে সম্রাট রাজপুতদের সাথে মিলনাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। চরম বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সম্রাট কেবল যশোবন্ত সিংহকে ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে সম্মান ও প্রদর্শন করেছিলেন। অনেক রাজপুত রাজা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ও আওরঙ্গজেবের পক্ষে সৈনিক ও সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আওরঙ্গজেব হিন্দুদের বৈরী ছিলেন এবং হিন্দু কর্মচারীদের বিনা অপরাধে পদচ্যুত করেছিলেন, এ কথা চিন্তাও করা যায় না।[৩২৭]

সামরিক কার্যের পরিবর্তে অমুসলিমদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছিলো। মুসলিম শাসনাধীনে তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষণ করার জন্য এ কর ধার্য করা হয়। সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী স্বাধীন ধর্মাচরণের উপর এ কর ধার্য করা হয়নি। আকবর এ কর উঠিয়ে দিলেন এবং তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক শ্রেণীকে সামরিক কার্যেও নিযুক্ত করেছিলেন।[৩২৮]

অমুসলিমদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামরিক কার্যে নিযুক্ত করার ব্যাপারকে আওরঙ্গজেব আইনসম্মত মনে করেননি এবং এজন্য তিনি জিযিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ব্যক্তি, স্ত্রীলোক, নাবালক ও বৃদ্ধ প্রভৃতিকে এ কর দিতে হতো না। হিন্দুদের উপর ধার্য অনেক কর ছাড়াও আশি রকম কর উঠিয়ে নেয়ার ফলে রাষ্ট্রের অর্থভান্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তথাপি হিন্দুরা অনুগত না হয়ে শত্রুভাবাপন্না হয়ে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সতের বছর পরে এ কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। কাজেই একথা পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় যে, সম্রাট কোনো ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বশবর্তী হননি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই তিনি জিযিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন।[৩২৯]

---

৩২৭. Edwards and Garret, *Mughal Rule in India*, op. cit., p. 437.
৩২৮. J.N. Sarkar, *Mughal Adminstration*, op. cit., p.791.
৩২৯. Ibid, p. 793.

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদের বিরোধিতার কারণঃ

একথা সত্য যে, আওরঙ্গজেব ধর্মীয় ক্ষেত্রে আকবর ও দারার ন্যায় সহিষ্ণু ছিলেন না। আকবর ও দারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় গোপন রাখতেন; এমনকি শাসিতদের ধর্মকে নানাভাবে উৎসাহ দান করতেন। আকবরের সময় হতে ইসলাম ধর্মের দৃঢ় বন্ধন সম্রাটের উদারনীতির ফলে অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছিলো। আওরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তাঁর সারল্যও ধর্মীয় মনোভাবের জন্য তিনি ভারতীয় মুসলমানদের নিকট 'জিন্দাপীর' উপাধি লাভ করেছিলেন। অন্যদের বিশেষ বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন না করে তিনি ইসলামের হৃত গৌরব পুণরুদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁকে যারা হিন্দুধর্মের উৎপীড়ক মনে করতেন, তারাই তাঁর বিরোধীতা করেছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হতে রাজপুতদের অধীন হিন্দুগণ নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মোগল শাসকগণ রাজনৈতিক কারণে ভারতের পুরাতন মুসলিম অধিবাসীদের উপর নির্ভর করতে পারেন নি। তাই তারা রাজপুতদেরকে সাম্রাজ্যের নানা বিভাগে নিযুক্ত করেছিলেন। মোগলদের, বিশেষতঃ আকবরের হিন্দুতোষণ নীতির ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের মনে মুসলমানদের বিতাড়িত করে সাম্রাজ্যে প্রভূত্ব অর্জন করার বাসনা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিলো।[৩৩০]

দারার মধ্যে হিন্দুরা তাদের আশা পূরণের অনেক সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলো। তাই তাঁর পরাজয়ে হিন্দুরা খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলো। আওরঙ্গজেবের সময়ে এ সমস্যা বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে। এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামিই হিন্দুদের পুণর্জাগরণ আন্দোলনের বিশেষ কারণ। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেব না থাকলেও হিন্দুদের মধ্যে জাগরণ দেখা দিতো। আওরঙ্গজেবের শাসনদন্ড বাত্যাবিক্ষুব্ধ জাহাজের নাবিকের কার্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। একথা সত্য নয় যে, তিনিই ঝড়ের কারণ ছিলেন। তিনি শুধু সাহসের উপর

---

৩৩০. Ray Chowdhury, *An Advanced History of India*, op. cit., p. 297.

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভর করে এ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি বিপদ এড়াতে গিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে এ বিপদের ফলে সাম্রাজ্য ধ্বংস হতো।[৩৩১]

ধর্মীয় নীতির প্রতিক্রিয়াঃ

কোনো কোনো পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকের মতে, আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

জাঠ বিদ্রোহঃ

১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মথুরাবাসী জাঠগণ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অনেক ঐতিহাসিকের মতানুসারে হিন্দুদের প্রতি আওরঙ্গজেবের অসহিষ্ণুতাই এ বিদ্রোহের কারণ; কিন্তু এ কথা সত্য নয়। হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক দারার পরাজয় ও মৃত্যুতে হিন্দুদের আশা নষ্ট হয়ে যায়। উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় হতে হিন্দুরা বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে আসছিলো।

আওরঙ্গজেব সৈয়দ আব্দুল নবী নামে মাথুরায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে আব্দুন নবী শহরের মাঝখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এতে মথুরা অঞ্চলের জাঠদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তারা গোকুল জাঠের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মথুরার ফৌজদারকে হত্যা করে সাদাবাদ পরগণা লুটপাট করে।[৩৩২] এ বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং গোকুলকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। কিন্তু ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় গোলযোগ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন রাজারাম। সিকান্দারবাদে আকবরের কবরস্থান লুণ্ঠন ও অপবিত্র করা হয়। রাজারাম পরাজিত ও নিহত হন। আওরঙ্গজেবের শেষ সময় পর্যন্ত চরামানের নেতৃত্বে জাঠগণ বিদ্রোহ করতে থাকে।[৩৩৩]

---

৩৩১. Ishwari Topa, *History of Bengal*, vol-iii, Rama Krishna Prokashoni, Delhi, India: 1958, p. 453.
৩৩২. Sinha and Banerjee, *Medieval India*, Jay- Durga Library, Calcutta: 1989, p. 382.
৩৩৩. Ibid, p. 385.

Dhaka University Institutional Repository

বান্দেলা বিদ্রোহঃ

অন্য এক বিদ্রোহ মারাত্মক আকার ধারণ করে মোগল সাম্রাজ্যকে বিপদাপন্ন করে তোলে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমভাগে বাঙ্গেলা সর্দার চপ্‌পত রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোগলদের হাতে বন্দী হবার ভয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর পুত্র ছত্রশাল রায় সম্রাটের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে তিনি আনুগত্যের সাথে কাজ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বিদ্রোহী হয়ে অসন্তুষ্ট হিন্দু দলের সাথে যোগদান করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি সম্রাট বাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি মালবে একটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩৩৪]

সাতনমি বিদ্রোহঃ

১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পাতিয়ালা ও আলোয়ারের সাতনমিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাদে মধ্যে অধিকাংশ ছিলো কৃষক ও ব্যবসায়ী। একজন মোগল পদাতিক সৈন্য কর্তৃক জনৈক সাতনমি কৃষকের হত্যাই এ বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিলো। কিন্তু সম্রাট বাহিনী শ্রীঘ্রই তাদের পরাজিত করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।[৩৩৫]

শিখ বিদ্রোহঃ

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে শিখগণ বিদ্রোহী হয়ে মোগলদের অশান্তি বৃদ্ধি করেছিলো। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিখদের পরম গুরু ভেজবাহাদুর মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সম্রাটের অসহিষ্ণুতাই এ বিদ্রোহের কারণ বলে ধরা হয়। ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে গুরু ভেজবাহাদুরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ভেজবাহাদুরের পুত্র গুরুগোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখগণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তিনি ছিলেন শিখদের সর্বশেষ গুরু। তিনি শিখদের এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলেন এবং এ সেনাবাহিনীকে পৃথক জীবন-শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি সংগঠিত করেন। গুরু গোবিন্দ বীরোচিত যুদ্ধ করেও পরাস্ত হন এবং তাঁর দুই পুত্রকে ও মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।[৩৩৬] সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবিতকাল পর্যন্ত গুরু গোবিন্দের চেষ্টা সফল হতে পারেনি।

---

৩৩৪. S.R. Sharma, *Mughal Govt. and Administration*, op. cit., p. 76.
৩৩৫. Mohammad Noman, *Muslim India*, op. cit., p. 462.
৩৩৬. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

রাজপুতদের প্রতি আওরঙ্গজেবের নীতিঃ

রাজপুতদের প্রতি আওরঙ্গজেবের নীতি এখনও সমালোচনার বিষয় হয়ে রয়েছে এবং এখনও তা মুসলমান ও অমুসলমান প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মনে আন্দোলন সৃষ্টি করে আসছে। সম্রাটের রাজপুত নীতি ব্যাখ্যা করার জন্য স্যার যদুনাথ সরকার তিনটি প্রধান বিষয় বেছে নিয়েছেন। প্রথমতঃ বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্য মোগল সাম্রাজ্যের সাথে মারওয়াড় রাজ্যের অন্ত র্ভূক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। কারণ দিল্লী হতে আহমদাবাদ পর্যন্ত ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও সহজ একটি পথের প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া কর্মব্যস্ত বন্দর 'কামবে' এ পথের মধ্যে অবস্থিত ছিলো।

দ্বিতীয়তঃ সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজপুতনাকে দু'টি অসমভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন। মারওয়াড় অধিকার করতে না পারলে তা সম্ভবপর ছিলো না। তৃতীয়তঃ জোরপূর্বক হিন্দুদেরকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য মারওয়াড়কে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো।[৩৩৭]

আমরা এখন স্যার যদুনাথের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে রাজপুত যুদ্ধের জন্য আওরঙ্গজেব কতোটুকু দায়ী, তা বিচার করে দেখবো। একথা ঠিক নয় যে, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে আওরঙ্গজেব মারওয়াড়কে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছিলেন। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহানের রাজত্বকালে বাণিজ্যিক প্রয়োজন বেশী থাকলেও এ বাণিজ্য পথ রক্ষা করার জন্য তাঁরা মারওয়াড় জয় করার কোনো চেষ্টাই করেননি। রাজত্বের বিশ বছর পর্যন্ত বাণিজ্যপথ মুক্ত রেখে আওরঙ্গজেব কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হননি। কাজেই আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তিনি বাণিজ্যপথ রক্ষা করার জন্য মারওয়াড়কে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নিতে সচেষ্ট হলেন। সম্রাটের এরূপ ইচ্ছা থাকলেও যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার অজুহাতে তিনি তা পূর্ণ করতে পারতেন; কাজেই রাজপুতদের সাথে যুদ্ধের জন্য সম্রাটকে এভাবে দায়ী করা যায় না।[৩৩৮]

[৩৩৭]. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, op. cit., p. 912.
[৩৩৮]. Ibid, p. 914.

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট মারওয়ার অধিকার করে রাজপুতনাকে দু'টি অসমভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন বলে স্যার যদুনাথ সরকার অভিযোগ করেছেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব রাজপুতনার রাজ্যগুলো অধিকার করার ইচ্ছা কখনোই পোষণ করেননি; কারণ এগুলো মোগলদের অধীনেই ছিলো। এসব রাজ্যের রাজ্যগণ সম্রাটের অনুগত ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আকবরের সময় রাজপুত রাজাগণ প্রভূত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্যে তাঁরা উচ্চপদ ও ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব এ নীতির কোনো ব্যতিক্রম করেননি। আওরঙ্গজেব যে এ নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক দুঃখ ভোগ করেছিলেন, তা অনেক যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। আমৃত্যু যশোবন্ত সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর প্রতি সম্রাটের ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার এবং রাজপুতগণ যে শেষ পর্যন্ত সম্রাটের অধীনে রাষ্ট্রের সেবা করেচিলেন তা হতে প্রমাণ করা যায় যে, সম্রাট তাঁর পূর্বপুরুষ আকবরের মিলনাত্মক নীতিকে বরাবর অনুসরণ করেছিলেন।[৩৩৯] কাজেই রাজপুতনাকে বিভক্ত করার জন্য মারওয়াড় অধিকার করার কারণকে রাজপুত যুদ্ধের কারণ বলে ধরা যায় না।

হিন্দুদেরকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য সম্রাটের বিরুদ্ধে স্যার যদুনাথ সরকার যে অভিযোগ আনয়ন করেছেন তাও সত্য নয়। রাজা যশোবন্ত সিংহের রাজ্য সকল সময়ই মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলো (এমনকি শক্তিশালী যশোবন্ত সিংহের আমলেও) এবং একজন ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার পক্ষে এটি ছাড়া অন্য কিছু সম্ভব ছিলো না। এটি সত্যিই বড় অদ্ভূত যে, সম্রাট যশোবন্ত সিংহ অপেক্ষা তাঁর পুত্রকেই হিন্দু দমন নীতির পক্ষে এক বিরাট বাধা হিসেবে মনে করতেন। তাহলে যশোবন্ত সিংহকে হিন্দুদের সর্বজন স্বীকৃত নেতা ও নিপীড়িত হিন্দুদের রক্ষাকর্তা হিসেবে জানিয়েও সম্রাট কেন তাঁকে নিশ্চিতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন?

কেবল একবার বা দু'বার নয়, সারা জীবন যশোবন্ত সিংহ মোগল সম্রাটের বিরোধিতা করেছিলেন। তথাপি তাঁকে বিশ্বাস করে উচ্চপদ দান করে হয়েছিলো এবং সাম্রাজ্যের বহিঃসীমান্তে সম্রাটের ক্ষতি করতে পারেন জেনেও সম্রাট তাঁকে সে স্থানে সেনাপতির পদ দান করেছিলেন। একথা বলা অসঙ্গত হবে যে, সম্রাট যশোবন্ত সিংহকে ভয় করতেন এবং ততোধিক অন্যায় হবে যদি মধ্য ও আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকদের সাথে একই সুরে বলা হয় যে, আওরঙ্গজেব শক্তিশালী

---

৩৩৯. V.A. Smith, *Oxford History of India*, op. cit., p. 1421.

Dhaka University Institutional Repository

যশোবন্ত সিংহের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁকে তিনি তাঁর নীতির বিরোধী এক 'সম্ভাব্য সুদক্ষ নেতা' মনে করে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।[৩৪০] যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পরও অনেক শক্তিশালী রাজপুত রাজা ছিলেন এবং তাঁরা হয়তো নিপীড়িত হিন্দুদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারতেন। 'সম্ভাব্য সুদক্ষ নেতার' অপসারণ করা সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিলো না। কাজেই এ যুক্তি যে সঙ্গত নয়, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৩৪১]

ঘটনাবলীঃ

রাজপুতদের সাথে আওরঙ্গজেবের সংঘর্ষ বা যুদ্ধের কারণ ছিলো অন্যরূপ। রাজপুতরা ভারতের ইতিহাসে শৌর্য-বীর্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। তারা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে অত্যন্ত তৎপর ছিলো। সৎনামী বিদ্রোহের সময়ে তাদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ এর প্রমাণ। মোগলরা যখন অন্যত্র ব্যস্ত, তখন তারা তাদের পেছন হতে আঘাত করার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, সমগ্র আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালই এমন ঘটনায় পরিপূর্ণ।

রাজপুতনায় অবিরাম গোলমাল চলতে থাকে এবং ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। এ সময়ে আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত খাইবার গিরিপথে জমরুদ দূর্গের ফৌজদার রাজা যশোবন্ত সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। এ অবস্থা আরও চরমে ওঠে যখন রাজা যশোবন্ত সিংহের দুই বিধবা স্ত্রী জমরুদ হতে লাহোর এসে পৌছেন এবং সেখানে দুই বিধবা রাণীর দু'টি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তন্মধ্যে একজনের পুত্র মারা যায় এবং অন্য জনের পুত্র বেঁচে থাকে।[৩৪২]

সম্রাট আওরঙ্গজেব জীবিত পুত্র অজিত সিংহকে রাজ-দরবারে হাজির করে তাঁর পক্ষে উত্তরাধিকার লাভের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু তাদের রাজ-দরবারে হাজির হতে দেরী হওয়াতে সম্রাট শূণ্য আসনের জন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিন মাস অপেক্ষা করার পর সম্রাট মারওয়াড়ের স্বার্থরক্ষা এবং রাজদায়িত্ব পালনে কৃতিত্বের কথা বিবেচনা করে ইন্দ্রসিংহ নামে যশোবন্ত সিংহের এক আত্মীয়কে মারওয়াড়ের রাজা হিসেবে যোধপুরের সিংহাসনে বসা (২৬

---

৩৪০. Ishwari Topa, *History of Aurangzeb*, vol-iv, Noborag Prokashoni, Calcutta, India: 1967, p. 914.
৩৪১. Ibid, p. 920.
৩৪২. J.N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, op. cit., p. 316.

Dhaka University Institutional Repository

মে, ১৬৭৯ খ্রিঃ)। এতে প্রমাণিত হয় যে, আওরঙ্গজেবের মারওয়াড় অধিকার করার কোনো ইচ্ছাই মূলতঃ ছিলো না।[৩৪৩]

রাজা যশোবন্ত সিংহের পরিবার ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের শেষের দিকে দিল্লীতে পৌছেন এবং সম্রাটের সামনে যুবরাজের দাবি পেশ করেন। যুবরাজের দাবির যথার্থতা প্রমাণের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব যুবরাজকে পুণরায় দরবারে হাজির করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কথা ছিলো যদি যুবরাজের দাবি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তাঁকে সিংহাসনে বসানো হবে। অতএব, আওরঙ্গজেবের সদিচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। একমাত্র পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকগণই তাঁর কার্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে- আওরঙ্গজেব যুবরাজকে তাঁর হেরেমে প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার এ মন্তব্য ঠিক নয়। তিনি শুধু তাঁকে রাজ দরবারে আনার জন্য বলেছিলেন।[৩৪৪]

যুবরাজের স্বঘোষিত অভিভাবক দূর্গাদাস অন্যরূপ চিন্তা করলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের সতর্কতামূলক নীতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে সম্রাটের আদেশ অমান্য করার এবং মারওয়াড়ে গিয়ে যুবরাজ অজিত সিংহকে সিংহাসনে বসাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আওরঙ্গজেব এটি জানতে পেরে দূর্গাদাস ও রাণীদ্বয়কে নূরগড় দূর্গে বন্দী করে রাখার আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজপুত বীর দূর্গাদাস ও রাণীদ্বয় রাজকীয় বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে দিল্লী হতে পলায়ন করতে সমর্থ হলেন। এটি ছিলো রাজপুত যুদ্ধের প্রথম সূচনা। কাজেইরাজপুত যুদ্ধের জন্য দূর্গাদাসই দায়ী আওরঙ্গজেব নন।

রাজপুতরাই সম্রাট আওরঙ্গজেবের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলো। সুতরাং সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মোগল সম্রাটের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। তিনি যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করে যুদ্ধ এড়াবার জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু দূর্গাদাস সেদিকে দৃষ্টি দিলেন না। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে মারওয়াড়ের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালেন এবং স্বয়ং আজমীরে উপস্থিত হয়ে সেখান হতে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধে রাজপুত বাহিনী মোগলদের হাতে পরাজিত হলো এবং মারওয়াড় মোগলদের অধিকারে আসলো।[৩৪৫]

---

৩৪৩. Aga Mehdi Hussain, *Rise and Fall of the Mughal Empire*, Civil Steam Press, Lahore, Pakistan: 1978, p. 613.
৩৪৪. Tara Chand, *Influence of Islam on Indian Culture*, op. cit., p. 472.
৩৪৫. Ibid, p. 473.

Dhaka University Institutional Repository

যুবরাজ অজিত সিংহের পক্ষে রাজপুতদের একত্রিত হতে দেখে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর দাবির যথার্থতা উপলদ্ধি করে মারওয়াড়ের সিংহাসন হতে ইন্দ্র সিংহকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কিন্তু সম্রাটের এ ব্যবস্থায় কোনো সাড়া পাওয়া গেল না এবং যুদ্ধ চলতে লাগলো। রাণী তাঁর আত্মীয় রাজা রাজসিংহের নিকট সাহায্যের আবেদন জানালেন। রাজা রাজসিংহ এ আহবানে সাড়া দিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো (নভেম্বর, ১৬৭৯ খ্রিঃ) এবং এ যুদ্ধ ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চললো। দূর্গাদাস ও রাজসিংহের সম্মিলিত বাহিনী মোগলদের নিকট পরাজিত হলো।[৩৪৬]

মোগলরা উদয়পুর ও চিতোর অধিকার করলো। আওরঙ্গজেব স্বীয় পুত্র আকবরকে চিতোরের দায়িত্বে রেখে আজমীরে চলে গেলেন। এ সময় রাজপুতরা যুবরাজ আকবরের উপর তীব্র আঘাত হানলো। আওরঙ্গজেব আকবরের পরাজয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মেবার হতে মারওয়াড়ে স্থানান্তরিত করলেন এবং সে স্থলে যুবরাজ আজমকে নিযুক্ত করলেন। এতে যুবরাজ আকবর অপমানবোধ করে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং রাজপুতদের সাথে যোগ দিলেন। যা হোক, আকবরের বিদ্রোহ দমন করা হলো। আওরঙ্গজেব কূটকৌশলে আকবরের সাথে রাজপুতদের মিত্রতাও বিনষ্ট করলেন।[৩৪৭]

মারওয়াড়ের সাথে যুদ্ধ চলতে লাগলো। অবশেষে রাজপুত নেতারা বুঝলেন যে, যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই। এ যুদ্ধে জান-মালের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিলো। তাই ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ অজিত সিংহ সম্রাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আওরঙ্গজেব ক্ষমা মঞ্জুর করে অজিত সিংহকে 'মনসব' দান করলেন। যে দূর্গাদাস এতোদিন তাঁকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে তিনি ক্ষমা করে গুজরাটের ফৌজদার নিযুক্ত করলেন; কিন্তু তাঁরা এ বিশ্বাসের মর্যাদা না দিয়ে আবার বিদ্রোহী হলেন (১৭০১ খ্রিঃ)। সম্রাট আওরঙ্গজেব পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন এবং সম্রাট আবার ও তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়; কিন্তু তখন ও রাজপুত যুদ্ধ চলছিলো।[৩৪৮]

---

৩৪৬. A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, op. cit., p. 193.
৩৪৭. M.A. Rahim, *Social and Political History of Bengal*, op. cit., p. 322.
৩৪৮. S.M. Jaffar, *The Mughal Empire*, op. cit., p. 279.

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এটি সুস্পষ্ট যে, রাজপুত যুদ্ধ এবং এর অপরিমিত ক্ষতির জন্য দূর্গাদাস, যুবরাজ অজিত সিংহ ও রানা রাজসিংহ দায়ী ও দোষী। সম্রাট আওরঙ্গজেব এর জন্যদায়ী নন; কিন্তু তিনি ঐতিহাসিকদের মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়েছেন।

মারাঠাদের উত্থানঃ

মারাঠাদের উত্থান সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মারাঠাদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেব প্রায় পঁচিশ বছর যুদ্ধ করেন। আওরঙ্গজেবের মারাঠা নীতিই শেষ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা মারাঠা নামে পরিচিত। এ অঞ্চল দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। নাসিক, পুনা, সাতারা, সোলাপুর, আহমদনগর ও কঙ্কনের কিছু অংশ নিয়ে এ রাষ্ট্র গঠিত ছিলো। এখানকার ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উত্তর-ভারত অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিলো। নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত এ দুর্গম অঞ্চলের জনগণ ছিলো দূর্ধর্ষ রণপ্রিয়। গেরিলা পদ্ধতিতে তাঁরা ছিলো অত্যন্ত নিপুণ।[৩৪৯]

মুসলমান সুলতানগণ কর্তৃক দাক্ষিণাত্যে বিজিত হলে মারাঠারা তাদের অধীনে প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে মুসলিম রাজ্যগুলোর দূর্বলতার সুযোগে মারাঠারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের সুযোগ খুঁজতে থাকে। এ দলে শিবাজীর পিতা শাহ্জী ভোঁসলাও ছিলেন। আহমদনগর রাজ্যে তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মালিক অম্বরের ন্যায় তিনিও দাক্ষিণাত্যে মোগল আধিপত্য বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোগলদের হাতে আহমদনগরের পতনের পর (১৫৩৫ খ্রিঃ) তিনি বিজাপুরে চাকরি গ্রহণ করেন। সুলতান তাঁকে কর্নাটের জায়গীর প্রদান করেছিলেন। ইতোমধ্যে মারাঠাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধ জাগ্রত হতে থাকে; পরবর্তী পর্যায়ে মারাঠাদের ইতিহাসে শিবাজীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে মারাঠাদেরকে ঐক্যবদ্ধ একটি জাতিতে পরিণত করেন।[৩৫০]

---

৩৪৯. J.N. Sarkar, *An Advanced History of India*, op. cit., p. 914.
৩৫০. Ibid, p. 917.

Dhaka University Institutional Repository

১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী শিবনার দূর্গে জন্মগ্রহণ করেন। শিবাজীর মাতার নাম জিজাবাঈ। শিবাজীর পিতা শাহ্জী ভোঁসলা অপর একজন যুবতী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি পুত্র শিবাজী ও পত্নী জিজাবাঈয়ের প্রতি সদয় ছিলেন না। মাতা ও পুত্র উভয়েই দাদাজী কোন্দদের নামে জনৈক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে বাস করতেন। জিজাবাঈ ছিলেন গুণবতী ও ধর্মপরায়ণ। শিবাজী তাঁর মাতা ও ধর্মগুরুর প্রভাবে গোঁড়া হিন্দুধর্মের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হন। তিনি লেখা পড়ার তেমন সুযোগ পাননি; তবে মায়ের কাছে হিন্দু বীরদের গল্প কাহিনী শুনে অল্প বয়সেই তাঁর মনে বীর হবার বাসনা জাগ্রত হয়। গুরু রামদাস তাঁকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। তাঁর কাছে তিনি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করেন।[৩৫১]

শিবাজী তাঁর দুঃসাহসিকার জন্য খ্যাত ছিলেন। লুট-তরাজের মধ্য দিয়ে শিবাজীর সামরিক জীবনের সূচনা হয়। শীঘ্রই অনেকে তাঁর দলভূক্ত হয়। মাওয়ালী নামক পার্বত্য জাতির লোকজন নিয়ে তিনি একটি দূর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন। মারাঠাদের অনেকে তাঁর দলে যোগ দিয়েছিলো। এ সময় বিজাপুর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজ করছিলো। শিবাজী এ পরিস্থিতির সুযোগে এ রাজ্যে হানা দিতে শুরু করেন। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিজাপুরের 'তারানা' নামক পার্বত্য দূর্গ অধিকার করেন। তিনি রায়গড় দূর্গও অধিকার করেছিলেন। পরে তিনি চাকান, বরবতী, ইন্দ্রপুর, সিনগড়, কোন্দনা ও পুরন্দর দখল করেন।[৩৫২]

শিবাজী কল্যাণ ও কঙ্কন অধিকারেরও আয়োজন করেন। তাঁর কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে বিজাপুরের সুলতান তাঁর পিতাকে বন্দী করেন। এ ঘটনায় শিবাজী মর্মাহত হলেও দমলেন না। তিনি দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্তা শাহ্জাদা মুরাদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। এতে বিজাপুরের সুলতান বিচলিত হন এবং তিনি শাহ্জীকে মুক্তি দেন। কিছুদিন শিবাজী তাঁর লুট-তরাজ বন্ধ রাখেন। তবে গোপনে তিনি অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন।

১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী জাওয়ালী দূর্গ অধিকার করেন। আওরঙ্গজেব যখন বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, শিবাজী তখন মোগলদের দক্ষিণ-পশ্চিম ভূ-ভাগ দখল করেন।

---

৩৫১. Ibid, p. 919.

৩৫২. S.M. Akram, *History of Muslim civilzation in India*, Maulana Azad Library, Aligarh, India: 1967, p. 31.

Dhaka University Institutional Repository

দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হিসেবে আওরঙ্গজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলে তিনি পরাজিত হন। কিন্তু শিবাজীকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা সম্ভব হয়নি। এদিকে সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থ্যতার সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করে আগ্রায় পৌঁছেন। আগ্রায় তখন সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ চলছিলো।[৩৫৩] ফলে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানে বাধা পড়লো। সুযোগ বুঝে শিবাজী দক্ষিণ কঙ্কন অধিকার করলেন (১৬৫৯ খ্রিঃ)।

আওরঙ্গজেব ইতোপূর্বে পিতার নির্দেশে বিজাপুরের সুলতানের সাথে সন্ধি করেছিলেন। বিজাপুরের সুলতান এবার শিবাজীর দিকে নজর দিলেন। সেনাপতি আফজাল খানের নেতৃত্বে একটি মোগল বাহিনী শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। আফজাল খান শিবাজীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে পূর্বে তাঁকে ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেন।[৩৫৪] বিশ্বাসঘাত শিবাজী তাঁর উপদেশ মানতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং বিস্তারিত আলোচনায় সম্মত হন। প্রস্তাবানুসারে শিবাজী বিজাপুরের সেনাপতির সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁকে হত্যা করেন (১৬৬০ খ্রিঃ)। মারাঠা ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে, আফজাল খানই ছিলেন এ ঘটনার মূল নায়ক; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর শিবাজীকে হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং তিনি নিজেই নিহত হন। ঐতিহাসিক কাফী খানের মতে, সেনাপতি আফজাল খান এ সময় নিরস্ত্র ছিলেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ও কাফী খানের সাথে একমত। শিবাজীই ছিলেন এ হত্যাকান্ডের নায়ক; তাঁর অতীত কার্যকলাপ এ কথার সত্যতাই প্রমাণ করে।[৩৫৫]

আওরঙ্গজেব ও শিবাজীঃ

শিবাজী এতোদিন পর্যন্ত বিজাপুরের রাজ্য আক্রমণ করে সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর তিনি মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সিংহাসন অধিকার করে আওরঙ্গজেব তাঁর মাতুল ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা শায়েস্তা খানকে মারাঠা নেতা শিবাজীকে দমন করতে পাঠালেন। শিবাজী পরাজিত হন এবং চাকান দূর্গ অধিকৃত হয়।

৩৫৩. Ibn Hasan, *The central structure of the Mughal Empire*, op. cit., p. 491.
৩৫৪. Ibid, p. 495.
৩৫৫. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, op. cit., p. 811.

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর মোগল সেনাপতি পুনা ও কঙ্কন জেলার কল্যাণ অধিকার করেন; কিন্তু ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের এক রাতে শিবাজী অতর্কিতে শায়েস্তা খানের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাঁর এক পুত্রকে হত্যা করেন। শায়েস্তা খান একটি আঙ্গুলি হারিয়ে কোনো রকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। কর্তব্য-কর্মে অবহেলার জন্য শায়েস্তা খানকে দাক্ষিণাত্য হতে সরিয়ে আনা হয় এবং তাঁকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী সুরাট দূর্গ লুণ্ঠন করেন; এমনকি তীর্থযাত্রীদের জাহাজও তিনি লুণ্ঠন করেন। সুতরাং সম্রাট তাঁর বিরুদ্ধে দিলীর খান ও জয়সিংহকে সুদক্ষ সেনাবাহিনীসহ প্রেরণ করতে বাধ্য হলেন। উপায়ান্তর না দেখে শিবাজী সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং পুরন্দরের সন্ধির শর্তানুসারে শিবাজী মোগলদের হাতে ২৩টি দূর্গ ছেড়ে দেন এবং ১২টি দূর্গ স্বীয় অধিকারে রাখেন। অধিকন্তু বিজাপুরের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য ও বাৎসরিক কর দানের প্রতিশ্রুতি ও দেন।[৩৫৬]

অতঃপর জয়সিংহ শিবাজীকে আগ্রায় সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে শিবাজী তাঁর পুত্র শম্ভুজীকে নিয়ে আগ্রায় গমন করলেন। মোগল দরবারে তিনি সম্মানের সাথে গৃহীত হন; কিন্তু তাঁর উদ্ধত ব্যবহারের জন্য আওরঙ্গজেব তাঁকে নজরবন্দী করে রাখেন। শিবাজী অল্পকালের মধ্যে পলায়নের এক নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি অসুখের ভান করে ব্রাহ্মণ ও সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল পাঠাবার অনুমতি লাভ করেন। প্রথমদিকে এ ঝুড়ি পরীক্ষা করে দেখা হতো। কিন্তু পরে পরীক্ষা না করার সুযোগে একদিন শিবাজী ঝুড়ির ভেতর বসে নাটকীয়ভাবে পলায়ন করেন।[৩৫৭]

অতঃপর তিনি সরাসরি দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হলেন; কিন্তু পরে মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন। মুয়াজ্জম শাহ ও জয়সিংহের অনুরোধে তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করা হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে পুণরায় বিদ্রোহী হয়ে তিনি পুরন্দরের সন্ধি অনুসারে সে দূর্গগুলো মোগলদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন, তা পুনরুদ্ধার করলে। সে সময় আওরঙ্গজেব উত্তর পশ্চিম

---

৩৫৬. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, op. cit., p. 145.

৩৫৭. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol-ii, op. cit., p. 641.

Dhaka University Institutional Repository

সীমান্তে ইউসুফজাই সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো বলে এসব ব্যাপারে তিনি মনোযোগ দিতে পারেননি।[৩৫৮]

১৬৭৩ ও ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শিবাজী কয়েকটি বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুন তিনি রামগড়ে 'রাজা' উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মোগলদের অত্যধিক ব্যস্ত থাকতে দেখে শিবাজী তাঁর শক্তি নানাভাবে বর্ধিত করতে লাগলেন। গোলকুন্ডার সুলতানের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তিনি ভেলোর, জিঞ্জি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রাজ্যভূক্ত করেন।[৩৫৯]

কিন্তু শিবাজীর সকল উদ্দেশ্য স্বার্থক হয়ে উঠার পূর্বেই মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। শিবাজীর মৃত্যুকালে মারাঠা রাজ্য উত্তরে রামনগর হতে দক্ষিণে কারওয়ার, পূর্বে বাগনালা হতে দক্ষিণে কোলাপুর এবং পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। অবশ্য এ অঞ্চলের মধ্যে পর্তুগীজ, ইংরেজ ও আফ্রিকার বণিকগণের বাণিজ্য-কেন্দ্র দমন, সলসেট, টোল, বেসিন, বোম্বাই প্রভৃতি মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলো না।[৩৬০]

শিবাজীর কৃতিত্ব ও চরিত্রঃ

ঐতিহাসিক কাফী খান ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর কৃতিত্ব ও চরিত্র সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করলেও এটি অস্বীকার করা যায় না যে, শিবাজী একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; মুসলিম রাজ্যের একজন সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হয়ে নিজ শ্রম, অধ্যবসায়, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে তিনি একজন শক্তিশালী রাজার মর্যাদায় উন্নীত হন এবং শত্রুর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে মুসলিম বিরোধিতার মুখে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৬১]

শিবাজী একজন দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপতি ছিলেন। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্য হতে তিনি একটি শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। বিচ্ছিন্ন মারাঠাদের একটি জাতিতে পরিণত করে তিনি তাদেরকে গৌরবের এমন এক শীর্ষ শিখরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, যা তারা কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করেননি। বিজাপুর ও মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করে শিবাজী

---

৩৫৮. Ibid, p. 645.

৩৫৯. Ibid, p. 651.

৩৬০. Aga Mehdi Hussain, *Rise and Fall of Mughal Empire*, op. cit., p. 423.

৩৬১. V.A. Smith, *Oxford History of India*, op. cit., p. 594.

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পর্যন্ত অভীষ্ট লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এটা তাঁর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। সামরিক বাহিনীর সংগঠনের ব্যাপারেও শিবাজী মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা, বিচার-পদ্ধতি প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিক মাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করেছে।[৩৬২]

শিবাজীর সাহস, উদ্যম, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি তাঁর অপূর্ব রণ-নৈপূণ্য প্রশংসার যোগ্য। মাতৃভক্তি, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বধর্মানুরাগ তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিস্ট্য ছিলো। হিন্দুধর্মের রক্ষক ও হিন্দু স্বাধীনতার প্রতীক হলেও শিবাজী পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না। তাঁর উদারতা, মহানুভতা ও ন্যায়পরায়ণাতার জন্য মাহরাষ্ট্রের লোক আজও তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করে থাকে।[৩৬৩]

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিঃ

সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজপুতদের দমনের পর দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টি দেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বিরাট এলাকা জুড়ে ছিলো মারাঠাদের আবাসভূমি।

এতদঞ্চলে গোলকুন্ডা ও বিজাপুর নামে দু'টি সুলতানী রাজ্য ছিলো। সুলতানগণ ছিলেন শীয়া, অন্যদিকে সম্রাটগণ ছিলেন সুন্নী। শীয়া মুসলমানদের প্রতি সুন্নী সম্রাটগণের বিরূপ মনোভাব থাকলেও একথা সত্য নয় যে, বিজাতীয় ও ধর্মীয় প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে অভিমান পরিচালনা করেন। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিই ছিলো তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্য।[৩৬৪]

সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল হতেই মূলতঃ দাক্ষিণ্যত্যে সাম্রাজ্যে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহান ও দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেব ও এ নীতি হতে বিচ্যুত হননি। সিংহাসন লাভের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পিতার জীবদ্দশায় আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি গোলকুন্ডা ও বিজাপুরকে সাম্রাজ্যভূক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর পিতা বাদ সাধেন। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিতার নির্দেশে গোলকুন্ডা অবরোধ প্রত্যাহার

৩৬২. Ibid, p. 597.
৩৬৩. S.K. Banarjee, *Aurangzeb Badshah*, India Office Library, London: 1973, p. 217.
৩৬৪. A.B. Keith, *A Constitutional History of India*, op. cit., p. 210.

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তাঁর সেনাপতি মীরজুমলা যখন বিজাপুর বিধ্বস্ত করছিলেন, তখনও তিনি পিতার নির্দেশে সুলতানের সাথে সন্ধি করেন।

কাজেই লক্ষ্য করা যায়, বহু পূর্ব হতেই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের দিকে আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি ছিলো। ঐতিহাসিক Edward & Garret এর মতে-

> "তিনি ষোড়শ শতাব্দীর আকবরের আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী
> নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানে
> নীতি তাঁকে উৎসাহিত করেছিলো।"[৩৬৫]

দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের প্রতি তাঁর বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিলো না; সেখানকার শীয়া সুলতানদের প্রতিও সুন্নী সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় আক্রোশ ছিলো না। মীর জুমলাও শীয়া ছিলেন। সাম্রাজ্যে আরও অনেক শীয়া আওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। অতএব, ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা সত্য বলে স্বীকার করা যায় না।[৩৬৬]

সিংহাসনে আরোহণের পর আওরঙ্গজেব বেশ কিছু দিন রাজপুতদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন। রাজপুতরা পরাজিত হলে সম্রাট দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতির কয়েকটি সুস্পষ্ট কারণ ছিলো। প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলো মোগল সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ ছিলো। দ্বিতীয়তঃ গোলকুন্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদ্বয় মোগল সম্রাটদের নিয়মিত কর প্রদান হতে বিরত ছিলেন। তৃতীয়তঃ বিদ্রোহী পুত্র আকবর মারাঠা নায়ক শম্ভূজীর সাথে মৈত্রী স্থাপন করলে আওরঙ্গজেব তাঁকে দমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। চতুর্থতঃ দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা এ সময় বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। সম্রাট মারাঠাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বিজাপুর ও গোলকুন্ডা দখলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এ রাজ্যদ্বয় মোগল সাম্রাজ্যভূক্ত করার প্রয়াস পান।[৩৬৭]

---

৩৬৫. J.B. Travernier, *Travels in India*, op. cit., p. 171.
৩৬৬. Ibid, p.175.
৩৬৭. Ibid, p. 182.

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিকে তিনটি পর্যয়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় তাঁর সিংহাসনারোহণ হতে ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে সম্রাট দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিস্তৃতিকাল ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়ে মারাঠাদের নেতা ছিলেন শিবাজীর পুত্র শম্ভূজী। সম্রাটের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে মারাঠারা শম্ভূজীর নেতৃত্বে আশ্রয় প্রদান করলে সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশেষভাবে বিচলিত হন এবং পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করেন। এ পর্যায়ে গোলকুন্ডা ও বিজাপুর রাজ্যদ্বয় দখল ও মোগল সাম্রাজ্যভূক্ত হয়েছিলো। সর্বশেষ পর্যায়ে (১৬৮৭-১৭০৭ খ্রিঃ) সম্রাট আওরঙ্গজেব শম্ভূজী ও অন্যান্য মারাঠা নায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন।[৩৬৮]

দাক্ষিণাত্যে মারাঠা নায়ক শিবাজীর শক্তিবৃদ্ধি বরাবরই আওরঙ্গজেবের দুশ্চিন্তার কারণ ছিলো। তাঁকে দমন করার জন্য শায়েস্তা খানকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। শায়েস্তা খান শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সুবিধা করতে পারেন নি। মারাঠাদের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে আওরঙ্গজেব জয়সিংহ ও দিল্লীর খানকে প্রেরণ করেন। তাঁরা সাময়িকভাবে সাফল্য অর্জন করেছিলেন; কিন্তু মারাঠাদের বিধ্বস্ত করতে পারেননি। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী পরলোক গমন করেন।

শিবাজীর পুত্র শম্ভূজীও মোগলদের দাক্ষিণাত্য নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজ আকবরকে তাঁর দরবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এতে সম্রাট আওরঙ্গজেব খুব শঙ্কিত হন। দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে আজমীর পরিত্যাগ করে আওরঙ্গজেব আহমদনগরে হাজির হলেন (১৬৮২ খ্রিঃ)। মোগলদের এ অভিযানে কয়েকটি মারাঠা দূর্গ অধিকৃত হয়েছিলো; তবে মারাঠা শক্তিকে সার্বিকভাবে দূর্বল করা মোগল বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে বিদ্রোহী যুবরাজ পারস্যের দিকে পলায়ন করলে সম্রাট তাঁকে শাস্তি দিতে পারলেন না।[৩৬৯]

দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলো মোগল সম্রাটের দাক্ষিণাত্য নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক ছিলো। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে শাহ্জাদা আযমকে বিজাপুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

---

৩৬৮. S.M. Akram, *History of Muslim Civilization in India*, op. cit., p. 315.
৩৬৯. Ray Chowdhury, *An Advanced History of India*, op. cit., p. 411.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সোলাপুর দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু বিজাপুরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়। এ ঘটনার পর সম্রাট নিজেই সোলাপুর আসেন (১৬৮৫ খ্রিঃ) এবং তাঁর বাহিনী বিজাপুর আক্রমণ করে। বিজাপুরের বালক সুলতান সিকান্দর পরাজিত হয়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করলেন।[৩৭০] সম্রাট এবার গোলকুন্ডার দিকে দৃষ্টি দিলেন। সম্রাটের সেনাবাহিনী প্রায় আট মাস গোলকুন্ডা অবরোধ করে রাখে। অবশেষে জনৈক আফগান সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ মোগল বাহিনী দূর্গের প্রবেশ পথের সন্ধান লাভ করে। গোলকুন্ডার শাসনকর্তা আবুল হাসান বন্দী হলেন। এভাবে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে গোলকুন্ডা মোগলদের অধিকারে আসলো। বিজাপুর ও গোলকুন্ডা মোগলদের অধীন হওয়ায় দাক্ষিণাত্যে মোগলদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব মারাঠাদের বিরুদ্ধে পুনরায় শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। মোগল সেনাপতি মুকাররবকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হলো। এ অভিযানে রামগড় অধিকৃত হয়; শাম্ভূজী মোগলদের হাতে নিহত হলেন। ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোরের হিন্দু রাজারাও সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেলন। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যজয়ের ফলে সম্রাটের রাজ্যসীমা কাবুল হতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর হতে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। দাক্ষিণাত্যে মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও মারাঠা শক্তিকে সম্রাট নির্মূল করতে পারেননি। রাজারাম, তারাবাঈ, তৃতীয় শিবাজী প্রমুখ মারাঠা নেতৃবৃন্দ মোগলদেরবিরুদ্ধে তখনও যুদ্ধরত ছিলেন।[৩৭১]

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাহিনী মারাঠাদের নিকট হতে 'পানহালা' দূর্গ দখল করতে ব্যর্থ হন। পরে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাহিনী জিঞ্জি অধিকার করেন। মারাঠা নেতা রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী তারারাঈ মারাঠাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মোগল-মারাঠা সংঘর্ষ অব্যাহত ছিলো। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল অভিযান ও মারাঠাদের সাথে অবিরাম সংঘর্ষের ফলে সম্রাটের মন ও স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব ইন্তেকাল করেন। তাঁর রাজত্বকালে মোল সাম্রাজ্য চরম বিস্তৃতি লাভ করেছিলো।[৩৭২]

---

৩৭০. S.M. Jaffar, *The Mughal Empire*, op. cit., p. 212.
৩৭১. S.R. Sharma, *Mughal Govt. and Administration*, op. cit., p. 720.
৩৭২. Ibid, p. 721.

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনাঃ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে নীতিকে অনেক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দূরদর্শিতাপ্রসূত বলে স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে, আওরঙ্গজেব কর্তৃক গোলকুন্ডা ও বিজাপুর অধিকৃত হলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তিকে প্রতিরোধ করার মতো আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিলো না। এই দুই রাজ্যের পতনের পর সেখানকার ছত্রভঙ্গ সৈন্যরা মারাঠাদের স্বার্থে নিয়োজিত হয়। এতে স্থানীয় শত্রুদের হাতে মারাঠা সর্দারগণ রেহাই পান এবং তাঁরা মোগলদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে সমর্থ হন। এভাবে 'দাক্ষিণাত্যের ক্ষত' নেপোলিয়নের 'স্পেনীয় ক্ষতের' মত মোগল সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলো।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক জে.এন.সরকার, রায় চৌধুরী প্রমখ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের পূর্বোক্ত মত মানেননি। ঐতিহাসিক জে. এন.সরকারের মতে-

> "আকবরের বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করার পর হতে দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের ভূ-ভাগ দখল করাই মুসলমানদের একমাত্র লক্ষ্য। এমতাবস্থায় এ দুই বিরুদ্ধবাদীর সাথে সন্ধি এক প্রকার অসম্ভব ছিলো।"[৩৭৩]

এ দুই সুলতানী রাজ্য বিজিত না হলেও তাদের দ্বারা মোগলদের স্বার্থোদ্ধার হতো, এমন আশা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, দাক্ষিণাত্যে গোলকুন্ডা, বিজাপুর ও অন্যান্য রাজ্যগুলো ছিলো দূর্বল ও পতনোম্মখ। তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিলো না। অন্যদিকে মারাঠারা ছিলো ঐক্যবদ্ধ, কর্মোন্মত্ত ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ। সংঘবদ্ধ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মারাঠা শক্তিকে বাধা দেয়ার সাধ্য তাদের ছিলো না। অতএব সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে আওরঙ্গজেবের গোলকুন্ডা ও বিজাপুর বিজয়কে দায়ী করা যায় না। এ বিজয় তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ছিলো, এ কথাও ঠিক নয়।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মোগল সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়েছিলো। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন-

---

৩৭৩. B.P. Saksena, *History of Jahangir*, Vol-ii, op. cit., p. 509.

Dhaka University Institutional Repository

> "আপাতদৃষ্টিতে আওরঙ্গজেব সকল কিছু লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সকল কিছুই হারালেন। এ সময় হতেই তাঁর পতনের সূচনা এবং জীবনের চরম দুঃখ ও নৈরাশ্যের দিন শুরু হয়।"[৩৭৪]

প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যের রাজ্য বিজয় সম্রাটের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেনি। বরং সাম্রাজ্যের সুবিস্তৃত সর্বত্র সু-শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলো। এতে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ রাজধানীতে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতি উত্তর ও মধ্য-ভারতে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ মারাঠাদের বিরুদ্ধে সম্রাটকে দীর্ঘদিন সামরিক অভিযান চালাতে হয়েছিলো। এতে রাজ কোষের আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয় এবং বহু সৈন্য হতাহত হয়। চতুর্থতঃ মোগলদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের সাফল্য অপরাপর জাতি, যেমন- রাজপুত, জাঠ ও শিখদের বিদ্রোহে উস্কানি দেয়। পরবর্তীকালে এসব শক্তি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের ব্যর্থতা তাঁর সুযশ বিনষ্ট করেছিলো; দুশ্চিন্তায় তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং দাক্ষিণাত্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Dr. Smith মন্তব্য করেছেন- "The Decan was the grave of his reputation as well as his body."

অর্থাৎ, "দাক্ষিণাত্য সম্রাটের খ্যাতি ও দেহের সমাধিভূমি ছিলো।"[৩৭৫]

<u>মারাঠাদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতার কারণঃ</u>

মারাঠাদের বিরুদ্ধে অথবা দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতার প্রথম কারণ হলো ভৌগলিক দূরত্ব। দিল্লী হতে পুনার দূরত্ব প্রায় পাঁচশ মাইল। সুতরাং অতদূরে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা সহজ ব্যাপার নয়। মারাঠা সৈন্য নিজ দেশে যুদ্ধ করতো, আর মোগল সৈন্য বিদেশে যুদ্ধ করতো। দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য পথ-ঘাট ও জলবায়ুর সাথে মারাঠাদের পরিচয় ছিলো; কিন্তু মোগলদের পক্ষে সমস্তই ছিলো নতুন। দ্বিতীয়তঃ পর্বত-সঙ্কুল মহারাষ্ট্র অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য গেরিলা পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী ছিলো। গেরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতিতে মারাঠার বিশেষ দক্ষ ছিলো।[৩৭৬] তাই দূর্ধর্ষ মারাঠাদের শায়েস্তা করা মোগল বাহিনীর পক্ষে দুস্কর ছিলো। তৃতীয়তঃ দাক্ষিণাত্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে

---

৩৭৪. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, vol-iii, op. cit., p. 317.
৩৭৫. Ibid, p. 319.
৩৭৬. Ibid, p.322.

Dhaka University Institutional Repository

মারাঠাদের অবাধ গতি ছিলো। মারাঠা নেতা শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠারা মোগলদের বিরুদ্ধে দল মত নির্বিশেষ ঐক্যবদ্ধ ছিলো। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা মোগল সৈন্যদের পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিলো না।[৩৭৭]

অধিকন্তু, মারাঠাদের সংগ্রাম ছিলো স্বদেশ রক্ষার; অন্যদিকে মোগলদের লক্ষ্য ছিলো সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ। কাজেই মারাঠাদের প্রতিরোধ শক্তি মোগলদের তুলনায় শক্তিশালী ছিলো। মারাঠাদের মনোবল ও ছিলো সক্রিয় ও অটুট। চতুর্থঃ মারাঠারা জানতো যে, অবিরাম সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তাদের বাঁচতে হবে। এজন্য তারা গেরিলা পদ্ধতিসহ রণবিদ্যায় বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলো। অন্যদিকে, আওরঙ্গজেবের বিশাল সেনাবাহিনী থাকলেও রণচাতুর্যে ও মনোবলে তারা মারাঠাদের তুলনায় দূর্বল ছিলো। বিলাসিতার প্রতি আসক্তি ও তাদের নৈতিকতাকে শক্তিশালী করতে দেয়নি। পঞ্চমতঃ দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য আওরঙ্গজেবকে বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ করতে হয়। এতে রাজকোষে অর্থ ঘাটতি দেখা দেয়। সৈন্যরা তাদের চাহিদামত অর্থ না পাওয়ার মারাঠাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ তারা তেমন উৎসাহী ছিলো না। জুলফিকারের মতো সুদক্ষ সেনাপতি ও স্বীয় সৈন্যদলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত, মোগল সৈন্যদের পারস্পরিক কলহ, বিদ্বেষ, আক্রোশ ইত্যাদি তাদের রণনৈপুণ্যকে বহুলাংশে খর্ব করছিলো।[৩৭৮]

ষষ্ঠতঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন-দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ইত্যাদি মোগলদের জয়লাভের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলো। ঐতিহাসিক মানুচ্চির মতে-

> "১৭০২ হতে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে অনাবৃষ্টি ছিলো এবং অন্যদিকে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ দু'বছরে বিশ হাজার লোক প্রাণত্যাগ করে; ক্ষুধার যন্ত্রণায় পিতা সন্তানকে ৪ অথবা ৮ আনায় বিক্রি করতো এবং কখনো কখনো ক্রেতার অভাবে অভুক্ত থাকতে বাধ্য হতো।"[৩৭৯]

সপ্তমত ঃ মারাঠাদের কোনো কেন্দ্রীয় সরকার বা রাষ্ট্রীয় বাহিনী ছিলো না। তারা স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন নেতার অধীনে মোগলদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। ফলে মোগলদের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মারাঠা বাহিনীর মোকাবেলা করতে হয়েছিলো। কোনো এক রণাঙ্গনে মারাঠারা

---

৩৭৭. V.A. Smith, *Oxford History of India*, op. cit., p. 463.

৩৭৮. J.N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, op. cit., p. 194.

৩৭৯. K.M. Ashraf, *Social and Political Condition in Medieval India*, Taj Publications, Karachi, Pakistan: 1929, p. 418.

Dhaka University Institutional Repository

পরাজিত হলেও অন্যান্য স্থানের মারাঠারা এ পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় হিসেবে মানতো না; বরং অধিকতর আক্রোশে মোগল বাহিনীর হামলার মোকাবেলা করতো। অষ্টমতঃ সামরিক উপকরণের দিক হতেও মারাঠারা মোগলদের তুলনায় উন্নত ছিলো। তাদের গোলন্দাজ বাহিনীতে মুখোশ, তীরধনুক, বলশালী হস্তী ও উন্নতমানের উট ছিলো। পরিচিত পরিবেশে তারা সামরিক উপকরণসহ দ্রুত গতিতে স্থান পরিবর্তন করতে পারতো। অন্যদিকে, এসব সুযোগ-সুবিধা হতে মোগলরা বঞ্চিত ছিলো। অধিকন্তু মারাঠাদের উন্নত গেরিলা পদ্ধতি মোগলদের জন্য অধিকতর বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছিলো।[৩৮০]

<u>আওরঙ্গজেব ও ইংরেজগণঃ</u>

মোগল সম্রাটদের আমলে ইংরেজগণ এদেশে নানা সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬১৫ খ্রিঃ) স্যার টমাস রো তাঁর দরবারে আগমন করে ইংরেজ বণিকদের জন্য সর্বপ্রথম কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করেন।

১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা মৌসলিপওমে একটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে এবং ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রগিরি রাজার অনুমতিক্রমে মাদ্রাজে একটি কুঠি ও দূর্গ নির্মাণ করে। পরে এ দূর্গটি ফোর্ট সেন্ট জর্জ নামে পরিচিত হয়। সম্রাট শাহজাহান পর্তুগীজদের প্রতি রুষ্ট থাকলেও ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে ইংরেজগণ একটি কুঠি স্থাপন করে এবং তাদের কিছু অতিরিক্ত বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে সকল ইংরেজ কুঠি সুরাট এর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। শিবাজীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য পুরস্কার হিসেবে আওরঙ্গজেব ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের বাণিজ্যশুল্ক কমিয়ে দেন। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস বিয়ের যৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত বোম্বাই ও সালসেটি বন্দর দু'টি ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করেন। এর ফলে কোম্পানী এদেশে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[৩৮১]

সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বহির্বাণিজ্যের যে বিরাট গুরুত্ব ছিলো তা উপলব্ধি করে মোগল সম্রাটগণ বিদেশী বণিকদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করতেন। কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ এ সুযোগের অপব্যবহার করতে থাকলে মোগল সম্রাটরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিকরা এরূপ সুযোগের অপব্যবহার করলে সুবাদার শায়েস্তা খান ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ

---

৩৮০. Tara Chand, *Influence of Islam on Indian Culture*, op. cit., p. 374.
৩৮১. Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire*, op. cit., p. 360.

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ফলে ইংরেজদের সাথে মোগলদের সংঘর্ষ বাধে এবং ইংরেজরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। কিছুদিন পর আওরঙ্গজেব ইংরেজদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং ইংরেজ কুঠির নায়ক জব চার্নককে বঙ্গদেশে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানাবার জন্য শায়েস্তা খানের উত্তরাধিকারী ইব্রাহীমকে নির্দেশ দেন। জব চার্নক বঙ্গদেশে ফিরে আসেন এবং ফরমান লাভ করে হুগলীর অনতিদূরে কলকাতা নামক স্থানে কুঠি স্থাপন করেন (১৬৯০ খ্রিঃ)। এ কলকাতাই ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়।[৩৮২]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র বিচারঃ

সম্রাট আওরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম ছিলেন। একজন সুদক্ষ সেনাপতি, আদর্শ শাসক, সরল ও ধার্মিক লোক, নিরপেক্ষ বিচারক এবং প্রজাহিতৈষী হিসেবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে তিনি উচ্চাসন লাভ করেছিলেন। সারল্য, নিরপেক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সৎ উদ্দেশ্য তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিলো। তিনি তাঁর অদম্য সাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও অক্লান্ত কর্মগুণের দ্বারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন।

রাজত্বের প্রথমভাগে সিংহাসন অধিকার করার জন্য আওরঙ্গজেব নিষ্ঠুর উপায় গ্রহণ করলেও পূর্বপুরুষদের ধারানুক্রমিক কার্যাবলী ও তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার বিচারে তিনি ক্ষমার পাত্র। সিংহাসন অধিকার করার পর তিনি কখনও বৃথা রক্তপাতের প্রশয় দেননি; বরং তিনি নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা কোমল স্বভাবের অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন।[৩৮৩]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজ্য শাসনের আদর্শ ছিলো মহান। আওরঙ্গজেব বলেন-

> "I was sent into the world by Providence to live and labour,
> non for myself but for others, that it is my duty not to
> think of my own happiness except so for as it is inseparably
> connected with the happiness of my people."[৩৮৪]

অর্থাৎ, নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য পরিশ্রম করে বাঁচতে আমি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। আমার প্রজাদের সুখের জন্য আমার যে সুখ সম্পর্কিত নয়, সে সুখের জন্য চিন্তা না করাই আমার কর্তব্য।

---

৩৮২. Edwards and Garret, *Mughal Rule in India*, op. cit., p. 215.
৩৮৩. Wairvine, *Later Mughals*, Danforth University Press, London, England: 1912, p. 179:
৩৮৪. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol-ii, op. cit., p. 487.

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর মহান আদর্শে অবিচলিত ছিলেন। সিংহাসন গ্রহণ করার পর তিনি ন্যূনপক্ষে ৮০ টি কর তুলে দিয়েছিলেন। রাজনীতির দ্বারা ধর্মকে তিনি কলুষিত হতে দিতেন না। সেজন্য তিনি 'ভবিষ্যত বিপদের' ইঙ্গিত করেছিলেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ইসলামকে পবিত্রতা ও সম্পূর্ণতার মধ্যে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। এ কথাও সত্য যে, একজন মুসলমান শাসক হিসেবেই তিনি ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন। এ জন্য সম্রাট আকবরের সময় যে সব লোক প্রশ্রয় পেয়েছিলো, তারা তাঁকে পছন্দ করতো না।

আওরঙ্গজেব শাসনদক্ষতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারের যুদ্ধ, বিদ্রোহ দমন ও দাক্ষিণাত্য অভিযানে সৈনিক ও সেনাপতি হিসেবে তাঁর শক্তিমত্তা এবং বুদ্ধির পরিচয় দেন। কূটনীতি, সেনাপতিত্ব ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলো না। মারঠাদের সাথে যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ সফলকাম হতে পারেননি সত্য, তবে তিনি তৎকালীন যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাই এ অকৃতকার্যতার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলো, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[৩৮৫]

শাসক হিসেবে আওরঙ্গজেব রাষ্ট্রের সকল বিভাগের শাসনকার্য পরিদর্শন করতেন। অন্যায় কর, দুর্নীতি ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের উপর তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। কৃষিকাজে তিনি উৎসাহ দান করেন এবং অনেকগুলো রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করেন। তিনি নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। তাঁর নিকট দরিদ্র, ধনী, অভিজাত ও সাধারণ মানুষ সমান বিচার লাভ করতো। ব্যক্তিগত জীবনে সরল হলেও সর্বদা নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে তিনি দরবারের মর্যাদা রক্ষা করতেন।[৩৮৬]

আওরঙ্গজেব একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষাকার্যে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে তিনি অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কুরআনের সূরাগুলো তাঁর মুখস্ত ছিলো এবং বহু হাদীস তাঁর জানা ছিলো। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ বুৎপত্তি ছিলো। আরবী ও ফার্সী সাহিত্যে ও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে 'ফতোয়া-ই-

---

৩৮৫. Ibid, p. 489.
৩৮৬. Ibid, p. 492.

Dhaka University Institutional Repository

আলমগীর' রচিত হয়। তিনি একজন হস্তলিপি বিশারদ ছিলেন এবং অতি সহজে ও দক্ষতার সাথে কুরআন শরীফ সিকাস্ত ও নাসতালিক পদ্ধতিতে লিখতেন।[৩৮৭]

সম্রাট আওরঙ্গজেব একনিষ্ঠ মুসলমান হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তিনি সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে রাজা যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহের ন্যায় অনেক হিন্দু রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালের তুলনায় তাঁর সময়ে হিন্দু রাজকর্মচারীদের সংখ্যা অধিক ছিলো। কিন্তু ইসলামী শরীয়াতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তিনি অধিকতর সচেতন ছিলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কাফী খান এ প্রসঙ্গে বলেন-

> "Of all the Sovereigns of the house Timurnay, of all the Sovereigns of Delhi.... no one since Sikandar Lodi has ever been apparently so distinguished for devotion, austerity and justice. In courage, long sufferings and sound judgements he was unrivalled."[৩৮৮]

অর্থাৎ, কেবল তৈমুরের বংশের সুলতান নয়, দিল্লীর সকল সুলতানদের মধ্যে সিকান্দার লোদীর পর ধর্মানুরক্তি, কঠোর পবিত্র জীবন ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁর ন্যায় আর কারো ছিলোনা। অধিকন্তু সাহস, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

আওরঙ্গজেব যদি তাঁর পুত্র ও কর্মচারীদের উপর অবিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তাহলে তা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই হয়েছিলো। এ অবস্থায় তিনি যদি সচেতন ও সর্বদা সতর্ক থেকে থাকেন, তাহলে তাঁকে দোষ দেয়া যায় না।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সরল জীবন-যাপন করতেন এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। রাজ-ভান্ডারকে তিনি পবিত্র আমানত মনে করতেন এবং নিজের জন্য তা হতে একটি পয়সাও ব্যয় করতেন না। পবিত্র কুরআন শরীফ নকল করে ও নিজের হাতে টুপি সেলাই করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৩৮৯] তিনি কখনও প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়েননি এবং নিষিদ্ধ খাদ্য, পানীয় ও পোশাক ইত্যাদি গ্রহণ করতেন না।

---

[৩৮৭]. Ray Chowdhury, *An Advanced History of India*, op. cit., p. 236.
[৩৮৮]. Kafi Khan, *Muntakhab- ul-Lubab*, Vol-vii, Asrare Karimi Press, Lucknow: 1973, p. 936.
[৩৮৯]. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol-iii, op. cit., p. 453.

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই ব্যক্তিগত জীবনে সরল ও নিরাসক্ত, ধর্মীয় জীবন-যাপনে কঠোর, একজন উচ্চ শিক্ষাবিদ, দরিদ্র ও শিক্ষিতদের পৃষ্ঠপোষক, উন্নত ধরণের পত্রলেখক, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক এবং মসী ও অসির একজন সুদক্ষ ধারক ও বাহক হিসেবে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ্ গাজী প্রকৃতপক্ষেই একজন মহান, সুদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন।[৩৯০]

মোগল সাম্রাজ্যের পতন যুগঃ

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন সম্রাট যহীরউদ্দীন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল শাসনামলেই ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মুল্লাজীউনের কর্মবহুল জীবনের ব্যাপ্তীকাল ছিলো প্রায় পুরো মোগল আমল জুড়েই। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ও পতনযুগ উভয়টাই পেয়েছিলেন। পূর্বে আমরা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সময়কার ভারতীয় উপমহাদেশের মোগল শাসনামলের স্বর্ণযুগের দু'জন প্রভাবশালী শাসক সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছি। কেননা মোগল সম্রাট শাহ্জাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনামলেই আহ্মাদ মুল্লাজীউন তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছিলেন (১৬৩৭-১৭০৭ খ্রিঃ)।

আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিম্নে আমরা আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সময়কার ভারতীয় উপমহাদেশের মোগল শাসনামলের পতনযুগের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী শাসক সম্পর্কে সংক্ষিপ্তকারে আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

বাহাদুর শাহ্ বা শাহ্ আলম (প্রথম) (১৭০৭-১৭১২ খ্রিঃ)ঃ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়। তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তা রক্ষা করার মতো যোগ্যতা তাঁর উত্তরাধিকারীদের ছিলো না। তাঁরা নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে তাঁর পুত্রগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম (মুয়াজ্জম) অন্যান্য ভ্রাতাকে পরাজিত করে 'বাহাদুর শাহ'

[৩৯০].M.A.Rahim, *Social and Political History of Bengal*, op. cit., p. 710.

Dhaka University Institutional Repository

উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩৯১] ভ্রাতাগণের মধ্যে বাহাদুর শাহ্ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি রাজপুতদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে সর্বপ্রধান ঘটনা শিখ নায়ক বান্দার অভ্যুত্থান। শিখ নায়ক বান্দা ও তাঁর অনুচরগণ পাঞ্জাবের অন্তর্গত সরহিন্দ শহরে লুট-পাট আরম্ভ করলে বাহাদুর শাহ্ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পরবর্তীতে শিখ নায়ক বান্দা জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন।[৩৯২]

মু'ইযুদ্দীন জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-১৭১৩ খ্রিঃ)

১৭১২ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহ্ বা শাহ্ আলম (প্রথম) ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অবশেষে অন্যান্য ভ্রাতাদের পরাজিত করে জ্যেষ্ঠ পুত্র মু'ইযদ্দীন জাহান্দার শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় এক বছর রাজত্ব করার পর আজিম-উস-শানের পুত্র ও বাহাদুর শাহের পৌত্র ফররুখ শিয়ারের হাতে নিহত হন।[৩৯৩]

ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রিঃ)

সম্রাট মু'ইযুদ্দীন জাহান্দার শাহ্ নিহত হলে ফররুখ শিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈয়দ হোসেন আলী ও সৈয়দ আব্দুল্লাহ্ নামক দুই ভ্রাতা ফররুখ শিয়ারকে সিংহাসন লাভে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দেন। তখন হতে তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসক হয়ে দাঁড়ালেন আর ফররুখ শিয়ার হলেন তাদের হাতের পুতুল।[৩৯৪]

আমীরগণ ছিলেন তিন দলে বিভক্ত- হিন্দুস্থানী (ভারতের জাঠ), ইরানী (পারস্য ও (খারাসান হতে আগত) এবং তুরাণী (মধ্য-এশিয়া হতে আগত)। বিভিন্ন দলের পরস্পর ষড়যন্ত্র ও বিবাদের ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি দূর্বল হতে লাগলো। এ সময় মারওয়াড়ের রাজা অজিত সিংহ্ বিদ্রোহী হন। কিন্তু পরে সম্রাট ফররুখ শিয়ারের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সাথে নিজের কন্যার বিয়ে দেন।[৩৯৫]

---

৩৯১. J.N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, op. cit., p. 384.
৩৯২. Edwards and Garret, *Mughal Rule in India*, op. cit., p. 272.
৩৯৩. Ibn Hasan, *The central structure of the Mughal Empire*, op. cit., p. 195.
৩৯৪. S.R. Sharma, *Mughal Govt. and Administration*, op. cit., p. 613.
৩৯৫. Ibid, p. 618.

Dhaka University Institutional Repository

শিখ্ নায়ক বান্দা সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে পুনরায় মাথা তুলতে চেষ্টা করলে সম্রাট তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করেন। কিন্তু মারাঠা জাতি নতুন করে রাজ্যে উৎপাত শুরু করলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাদেরকে দমন করতে না পেরে তাদের হাতে দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবা হতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার ছেড়ে দেন। সম্রাট তাঁদের এ আচরণে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হতে হতে মুক্তি পাবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তা জানতে পেরে মারাঠাদের সাহায্যে তাকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করেন।[৩৯৬]

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণঃ

উত্থান ও পতন দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম। আজ যে জাতি উন্নতির শীর্ষ শিখরে সমাসীন, কাল হয়তো তার অস্তিত্ব ও লোপ পাবে। ভাঙ্গাগড়ার এ ইতিহাস চিরন্তন। এ ভারতে কতো জাতি আসলো, কতো জাতি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেলো। একদিন এ 'মহামানবের সাগর তীরে' অন্যান্য জাতির ন্যায় মোগলরাও এসেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রিঃ) তাঁরা এদেশ শাসন করেছিলেন; কিন্তু পতনের হাত হতে তাঁরাও রক্ষা পাননি। মোগল সাম্রাজ্যের পতন অনেক পূর্বেই শুরু হয়েছিলো। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সময় এটি চরম অবস্থায় পৌঁছায়।

কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকগণ পতনের আসল কারণ চাপা দিয়ে অসত্য কারণগুলোর উপর বেশীর জোর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা আওরঙ্গজেবকে দায়ী করে থাকেন। তাঁদের মতে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির দরুণ মোগলরা হিন্দুদের সমর্থন ও সহানুভূতি হতে বঞ্চিত হয়।[৩৯৭] এর ফলে রাজপুত, শিখ, জাঠ ও মারঠারা মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাম্রাজ্যের পতনকে অতি ত্বরান্বিত করে। এ প্রসঙ্গে এটি স্মরণযোগ্য যে, সম্রাট আকবরের সময় হতেই হিন্দুদের মনে বিদ্রোহভাব জেগে উঠতে থাকে এবং জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে শিখ ও মারাঠা শক্তির চাপ প্রবলভাবে অনুভূত হয়। সুতরাং হিন্দু জাগরণের জন্য আওরঙ্গজেবকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।[৩৯৮]

সপ্তদশ শতাব্দী ছিলো হিন্দু জাগরণের যুগ এবং আওরঙ্গজেবকে এর সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। তিনি হিন্দু জাগরণকারীদের আশা-আকাঙ্খাকে অনেকাংশে ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ

[৩৯৬]. Beni Prasad, *Religious Policy of the Mughal*, Notingham University Press, London, England: 1958, p. 471.
[৩৯৭]. S.M. Jaffar, *The Mughal Empire*, op. cit., p. 234.
[৩৯৮]. Aga Mehdi Hussain, *Rise and Fall of Mughal Empire*, op. cit., p. 192.

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মতো আর একজন শাসক থাকলে ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যরূপে লিখতে হতো। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীগণ অত্যন্ত দূর্বল ছিলেন বলে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারেননি। তাঁদের রাজত্বকালে মারাঠারা এতো বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো যে, তারা দিল্লীর দ্বারাপ্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলো। আর অভিযোগ করা হয় যে, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অপর একটি কারণ ছিলো।[৩৯৯] পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আওরঙ্গজেব তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাটদের নীতিই শুধু অনুসরণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করা যায় না। এর কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) আওরঙ্গজেবের দূর্বল উত্তরাধিকারীগণঃ

পরবর্তী মোগলদের অযোগ্যতা ও চরিত্রের অবনতি মোগল বংশ পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী। আকবর হতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মোগল বংশের প্রায় সকলেই শক্তিশালী ও যোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁদের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলো। কিন্তু একমাত্র বাহাদুর শাহ ব্যতীত আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণ দূর্বল ও অযোগ্য হওয়ায় মোগল সাম্রাজ্যের পতনের গতিকে রোধ করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা কর্মঠ, পরিশ্রমী ও শক্তিশালী না হয়ে দূর্বল, অলস, বিলাসপ্রিয় ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের অনেকেই মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করে মদ ও নারীতে আসক্ত হয়ে কালাতিপাত করতেন। যে সব মন্ত্রীর উপর সম্রাটগণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছিলেন, তাঁরাই তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করতে গিয়ে রাষ্ট্রের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। তাঁদের দূর্বলতার সুযোগে রাজ্যের অভ্যন্তরে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিশাল সাম্রাজ্যের শান্তি রক্ষা, বিদ্রোহ দমন ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা, বিচক্ষণতা ও যোগ্যতা তাঁদের একেবারেই ছিলো না।[৪০০]

(২) উত্তরাধিকারী নির্বাচনে নির্দিষ্ট নিয়মের অভাবঃ

মোগল সম্রাটদের মধ্যে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিলো না; 'জোর যার মুল্লুক তার'- এ নীতির উপরই সিংহাসন লাভ নির্ভর করতো। মোগল বাদশাহদের মধ্যে আকবরই

---

৩৯৯. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, op. cit., p. 317.
৪০০. Ibid, p. 319.

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র শাসক যিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিংহাসন লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। কাজেই সিংহাসনের জন্য রাজ-পরিবারের মধ্যে প্রায়ই পিতৃঘাতী এবং ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যেতো। এর ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি অনেকখানি দূর্বল হয়ে পড়ে।[৪০১]

(৩) অভিজাতবর্গের অবনতিঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অভিজাত সম্প্রদায়ের (Nobility) চারিত্রিক অবনতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বিশেষ কারণ ছিলো। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আমীরগণ যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা নিজেদের স্বার্থের জন্য ইরানী, তুরানী, হিন্দুস্থায়ী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট করে দেন। আমীরগণের অবনতি সম্বন্ধে স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন-

> "To the thoughtful student of Mughal History, nothing is more striking than the decline of the Peerage. The herose adorn the stage for the generation only and leave no worthy heris, sprung from their lines."[৪০২]

অর্থাৎ মোগল ইতিহাসের চিন্তাশীল পাঠকের নিকট আভিজাত্যের পতনের মতো অন্য কিছু অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হবে না। বীর সেনানীরা মাত্র এক যুগের জন্য মোগল দরবারকে অলংকৃত করলেও পশ্চাতে কোনো উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রেখে যাননি।

যে সব ব্যক্তি সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাস অলংকৃত করেছিলেন, সে আব্দুর রহীম, রহমত খান, সাদুল্লাহ, মীর জুমলা, ইবরাহীম ও ইমাম খান রুমী প্রমুখ ব্যক্তি তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের অর্ধেক যোগ্যতাসম্পন্ন পুত্র বা পৌত্র ও রেখে যেতে পারেননি। সুতরাং যে আমীরগণ মোগলদের নিকট এক সময় যোগ্যতা, আনুগত্য ও সংহতির প্রমাণ দিয়েছিলেন; তারাই পরবর্তীকালে স্বার্থপর, পরগাছা ও বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন।[৪০৩]

---

৪০১. S.M. Jaffar, *The Mughal Empire*, op. cit., p. 174.
৪০২. J.N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, op. cit., p. 312.
৪০৩. Ibid, p. 314.

Dhaka University Institutional Repository

(৪) সামরিক শক্তির অবনতিঃ

সামরিক শক্তির অবনতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। বৈদিশিক আক্রমণ হতে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করতো।

কিন্তু যে সব সেনাপতি মোগল আমলের প্রথমদিকে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা পরবর্তীকালে দূর্বল হয়ে পড়েন।

ঐতিহাসিক ডব্লিউ আরভিন বলেন-

> "In short, excepting want of Personal courage, every other in the list of military vices may be attributed to the degenerate Mughals in discipline, Want of cohesion, cumbrous luxurious habit, inactivity, bad commissariat and Cumbrous equipments."[৪০৪]

অর্থাৎ, সংক্ষেপে ব্যক্তিগত বীরত্ব ব্যতীত বিশৃঙ্খলা, সংহতির অভাব, বিলাস পরায়ণতা, অকর্মণ্যতা ও কর্তব্যবিমুখতা, সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহকারী বিভাগের অবহেলা এবং অবৈজ্ঞানিক ভারী সমরাস্ত্র প্রভৃতি দোষ-ত্রুটি মোগল সামরিক শক্তির অবনতি ঘটিয়েছিলো।

অধিকন্তু, বিভিন্ন জাতির লোক নিয়ে যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়েছিলো, তাদের মধ্যে কোনো স্বদেশপ্রীতি ছিলো না; বরং সাম্রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য না করে তারা স্ব স্ব দলের আধিপত্য স্থাপনে ব্যস্ত ছিলো।

(৫) আর্থিক অবস্থার অবনতিঃ

আর্থিক অবস্থার অবনতি ও মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বিশেষ কারণ ছিলো। সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সম্রাটদের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হতো। বিদ্রোহ দমনার্থে বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ ও বিভিন্ন স্থানে পাঠাবার বিপুল খরচ-পত্র বহন করা, তদুপরি আওরঙ্গজেব কর্তৃক দাক্ষিণাত্য অভিযানে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ায় রাজকোষ অর্থশূণ্য হয়ে পড়ে। এ সংকটময় আর্থিক অবস্থা সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে চালিত করে।[৪০৫]

---

[৪০৪]. Wairvine, Sir, *Later Mughals*, op. cit., p. 193.

[৪০৫]. Ibid, p. 195.

Dhaka University Institutional Repository

(৬) নৌবলের অভাবঃ

মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাটদের সামরিক শক্তির উৎস ছিলো স্থলবাহিনী। বহুদূর বিস্তৃত ও অরক্ষিত উপকূলভাগ রক্ষা করার জন্য তাঁরা উপযুক্ত নৌবহর গঠন করেননি। ফলে পাশ্চাত্য বণিকদের সাথে নৌযুদ্ধে তাঁরা হার মানেন। এতে মগ ও ঠগীরা স্থানে স্থানে নৌকাযোগে লুটতরাজ করতে সুযোগ পায়।[৪০৬]

(৭) হিন্দুজাগরণঃ

রাজপুত, মারাঠা, শিখ ও হিন্দুজাতির জাগরণ ও বিদ্রোহ এ সময় মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। ভারতে হিন্দু রাজত্ব কায়েম করার জন্য মোগল রাজত্বের প্রথম হতেই তারা নানারকম ষড়যন্ত্র করেছে। আওরঙ্গজেবের দূর্বল উত্তরাধিকারীগণ নবজাগ্রত হিন্দুশক্তির সাথে এঁটে উঠতে পারেননি। তাঁদের সময়ে হিন্দুরা সর্বত্র বিদ্রোহ করে মোগল শক্তিকে দূর্বল করে দেয়।[৪০৭]

(৮) সাম্রাজ্যের বিশালতাঃ

মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা এর পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিলো। আওরঙ্গজেবের সময় সাম্রাজ্য আফগানিস্তান হতে আসাম এবং কাশ্মীর হতে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এ যুগে দ্রুত যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের কোনো সুব্যবস্থা ছিলো না।[৪০৮] কোনো দূরবর্তী প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে দিল্লী হতে সৈন্য নিয়ে তা দমন করা কঠিন ছিলো। সুতরাং মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি ক্ষমতার উৎস না হয়ে দূর্বলতার কারণ হয়েছিলো। এতো বড় সাম্রাজ্যের উপর ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে হলে বাবর, আকবর ও আওরঙ্গজেবের মতো শক্তিশালী ও যোগ্য সম্রাটের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটদের মধ্যে এসব গুণের অভাব ছিলো। তাছাড়া মৌলিক জাতীয়তাবাদের অভাবও এ সাম্রাজ্যের অবনতির পক্ষে সহায়ক হয়েছিলো।[৪০৯]

---

৪০৬. Edwards and Garret, *Mughal Rule in India*, op. cit., p.326.
৪০৭. Ibid, p. 327.
৪০৮. Ibn Hasan, *The Central Structure of the Mughal Empire*, op. cit., p. 532.
৪০৯. Aga Mehdi Hussain, *The Rise and Fall of the Mughal Empire*, op. cit., p. 278.

Dhaka University Institutional Repository

(৯) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ ঃ

পরবর্তী সম্রাটদের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসনর্তারা স্ব স্ব প্রদেশে প্রধান হয়ে উঠলেন এবং কালক্রমে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল-মুলক এবং অযোধ্যা প্রদেশে সাদত খান স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। আলীবর্দী খান বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজত্ব করতে থাকেন। এগুলো রাজ্যের সংহতির উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছিলো।[৪১০]

(১০) দূর্বল শাসনব্যবস্থাঃ

মোগল যুগের শাসন ব্যবস্থা ছিলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সম্রাটের দৃঢ়তা কিংবা দূর্বলতা শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণ করতো। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক এস.আর.শর্মা মন্তব্য করেন-

"সম্রাটগণই ছিলেন মোগল শাসনব্যবস্থার স্রষ্টা এবং এতে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতো। সম্রাটের অধঃপতনে সমগ্র মোগল শাসনকাঠামোর ভিত্তিমূল কেঁপে ওঠে।"[৪১১]

জায়গীর প্রথা মোগল শাসন কাঠামোর একটি শক্তিশালী স্তম্ভ ছিলো; কিন্তু এ ব্যবস্থা যোগ্য সম্রাটের অভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে।

(১১) বৈদেশিক আক্রমণঃ

মোগল সাম্রাজ্যে যখন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান, তখন পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ এবং আফগানরাজ আহমদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণ এটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উল্সলে হেগের মতে, পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের প্রচন্ড আক্রমণে দু'মাস ধরে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা অচল ছিলো। অগণিত লোক হতাহত এবং অর্থ-সম্পদ লুটতরাজের ফলে মোগল সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়ে। অবশেষে ভারতে ইউরোপীয়দের প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়।[৪১২]

---

৪১০. Wairvine, Sir, *Later Mughals*, op. cit., p. 417.
৪১১. S.R. Sharma, *Mughal Govt. and Administration*, op. cit., p. 113.
৪১২. H.G. Kecne, *The Fall of The Mughal Empie*, op. cit., p. 320.

Dhaka University Institutional Repository

শেষ কথাঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব পেয়েছিলেন ২১ বছর, আওরঙ্গজেবের ৫০ বছর ৩মাস, বাহাদুর শাহের ৫ বছর, মু'ইযুদ্দীন জাহান্দার শাহের ১ বছর এবং সম্রাট ফররুখ শিয়ারের ৬ বছর।[৪১৩]

সম্রাট আওরঙ্গজেব বাদে বাকী চারজন সম্রাটের রাজত্ব পেয়েছিলেন ৩৩ বছর। সে অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, আহমাদ মুল্লাজীউনের জীবনের বৃহৎ অংশটুকুই কেটেছে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামলে। যিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ইসলামের অনুগত একজন শাসক। তিনি যদিও খলীফা ছিলেন না, তথাপি তাঁর রাজ্য পরিচালনা খেলাফতের নিয়ম-কানুন বহির্ভূত ছিলো না। তাই তাঁর রাজ্য ব্যবস্থাকে যদি খেলাফতের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে খলীফা হারুনুর রশীদ, আল- মামুন ও আব্দুল মালেকের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলা না।[৪১৪]

তাই সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরকে যদি ভারতবর্ষের মোগল খলীফা বলা হয়, তবে তা অত্যুক্তি হবে না। এই খলীফারই শিক্ষক, পৃষ্ঠপোষক এবং তদীয় পুত্রের শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক; এটাও আহমাদ মুল্লাজীউনের মর্যাদাকে আরও সমুজ্জ্বল করেছে।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি, আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউনের জন্ম হয়েছিলো মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে, কর্মজীবন শুরু হয়েছিলো মোগল সাম্রাজ্যের সংস্কার যুগে, আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো মোগল সাম্রাজ্যের পতন-যুগে।[৪১৫]

---

[৪১৩]. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল মুসান্নিফীন*, মীর মোহাম্মদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তানঃ ১৯৮৬, পৃ. ২১৯।

[৪১৪]. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, vol-ii, op. cit., p. 724.

[৪১৫]. ফকীর মুহাম্মদ, *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ্*, ৩য় সংস্করণ, লক্ষ্ণৌঃ ১৩২৪ হি./১৯০৬ খ্রি., পৃ. ৪৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জীবন-দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জীবন-দর্শন

- মুখবন্ধ
- নাম ও বংশ পরিচয়
    - নাম ও উপনাম
    - বংশ
    - নামের শেষে ব্যবহৃত উপাধি
    - পূর্ব-পুরুষের বাসস্থান
- জন্ম
- শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা
- উচ্চশিক্ষা ও সনদ লাভ
- প্রখর স্মৃতিশক্তি
- বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ
- লেখনী জগতে মুল্লাজীউনের পরিবারের অবদান
- হজ্জব্রত পালন
- রাজ-রাজাদের সংস্পর্শে থাকার কারণ
- বিস্ময়কর স্বপ্ন
- বাদশাহ্ আলমগীর ও বাহাদুর শাহের শিক্ষক
- সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে দাক্ষিণাত্যে
- বাদশাহ্ আলমগীরের জানাযা এবং ইবাদাতের বহিঃ প্রকাশ.....
- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের প্রতি সম্রাট শাহ্ আলমের অভ্যর্থনা এবং তাঁর সাথে রাজ-কার্যে
- গুপ্তচরের ভূমিকায় দুঃসাহসিক এক মহাপুরুষ
- তাসাওউফে দীক্ষিত এবং সূফী খিরকাহ্ লাভ
- তাসাওউফে দীক্ষিত হওয়ার কারণসমূহ
- ব্যতিক্রমধর্মী এক সূফী-সাধক
- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্র
- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের সময়ে ভারতবর্ষ
- মুল্লাজীউনের সময়কার রাজা-বাদশাহগণ
- দেশ-বিদেশ ভ্রমণে মুল্লাজীউন
- মুল্লাজীউনের মাতৃভাষার রহস্য উদ্‌ঘাটন
- মুল্লাজীউনের চিন্তাধারায় বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাব
- আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর মাযার যিয়ারত
- কুমিরের সাথে সংঘর্ষ
- ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতকের এক বিস্ময়কর মণীষী
- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব
- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- মুল্লাজীউনের মৃত্যু ও দু'কবরের রহস্য
- শেষ কথা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জীবন-দর্শন

মুখবন্ধঃ

মানুষ স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষই মানুষের অধ্যয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে-

"Man is the best creature of Allah.[১]" The best study for mankind is man".[২]

মানুষ পৃথিবীতে আসে আর যায়, এর মাঝে অনেক মানুষই অমর হয়ে রয়। প্রতিনিয়ত যাঁদের নাম উচ্চারিত হয়। যাঁদের জীবনপাঠে চিত্ত প্রসারিত হয়; এরূপ মানুষের আবির্ভাব কালে খুব কমই হয়। যাঁদের কাছে পৃথিবী ঋণী; যাঁদের অবদানে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি হয় এবং যাঁরা ব্যক্তির চেয়ে সমাজ নিয়ে বেশী ভাবেন। যেমন কবি বলেছেন-

"আয় দেল তামাম নফা' হায় সোদায়ে ইশক মেঁ
আগ জানকা যিয়ান হায় সো এইছা যিয়ান নেহেঁ।"[৩]

অর্থাৎ, হে অবুঝ মন! প্রেমের মাঝেই রয়েছে সব কল্যাণ
একটি জীবনের কোরবানীর মাঝে যে শত প্রাণ।

যাঁদের অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার বিকশিত আলো ইসলামী শরীয়াতের গন্ডিতে থেকে যুগ সমস্যার সমাধান দিয়েছে এবং উন্মোচন করেছে ধর্মের দিক; তাঁদের মধ্যে জ্ঞানতাপস, সরলমনা আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন অন্যতম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তথা কুরআন, হাদীস, তাফসীর, আকাঈদ (ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত বিদ্যা), মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), তাসাওউফ (আধ্যাত্মবাদ), নাহ্‌ব (বাক্য প্রকরণ ও শব্দের শেষ অক্ষরের স্বরচিহ্ন নির্ণয় শাস্ত্র), সরফ্‌ (শব্দ

---

[১]. এম. এ. সামাদ, *Methods of Learning Correct English*, ৪৫ তম সংস্করণ, গ্রীন বুক হাউজ, (রচনা অধ্যায়),বগুড়াঃ ১৯৮৫, পৃ. ১৬৬।

[২]. সৈয়দ আব্দুস সুলতান, *বড় মানুষদের ছোটকালের কথা*, ৫ম সংস্করণ, রুনা প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৫।

[৩]. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *জীবন পথের দিশা*, (মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকরণ বিদ্যা), বালাগাত (বাক্যালংকার শাস্ত্র), ফিক্‌হ (ইসলামী আইন শাস্ত্র), উসূল-ই- ফিক্‌হ (ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি), আরবী ও ফার্সী সাহিত্যে যাঁর ছিলো বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছন্দ পদচারণা।[৪]

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত ভারতীয় ইসলামী চিন্তাবিদ আজাদ বিলগ্রামী বলেছেন-

> "মুল্লাজীউন ছিলেন আল্লাহর কালামের সংক্ষিপ্ত সার,[৫] এবং আকলী ও নকলী তথা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক অকুল সমুদ্র।"[৬]

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন সম্পর্কে বলেন-

> "তাঁর আগমন হয়েছিলো ঐ যুগে, যখন ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টিকরা ও মর্যাদা লাভের মূল চাবিকাঠি ছিলো ফিক্‌হ ও উসূল-ই-ফিকহ।[৭] এ ক্ষেত্রেই রয়েছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী যেমন ভারতবর্ষে হাদীস শাস্ত্রের যুগ স্রষ্টা;[৮] তেমনি মুল্লাজীউন ফিক্‌হ ও উসূল-ই-ফিক্‌হ এর স্রষ্টা ও মুজতাহিদ।[৯] 'তাফসীরে আহমাদী' ও 'নূরুল আনওয়ার' এ দু'টি কালজয়ী গ্রন্থের প্রণেতা; বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব ও তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহের শিক্ষক ও ধর্মোপোদেষ্টা।[১০] বোধকরি এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়।"

---

[৪]. ওমর রেযা কাহ্‌হালা, *মুজামুল মুআল্লিফীন-তারাজিমু মুসান্নিফিল কুতুব আল আরাবিয়্যাহ্*, ১ম খন্ড, বৈরুত, লেবাননঃ ১৯৫৭, পৃ. ২৩৩।

[৫]. মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা, *আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*, ১ম খন্ড, (মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৯।

[৬]. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা,আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তানঃ ১৯৮৬, পৃ. ২১৮।

[৭]. আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, *হিন্দুস্তান কী-কাদীম দরসগাঁহে*, মা'আরিফ প্রেস, আযমগড়ঃ ১৯৩৬, পৃ. ৮৯-১০০।

[৮]. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ৫ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ৬৩৭।

[৯]. অধ্যাপক আব্দুল করিম সম্পাদিত, *ইসলামী ঐতিহ্য*, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান (চট্টগ্রাম)ঃ ১৯৮৫, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৬-৩৭।

[১০]. ইউসুফ আলইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবু'আতু'ল আরাবিয়্যাহ্*, ২য় খন্ড, সারকীস মূদ্রণালয়, মিশরঃ ১৯২৮, পৃ. ১১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার অধিকারী এবং জ্ঞানতাপস ও সরলমনা আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন আমাদের মাঝে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। তাইতো কবির সুরে আমরা গেয়ে উঠতে পারি-

জীওয়ান অর্থ প্রাণ
পুষ্পসম তোমার ঘ্রাণ।
সারা দুনিয়া ছেয়ে গেছে
তোমার সে নামের সুঘ্রাণ॥

বিস্ময়কর নামটি
বিস্ময়কর খ্যাতি।
চিরদিন স্মরণ করবে, তোমায় জাতি
চিরদিন থাকবে, তোমার অম্লান খ্যাতি॥

মরেও তুমি মৃত নও
রেখে গিয়েছো স্মৃতি।
স্বার্থক তোমার নাম
স্মরণ করবে জাতি॥

সত্যিই (জীওয়ান) প্রাণ
তুমি আজো মোদের প্রাণের প্রাণ।
এক মুহূর্তের তরে, ভুলিতে নাহি পারে
একটি প্রাণকে, শত-শত প্রাণ॥[১১]

(১) নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম ও উপনাম

তাঁর নাম আহ্‌মাদ,[১২] তবে তিনি 'মুল্লা জীওয়ান' বা 'শেখ জীওয়ান' নামে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত।[১৩]

---

[১১]. স্বরচিত।

[১২]. আরবীর সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এরূপ লেখা হয়েছে। (বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ বানান রীতি দ্রষ্টব্য), ১৪শ খন্ড, পৃ. ১১ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

[১৩]. রফীক আহমাদ রফীক, *ইরশাদুত্তালিবীন ফী আহ্ওয়ালিল মুসান্নিফীন*, আশ্‌রাফিয়া লাইব্রেরী, পটিয়া, চট্টগ্রামঃ ১৩৯৯ হিজরী, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

আর 'মুল্লা' শব্দটি তুর্কী[১৪] (Mevla) এবং আরবী (Mavla) এর রূপভেদ। যার অর্থ প্রভূ (Lord), মনিব (Master), দাস (Slave) ইত্যাদি।

তবে এখানে 'মুল্লা' শব্দটি 'ধর্মীয় সূফী-পন্ডিত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তুরস্ক, পারস্য, রাশিয়া ও ভারতে ইসলামের ধর্মীয় গুরু বা পন্ডিতের পদবীরূপে 'মুল্লা' শব্দটি ব্যাপক প্রচলিত।[১৫] এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তৎকালে একজন ইসলামের ধর্মীয় গুরু বা পন্ডিত ছিলেন।

'জীওয়ান' শব্দটি হিন্দী। যার অর্থ- প্রাণ বা জীবন।[১৬] তাঁর এই উপনামটি কোন্ সময় থেকে শুরু হয়, তার সঠিক কোনো ইতিহাস জানা যায়নি। তবে 'মুল্লা' শব্দের ইতিহাস থেকে অনুমান করা যায় যে, এর পূর্বে তিনি 'জীওয়ান' নামে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। যখন তিনি তাসাওউফে দীক্ষিত হন, তখন শেখ কর্তৃক অথবা সাধারণ মানুষ কর্তৃক এ বিস্ময়কর নামটি ধারণ করেন। কেননা তৎকালীন সময়ে তিনিই ছিলেন আলেম সমাজের প্রাণের চালিকাশক্তি। যেমন, 'আস্হাবে সুফ্ফাবাসী' রাসূল (সা.) কে দেখলে তাদের মৃতপ্রায় হৃদয়ে আশার সঞ্চার হতো; ঠিক তেমনি তাঁকে দেখলেও নাকি তাসাওউফ পন্থীদের হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তির সুধা জাগ্রত হতো। এ কারণেই হয়তো তাঁকে 'জীওয়ান' বা জীবন বলা হয়েছে।[১৭]

অতঃপর যখন তিনি রাজ-দরবারে সভা গুরু বা ইসলামী আইনবিদ ও ধর্মীয় শিক্ষক নিযুক্ত হলেন; তখন তিনি 'মুল্লা' উপনামে ভূষিত হলেন। কেননা সেকালে ধর্মমন্ত্রীকে 'রাজ-সভা মুল্লা' বলা হতো।[১৮]

সুতরাং 'মুল্লা' ও 'জীওয়ান' এ দু'টি উপনামের সমন্বয়ে 'মুল্লা-জীওয়ান' বা 'মুল্লাজীউন' উপনামটি হয়েছে। আর পরবর্তীকালে এ উপনামেই তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেছেন। আর এ উপনামের সুখ্যাতিতে তাঁর মূল নাম লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে গেছে।

---

[১৪]. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, *সাহিত্য সংসদ*, কলকাতাঃ ১৯৮৬, পৃ. ৫৯০।

[১৫]. *Encyclopaedia of Religion and Ethics in the United States and Canada*, Vol-viii, Scribners, Edited by James Hastings, New York, America: 1965, p. 909

[১৬]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, *কামরুল আকমার শারহু নূরিল আনওয়ার (আরবী)*, মাকতাবায়ে থান্‌ভী, দেওবন্দঃ ১৯৮৩, পৃ. ৩১৮।

[১৭]. ইউসুফ আলইয়ান সারকিস, *মু'জামুল মাতবুআতুল আরাবিয়্যাহ্*, ২য় খন্ড, কায়রো, মিশরঃ ১৯২৮।

[১৮]. আযাদ বিলগ্রামী, *সুবহাতুল মারজান*, বোম্বেঃ ১৩০৩ হিজরী/১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬০৫।

Dhaka University Institutional Repository

তবে 'আহ্‌মাদ' নামের এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রয়েছে। সর্বকালেই এ নামটি প্রশংসিত হয়েছে। সর্বপ্রথম এ নামটি রাসূল (সা.) এর জন্যে ব্যবহৃত হয়। জাহেলী যুগে এবং সাহাবীদের যুগে এ নামটি রাসূল (সা.) ব্যতীত অন্য কারো নামের সাথে ব্যবহৃত হয়নি।

রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম এই নামটি ব্যবহৃত হয় আহ্‌মাদ বিন্ আমর তামীমীর নামে।[১৯] আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন এই বংশের লোক।[২০] আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনও কিন্তু সে ঐতিহ্যবাহী বংশের লোক ছিলেন।[২১] সেই কারণেই হয়তো তাঁর নাম 'আহ্‌মাদ' রাখা হয়েছিলো কি-না তার কোনো সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি।

বংশঃ

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের বংশ পরম্পরা এরূপঃ

মুল্লা আহ্‌মাদ বিন আবু সাঈদ[২২] বিন ওবায়দুল্লাহ[২৩] (মতান্তরে আব্দুল্লাহ্)[২৪] বিন আব্দুর রায্যাক বিন (শাহ)[২৫] মাখদুম খাস্‌সা-ই-খোদা[২৬] (মাখদুম খাস্‌সা)[২৭] বিন সালাহ উদ্দীন দেহলভী[২৮], আল-হানাফী, আল-সালিহী, আল-সিদ্দীকী, আল-মাক্কী,[২৯] আল-হিন্দুভী, আল-লখনৌভী, জৈনপুরী (জোনফারী),[৩০] আল-আমেথী (আমেঠী)।[৩১]

---

১৯. আল-মুআল্লিম বাতরুস আল-বুস্তানী সংকলিত, *দায়িরাতু'ল মা'আরিফ,* ২য় খন্ড, বৈরুত, লেবাননঃ পৃ. ৫৬৭।
২০. আব্বাস মাহমুদ আল- আক্‌কাদ, *আবু বকর সিদ্দীক (রা.),* মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকাঃ (তা. বি.) পৃ. ৬৩।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।
২২. মুল্লাজীর মাতৃকুল সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায়নি। এমনকি তাঁর মায়ের নামই বা কী ছিলো; সে সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি।
২৩. আব্দুল হাই আল-হাসানী, *নুযহাতুল খাওয়াতির,* ২য় সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খন্ড,হায়দারাবাদঃ ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ১৯-২০।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।
২৫. মাওলানা শায়খ আহমাদ, *তানযীমুল মাখ্যুন,* হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রামঃ ১৪১৪ হিজরী, পৃ. ১০৮।
২৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ,* সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ১১শ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
২৯. প্রখ্যাত লেখক Dr. C. Brockel Man মুল্লাজীকে আল-হানাফী আল মালেকী বলেছেন। তিনি যেভাবে কথাটি লিখেছেন তাতে মনে হয়, তিনি প্রথমে হানাফী ও পরে তা বর্জন করে মালেকী মাযহাব গ্রহণ করেছিলেন। অথচ এটি তাঁর জীবনে কখনো হয়নি। তিনি আজীবন হানাফী মাযহাবের মতামতকে সাব্যস্ত করেছেন; যার প্রমাণ তাঁর রচনাবলী। সম্ভবতঃ তিনি 'আল' শব্দটিকে 'মীম' বর্ণের পরে পড়েছেন। তারপর আরেকটি 'আল' কে পূর্বে সংযুক্ত করেছেন। ফলে 'আল-মাক্কী' এর পরিবর্তে 'আল-মালেকী' হয়ে গেছে। পরবর্তীতে অনেকে তাঁর এ ভুলের উপর সওয়ার হয়েছেন।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।
৩১. রহমান আলী সাহিব, *তাযকিরা-ই-উলামা-ই-হিন্দ,* নুল কিশুর মুদ্রণালয়, লক্ষ্ণৌঃ ১৯৯৪, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

নামের শেষে ব্যবহৃত উপাধিঃ

আল-হানাফীঃ মুল্লাজীকে আল-হানাফী উপাধিতে ভূষিত করার কারণ হলো- তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, ফকীহ্ ও উসূলবিদ।[৩২]

আল-সালিহীঃ আল সালিহী উপাধির কারণ হলো- মোল্লাজীর পরদাদা মাখদুম খাস্‌সা দাবী করতেন যে, তিনি হযরত সালিহ্ (আ.) এর বংশধর।[৩৩] এ দাবীটি ইতিহাসের যুক্তির আলোকে টেকে না। কেননা তাঁর পূর্বপুরুষ কেউ এ দাবী উত্থাপন করেননি। তাই হঠাৎ করে এরূপ দাবী করা যুক্তি বিরোধী। তবে এর সমাধান হলো- তাঁর পূর্বপুরুষ শেখ সালাহ্ উদ্দীন দেহলভী নামে একজন কামিল-বুজূর্গ লোক ছিলেন। সেই কামিল ব্যক্তি সালাহ্ উদ্দীন দেহলভীর দিকে শাহ্ মাখদুম খাস্‌সা নিজেকে সম্বোধন করে 'সালিহী' বলতেন।[৩৪] এ মতটিই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ও যুক্তিযুক্ত।

আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন- তিনি হলেন নবী হযরত সালিহ (আ.); তাই তাঁর বংশ পরম্পরা হযরত সালিহ্ (আ.) এর দিকে সম্বোধন করেছেন। যা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি ও যুক্তির বিরোধী।

আল-সিদ্দীকীঃ আহমাদ মুল্লাজীউনের উপাধি সমূহের মধ্যে 'আল-সিদ্দীকী' উপাধিটি বিশেষ তাৎপর্যবহ ও মর্যাদা সম্পন্ন। কেননা তাঁর বংশ গোড়ার দিকে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর সাথে সংযুক্ত। সেজন্য তাঁর উপাধি হলো 'আল- সিদ্দীকী'।[৩৫]

আর আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অন্যান্য উপাধিগুলো স্থানের প্রতি সম্বোন্ধ করে রাখা হয়েছে। মক্কা ব্যতীত সবগুলোই হিন্দুস্থানের উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গার নাম।

---

৩২. *The Islamic University Studies*, Vol-I, Published by the Registrar, Islamic University, Kushtia: 1990, p. 42.

৩৩. আল-বাগদাদী (রহ.), *হাদইয়াতুল আরিফীন*, ১ম খন্ড, মিশরঃ ১৯৮৫ খ্রি. পৃ. ১৭।

৩৪. *দাইরা-ই-মাআরিফ-ই-ইসলামিয়াহ* (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ৭ম খন্ড, লাহোরঃ ১৯৭১, পৃ. ৬০৫।

৩৫. *ফাহরাসুল তাইমুরিয়্যাহ*, ১ম খন্ড, বাগদাদঃ ১৯৬৮, পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব-পুরুষের বাসস্থানঃ

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের পূর্ব- পুরুষের আদি নিবাস হিজাযের মক্কা মুয়ায্যমায়।[৩৬] তাঁদের মধ্যে থেকে কোনো একজন মক্কা থেকে ভারতে আগমন করেন। সর্বপ্রথম কে আগমন করেন এবং কোথায় বসবাস করেন, তার কোনো সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। তবে এতোটুকু জানা যায় যে, মুল্লাজীর দাদা আব্দুল্লাহ্ (ওবায়দুল্লাহ্), তাঁর দাদা শাহ্ মাখদুম খাস্সা দিল্লী হতে স্থানান্তরিত হয়ে 'আমেথী' তে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর পূর্বপুরুষগণ মক্কা থেকে এসে দিল্লীতে বসবাস শুরু করেন। সুতরাং মক্কার পর দিল্লীই ছিলো তাঁর পূর্বপুরুষদের সর্বপ্রথম বাসস্থান; এরপর আমেথী।[৩৭]

(২) জন্ম ঃ

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সমধিক আলোচিত ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী ও তদীয় পুত্র সাবেক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রী রাজীব গান্ধীর নির্বাচনী এলাকা উত্তর প্রদেশের আমেথী। আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী আমেথী পরগণায় আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ বছরেরও অধিককাল পূর্বে ১০৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সঠিক কোনো তারিখ নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায়নি।[৩৮] তাঁর পিতার নাম আবু সাঈদ এবং দাদার নাম ওবায়দুল্লাহ্। অবশ্য কোনো কোনো সূত্রে তাঁর দাদার নাম আব্দুল্লাহ্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মুল্লাজীর মাতৃকুল সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায়নি; এমনকি তাঁর মায়ের নাম কী ছিলো, সে সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি।

উপরোক্ত মতটি ছাড়াও আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের জন্ম সম্পর্কে আরও তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

---

[৩৬]. মাওলানা জামীল আহমাদ, *কুতু'ল আখইয়ার শারহু নূরিল আনওয়ার*, ১ম খন্ড, মাকতাবাতুল বালাগ, দেওবন্দঃ ১৯৮৯, পৃ. ১৩।

[৩৭]. লক্ষ্ণৌ থেকে ৭০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আর জৌনপুর থেকে ৬০ মাইল উত্তরে আমেথী শহর অবস্থিত। এখানেই মুল্লাজীর জন্ম ও মৃত্যু হয়।

[৩৮]. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ নুযহাতুল খাওয়াতিরের বর্ণনায়- মুল্লাজী ১০৪৭ হিঃ/ ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৫ শে শা'বান সোমবার দিনে আমেথী (আমেঠী) শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩৯]

দ্বিতীয়তঃ 'সুবহাতুল মারজান' গ্রন্থের বর্ণনায়- তিনি ১০৪৮ (১৬৩৮ খ্রিঃ) হিজরী সনে লক্ষ্ণৌ প্রদেশের 'আমেথী' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৪০]

তৃতীয়তঃ আবার কোনো কোনো বর্ণনায় আমেথীর অন্তর্গত 'কাস্‌বা' নামক স্থানে তাঁর জন্মের কথা উল্লেখ আছে।[৪১]

এখন প্রশ্ন জাগে তিনি কোন্ আমেথীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা গ্রাম না শহর। গ্রাম বলে কোনো আমেথী ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে নেই। দু'টি আমেথী আছে। দু'টিই বর্তমানে শহর। তাহলে 'সুবহাতুল মারজান' গ্রন্থকার কীভাবে আমেথীকে বললেন? এর সমাধান এই যে, সেকালে হয়তো গ্রাম ছিলো; কিন্তু বর্তমানে তা শহরে রূপলাভ করেছে। যারা 'কাস্‌বায়' জন্মের কথা বলেছেন, তারা অনুবাদ করতে ভুল করেছেন। কেননা আরবীতে 'কাস্‌বাহ' অর্থ শহর।[৪২] এটা কোনো জায়গার নাম নয়।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক এ,কে,এম, নূরুল আলম- মুল্লাজীর জন্মস্থান লক্ষ্ণৌ[৪৩] এর সংশ্লিষ্ট 'আমেথী' বলে উল্লেখ করেছেন;[৪৪] কিন্তু তা ঠিক নয়।[৪৫] কেননা তার কবর হলো

---

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯।
৪২. মুহাম্মাদ আলী আল-নাজ্জার, *মাজমাউল লুগাতুল আরাবিয়্যাহ*, ইস্তাম্বুল, তুর্কীঃ ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ৭৩৭।
৪৩. লক্ষ্ণৌ ভারতের উত্তর প্রদেশে দিল্লী থেকে ২৭০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ দিকে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর।
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
৪৫. তাঁর (অধ্যাপক এ,কে,এম,নূরুল আলম) এর ভুল প্রমাণিত হয় তাঁর প্রবন্ধ (মোল্লাজীওনঃ বিস্ময়কর এক মনীষা) দ্বারাই। কেননা তিনি মুল্লাজীকে জৌনপুরী বলেছেন। যদি তিনি লক্ষ্ণৌ সংলগ্ন আমিথীতেই জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে দূরবর্তী শহর জৌনপুরের দিকে সম্বোধন করার প্রয়োজন হতো না। কেননা জৌনপুর লক্ষ্ণৌ থেকে ১৩০ মাইল দূরে। পক্ষান্তরে আমেথী ২০ মাইল দূরে। তারপর তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন- লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী আমেথীতে জন্মের কথা। তিনি যে সব তথ্য থেকে তাঁর প্রবন্ধ লিখেছেন; সে সব গ্রন্থকারসহ সমস্ত জীবনী লেখকগণ বলেছেন জৌনপুর সংশ্লিষ্ট আমেথীর কথা। তাদের জানা ছিলো 'আমেথী' (আমেঠী) দু'টি। একটি জৌনপুর সংশ্লিষ্ট অপরটি লক্ষ্ণৌ। সংশ্লিষ্ট পাঠকগণ যাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না পড়েন; সে সন্দেহ দূর করার জন্যই তাঁকে 'জৌনপুরী' বলে সম্বোধন করেছেন। তবে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো- মুল্লাজীর মাদ্রাসার আব্দুল্লাহ নামে একজন ছাত্রের পত্র। যিনি হাদীস শেষ বর্ষের ছাত্র। তিনি বর্তমানেও সে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত। তিনি বলেছেন- "ইহা জৌনপুর সংশ্লিষ্ট আমেথী; লক্ষ্ণৌ সংশ্লিষ্ট আমেথী নয়।"

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানপুর ও জৌনপুর[৪৬] শহরদ্বয় সংশ্লিষ্ট আমেথী শহরে।[৪৭] আর একথা সকলেই মনে নিয়েছেন যে, তাঁর যেখানে জন্ম হয়েছে; সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

তাছাড়া আরেকটি যুক্তি এই যে, তাঁর নামের শেষে 'জৌনপুরী' নেসবতী নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি যদি লক্ষ্ণৌ সংলগ্ন আমেথীতে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে এ পদবীটি তাঁর নামের সাথে সংযুক্ত হতো না। কেননা জৌনপুর লক্ষ্ণৌ থেকে ১৩০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। পক্ষান্তরে লক্ষ্ণৌ সংলগ্ন 'আমেথী' লক্ষ্ণৌ শহর থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে অবস্থিত।[৪৮] নিকটতম শহরের দিকেই সাধারণতঃ সম্বোধন করা হয়; দূরবর্তী শহরের দিকে নয়। এ যুক্তির আলোকেও বলা যায় যে, আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন সুলতানপুর ও জৌনপুর সংলগ্ন আমেথীতেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

---

৪৬. ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ জৌনের নামানুসারে 'জৌনপুর' শহরের নামকরণ করেন। তিনি ছিলেন এ শহরটির পৃষ্ঠপোষক। এ শহরটি তৎকালীন সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুবই উন্নত ছিলো।

৪৭. ফকীর মুহাম্মদ, *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ*, ৩য় সংস্করণ, লক্ষ্ণৌঃ ১৩২৪ হি./১৯০৬ খ্রি., পৃ. ২১৮।

৪৮. *The oxford School Atlas*, Delhi Oxford University Press, 28th Revised Edition, Bombay: 1993, p. 18.

Dhaka University Institutional Repository

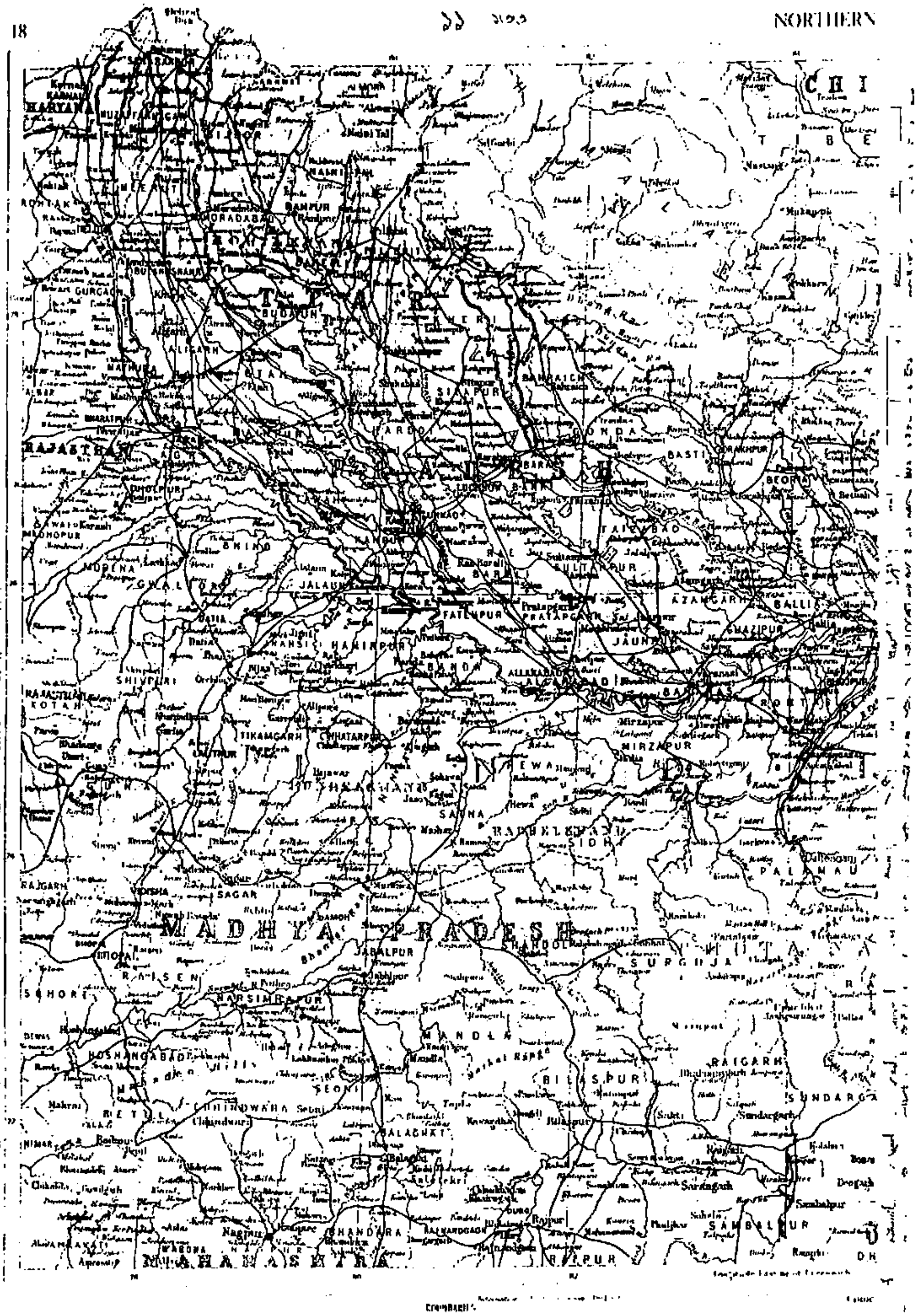

উৎস ঃ *The Oxford School Atlas*, Delhi Oxford University Press, 28th Revised Edition, Bombay: 1993, p. 18.

Dhaka University Institutional Repository

(৩) শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষাঃ

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন তাঁর শৈশবকাল পিতৃগৃহেই কাটান। সেখানেই তাঁর হাতে প্রাথমিক শিক্ষার খড়ি পড়ে। শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্ত করে ফেলেন। তের বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। এ পর্যন্ত তিনি আপন গৃহেই শিক্ষা লাভ করেন।[৪৯]

(৪) উচ্চশিক্ষা ও সনদলাভঃ

অতঃপর আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে (উলূম ও ফুনূন) পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং তৎকালীন পন্ডিতগণের নিকট ইসলামী বিষয়সমূহে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা লাভ করেন প্রখ্যাত আলেম শেখ মুহাম্মদ সাদেক আল সিতারখী (অথবা তারখী) এর নিকট। তাঁর নিকটেই মাত্র ষোল বছর বয়সে যৌক্তিক ও ঐতিহ্যভিত্তিক বিজ্ঞান সমূহের শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৫০]

নিয়মতান্ত্রিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের শেষ পর্যায়ে তিনি ফতেহ্পুর[৫১] এলাকার কুড়া নামক স্থানে আল্লামা মোল্লা হযরত লুৎফুল্লাহ কুড়া জাহানাবাদী (অথবা কুর্ভী জাহানাবাদী) এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা সমাপনী সনদ প্রাপ্ত হন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিলো মাত্র ষোল বছর।[৫২] অপর একটি বর্ণনায় মাত্র ২২ বছর।[৫৩] এতো অল্প বয়সেই তিনি ধর্মীয় বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন মহান আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত অসাধারণ ধীশক্তির বলে।

---

[৪৯]. আব্দুল হাই আল হাসানী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, ৬ষ্ঠ খন্ড, হায়দারাবাদঃ ১৩৫০ হিজরী, পৃ. ২০।
[৫০]. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ২১৭।
[৫১]. ফতেহ্পুর দু'টি। একটি হলো কানপুর সংশ্লিষ্ট ফতেহ্পুর যা কানপুর থেকে ৫০ মাইল, লক্ষ্ণৌ থেকে ৭০ মাইল এবং আমেথী থেকে ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। উহা অনেক বড় একটি প্রাচীন শহর। অপরটি হলো লক্ষ্ণৌর উত্তর-পূর্ব দিকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। যা আমেথী থেকে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত। শহরটি হালি ও অতি ছোট, যা মুল্লাজীর সময় ছিলো না। সুতরাং প্রবন্ধে প্রথম ও বড় ফতেহ্পুরটি উদ্দেশ্য। সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো- মুল্লাজীর ওস্তাদ লুৎফুল্লাহ কুড়া ফতেহ্পুরীর জীবনীতে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী তাঁর নুযহাতুল খাওয়াতিরে এ ফতেহ্পুরকে নির্দেশ করেছেন এবং আজ অবধি তথায় তাঁর মাযার রয়েছে। (আধুনিক পৃথিবীর মানচিত্রঃ ১১৯৪ সংস্করণ, প্রকাশকঃ চন্ডীচরণ দাস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ.২৫)।
[৫২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
[৫৩]. ফকীর মুহাম্মদ, *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ*, নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৮৮৬, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) প্রখর স্মৃতিশক্তিঃ

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। একবার কোনো একটি কবিতা শোনার পর তিনি তা মুখস্ত বলতে পারতেন। তাই তা যতো লম্বা ও যতো জটিলই হোক না কেন। কোনো একটি বই পড়ার পর তা আর দ্বিতীয়বার পড়ার কোনো প্রয়োজন হতো না। পৃষ্ঠা-পৃষ্ঠা, অক্ষরে-অক্ষরে বলতে পারতেন।[৫৪] পঠিত পুস্তক সমূহের পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ প্রতিটি বাক্য তিনি হুবহু স্মরণ রাখতে পারতেন। একবার শ্রবণ করলেই বড় বড় ক্বাসীদা তাঁর মুখস্ত হয়ে যেত।

মাত্র ৭ বছর বয়সে কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণরূপে মুখস্ত করেন, ২ মাস ৭ দিনে সফরাবস্থায় নিজের স্মৃতি থেকে 'নূরুল্-আন্ওয়ার' এর মতো একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করাই প্রমাণ করে যে, মুল্লাজীউন ছিলেন অতি বিস্ময়কর প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী একজন ব্যক্তি।[৫৫]

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যা মানযুর নোমানী কর্তৃক সম্পাদিত 'আল-ফুরকান' নামক মাসিক পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

"একদা আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন তাঁর হাজ্জের দ্বিতীয় সফরে মদীনার একটি মসজিদে পড়াচ্ছিলেন। এ শোরগোল তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। তখন এক বিজ্ঞ আলিম তাঁকে পরীক্ষা করতে আসলেন। তিনি এসে দেখলেন মুল্লাজী ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। তখন তিনি সেখানে বসে যান। অতঃপর মুল্লাজীর দারস শোনার পর তাঁর ধারণা পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি দেখলেন, মুল্লাজী 'মানার' কিতাবটি পড়াচ্ছেন, অথচ তার দিকে লক্ষ্য করছেন না। তখন তিনি মনে করলেন, কিতাবটি হয়তো তিনি মুখস্ত করে ফেলেছেন; তাই দেখার কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না। অতঃপর তিনি শুনতে পেলেন, মুল্লাজী যা একবার মনোযোগ সহকারে পড়েন, তা আর দ্বিতীয়বার পড়তে হয় না। একথা শোনার পর তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে মুল্লাজীকে তা আবৃত্তি করতে বললেন। মুল্লাজী তা হুবহু আবৃত্তি করায় বিজ্ঞ আলিম ভাবলেন, কবিতাটি হয়তো তাঁর আগে থেকে মুখস্ত ছিলো। তাই তিনি পুনরায় আরেকটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। এরূপ বেশ কিছুক্ষণ করার পর তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছ তাঁর প্রশংসায় আবৃত্তি করলেনঃ

---

[৫৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬৫।

[৫৫]. গোলাম সারওয়ার, *খাযীনাতুল আস্ফীয়া,* ৬ষ্ঠ খন্ড,নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্মৌঃ ১৯০২, পৃ. ৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইল্‌মু নুরুম্‌ মিন্‌ নুরি ইলাহী

ইউ'তী মাঈ ইয়াশাউ ওয়া লাও কুন্ত্ব শাকী

আন্তা 'আব্দুম্‌ মিন ইবাদি ইলাহী

ইউ'তী কাল্লাহু ওয়ালাও কুন্তা আ'জামী

আল-কুওয়াহ্‌ কুওয়াতুম্‌ মিন্‌ ইলাহী

ইউ'তীকাল্লাহু ফা'আন্তা যাকী[৫৬]

তাঁর জবাবে আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন আবৃত্তি করলেনঃ

আল-ফাদ্‌লু ফাদ্‌লুম্‌ মিন্‌ ইলাহী

লা ফাদ্‌লা ফীল আ'রাবী

আন্তা 'আব্দুম্‌ মিন্‌ 'ইবাদি রাব্বী

ফা'য্‌কুর কিস্‌সাতা'ল খিদির ওয়ার্‌রায়ী[৫৭]

আল-ইল্‌মু জুয্‌উ'ম্‌ মিন্‌ জুয্‌ই' ইলাহী

ফাশ্‌কুরু'ল্লাহা ওয়া মা ইউ'তী।"[৫৮]

ভাবানুবাদঃ *

জ্ঞান হলো মোর উপাস্য-র জ্যোতির জ্যোতি

যাকে ইচ্ছে করেন তারে করেন অধিপতী

যত অভিযোগ করিনা কেন আমি।

মোর উপাস্য-র শত সৃষ্টির মাঝে তুমি এক বিস্ময়কর সৃষ্টি

তোমার প্রতি আল্লাহ্‌ দিয়েছেন করুণার দৃষ্টি

তাই বোবাদেশের হয়েও তুমি এক বিস্ময়কর কৃষ্টি।

---

* স্ব- ভাবানুবাদ।

৫৬. মানযুর নোমানী, *আল-ফুরকান,* (উর্দু মাসিক), লাহোরঃ ১৯৩৫, ৩২তম সংখ্যা, পৃ. ৩৩।

৫৭. 'রা'য়ী' অর্থ- বকরীর রাখাল। এখানে আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ.) উদ্দেশ্য। কেননা, একসময় তিনি বকরী (ছাগল) চরাতেন। (মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মাআ'রিফুল কোরআন,* সূরা বাক্বারাহ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭৯)

৫৮. মানযুর নোমানী কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-ফুরকান,* (উর্দু মাসিক), বেরিলী (Barielly): ১৯৩৫, ৩২তম সংখ্যা, পৃ. ৩৩। (মূলতঃ এ ঘটনাটি উল্লেখ করে ছাত্র ও আলিম সমাজকে বিদ্যা চর্চার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।)

Dhaka University Institutional Repository

সকল শক্তির উৎস তিনি
যিনি মোর উপাসনার স্বামী।
করুণাবশতঃ এক অণু দিয়েছেন তোমায় তিনি
তাই তুমি স্মৃতিশক্তির এক অভিনব স্বামী।

সকল সম্মানের উৎস তিনি
যিনি মোর উপাসনার স্বামী
আরবীর জন্য নাই কোনো বিশেষ সম্মানী।

তুমি তো মোর প্রভূর শত-সৃষ্টির মাঝে এক অভিনব সৃষ্টি
খিজির-মুসার ঘটনার প্রতি একটু দাওনা দৃষ্টি।
সকল জ্ঞানের উৎস তিনি
যিনি মোর উপাসনার স্বামী।
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করো তুমি
যা কিছু দিয়েছেন বিশ্বাস্বামী॥"

সুতরাং, আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত এক বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী। যা সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক হবার মতো একটি বিষয়। যা স্বীকার করে নিয়েছেন সকল জীবনীকার।

(৬) বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগঃ

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউনের প্রাথমিক শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয় নিজ শহর আমেথীতে। তিনি এখানে একটি মাদ্রাসা ও স্থাপন করেন এবং নিয়মিত পাঠদান কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। সময়ের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর লিখিত তাফসীর খানার সংশোধনী দেখেন। এভাবে এখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁর ৪০টি বছর কেটে যায়।

অতঃপর তিনি আজমীর ও দিল্লীতে যান। এখানেও তিনি শিক্ষাদানে ব্রতী হন। বহুলোক তাঁর কাছ থেকে ইসলামের মৌলিক বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন।[৫৯] এ পেশায় মুল্লাজীর কেটে ছিলো প্রায় ৬১/৬২ বছর।[৬০]

---

[৫৯]. শাকির আখতার, *ইযাহু'ল মাকনুন*, ২য় খন্ড, মাকতাবাতুল ইসতিকামাহ, কায়রো, মিশরঃ ১৯৩৯, পৃ. ৫৫৪।
[৬০]. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকতা পেশায় তিনি যেখানেই নিয়োজিত হতেন; সেখানেই তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে শরীর চর্চা, কুচ্‌কাওয়াজ ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, একজন মুমীনকে যেমন নফ্‌স (প্রবৃত্তি) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন;[৬১] ঠিক অনুরূপভাবে প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে।[৬২] সুতরাং, তাঁর মতে- যুদ্ধ দুই প্রকার। যথা-

(i) আধ্যাত্মিক যুদ্ধ (Spiritual Fight/Fight with Devils).

(ii) শত্রুর সাথে যুদ্ধ (Fight with Enemies).

উপরোক্ত দু'প্রকার যুদ্ধের সমন্বয়েই মূলতঃ একজন মুমীনের জীবন। তিনি শিষ্যদের পাঠদানের সময় বলতেনঃ

"তোমরা জিহাদের আয়াত পড়বে, এবং রাসূল (সাঃ), সাহাবী ও পূর্ব-পুরুষদের যুদ্ধের কাহিনী পড়বে; অথচ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করবে না, তা কখনো হতে পারে না। বরং সন্তরন, ঘৌড়-সওয়ারী এবং অসি চালনা শিক্ষা দেয়া প্রত্যেক শিক্ষকের উপরই অত্যাবশ্যক। কেননা, পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে একজন পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শবান মানুষ হবার জন্যই তো বিদ্যালয়ে পাঠান।"[৬৩]

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাঁর ছাত্রদেরকে সন্তরন, ঘৌড় সওয়ার এবং অসি চালনা শিক্ষা দিতেন। একদা সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীতে যান কোনো একটি কারণে। তিনি সকালে প্রাসাদ থেকে দেখলেন, এক মুল্লা মাদ্রাসার ছেলেদের ঐরূপ প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। অতঃপর সম্রাট আওরঙ্গজেব লোক মারফত তাঁকে ডেকে এনে প্রশ্ন করলেন; আপনার দায়িত্ব হলো কেবল পাঠদান করা, আপনি কেনো তাদেরকে এরূপ সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন? সম্রাটের প্রশ্নের জবাবে মুল্লাজী বললেন, ইসলাম আমাদেরকে ঐরূপই শিক্ষা দেবার কথা বলেছে; তাই আমি এমনটি শিক্ষা দিচ্ছি। এতে লেখা-পড়ার কোনো ক্ষতি হয় না, বরং ছেলে-মেয়েরা আনন্দই পায়। আর সে কারণেই হয়তো আমার মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। সম্রাট আওরঙ্গজেব এ কথা শুনে তাঁর প্রতি অত্যন্ত খুশী হয়ে যান। এরপর থেকেই মুল্লাজীকে সব সময়

---

৬১. শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *আত্‌ তাফসীরাতুল্‌ আহ্‌মাদিয়্যাহ্‌ ফী বায়ানিল আয়াতি'শ শার'ইয়্যাহ্‌*, (টীকাকার, মাওলানা রহীম বখ্‌শ), প্রকাশকঃ আব্দুল করিম, দেওবন্দ, বোম্বেঃ ১৩২৭ হি./১৯০৬ খ্রি., পৃ. ৭৪০।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩।

৬৩. Mohammad Jubaer Ahmed, *Contribution of India to Arabic Literature,* Alahabad: 1946, p. 218.

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট সাথে রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। অতঃপর তাঁকে রাজ-দরবার ও সেনানিবাসের প্রশিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন।[৬৪]

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন যে দাক্ষিণাত্যে সামরিক বাহিনীতে একটানা ছয়টি বছর কাটিয়েছিলেন, তা সকল ঐতিহাসিক ও জীবনীলেখকগণই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন।[৬৫] আমরা জানি, যারা সেনাবাহিনীতে থাকে; তাদের আত্মরক্ষামূলক কিছু প্রশিক্ষণ নিতে হয়। আর যারা সেনাবাহিনীতে থাকে, তাদেরকে সৈনিকরূপেই চিহ্নিত করা হয়; তাই যুদ্ধ করুক বা নাই করুক। তাই অনেক ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকগণ তাঁর এই ছয়টি বছরকে সৈনিক জীবন বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৬]

এটা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে মুল্লাজী তাঁর জীবনের কোনো এক সময়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ছাত্রদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণের ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি হয়তো ছাত্রজীবনেই অথবা রাজ-দরবারে আসার পূর্বেই কোনো এক সময়ে সামরিক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। আর এ বিষয়টি মূলতঃ অস্বাভাবিক নয় এবং একজন সূফী সাধকের জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার কোনো প্রতিবন্ধক ও নয়। যেমন- আল্লামা কারামাত আলী জৌনপুরীর (১৮০০-১৮৭৩ খ্রিঃ) জীবনীতেও দেখা যায় যে, তিনি একজন দক্ষ সামরিক জান্তা ছিলেন। এজন্যে তিনি কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ ও নিয়েছিলেন।[৬৭] সুতরাং তিনি ছিলেন পাঠ্যপুস্তকের (Text Book) ঝানু আদর্শ শিক্ষক; অপরদিকে আধ্যাত্মিক ও সামরিক বিদ্যার দক্ষ একজন প্রশিক্ষক।

অতএব বলা যায়- মুল্লাজীর বিদ্যালয় ছিলো আধুনিক 'Cadet College' এর মানের, আর তিনি ছিলেন সেই কলেজের সর্বাধিনায়ক। এ কারণেই হয়তো আওরঙ্গজেব তাঁকে বেশী সম্মান করতেন। কেননা তিনি ছিলেন একদিকে 'জিন্দাপীর' (Living Saint) অপরদিকে পবিত্র ধর্মযোদ্ধা।[৬৮]

---

৬৪. *আত্-তাযকীরা,* (স্মরণিকা) বার্ষিকী, মাদ্রাসা-ই-উস্তাদ আলমগীর মুল্লাজীউন, আমেথী, ভারতঃ ১৯৮৬, পৃ. ৩ উৎসমূলঃ 'আস্সাফরু' (মুল্লাজীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত) নামক পান্ডুলিপি, যা ঐ মাদ্রাসায় সংরক্ষিত আছে।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৬৭. আব্দুল বাতিন, *সীরাত-এ-কারামাত আলী জৌনপুরী,* আসরারে করিমী প্রেস, এলাহাবাদঃ ১৩৬৮ হি., পৃ. ৯-১১।

৬৮. অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের ইতিহাস,* জমজম প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) লেখনী জগতে মুল্লাজীউনের পরিবারের অবদানঃ

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন যে নতুন লেখক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন বা তাঁর বংশে আর কেউ লেখক ছিলেন না; ব্যাপারটি এমন নয়। বরং জন্মগতভাবেই আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন ছিলেন ঐতিহ্যবাহী এক লেখক পরিবারের সন্তান। বহুকাল পূর্ব থেকেই তাঁদের পরিবারে লেখালেখির এ ধারাটি চলে আসছিলো। যেমন- মুল্লাজীর দাদা ওবায়দুল্লাহ (আব্দুল্লাহ) ও চাচা লেখক ছিলেন।

আল্লামা মুল্লাজীউন এ প্রসঙ্গে তাঁর মানাকিবুল আওলিয়া, গ্রন্থে বলেছেনঃ

> "আমার বয়স যখন তের বছর, তখন আমি আমার
> দাদা ও চাচার সংকলনগুলো পড়তাম এবং পরিমার্জন,
> পরিবর্ধন ও পরিশুদ্ধ করতাম।"[৬৯]

মুল্লাজীর উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ লেখক ছিলেন। তবে তারা কে, কী বিষয়ে, কী কিতাব লিখে গেছেন; তা কালের স্রোতে আমাদের নিকট অস্পষ্ট। মুল্লাজীর উপরোক্ত কথার দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, কৈশর কালের মধ্যেই তাঁর মাঝে প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিলো। কেননা যদি তিনি একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি না-ই হবেন, তাহলে এতো অল্প বয়সে তাঁকে ঐ পান্ডুলিপির সংকলনগুলোকে সংশোধনীর জন্য কখনোই দেয়া হতো। তাই তিনি ছিলেন একজন সুযোগ্য উত্তরসূরী লেখক।[৭০]

আর মুল্লাজীও রেখে গিয়েছিলেন এক সুযোগ্য উত্তরসূরী পুত্র। যার নাম আব্দুল কাদির। তিনি পিতার লিখিত কিতাব 'মানাকিবুল আওলিয়া' এর পরিবর্ধন ও পরিশিষ্ট লিখে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাবে রূপান্তরিত করেন।[৭১] যদি তিনি তাঁর সুযোগ্য ও শিক্ষিত পুত্র না হতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে এ কাজ করা আদৌ সম্ভবপর হতো না। সুতরাং, তিনিও একজন সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন।

অতএব আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, লেখনী জগতে ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুল্লাজীউনের পরিবারের অবদান অপরিসীম, যা চিরস্মরণীয়।

---

৬৯. আল্লামা শেখ আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *মানাকিবুল আওলিয়া,* আমেথী, (সুলতানপুর) লক্ষ্ণৌ, উত্তর প্রদেশ, ভারতঃ (তা. বি.) পৃ. ১৯৭।

৭০. Dr. Mohammad Ishaq, *India's Contribution to the study of Hadith Literature*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka: 1976, p.374.

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২২।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) হাজ্জ্বব্রত পালনঃ

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন তাঁর জীবনে সর্বমোট কয়বার 'হজ্জ্ব' ও 'ওমরাহ' পালন করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে পাওয়া যায়নি। তবে ঐতিহাসিকগণ বলেন- তিনি দু'বার হিজায ও মক্কা মদীনা সফর করেন। এ দু'সফরে তাঁর সর্বমোট সময় কাটে মোট নয় বছর।[৭২] এ নয়টি বছরের প্রত্যেক বছরেই তিনি 'হজ্জ্ব' পালন করেছেন কি-না, নাকি প্রথম সফরে একবার আর দ্বিতীয় সফলে দ্বিতীয়বারের মতো 'হজ্জ্ব' সম্পাদন করেছেন কি-না; নাকি মাঝের বছরগুলো কোনো 'হজ্জ্ব' পালন করেননি বরং একাধিকবার 'ওমরাহ' পালন করেছিলেন- এ প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো আমরা নিম্নোক্ত আলোচনায়।

আল্লামা মুল্লাজীউন তাঁর হিজায ও মক্কা-মদীনার দীর্ঘ সফরে যে একাধিকবার 'হাজ্জ্ব' কিংবা 'ওমরাহ্' পালন করবেন না; তা যুক্তিতে টেকে না এবং মনও তাতে সাঁয় দেয় না। কেননা তিনি এ দু'টি সফরের অধিকাংশ সময় হেরেমদ্বয় তথা পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীতে কাটিয়েছেন। তিনি নগরীতে থাকবেন অথচ তাঁর চোখের সামনে অন্যান্য লোকেরা হাজ্জ্বব্রত পালন করবেন; আর তিনি তা নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখবেন, তা কখনো বিশ্বাস করা যায় না। কেননা ঐ সময় তাঁর রূহানী শক্তির (Spirtual Develpment) চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো।[৭৩]

অতএব আহ্মাদ মুল্লাজীউন একাধিকবার 'হাজ্জ্ব' (সর্বাধিক নয় বার) ও 'ওমরাহ' পালন করেছিলেন। যারা ২/৩ বার হাজ্জ্ব করার কথা বলেন, তারা শুধু প্রথম সফর ও দ্বিতীয় সফরের কথাই বলেন।[৭৪]

প্রথম সফরঃ

মুল্লাজীর বয়স যখন ৫৩/৫৫ বছর, তখন তিনি (১১০২ হিঃ/১৬৯০ খ্রিঃ) সনে প্রথমবারের মতো মক্কা ও মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মক্কা মুয়াযযমা ও মদীনা মুনাওয়ারার হারামাই-আশ্-শরীফাইনের সান্নিধ্যে তিনি দীর্ঘ পাঁচ বছর কাল অতিবাহিত করেন। ঐ সময় তিনি যাহেরী (প্রকাশ) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) ফয়েজ[৭৫] ও বরকত লাভ করতঃ স্বীয় জ্ঞান ও রূহানিয়াতের ভান্ডার আরও সমৃদ্ধ করেন। অতঃপর (১১০৭ হিঃ/১৬৯৫ খ্রিঃ) সনে মুল্লাজী হিন্দুস্থানে প্রর্ত্যাবর্তন করেন।[৭৬]

---

[৭২]. সিদ্দীক হাসান খান, *আব্জাদু'ল উলুম*, ভূপালঃ ১৯২৫ হিজরী , পৃ. ৯০৭।
[৭৩]. আযাদ বিলগ্রামী, *সুবহাতুল মারজান*, পৃ. ২২০।
[৭৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।
[৭৫]. এটি তাসাওউফ বা সূফীবাদের একটি বিশেষ পরিভাষা। যা মুর্শীদের হৃদয় তথা ক্বালব থেকে সালেকের (মুরীদের) ক্বালবে সঞ্চারিত হয়। (আ.ন.ম.বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক*, ৩য় সংস্করণ, সেরহিন্দ পাবলিকেশন্স, ঢাকাঃ ১৯৭৬, পৃ. ২৭৩)
[৭৬]. ইউসুফ আলইয়ান সারকিস, *মুজামুল মাত্বুআত আল আরাবিয়্যাহ্*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় সফরঃ

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন ভারতবর্ষে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর বহুমুখী প্রচারকার্য অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তাঁরা মুল্লাজীর ভক্ত বা মুরীদ হয়ে যায়। তাঁর বয়স যখন ৬৩/৬৫ বছর, তখন তিনি তাঁর বহু ভক্ত--মুরীদান নিয়ে (১১১২ হিঃ/১৭০০ খ্রিঃ) সনে দ্বিতীয় বারের মতো আল-হিজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এ বারের যাত্রায় তিনি একবার পিতার পক্ষ থেকে আরেকবার মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ্বব্রত সম্পাদন করেন।[৭৭] এ বারকার 'হজ্জ্ব' যাত্রায় তিনি পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনায় বুখারী-মুসলিমের পাঠ দানে ব্যাপৃত থাকেন এবং কোনো শরাহ্-শরুহাত ছাড়াই অত্যন্ত দক্ষতা, দৃঢ়তা ও যশের সাথে গবেষণালব্ধ পাঠদান করতে সক্ষম হন। অতঃপর দীর্ঘ চার বছর কাটিয়ে (১১১৬ হিঃ/১৭০৪ খ্রিঃ) সনে মুল্লাজী স্বীয় জন্মভূমি আমেথীতে ফিরে আসেন।[৭৮]

(৯) রাজ-রাজাদের সংস্পর্শে থাকার কারণঃ

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন অন্যান্য আলেম ও সূফী-সাধকের ন্যায় মাদ্রাসায় ও নির্জনে না থেকে কেন রাজ-দরবারে চাকুরী করলেন বা রাজা-রাজাদের সংস্পর্শে থাকলেন- এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী তাঁর বিখ্যাত 'নুযহাতুল খাওয়াতির' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেনঃ

"মুল্লাজী মানুষের উপকার করবার জন্যই রাজ-দরবারে চাকুরী নিয়েছিলেন; অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। তিনি চেয়েছিলেন, রাজরাজাদের যদি সূফী-সাধক ও মুত্তাকী বানানো যায়, তবে ইসলামের বড় উপকার হবে। শত-শত শিরক্ বিদআতের বিলোপ হবে। আর হয়েছিলো ও তাই। কেননা তাঁরই প্রভাবে সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন ধর্মভীরু বাদশাহ হয়ে যায়। যার মাধ্যমে সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত 'দ্বীন-ই-ইলাহী' মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধিত হয়ে যায়; যদিও এ মতবাদের বিলোপ সাধনের সূচনা হয়েছিলো শায়খুল হিন্দ হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে-সানী (রহ.) এর সময় থেকে। তিনি নিজের জন্য রাজদরবারে কোনো কিছু কোনো দিন চাননি। কিন্তু বহু মানুষের জন্য রাজ-দরবারে সুপারিশ করেছেন।"[৭৯]

অতএব আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভির উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারাই আহমাদ মুল্লাজীউনের রাজ-রাজাদের সংস্পর্শে থাকার কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো।

---

[৭৭]. ফকীর মুহাম্মদ, *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ*, ৩য় সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০।
[৭৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
[৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) বিস্ময়কর স্বপ্নঃ

'সাহেবে আয়ানাহ' গ্রন্থকার আল্লামা শাহ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আবুল হাসান মানিকপুরী তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তাঁর পিতা স্বপ্ন দেখেন তিনি আহমাদ মুল্লাজীউন ও তাঁর ছোট ভাই মুল্লা বদিউল আলমের হাতের আঙ্গুলী ধরে পথ চলছিলেন। এমন সময় হঠাৎ করে একটি শূকর দৌড়ে আসলো এবং আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের কাপড় স্পর্শ করে চেলে গেলো। এ স্বপ্নে তা'বীর তিনি এভাবে করছেন যে, 'মুল্লাজীকে দুনিয়া স্পর্শ করবে আর সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়বে।'[৮০]

উপরোক্ত ঘটনাটি থেকেই বোঝা যায় তাঁর পিতা-মাতা, ভ্রাতা ও পরিবার কতোটা উন্নত ছিলো। এ ঘটনার ভেতর দিয়ে তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যও ফুটে উঠেছে এবং তাঁরা যে আরবীয় বংশোদ্ভূত ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও আল্লাহর নবী হযরত সালিহ (আ.) এর বংশের লোক ছিলেন; তা কিছুটা অনুমান ও বিশ্বাস করা যায়। আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন ও কিন্তু সেরূপ উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। রাজদরবারে চাকুরী করলেও শুধুমাত্র খোর পোষ বা জামা-কাপড় ও আহারাদি গ্রহণ করতেন, অন্য কিছু নয়।[৮১]

স্বপ্নটি যদিও আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের রাজ-দরবারে চাকুরী করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছে; কিন্তু তাই বলে যে আলেমদের রাজ-দরবার থেকে দূরে থাকতে হবে তা নয়। কেননা সূফী-সাধক ও আলেমগণ যদি রাজ-দরবার থেকে দূরে থাকেন, তাহলে সে রাজ-দরবার বা রাজ্য বিরাণ ভূমিতে পরিণত হবে। আর একারণেই আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন রাজ-দরবারে চাকুরী নিয়েছিলেন এবং ইসলামী আদর্শভিত্তিক জীবনযাপন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। রাজ-দরবারের কোনো মোহ্ তাঁকে পেয়ে বসেনি, বরং তাঁর আদর্শেই রাজা (আওরঙ্গজেব ও তাঁর পুত্র শাহ আলম) ফকীর দরবেশে পরিণত হয়েছিলেন।[৮২]

---

[৮০]. আল্লামা শাহ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আবুল হাসান মানিকপুরী, *সাহেবে আয়ানাহ্*, ১ম খন্ড, নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৫১০।

[৮১]. আযাদ বিলগ্রামী, *সুবহাতু'ল মারজান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

[৮২]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, *রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর- আউলিয়ার গুরুত্ব*, বায়তুশ্ শরফ্ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রামঃ ১৯৮২, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

(১১) বাদশাহ্ আলমগীর ও বাহাদুর শাহের শিক্ষকঃ

বাদশাহ্ আলমগীর[৮৩] ও তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ্[৮৪] তাঁরা দু'জনেই আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের ছাত্র ছিলেন।[৮৫] যা একবাক্যে সকল ঐতিহাসিকগণই স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাঁরা কোন্ সময় মুল্লাজীর নিকট হতে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তার কোনো প্রমাণ সরকারী কাগজ-পত্রে নেই। কেননা যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে মোগল আমলের অনেক তথ্যই সংরক্ষিত হয়নি, যা কিছু হয়েছিলো তার অনেক তথ্যই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে সঠিক কোনো তথ্যও পাওয়া যায়নি।[৮৬] এক্ষেত্রে বে-সরকারী কাগজ-পত্রেও তেমন কোনো কিছু উল্লেখ নেই। তাই ইতিহাসের গতিধারা ধরে বা সন-তারিখের উপর নির্ভর করে এর একটা সমাধান দেয়া যেতে পারে।

খুব সম্ভব আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন যখন দিল্লীতে যান, তখন তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ই সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। অতঃপর মুল্লাজীর বিদ্যা-বুদ্ধি, জাহেরী ও বাতেনী ইলমের কামালাত বা গভীরতা দেখে তাঁর নিকট কিছু ধর্মীয় কিতাব পড়েন এবং পিতা-পুত্র উভয়ই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৮৭] এ মতটি বহু মণীষীই স্বীকার করেন ও সমর্থন করেন। কেননা উহা তাঁর বয়সের সাথে, শিক্ষা জীবনের সাথে ও কর্ম-জীবনের সাথে সংগত।

---

৮৩. এটা সম্রাট আওরঙ্গজেবের উপাধি। তিনি যখন তাঁর তিন ভাই দারাশিকো, শাহসুজা ও মুরাদকে যুদ্ধ সমূহে পরাজিত করে সিংহাসন লাভ করেন; তখন ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুলাই অভিষেক অনুষ্ঠানে আবুল মুজাফ্ফর মুহীউদ্দীন (ধর্মসংস্কারক) মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর (বিশ্ব সম্রাট/বিশ্বকে মুষ্ঠিবদ্ধকারী) বাদশাহ্ গাজী (মহান যোদ্ধা) নামটি ধারণ করেন। বাদশাহ আলমগীর বা আওরঙ্গজেব নামেই সুপরিচিত। (R.C. Majumder, *An Advanced History of India*, Macmillan S.T. Martings Press, London:1970, p.484)

৮৪. তাঁর পুরো নাম ঃ আবু মোজাফ্ফর সিরাজউদ্দীন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ (সাহসী সম্রাট) শাহ্ আলম (বিশ্ব সম্রাট) 'মুয়ায্যম (সম্মানিত)। তিনি আযম ও কামবখ্শকে পরাজিত করে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে অভিষেক অনুষ্ঠানে শাহ্ আলম বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বাহাদুর শাহ, শাহ আলম (১ম) বা মুয়ায্যম; এ তিনটি নামেই সুপরিচিত। (মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন, *মুসলমানদের উত্থান ও পতন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯, পৃ. ৩৬৮)

৮৫. আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী, *মুফীদুল মুফতী*, লক্ষ্ণৌঃ ১৯৩৭ খ্রি., পৃ. ১১৩।

৮৬. এ,কে,এম, আব্দুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৭৩, পৃ. ১ (উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য)।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জন্ম হয় ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে, শিক্ষা সমাপনী সনদ লাভ করেন মাত্র একুশ বছর বয়সে এবং আমেথীতে শিক্ষকতা করেন ৪০ বছর পর্যন্ত।[৮৮] সে অনুপাতে মুল্লাজীর দিল্লীতে আগমন ঘটেছিলো (১৬৩৭ খ্রিঃ+ ৪০) তথা ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে।

আর এ সময় সম্রাট আওরঙ্গজেব ও শাহ্ আলমের বয়স ছিলো যথাক্রমে ৬০ ও ৪৫ বছর। এটা সবচেয়ে নূন্যতম হিসাব। সে হিসেবে তাঁরা কখনও তাঁর কাছে বাল্যশিক্ষা করেননি।[৮৯] সে কারণেই হয়তো রাষ্ট্রীয় দলীল-পত্রে মুল্লাজীকে তাঁদের শিক্ষকরূপে চিহ্নিত করা হয়নি। যা যুক্তিসংগত।

অথবা সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তখন দেশ-বরণ্যে আলেমদেরকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে ধর্মীয় ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন।[৯০] সম্ভবতঃ আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁকে ধর্মীয় সংস্কার কার্যে পরামর্শ দেন; যা সম্রাটের মনোপুত ও হয়। আর মনোপুত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা মুল্লাজী তৎসময়েই শিক্ষা সমাপনী সনদ লাভ করেছেন এবং 'আদাব-ই-আহ্‌মাদী' ও 'তাফসীরে আহ্‌মাদী' সহ বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই লিখে ফেলেছিলেন।[৯১] ফলশ্রুতিতে মুল্লাজীর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া আগ্রা থেকে আমেথী বেশী দূরবর্তী শহর ও না। হয়তো এমন ও হতে পারে, যখন তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো; তখন এ সুনামের খবর রাজ-দরবারে ও পৌঁছেছিলো। ফলে বাদশাহ তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন।

---

[৮৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

[৮৯]. *'যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি আহ্‌ওয়ালিল মুসান্নিফীন'* এর গ্রন্থকার আল্লামা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহীসহ কতিপয় ঐতিহাসিক ও জীবনীকার বলেছেন, সম্রাট শাহজাহান তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন এবং স্বীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮) সে ভাষ্যে বোঝা যায় তিনি তাঁর বাল্যশিক্ষক ছিলেন। কিন্তু এ মতটি ইতিহাসের সাথে বিরোধপূর্ণ। কেননা মুল্লাজীর যখন জন্ম হয় তখন আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের গভর্ণর। তখন তাঁর বয়স ১৮-২০ বছর। এমনকি তাঁর পুত্র শাহ আলম (১ম) ও মুল্লাজী থেকে পাঁচ বছর বড়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫) মুল্লাজীর জন্মের পূর্বেই যেহেতু আওরঙ্গজেব ও তদীয় পুত্র শাহ আলমের শিক্ষক হওয়া বাস্তব বিরোধী। তাই এ মতটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

[৯০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫।

[৯১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

আর এটা অসম্ভবের কিছুই না। কেননা তৎকালীন সময়ে জৌনপুর শিক্ষা-দীক্ষায় খুবই অগ্রগামী ছিলো।[৯২] আর সেই শহরের অধীনস্থ্ শহর হলো আমেথী। সেখানে বসে এরূপ যুগান্ত কারী একটি তাফসীর লিখে ফেলেছেন; আর সে খবর জৌনপুরবাসী জানবেন না বা সে খবর রাজ-দরবারে পৌঁছবেনা-এটা কখনো হতে পারে না, এবং এটা অসংগত ও সম্পূর্ণরূপে বিবেক বহির্ভূত একটি ব্যাপার।

অথবা আলমগীর নতুন সম্রাট হওয়ার পর যখন প্রতি শহরের মসজিদ, মাদ্রাসা ও বড় বড় আলেমদেরকে ভাতা প্রদান করেন,[৯৩] তখন মুল্লাজীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিলো। অথবা আওরঙ্গজেব সিংহাসন লাভ করবার বহু পূর্বেই মুল্লাজীর সাথে রাজ-দরবারে তাঁর পরিচয় ঘটেছিলো। কেননা তাঁর পরিবার ছিলো হযরত সালিহ (আ.) এর বংশোদ্ভূত ঐতিহ্যবাহী আরবীয় সূফী পরিবার।[৯৪] সে পরিবারের প্রভাব রাজ-দরবারে পূর্ব-পুরুষ হতেই ছিলো। কেননা, ভারতবর্ষ হলো সূফী-সাধকের দেশ। যাঁদের মাধ্যমে ইসলাম বেশী প্রচারিত হয়েছিলো। তাঁদের সাথে বেয়াদবী করলে পরিণাম যে ভালো হয় না, তা রাজ-কর্মচারীদের অনেকেরই জানা ছিলো।

কিছুকাল পূর্বে সম্রাট আকবর সূফী-সাধক হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফে সানী (রহ.) এর সাথে বেয়াদবী করার ফলে মাথায় খুঁটির আঘাত লাগে। আর সে আঘাতের কারণেই পরবর্তীতে যে আকবরের মৃত্যু হয়েছিলো তা ইতিহাস কেন, বরং রাজ-পরিবারের অনেকের মাঝেই তা কাহিনী হিসেবে প্রচলিত ছিলো।[৯৫] সে কারণেই হয়তো মোগল সম্রাটরা সূফী-সাধক, আলেম ও পন্ডিতদের মাঝে 'ইনাম' বা 'মদদ-ই- মা'আশ' দিতো।[৯৬] সে জাতীয় পরিবারের মাঝে হয়তো তিনি পূর্বকাল থেকেই ছিলেন।

অথবা মুল্লাজীর পরদাদা শাহ মাখদুম এর পূর্ব বাসস্থান যেহেতু দিল্লীতে ছিলো,[৯৭] সে কারণে দিল্লী, আগ্রা, আজমীর ও আমেথীতে বেশ কিছু খান্‌কা ছিলো। সে সব খান্‌কা পরিদর্শন

---

৯২. Wolsely Haig, Sir, *The Cambridge History of India*, Vol-iii, Edited by: Sir Richard Burn, Chand and Company, New Delhi: 1971, p. 253 (Foot note).

৯৩. ওমর রেযা কাহ্‌হালা, *মুজামুল মুআল্লিফীন- তারাজিমু মুসান্নিফিল কুতুব আল আরাবিয়্যাহ্*, পৃ. ৩৪৫।

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬৫।

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

৯৬. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৫১।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

কালেই মাঝে মধ্যে রাজ-দরবারে তাঁদের মুরীদদের সাথে অথবা বাপ-চাচার সাথে রাজ-দরবারে মুল্লাজী আসা-যাওয়া করতেন। তিনি যেহেতু বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ছিলেন, সেহেতু সম্রাট শাহ্জাহান সহ রাজ-পরিবার ও রাজ-কর্মচারীদের অনেকেই কুরআন, হাদীস, তাফসীর, তাসাউফ এবং ইসলামী ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[৯৮]

বয়সে ছোট হয়েও মুল্লাজী তাদের শিক্ষা দিতেন, যা অস্বাভাবিক নয়। এ সময়ই যদি তাঁর রাজ-দরবারে যাতায়াত, পরিচয় ও শিক্ষা প্রদানের কথা সাব্যস্ত হয়; তাহলে সম্রাট শাহ্জাহান ও মুল্লাজীকে নিয়ে যে সমস্ত প্রচলিত ঘটনা রয়েছে তা সত্য।

তবে একথা সত্য যে, যে কোনো ভাবেই হোক, যে কোনো বয়সেই হোক, যে কোনো মাধ্যমেই হোক আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউনের সাথে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজ-দরবাহে পরিচয় ঘটেছিলো এবং আওরঙ্গজেব ও শাহ্ আলম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে ওস্তাদ রূপেই সম্মান করতেন।[৯৯] তাই তা বাল্য শিক্ষা হোক, ধর্মীয় শিক্ষা হোক অথবা আধ্যাত্মিক শিক্ষা হোক। জানিনা সেই 'ওস্তাদের কদর' কবিতাটি কবি তাঁকে কেন্দ্র করেই লিখেছেন কি-না। যেমন কবি বলছেনঃ

"বাদশাহ্ আলমগীর
কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবী দিল্লীর।

....

আজ হতে চির উন্নত হল শিক্ষা গুরুর শির
সত্যিই তুমি মহান উদার বাদশাহ্ আলমগীর।"[১০০]

যদিও কবি এখানে মৌলবীর নাম উল্লেখ করেননি; তবে একথা সত্য যে এ মৌলবী হয় আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন হবে নতুবা আল্লামা মুল্লা নিযাম হবে। কেননা এ দু'জনই রাজ-পন্ডিত ও ধর্মীয় গুরু ছিলেন। তবে উল্লেখিত কবিতায় 'মৌলবী' দ্বারা মুল্লাজীউন হবারই সম্ভাবনা বেশী। কেননা, মুল্লাজীউন মুল্লা নিযামের চেয়ে সবদিক দিয়ে বেশী যোগ্য ও পারদর্শী ছিলেন।[১০১]

---

[৯৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।
[৯৯]. শাহ্ নাওয়ায খান, *মা'আসিরু'ল উমারা,* ৩য় খন্ড, আসরারে করিমী প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ পৃ. ৭৯৪।
[১০০]. সাহিত্য সওগাত, ৫ম শ্রেণী, সিটি লাইব্রেরী, (*ওস্তাদের কদরঃ কাজী কাদের নওয়াজ*) বাংলা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, . ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃ. ৩২-৩৪।
[১০১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আর সে কারণেই সম্রাট আলমগীর ও বাহাদুর শাহ্ তাঁকে বেশী সম্মান করতেন এবং তাঁকে রাজ-দরবারে রাখা প্রয়োজন বোধ করে দীর্ঘ ১২টি বছর একাধারে রাজ-পন্ডিত ও ধর্মীয় উপদেষ্টা (The Religious Teacher and Guide) হিসেবে রেখেছিলেন।[১০২] অথচ মুল্লা নিযামের ভাগ্যে এমন সম্মান জোটেনি। যদিও মুল্লা নিযাম 'ফাতওয়া-ই- আলমগীরী' এর মতো মূল্যবান একটি কিতাবের সম্পাদক ছিলেন।[১০৩]

আর উপরোক্ত 'মৌলবী' যে আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন তার সবচেয়ে বড় শক্তিশালী দলীল হলো, মুল্লা নিযামের পদবীটি। কেননা 'মুল্লা নিযামে'র পদবী হলো কাজী। এ পদবীটি প্রমাণ করে যে, তিনি কখনও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, বরং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন মুফ্তী বা মুল্লা। যেমন, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেনঃ

"The Qazi was the Chief Judge in Criminal suits, ... Muslim law assisted by a Mufti (Mulla), who consulted the old Arabic Books."[১০৪]

তাছাড়া 'মুল্লা নিযাম' সম্পাদিত 'ফাত্ওয়া আলমগীরী' প্রমাণ করে যে, তিনি ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন না; বরং ছিলেন একজন কাজী বা ফৌজদারী বিভাগ প্রধান। কেননা তাতে 'মুল্লা' উপাধি নেই। সেখানে লেখা রয়েছে- 'মাওলানা শায়খ নিযাম'।[১০৫]

তাহলে বোঝা গেল যে, তিনি 'মুল্লা' নন। আর তিনি যদি 'মুল্লা'ই না হন, তাহলে তিনি মুফতী বা ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ ও না। আর যখন তিনি 'ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ' এর গুণটি হারালেন, তখন তিনি রাজপুত্রদের শিক্ষক হওয়ার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হলেন। কেননা কাজী কখন ও পড়ানোর সময় পান না বরং তাঁর অধীনে থাকে একধিক বিভাগের দায়িত্ব। 'আইন-ই-আকবরী'-র মতে ৪টি,[১০৬] পি, সারন এর মতে ১২টি[১০৭] বিভাগের দায়িত্ব পালন করতে হতো। তাই তাঁকে নিয়মিত অফিস করতে হতো।

---

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২১।
১০৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪তম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৫৬০।
১০৪. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, 2nd Edition, Calcutta: 1963, p. 26.
১০৫. মাওলানা শায়খ নিযাম এবং একদল ভারতীয় 'উলামা' পরিষদ কর্তৃক সংকলিত, *আল-ফাতওয়া আল-আলামগীরিয়্যাহ*, মাকতাবাতু মাজিদিয়্যাহ, পাকিস্তানঃ পৃ. ২ (১ম খন্ডের সূচী দ্রষ্টব্য)।
১০৬. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খন্ড, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ভারতঃ ১৯৭৮, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে 'মুল্লা' বা 'মুফতী'র কাজের পরিধি কম ছিলো। তাঁকে নিয়মিত অফিসে যেতে হতো না। যেমন ঐতিহাসিক পি, সারন বলেনঃ

> "Mufti (Mulla) was a short of unofficial legal refree... recognized to be an authority or religious law, and the Mufti's duty was only to state the law applicable to the case under reference. "[১০৮]

অতএব 'মুল্লা' বা 'মুফতী'র হাতে সময় থাকতো। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, রাজ-পরিবার ও রাজ-দরবারে শিক্ষা-দীক্ষা, মাসয়ালা-মাসায়েল ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া তাঁর কাজ ছিলো। সুতরাং বাদশাহ আলমগীরের ছেলে-মেয়ে তাঁর কাছ থেকেই ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষণ গ্রহণ করতো। অতএব কাজী কাদের নেওয়াজের 'ওস্তাদের কদর' কবিতায় উল্লেখিত 'মৌলবী' বা মুল্লা দ্বারা যে আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউনই উদ্দেশ্য; তা ইতিহাসের নিরিখেই প্রমাণিত।

তবে একথা স্মরণীয় যে, 'মুল্লা' বা 'মুফতী'র চেয়ে কাজীর নাম 'Record-Book' এ বেশী লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো।[১০৯] সে কারণেই কাজী নিযামের নাম সরকারী কাগজ-পত্রে বেশী পাওয়া যায়। আর এ কারণেই কাজী নিযামের নাম 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরী' তে সম্পাদকরূপে লিখিত আছে। মূলতঃ তাঁর চেয়ে মুল্লাজীই (মুফতী/মুল্লা) বেশী দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের ঐ ধারার কারণে আজ তাঁর নাম লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গিয়েছে।

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন যে শুধুমাত্র বাদশাহ আলমগীর ও বাহাদুর শাহের শিক্ষক ছিলেন তাও নয়। কেননা কবিতার ছন্দে পুত্রের নাম নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই এ পুত্র বলতে বাদশাহ আলমগীরের যে কোনো পুত্র হতে পারে। আর তাঁর পুত্র ছিলো পাঁচজন। যা ছকের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হলো ঃ

---

[১০৭]. P. Saran, *The Provincial Government of Mughals*, 2nd Edition, Bombay: 1973, pp. 321-325.

[১০৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫-৩২৬।

[১০৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬ এবং প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব আলমগীর (৬ষ্ঠ মোগল সম্রাট)

- মুহাম্মাদ সুলতান (মৃ. ১৬৭৬)
- মু'আয্যাম (শাহ আলম প্রথম বা বাহাদুর শাহ প্রথম) সিংহাসন লাভ ১৭০৭, মৃ, ১৭১২, ৭ম মোগল সম্রাট
- মুহাম্মাদ আ'যাম, যুদ্ধে নিহত (১৭০৭ খৃঃ)
- আকবর মৃ. পারস্যে (১৭০৪/১৭০৬) (পিতার বিদ্রোহী সন্তান, পারস্যে পলায়ন, তথায় মৃত্যু)
- কাম বখ্‌শ, নিহত হায়দারাবাদ এর নিকটে (১৭০৭/ খৃ. ১৭০৮ খৃ)

(১২) সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে দাক্ষিণাত্যেঃ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল দু'টি পর্বে বিভক্ত। একটি হলো আগ্রা কেন্দ্রীক, আর অপরটি হলো দাক্ষিণাত্য কেন্দ্রীক। আগ্রা থেকে ২৪ বছর এবং দাক্ষিণাত্য থেকে ২৭ বছর সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর রাজ্য শাসন করেন। আগ্রায় ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত; আর দাক্ষিণাত্যে ১৬৮১ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।[১১০]

সুতরাং সম্রাট আওরঙ্গজেব সর্বমোট ৫০ বছর, ৩ মাস রাজত্ব করেছিলেন। তন্মোধ্য থেকে দাক্ষিণাত্যের রাজ্য শাসনের পটভূমি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মাঝে মধ্যেই মারাঠা শত্রুগণ শিবাজীর নেতৃত্বে অথবা অন্য কোনো মারাঠা নেতৃত্বে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। সে কারণেই সম্রাট আওরঙ্গজেব তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে শত্রুদের সকল আক্রমণ দৃঢ় হস্তে দমন করেন।

কিন্তু ১৬৯৪/৯৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে হিন্দুধর্মের পুণঃজাগরণ এবং হিন্দুরাজ্য পুণঃ প্রতিষ্ঠার শোরগোল শোনা যাচ্ছিলো। বিশেষ করে হিন্দুধর্মের পুণঃ জাগরণের সমস্যাটি দানাবেঁধে

১১০. Sir Wolsely Haig, *The Cambridge History of India*, Vol-iv, (The Mughal Period), Edited by Sir Richard Burn, Chand and Company, New Delhi: 1979, p. 222.

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছিলো।[১১১] শত্রু প্রধানরা এটাকেই মূখ্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিলো। তারা হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য বিভিন্নভাবে তুলে ধরছিলো। মাঝে-মধ্যেই তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। তাতে মহাদেব, ভীম, অশোক, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও শ্রী চৈতন্য প্রমুখ হিন্দু মনীষী ও ধর্ম সংস্কারকের জীবনী আলোচনাপূর্বক অতীতের শৌর্য- বীর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হতো।[১১২]

শিবাজীর গুরু রামদাস ঘোষণা করলোঃ

"সবই হারিয়েছি আমরা জানো কি তুমি?
আছে শুধু এই মোদের মাতৃভূমি।"[১১৩]

অপরদিকে 'ভক্তিবাদী' কবিরা গাইতে থাকে- ধর্মে-ধর্মে কোনো প্রভেদ নেই। আমরা সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। আমরা সবাই একই ভূ-খন্ডের অধিবাসী। ভক্তিবাদী কবিদের এই বিষবান সৈনিকদের মাঝেও ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করছিলো। তাছাড়া অনেক বেদয়াতীমূলক অনুষ্ঠান ও অনৈতিক আচরণ যেমন- মুহার্‌রম-মুরসিয়া, নওরোজ (নববর্ষ), ছবি আঁকা, মদ্যপান, গান-বাজনা, বেশ্যাবৃত্তি, মুত্'আ বিবাহের প্রচলিন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার ফলে সাধারণ গণ-মানুষ ও সৈনিকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।[১১৪] কেননা সৈনিকরা একটু উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবেরই হয়। তাই, এই সময় ইসলামের প্রকৃত আদর্শ, শৌর্য-বীর্য এবং হিন্দু-মুসলিম যে এক জাতি নয়; তা ফুটিয়ে তোলার জন্য মুল্লাজীউনকে সম্রাট সাথে করে দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যান। তখন তাঁর বয় ছিলো ৬০ বছর।[১১৫]

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লজীউনের এই সময়ের জীবন ইতিহাস ছিলো বিচিত্র কর্মে ভরপুর। কোনো সময় সৈনিকদের ধর্মীয় শিক্ষাদান, কখনো তাদের মাঝে ওয়াজ-নসীহত করে মুসলিম-জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা; হিন্দু-মুসলমান যে একজাতি নয়, জাতিতে জাতিতে যে জগাখিচুড়ী চলবে না এবং মদ, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি, মুত্'আ বিবাহ, গান-বাজ্‌না ইত্যাদি যে হারাম এবং

---

১১১. Ibid, p. 367.
১১২. Ibid, pp. 36, 46, 193-200, 220, 226.
১১৩. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন শর্মা অনূদিত, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, প্রগতি প্রকাশনী, মস্কোঃ ১৯৮৬, পৃ. ৩৭৫।
১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১-৩৫৫, ৩৫৫-৩৭১, ৩২২-৩৭৩।
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০ এবং প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলোর খারাপ পরিণাম ফল (Bad Effect) যে কী হবে- সে ব্যাপারে বিষয়গুলোর একটি ভয়াল চিত্র তিনি তাদের সামনের তুলে ধরতেন।[১১৬]

কোনো কোনো সময় 'ভক্তিবাদী'দের পাশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ওয়াজ-মাহ্ফীলের আয়োজন করা হতো। তাতে আল্লামা মুল্লাজীউন ইসলামের বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য আলোচনাপূর্বক বিভিন্ন ইসলামী মণীষী তথা আব্দুল কাদির জিলানী, খাজা মুঈনউদ্দীন চিশ্তী সহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ওলী-আল্লাহদের উপমা দিয়ে মানুষদেরকে তাসাওউফ দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন। আর এভাবেই আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন 'ভক্তিবাদী' কবিদের প্রচারিত মতবাদের কু-প্রভাব থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১১৭]

হিন্দুরা মাঝে-মধ্যেই গান-বাজ্না ইত্যাদির অনুষ্ঠান করতো। এসব অনুষ্ঠানে সাধারণ মুসলমানরা অংশগ্রহণ করে বিভ্রান্ত হতো। এর প্রতিপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং সাধারণ মুসলিম জনগণের মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করতঃ তাতে আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনকে বক্তৃতা ও ওয়াজ-নসীহতের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। মুল্লাজীউন ও সে সব অনুষ্ঠানে সানন্দে অংশ গ্রহণ করে মুসলমানদের হৃদয়ে নব অঙ্কুরিত শির্ক-বিদ্আতের বীজকে মূলোৎপাটনের প্রয়াস পেতেন।[১১৮]

এছাড়া সম্রাট আকবর যেমন সুর সম্রাট মিয়াঁ তানসেনের[১১৯] মাধ্যমে গান-বাজ্নার আয়োজন করে ভালো গায়ক-গায়িকাদের পুরস্কৃত করতেন; মুল্লাজীও ঠিক একইভাবে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, ইসলামী সাহিত্য তথা বিভিন্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আকবরী বেদআতী প্রথা উচ্ছেদের জন্য এসব ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো। যা ছিলো আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অনন্য কৃতিত্ব।[১২০] আর এর ফলে বেদআতী প্রথাগুলো উচ্ছেদ করা অত্যন্ত সহজ হয়েছিলো।

---

১১৬. *দাইরা-ই-মাআরিফ-ই-ইসলামিয়্যাহ্* (উর্দু) ৭ম খন্ড, লাহোরঃ ১৩৯১ হি./ ১৯৭১ খ্রি. পৃ. ৬০৫।
১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭ এবং প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫।
১১৮. রহমান আলী, *তাযকিরা-ই-উলামা-ই-হিন্দ*, ২য় সংস্করণ, নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯১৪ খ্রি., পৃ. ৪৭৯।
১১৯. ভবেশ রায়, *শত মনীষীর কথা*, অনুপম প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ঢাকাঃ ১৯৯১, পৃ. ২১৬।
১২০. Muhammad Saqi Khan, *Ma'athir-i-Alamgiri*, Calcutta, India: 1873, pp. 368-387.

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় আফগানে ইউসুফ জাই, কুশহল খাঁ এবং ভারতে জাঠ ও মারাঠাদের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে।[১২১] মাঝে মধ্যেই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকতো। তখন মুল্লাজী এসব ব্যাপারে ও সম্রাট আওরঙ্গজেবকে পরামর্শ দিতেন এবং সাহায্য করতেন। সুযোগ-সুবিধামতো তিনি সে সব এলাকার মাদ্রাসা সমূহ ও পরিদর্শন করতেন এবং দরস্-তাদ্‌রীস দিতেন; আবার কখনও তিনি খান্‌কা শরীফে গিয়েও ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় কাটাতেন।[১২২]

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের এই সময়কার জীবন যাত্রা এতোটাই বৈচিত্রময় ছিলো যে, কোনো ঐতিহাসিকই তাঁর এ সময়কার জীবন-যাত্রার ব্যাপারে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। তাঁর এ সময়কার জীবন-প্রণালী যেন এরিস্টোটল (Aristotle)[১২৩] ও নিযামুল মুলকের[১২৪] জীবন যাত্রার ন্যায় ছিলো। দার্শনিক এরিস্টোটল যেমন সম্রাট আলেকজান্ডারের রাজ-দরবারে থেকে বিভিন্ন গুরু-মন্ত্র দিতেন, আবার জ্ঞানের নেশায় মাতাল থাকতেন; মুল্লাজী ও তেমনি দীর্ঘ পাঁচ/ছয়টি বছর (১৬৯৫-১৭০০ খ্রিঃ) বাদশাহ্ আলমগীরের পাশে থেকে বিভিন্ন রাজ-কার্যে তাঁকে সাহায্য করেছেন, আবার শিক্ষার নেশায় বিভোর হয়েছেন।

তাই আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জীবন-কালকে কোনো একটি নির্দিষ্ট পদের সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁর মর্যাদাকে খাটো করা ঠিক হবে না। কেননা তিনি ছিলেন একাধারো পৃষ্ঠপোষক, সহকর্মী, প্রধানমন্ত্রী, সামরিক নীল নক্‌শা প্রস্তুতকারক, সামরিক বাহিনীর ধর্মীয় শিক্ষক, রাজ-পন্ডিত ও ধর্মোপদেষ্টা। সম্রাট আলেকজান্ডার যেমন এরিস্টোটলের কথা অবুঝ শিশুর মতো শুনতেন, ঠিক তদ্রুপ সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তদীয় পুত্র শাহ্ আলম ও তাঁর কথা শুনতেন এবং তাঁকে উস্তাদরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন; যা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।[১২৫]

---

১২১. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্‌রুল মুহাস্‌সিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

১২২. Muhammad Jubaer Ahmed, *Contribution of India to Arabic Literature*, Vol-ii, (Edited by Badiul Alam), New Delhi: 1974, p. 517.

১২৩. Ibid, p. 39.

১২৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৬, পৃ. ১০।

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ.. ১৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) বাদশাহ্ আলমগীরের জানাযা এবং ইবাদাতের বহিঃপ্রকাশঃ

বাদশাহ্ আলমগীর তথা আওরঙ্গজেব তাঁর ইন্তেকালের মুহূর্তে ওসীয়াত করেন যে, আমার জানাযার নামাজে সেই ব্যক্তিই ইমামতী করবে, বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর যার সারা জীবনে তাহাজ্জুদের নামাজসহ এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ও ক্বাযা যায়নি।[১২৬]

এরূপ কঠিন শর্তারোপ করাতে বাদশাহ্ আলমগীরের ইন্তেকালের পরে কেউ তাঁর নামাজে জানাযার ইমামতী করতে সাহস করলেন না। এভাবে দীর্ঘক্ষণ বাদশাহের লাশ খাটিয়ায় রেখে জনসাধারণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো। অতঃপর নীরবতা ভেঙ্গে আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন বাদশাহ্ আলমগীরের নামাজে জানাযার ইমামতীর জন্য সামনে এগিয়ে গেলেন।[১২৭]

অতঃপর উপস্থিত জনসাধারণ আশ্চার্যান্বিত হয়ে মুল্লাজীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি সারাজীবনে এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ও ক্বাযা হয়নি? জবাবে মুল্লাজী বললেন, যতদূর আমার মনে পড়ে, বালেগ হবার পর থেকে আমার সারা জীবনে ফরজ নামাজ তো দূরের কথা, তাহাজ্জুদের নামাজ ও আল্লাহ্ পাকের অশেষ কৃপায় কখনো ক্বাযা হয়নি। আর যখনকার কথা মনে পড়ে না তখন আমি বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হইনি। আর একজন্যই আমি বাদশাহের নামাজে জানাযার ইমামতী করতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।[১২৮]

মুল্লাজীউনের মুখে একথা শুনে উপস্থিত জনতা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল এবং তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো- মূলতঃ তিনিই বাদশাহের নামাজে জানাযার ইমামতীর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। আর তাঁর চাল-চলনও এটাই প্রমাণ করে।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন ও সম্রাট আওরঙ্গজেব উভয়েই ছিলেন আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল এবং 'জিন্দাপীর'।[১২৯]

---

১২৬. মাওলানা আব্দুল হাই আল-হাসানী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, ২য় সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খন্ড, হায়দারাবাদ, হিন্দ (ভারত)ঃ ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ১৯-২০।

১২৭. আল্লামা রাফীক আহমাদ, *ইরশাদুত্তালিবীন ফী আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, আশ্‌রাফিয়া লাইব্রেরী, পটিয়া, চট্টগ্রামঃ ১৩৯৯ হিজরী, পৃ. ৬৩।

১২৮. মাওলানা শায়খ আহমাদ, *তানযীমুল মাখযুন*, হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রামঃ ১৪১৪ হি., পৃ. ১০৯।

১২৯. *আনওয়ারে মোহাম্মদী*, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ কমিটি, মীরবাড়ী, মাদারবাড়ী, সদর চট্টগ্রামঃ ১৯৬৫ খ্রি., পৃ. ১৯-২১।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪) আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের প্রতি সম্রাট শাহ্ আলমের অভ্যর্থনা এবং তাঁর সাথে রাজকার্যেঃ

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন আল্লাহ্ প্রেমিক ঐ সমস্ত আলেমদের অন্তর্ভূক্ত, যাঁদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে

"ইন্নামা ইয়াখ্‌শাল্লাহা মিন ইবাদিহিল্ উলামাউ।"[১৩০]

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে বেশী ভয় করে বা ভালোবাসে। তাই মুল্লাজী বাদশাহ্ আলমগীরের রাজ-দরবার থেকে ছুটি নিলেন এবং ১১১২ হিঃ/১৭০০ খ্রিঃ সনে মুসলমানদের পূণ্যভূমি, পৃথিবীর উপর আল্লাহর সর্বপ্রথম ঘর, জগতবাসীর উপাসনার একমাত্র কেন্দ্র বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতে বের হলেন। সে বছর আর ফেরা হলো না। দীর্ঘ ৪টি বছর তথায় এবং ২টি বছর নিজ মাতৃভূমি আমেথীতে কাটালেন।[১৩১]

এরপর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী কয়েকটি সংগ্রাম হলো। সংগ্রামে আ'যম নিহত, কামবখ্‌শ ধৃত হয়ে পরে নিহত হলে গৃহশক্রর আশঙ্কা থেকে শাহ্ আলম মুক্ত হলেন। মুয়ায্‌যম ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ আলম ও বাহাদুর শাহ্ উপাধি ধারণ করে দিল্লীশ্বর হলেন। এরপর মারাঠা নেতা শিবাজীর পৌত্র 'সাহু' কে রাজত্ব ফেরত দিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তর ভারতে রাজধানী স্থানান্তর করলেন।[১৩২]

এবার সম্রাট শাহ্ আলম মুল্লাজীর মাতৃভূমির কাছেই এসে পড়লেন। এতোদিন হয়তো যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে মুল্লাজীর কোনো খবর নিতে পারেননি অথবা মুল্লাজী যে হাজ্ব করে দেশে ফিরেছেন, তা হয়তো সম্রাটের জানা ছিলো না। তাই রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা দিয়ে রাজ-দরবারে মুল্লাজীকে ফিরিয়ে নিতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিলো।

দীর্ঘ ছয়টি বছর মুল্লাজীউন রাজ-দরবারে না থাকার কারণে রাজ-দরবার যেন মলিন হয়েছিলো; ভাটা পড়ে গিয়েছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়। তাই রাজ-দরবারে মুল্লাজীর উপস্থিতি

---

[১৩০] আল কুরআন, *সূরা আল-ফাতির*, আয়াত নং-২৮।
[১৩১]. আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *মানাকিবুল আউলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২২।
[১৩২]. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। সে কারণেই শাহান শাহ্ আজমীরের কোনো এক সভায় তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁকে সাথে করে লাহোরে নিয়ে যান।[১৩৩]

সম্রাট শাহ্ আলম অত্যন্ত দ্বীনদার, পরহেযগার ও শান্ত-শিষ্ট ছিলেন। পিতা আওরঙ্গজেবের ন্যায় তিনি ইসলামী অনুশাসনে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন।[১৩৪] তাই মুল্লাজী তাঁর সাথে দীর্ঘ ছয়টি বছর থাকেন। অতঃপর (১১২৪ হিঃ/১৭১২ খ্রিঃ) সনে সম্রাট শাহ আলমের মৃত্যু হলে মুল্লাজী পুনরায় দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং প্রিয় পেশা শিক্ষকতায় বাকী জীবনটা অতিবাহিত করেন।[১৩৫]

এরপর জাহান্দার শাহ সম্রাট হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এক বছর রাজত্বের পর তাঁর ভাতিজা আজিমুশ্ শানের পুত্র ফররুখ শিয়ার যুদ্ধে তাঁকে নিহত করে ১৭১৯ সাল পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। এ সময়ে রাজ্যে ব্যাপক আকারে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।[১৩৬] এ সমস্ত কারণে রাজ-পন্ডিত, আধ্যাত্মিক সূফী-সাধক আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন রাজ-দরবার ছেড়ে চলে যান। তিনি মনে করতেন, এটা আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নয়। কাজেই এখানে থাকা আর কল্যাণকর নয় এবং গৌরবেরও কোনো বিষয় নয়। এ দু'জনের (জাহান্দার শাহ ও ফররুখ শিয়ার) শাসনকালে মুল্লাজী রাজ-সভায় আসেননি বললেই চলে। যদিও ফররুখ শিয়ার তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি করতেন।[১৩৭]

এ পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন একজন দুনিয়া-বিরাগী, মোহমুক্ত, সমাজ সেবক, আলিম ও আল্লাহর ওলী ছিলেন। আল্লাহর বিধানমতে মানবসেবা করা আল্লাহ প্রেমেরই নামান্তর। যেখানে আল্লাহর বিধান নেই, সেখানে আল্লাহর প্রেম ও নেই। প্রেম শুন্য মানবসেবা প্রাণশুণ্য মানব দেহের মতো। সে সমাজ সেবার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য নেই। তাই তিনি রাজ-দরবার ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ভালোবাসায় তাঁর ইবাদতে নিমগ্ন হলেন।

অথচ রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ৬০০০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়নি যে, কেউ রাজ-দরবারে ঢুকেছে; অতঃপর স্বেচ্ছায় বের হয়ে এসেছে। বরং প্রত্যেকেই রাজ-দরবারে তাদের পদোন্নতি চেয়েছে

---

[১৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
[১৩৪]. অধ্যাপক ড. মুঈন উদ্দীন আহমাদ খান, *ভবিষ্যত রাজনীতির গতিধারা,* বায়তুশ্ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রামঃ ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৩২।
[১৩৫]. ইমাম আল- গাযালী, *আত্তিবরুল মাসবুক (সত্যিকারের সম্পদ),* (মোঃ এমদাদ উল্লাহ অনূদিত), ঢাকাঃ ১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ১৯৯।
[১৩৬]. আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী (সা.) (বঙ্গানুবাদ),* ৭ম খন্ড, (তা. বি.) পৃ. ৩০৩।
[১৩৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

অথবা সেই পদে বহাল থাকার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে।[১৩৮] কিন্তু আমাদের আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন স্বেচ্ছায় ও ঘৃণাভরে রাজ-দরবার ত্যাগ করলেন এবং সেখানে আর কোনোদিন ও ফিরে গেলেন না। এতেই প্রমাণিত হয় তিনি ছিলেন একজন দুনিয়া বিমুখ, মোহমুক্ত সমাজ সেবক ও আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় সিক্ত অনন্য এক মহাপুরুষ।

(১৫) গুপ্তচরের ভূমিকায় দুঃসাহসিক এক মহাপুরুষঃ

একবার বল্‌খের বাদশাহ্ আব্দুল আযীয ও বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের মাঝে যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন ও সঙ্গী হন। উভয়পক্ষে ভীষণভাবে যুদ্ধ চলছিলো, এবং লোকও তাতে হতাহত হচ্ছিলো। যুদ্ধের এই বিভীষিকাময় দৃশ্য আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের কোমল হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠলো। তাই কী করা যায়। এহেন অবস্থায়, সে ব্যাপারে মুল্লাজী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন এবং পাশাপাশি মহান আল্লাহ্ পাকের দয়া ও সাহায্য ও কামনা করলেন।[১৩৯]

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন জানতে পারলেন যে, যুদ্ধে লিপ্ত উভয় বাদশাহই অত্যন্ত আল্লাহ্ ভীরু। তখন তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তারপর পরের দিন ফজর নামাজান্তে মুল্লাজী প্রতিপক্ষের সৈন্য-শিবিরে গেলেন এবং দ্বার রক্ষীকে বললেন- 'তোমার বাদশাহকে খবর দাও যে একজন মুসলমান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়'। তখন দ্বাররক্ষী তাঁর কথায় প্রভাবিত হলো এবং মনে করলো, নিশ্চয়ই তিনি একজন কামেল লোক তথা আল্লাহ্‌র ওলী হবেন। তাই সে বাদশাহ্ আব্দুল আযীযের কাছে গিয়ে বললো-

"জনাব! আজ সকালে আপনার সাক্ষাৎ একজন দরবেশ
এসেছেন।তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।"[১৪০]

অতঃপর বাদশাহ্ তাঁকে সাদরে ভেতরে নিয়ে আসতে বললেন। বাদশাহ তাঁর চেহারা মুবারকে সত্যিকারের আল্লাহ্ ভীরুতার ছাপ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তাঁকে (মুল্লাজীকে) অত্যন্ত তা'জীম (সম্মান) করলেন। তারপর বাদশাহ্ তাঁর কাছে দোয়া প্রার্থনা করে বললেন-

---

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
১৩৯. ফকীর মুহাম্মদ, *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।
১৪০. হযরত রহমান আলী সাহিব, *তাযকিরা-ই-উলাম-ই-হিন্দ*, মুন্‌শী নুল কিশুর মুদ্রাণালয়, লক্ষ্ণৌঃ ১৯১৪ খ্রি., পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

> "জনাব, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র একজন প্রিয়-পাত্র বান্দাহ্ হবেন। তাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। কেননা মহাশক্তিধর মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে যুদ্ধ বেঁধেছে। যুদ্ধে যে কী হবে, তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। এ ব্যাপারে আমরা কঠিন পেরেশানী ও চিন্তার মাঝে আছি।"[১৪১]

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন এ সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। তাই মোক্ষম সুযোগ বুঝে তিনি বাদশাহকে বললেনঃ

> "আপনারা দু'জনই ন্যায়পরায়ণ মুসলমান বাদশাহ্"। তাহলে উভয়পক্ষ যুদ্ধ করে এতো মুসলমানের অযথা প্রাণ বিসর্জন কেন! এ প্রাণ বিসর্জন ও ক্ষয়ক্ষতি যদি কাফিরদের সাথে ও হতো; তাহলেও একটা কথা ছিলো।"

বাদশাহ্ মুল্লাজীর কথায় অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলেন এবং সন্ধির জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে লোক পাঠালেন। পরবর্তীতে উভয় পক্ষে সন্ধি হলো এবং যুদ্ধ বিরতি ঘটলো। আর এভাবেই মুল্লাজী ভ্রাতৃপ্রতীম বিবাদমান দুই পক্ষের যুদ্ধকে থামিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে ভবিষ্যত সমূহ্ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করলেন।[১৪২]

(১৬) তাসাওউফে দীক্ষিত এবং সূফী খির্‌কাহ্ লাভঃ

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন একদিকে ছিলেন 'চিশ্‌তীয়া' এবং অপরদিকে ছিলেন 'কাদরিয়া' ত্বরীকার কামেল পীর। আর এ দু'টি ত্বরীকাই বড় পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর উপ-ত্বরীকাহ।[১৪৩] মুল্লাজী যখন তাঁর উস্তাদ আল্লামা মুল্লা লুৎফুল্লাহ কুড়া জাহানাবাদীর নিকট থেকে শিক্ষা সমাপনী সনদ লাভ করেন; তখন তিনি তাঁর উস্তাদের[১৪৪] কাছ থেকে 'চিশ্‌তীয়া' ত্বরীকার দীক্ষাও লাভ করেন। এদিক থেকে তিনি (মুল্লাজী) 'চিশ্‌তিয়া' পন্থী ছিলেন।

---

[১৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।

[১৪২]. আযাদ বিলগ্রামী, *মাআসিরুল কিরাম*, ৩য় সংস্করণ, আগ্রা, ভারতঃ ১৩২৮ হি./১৯৩৫ খ্রি., পৃ. ৭৮।

[১৪৩]. মাওলানা আব্দুর রহীম হাজারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৮, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

[১৪৪]. অপর বর্ণনায় আছে- মুহাম্মদ সাদেক সাতারখী। (*The Islamic University Studies*, Vol-i, Published by the Registrar, Islamic University, Kushtia: 1990, p. 43).

Dhaka University Institutional Repository

তবে আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন 'কাদরিয়া পন্থী' বলেই বেশী পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তিনি যখন (১১১৬হিঃ/১৭০৪ খ্রিঃ) সনে হিন্দুস্থানে ফিরে এসে দু'টি বছর স্বীয় মাতৃভূমি আমেথীতে বসবাস করেন; তখন তাসাওউফের (আধ্যাত্মবাদ) প্রতি তিনি অত্যন্ত ঝুঁকে পড়েন এবং শায়খ ইয়াসী ইব্‌ন আব্দুর রায্‌যাক কাদেরীর নিকট 'বায়াত' (তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা) গ্রহণ করেন ও তাঁর নিকট থেকেই তাসাওউফের 'খিরকাহ্'[১৪৫] (Rag) লাভ করেন।[১৪৬]

এই 'সূফী খিরকাহ' প্রাপ্তির পর থেকে আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউনের জীবনে একটি ব্যাপক পরিবর্তনের ভাব পরিলক্ষিত হয়। আর তা হলো তিনি 'খিরকাহ' লাভের পর থেকে তাসাওউফের ওয়াজ-নসীহাত, যিকির আয্‌কার ইত্যাদিতে বেশী সময় দিতে লাগলেন। যদিও তিনি এর পাশাপাশি দিল্লীর বিভিন্ন মাদ্রাসাতে শিক্ষকতাও করেছেন।[১৪৭]

সুতরাং মুল্লাজীর জীবন কালকে যদি আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করি, তাহলে তাঁর এজীবন-কালকে আমরা 'তাসাওউফী জীবন-কাল' বলতে পারি। এ পথে একাগ্রচিত্তে তিনি প্রায় দীর্ঘ ১৪টি বছর কাটান। এর জন্যে তাঁর প্রধান দু'টি কেন্দ্র ছিলো; একটি হলো দিল্লীতে এবং অপরটি হলো স্বীয় মাতৃভূমি আমেথীতে। উভয় স্থানসহ আরব-অনারবে (ভারতবর্ষ ও মক্কা-মদীনায়) মুল্লাজীর অসংখ্য ভক্ত, শিষ্য ও মুরীদ ছিলো।[১৪৮]

(১৭) তাসাওউফে দীক্ষিত হওয়ার কারণসমূহঃ

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউনের তাসাওউফে দীক্ষিত হওয়ার বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। তন্মোধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

[১৪৫]. খিরকাহ্ঃ এটা তাসাওউফের পরিভাষায় এক প্রকার 'খেল্‌কাহ' বা জামা লাভ করা। (i) প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯, (ii) মুনীর আল-বা'লাবাক্কীঃ *আল মাওরিদ*, দারুল ইল্‌ম লিল্ সালায়িন, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ.৭৫৬।) শায়েখ কর্তৃক এ বস্ত্র পাওয়া মানে শায়েখ কর্তৃক খেলাফত প্রাপ্ত হওয়া। এটাই খেলাফত পাওয়ার নমুনা। যাকে তাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যের পবিত্র বস্ত্র মনে করে।

[১৪৬]. শাকির আখতার, *ইযাহুল মাকনুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

[১৪৭]. মোহাম্মদ তোফায়েল, *নুকূশে লাহোর*, পাকিস্তানঃ ১৯৬২ খ্রি., পৃ. ৬৮৩।

[১৪৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

● পারিবারিক কারণে। কেননা তাঁর পরিবার এ মতবাদে শুধু বিশ্বাসীই ছিলো না, বরং পরিবারের প্রত্যেকেই এক একজন উঁচু পর্যায়ের সূফী সাধক ছিলেন।[১৪৯]

● পারিপার্শ্বিকতার কারণে। কেননা ভারত-বর্ষ সূফী-সাধকদের দেশ। আর এ সূফী-সাধকদের অপরিসীম অবদানের কারণেই ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের সু-শীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।[১৫০]

● অথবা, আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন যখন সূফী সাধক তথা ওলী- আউলিয়াদের জীবনী লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁদের অবদান ও কীর্তিকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেকেও একজন উঁচু পর্যাযের সূফী বানানোর জন্যে আত্ম-উন্নয়ন (Self-development) করতে থাকেন।[১৫১]

● সম্ভবতঃ মুল্লাজী যখন কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীর নিম্নোক্ত মতবাদটি পড়েন, মূলতঃ তখন থেকেই তাঁর মাঝে আধ্যাত্মিকতার বীজ রোপিত হতে থাকে। যেমন- কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর মতবাদে বলেছেনঃ

> "পবিত্র কুরআন মাজীদে ৩০,৯৮,০০ (ত্রিশ লক্ষ, আটানব্বই হাজার) কালিমা রয়েছে। প্রত্যেক কালিমার (আল্লাহর বাণী) আবার দু'টি রূপ রয়েছে। একটি আভ্যন্তরীণ আরেকটি বাহ্যিক। (লি কুল্লি কালিমাতিন্ জহ্রুন্ ওয়া বাত্নুন্)[১৫২] আমরা শুধু কালিমার বাহ্যিক রূপটাই দেখি। আর যারা জাহেরী ও বাতেনী (আর্রাসীখু'না ফীল্ ইল্মে)[১৫৩] উভয় প্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হন; তাঁরা বাহ্যিক রূপটার সাথে সাথে ভেতরের অনেক রূপই দেখতে পান। এরূপ বহু বিদ্যার সমাহার রয়েছে কুরআনুল কারীমে, যার রহস্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।"[১৫৪]

● অথবা, আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন হয়তো হযরত মুসা ও খিজির (আ.) ও মুমীন বান্দাহ আসিফ ইব্ন বুরখিয়া এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও নবী প্রেমিক হযরত ওয়া'ইজ কুরুনীর

---

[১৪৯]. মুহাম্মাদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯।
[১৫০]. ড. আব্দুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রামঃ ১৯৮০, পৃ. ৫৮-৯৪।
[১৫১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ এবং প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।
[১৫২]. শাহ নেওয়াজ খান, *মা'আসিরু'ল উমারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৭।
[১৫৩]. আল কুরআন, *সূরা-আল-ইমরান*, আয়াত নং ঃ ৭।
[১৫৪]. আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদ্ভী, *মা'আরিফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা ও জীবনী গভীরভাবে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করেছেন; তখন মুল্লাজী হয়তো মনে করেছেন- বিদ্যার বহু প্রকার রয়েছে। একেক জনকে আল্লাহ্ পাক একেক প্রকার ইল্‌ম তথা জ্ঞান দান করেন।[১৫৫]

হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক তাঁকে এ ইল্‌ম দান করেননি, যা তিনি হযরত খিজির (আ.) কে দান করেছিলেন। ঠিক অনুরূপভাবে আল্লামা শামসুদ্দীন তিবরিযীর নিকট যে ইল্‌ম ছিলো, তা আল্লামা রুমী জানতেন না। তাই ওলীদের নিকট রুহানী তারাক্কীর (আধ্যাত্মিক উন্নতি) জন্যে রুহে-রুহে (অন্তরে-অন্তরে) রাসূল (সা.) থেকে ধারাবাহিকভাবে বাতেনী ইল্‌মের (অপ্রকাশ্য জ্ঞান) ক্রমধারা চলে আসছে।[১৫৬] যে ইল্‌ম শুধুমাত্র বই পড়ে জানা যায় না। যেমন- 'সিল্‌ভা মেথড'[১৫৭] ও 'কোয়ান্টাম মেথড'[১৫৮] (আত্ম-উন্নয়ন) শুধু বই পড়ে বোঝা যায় না। এর জন্যে বাস্তব শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। যে শিক্ষা হাতে-কলমে রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে দিয়েছিলেন। তারই ধারা আজ অবধি চলে আসছে। তাই কোনো এক শায়খের (ওলী/সূফী সাধক) কাছে মুরীদ হয়ে এর উন্নতি করা যেতে পারে। যেমনটি শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী ও অন্যান্য ওলী-আউলিয়াদের জীবন ইতিহাসে জানা গিয়েছে।

- অথবা আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের কাম-রিপুকে বশে আনার জন্য তাসাওউফ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত মার্গে কখনো পৌছা যাবে না, যা একজন শায়খ কর্তৃক অতি সহজে হবে। এখন প্রশ্ন জাগে ৬৭ বছর বয়সে হাজ্জ্ব থেকে ফিরে এসে আধ্যাত্মিকতার প্রতি অত্যধিক ঝুকে পড়ার কারণ কী? এর উত্তরে বলা যায়- হয়তো তিনি এ সময় এ মতবাদের প্রতি মন-মানসিকতার দিক থেকে ঝুঁকে পড়েন, অথবা হাজ্জ্ব থেকে ফিরে আসার সময় খাজা মাঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এর মাযার জিয়ারতকালে অত্যধিক আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং তৎকালের যুগশ্রেষ্ঠ সূফী শায়খ ইয়াসী ইব্‌ন আব্দুর রায্‌যাকের কাছে 'বায়াত' গ্রহণ করেন।[১৫৯]

স্মর্তব্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক উন্নয়ন (Spiritual Development) না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের অন্তর্নিহিত (বাতেনী) অর্থ বোঝা যায় না। যা আবু বকর ইবনুল আরাবীসহ অনেকেই মন্তব্য করেছেন।[১৬০] সেজন্য পূর্বশর্ত হলো মন নিয়ন্ত্রণ করা। আর এই মন নিয়ন্ত্রণের কৌশল সহজভাবেই সূফীতত্ত্বে একজন সূফী সাধকের কাছে শিক্ষা করা যায়। সূফীতত্ত্বে দীক্ষিত হবার জন্য মুল্লাজীর এটিও একটি কারণ হতে পারে। কেননা এতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি রিপু[১৬১] দমনের কৌশল শিক্ষা দেয়া হয়।[১৬২]

---

১৫৫. আযাদ বিলগ্রামী, *সুব্‌হাতুল মারজান*, বোম্বেঃ ১৩০৫ হি./১৮৮৫ খ্রি., পৃ. ৩৭৯।
১৫৬. সিদ্দীক হাসান খান, *আবজাদুল উলুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৮।
১৫৭. Mujibur Rahman, *Self- Development*, Siga Bangladesh, Dhaka: 1995, pp. 35-60.
১৫৮. মহাজাতক, *কোয়ান্টাম মেথড*, ৫ম সংস্করণ প্রজাপতি প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃ. ৩৪-৩৭।
১৫৯. খালিক আহমাদ নিযামী, *তা'রীখে মাশায়িখ চিশ্‌ত*, ইদারা-ই-আদাবিয়্যাত, দিল্লীঃ ১৯৮০, পৃ. ৪৫।
১৬০. প্রাগুক্ত; পৃঃ ২০।
১৬১. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৮৬- পৃঃ ৬১৩।

নাফস (মন) এর প্রকারঃ

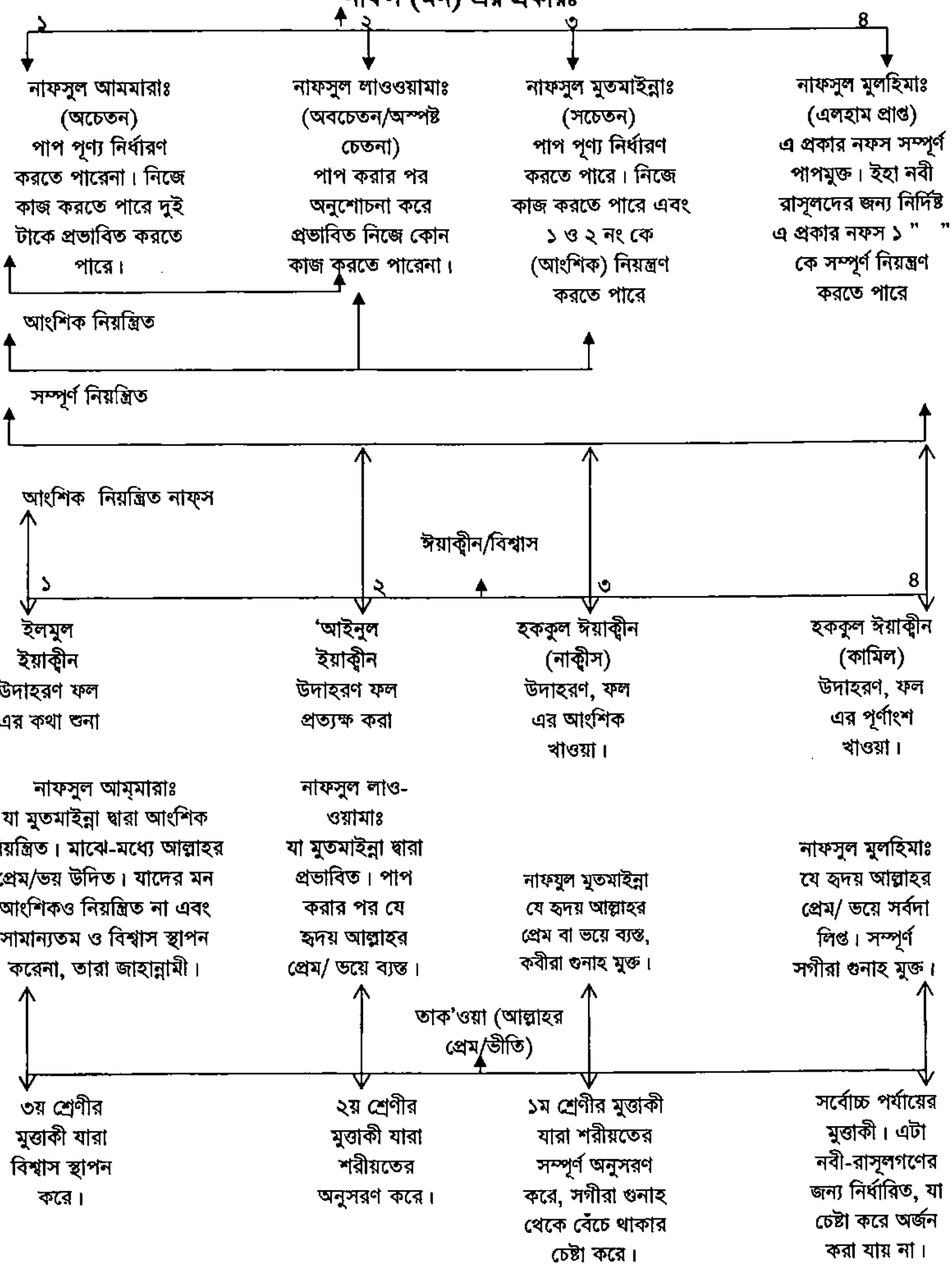

---

[১৬২]. মহাজাতক, *কোয়ান্টাম মেথড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮) ব্যতিক্রমধর্মী এ সূফী সাধকঃ

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের জীবনী ও রচনাবলী পড়লে দেখা যায় যে, তিনি প্রচলিত সূফী-সাধকদের থেকে ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। তৎকালীন সময়ে যারা সূফী ছিলেন তারা দর্শন, মানতিক ও তাসাওউফ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করতেন। আর কেউ কোনো বিষয়ে কোনোকিছু রচনা করলে, সে বিষয়ের উপর সমালোচনামূলক গ্রন্থ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতেন।[১৬৩] অথচ মুল্লাজীর রচনা সমগ্রকে দেখা যায়, তিনি ফিক্‌হ (ইসলামী আইন শাস্ত্র) নিয়ে বেশী গবেষণা করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফ্‌সীরে আহ্মাদী'[১৬৪] টাও ফিক্‌হ এর আলোকে লিখেছেন। ফলে অনেকেই তাঁকে 'মুফাস্‌সির' হিসেবে নয়, বরং একজন 'ফকীহ' হিসেবেই মূল্যায়ন করেছেন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি ধর্মীয় বিষয়কে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

সবচেয়ে বড় পার্থক্য ছিলো এই যে, অন্যান্য সূফী-সাধকরা সাধারণতঃ লোক চক্ষুর আড়ালেই থাকতেন। তাঁরা কখন ও রাজ-দরবারে থাকাটাকে পছন্দ করতেন না এবং রাজ-রাজাদের সংস্পর্শে ও খুব একটা যেতেন না।[১৬৫]

পক্ষান্তরে আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চিত্র দেখতে পাই। তিনি শুধু রাজ-দরবার ও রাজ-রাজাদের সংস্পর্শে যান-ই-নি, বরং সৈনিক, শিক্ষক, পৃষ্ঠপোষক ও রাজ-পন্ডিত হিসেবে দীর্ঘদিন রাজ-দরবারে কাটিয়েছেন।

তিনি তাঁর জীবনে কখনোই লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকেননি।

'নুয্‌হাতুল খাওয়াতির' এর গ্রন্থকার মাওলানা আব্দুল হাই বলেনঃ

> "শেখ মুল্লাজীউন আমৃত্যু মানুষের সাথে মিশেছেন এবং
> শিক্ষা-দীক্ষার মাঝেই শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেছেন।"[১৬৬]

---

[১৬৩]. আল্লামা শিবলী নু'মানী, *মাকালাতুশ্ শিবলী*, ৩য় সংস্করণ, আযমগড়ঃ ১৯৯২, পৃ. ১২৫।

[১৬৪]. আল্লামা শেখ আহমাদ মুল্লাজীউন রচিত একটি অনন্য তাফসীর; যা তিনি মাত্র ২১ বছর বয়সে রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে শুধু শরীয়াতের ঐ সকল আহকাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা কেবল কুরআন থেকে সরাসরি গৃহিত হয়েছে। (ফকীর মুহাম্মদ, *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ*, ৩য় সংস্করণ, লক্ষ্ণৌঃ পৃ. ৩২১)।

[১৬৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২-৩৯৩।

[১৬৬]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২য় সংস্করণ, হায়দারাবাদঃ ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুল্লাজী সারা জীবন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করেছেন এবং অপরকে তা দানে সাধ্যমত আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর জীবন সম্পর্কেই ইমাম আল্-গাযালীর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রযোজ্য হতে পারে- "To acquire knowledge from cradle to grave."[১৬৭] অর্থাৎ তিনি জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিদ্যা চর্চায় ব্রত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু দিল্লীর মাদ্রাসাতে পাঠদানের মাঝে হয়েছিলো। পঠন-পাঠনের মাঝেই তাঁর জীবনের যবনিকাপাত ঘটেছিলো। যেমন কবি বলেছেনঃ

"মরেংগেঁ হাম কেতাবুঁপর
ওয়ারাক হোগা কাফন আপনা।"

সুতরাং মুল্লাজী ছিলেন একাধারে সূফী-সাধক, জ্ঞান-পিপাসু, সমাজ সেবক এবং রাজ দরবারের একজন পৃষ্ঠপোষক। যেমনটি 'আহ্‌লে সুফফ্‌াবাসী'র ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁরা একদিকে ছিলেন জ্ঞান-পিপাসু অপরদিকে ছিলেন রাসূলের রাজ-দরবারের সহায়ক ও সুপরামর্শক।[১৬৮]

(১৯) আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্রঃ

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁর সারাটি জীবন কাটিয়েছেন শিক্ষকতা পেশায়। আয়ু পেয়েছিলেন ৮৩ বছর, তন্মোধ্য থেকে শিক্ষকতা পেশাতেই কাটিয়েছেন প্রায় ৬২টি বছর। এ দীর্ঘ সময় তিনি বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কার্যে ব্রত ছিলেন। এমনকি মক্কা-মদীনায় যখন তিনি পবিত্র হাজ্জ্বব্রত পালন করতে যান, তখন ও তিনি সেখানে নিজেকে শিক্ষকতা পেশায় সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। যা মুল্লাজী নিজেই তাঁর বিখ্যাত 'নূরুল্ আন্ওয়ার' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[১৬৯]

সুতরাং আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের দেশে বিদেশে এতো অসংখ্য ছাত্র ছিলো, যাদের সঠিক কোনো সংখ্যা নির্ণয় করা আদৌ সম্ভবপর নয়। তবে মুল্লাজীর এতো অগণিত ছাত্রদের মাঝে যারা স্বীয় মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় ভাস্বর হয়ে আছে; তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে আমরা উল্লেখের প্রয়াস পাবোঃ-

---

১৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬-২৬৭।
১৬৮. *নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র*, ৮ম খন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃ. ২৭৭-২৭৯।
১৬৯. মাওলানা আব্দুল আহাদ আল্-কাসিমী ও মাওলানা উবাঈদু'ল হক জালালাবাদী, *নূরু'ল আনওয়ার মা'আ আযহারুল আযহার*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯৭৬ খ্রি. পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

(১) শায়খ আহমাদ ইবন আবুল মানসুর খতীব গোপামুঈ। তিনি 'ফাতওয়া-ই-আলমগীরী' এর অন্যতম লেখক ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিশিষ্ট কাজী ছিলেন।[১৭০] তিনি একজন সুবক্তা ও ছিলেন। তিনি 'ফিক্হ' শাস্ত্রের বুৎপত্তি মুল্লাজীর নিকট থেকেই লাভ করেছিলেন।[১৭১] শায়খ আহ্মাদ ইব্ন আবুল মানসুর মুল্লাজীর সাথে হাজ্জ্ব করতে যান এবং ১১১২ হিজরী সনে তথায় ইন্তে কাল করেন।[১৭২] আর এটা ছিলো আহমাদ মুল্লাজীউনের হাজ্জের দ্বিতীয় সফর।

(২) ফাসীহুদ্দীন জা'ফর ফুলওয়ারী (মৃঃ ১১১৯ হিঃ)। তিনি ও 'ফাতওয়া-ই-আলমগীরী' এর অন্যতম লেখক ছিলেন।[১৭৩] তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু-পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন।[১৭৪] এ দু'জনই মুল্লাজীর ঘনিষ্ট ও একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন।

(৩) আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের পুত্র-আব্দুল কাদির, যিনি 'মানাকিবুল আওলিয়া' এর পরিশিষ্ট লিখেছিলেন।[১৭৫]

(৪) মোগল সম্রাট আবুল মুজাফ্ফর মুহীউদ্দীন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব বাদশাহ গাজী (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ)। যিনি ইসলাম ধর্মের একজন মহান সংস্কারক ছিলেন।[১৭৬]

(৫) মোগল সম্রাট শাহ্ আলম প্রথম (বাহাদুর শাহ্)। যিনি অত্যন্ত শান্তি-প্রিয় ছিলেন। শিখদের দমনকারী সম্রাট বলেই তাঁর সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব ছিলো।[১৭৭]

(২০) আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সময়ে ভারতবর্ষঃ

খ্যাতিমান বিদ্বান ও জ্ঞান-সাধক আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন ভারতবর্ষ ছিলো মর্ত্যের স্বর্গপুরী এবং বিশ্ব-বাণিজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। যেমন- বিখ্যাত ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল বলেছেনঃ

> "ইংরেজ জাতির কাছে ভারতবর্ষ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ
> নগরী, আর সেক্সপীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।"[১৭৮]

---

[১৭০]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪ তম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ পৃ. ৫৬০-৫৬১।

[১৭১]. *দায়িরাতু মা'আরিফ ইসলামিয়্যাহ*, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ১৫ তম খন্ড, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৭৫, পৃ. ১৫১।

[১৭২].মাওলানা সুলাইমান আন্-নদ্ভী, *খিলাফাত আওর হিন্দুস্তান*, আযমগড়, ভারতঃ ১৩৪০ হি., পৃ. ২ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

[১৭৩]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১ তম খন্ড, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩।

[১৭৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২।

[১৭৫]. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন শর্মা অনূদিত, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

[১৭৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৬।

[১৭৭]. আব্দুল হামিদ লাহোরী, *বাদশাহ্-নামা*, ১ম খন্ড, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৩৫ খ্রি. পৃ. ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

অপর আরেকজন প্রখ্যাত ইংরেজ কবি ও দার্শনিক H.C. Hill বলেছেনঃ

> "মোগল আমল কেন! সমগ্র ভারতবর্ষ কেন! ভারতের স্বর্ণযুগের কথা কেন! পতনকালের কথাই ধরুণ! শুধুমাত্র বাংলার কথাই বলুন! পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রিঃ) পর নবাবের শুন্য কোষাগারে যা ছিল; তার পরিমাণ ছিলো তৎকালীন মুদ্রামানে ৬৮ কোটি টাকা। যার বর্তমান মূল্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার (১,৪০,০০০০০০০০০০) কোটি টাকা। যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট বাজেটের সমান।"[১৭৯]

জ্ঞান-বিজ্ঞান,শিক্ষা-দীক্ষা,শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মুসলমানরা ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ক অগ্রসর ভূমিকা সম্পর্কে 'জেনারেল শ্রীম্যান' নামক জনৈক ইংরেজের মন্তব্য ও প্রণিধানযোগ্য। যেমন তিনি বলেছেনঃ

"ভারতের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার যেরূপ ব্যাপক প্রসার হয়েছে, পৃথিবীর খুব কম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেরূপ হয়েছে। তাদের মধ্যে যে কুঁড়ি টাকা মাইনেতে চাকরি করে, সে তার পুত্রের জন্য সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের সমান শিক্ষার ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশের যুবকগণ ব্যাকরণ, তর্ক শাস্ত্র ইত্যাদি যে সকল বিষয় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা করে, অক্সফোর্ড থেকে যুবকগণ আজ যে জ্ঞান নিয়ে আসে; মুসলিম যুবকগণ সাত বছরে সেই জ্ঞান আহোরণ করে মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। সে অনর্গল সক্রেটিস, এরিস্টোটল, প্লেটো, হিপোক্রেটিস ও ইবনে সীনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে। যখন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ব্যতীত বাইরের কোন বিষয় নিয়ে আমাদেরকে কোন পদস্থ ও শিক্ষিত মুসলমানের সাথে আলোচনা করতে হয়, তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ব্যক্তিগণও নিজেদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা উপলব্ধি করে।"[১৮০]

প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক Sir William Haunter তাঁর বিখ্যাত "The Indian Musalmans" শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

> "এ দেশটা আমাদের হুকুমাতে আসার আগে মুসলমানরা শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়; বরং শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল।"[১৮১]

---

১৭৮. ভবেশ রায়, *শত মনীষীর কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

১৭৯. এডভোকেট বদিউল আলম, *উপমহাদেশ বিভক্তি ও আজকের বাংলাদেশ*, ১ম সংখ্যা, (প্রকাশকঃ আলহাজ্ব এ,এফ,এম, হাসান), বাগ-ই-নূর, চট্টগ্রামঃ ১৯৯৫, পৃ. ৫।

১৮০. *অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৭, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১৩।

১৮১. Sir Willam Haunter, *The Indian Musalmans*, 3rd Edition, (Translated by Abdul Maudud), Dhaka: 1955, p. 164.

Dhaka University Institutional Repository

Sir William Haunter আরও বলেছেনঃ

"একশত বছর আগে মুসলমানরা সরকারী
বড় বড় চাকরির সুবিধা একচেটিয়া ভোগ করত।"[১৮২]

তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও শিক্ষা নিয়ে ইউরোপের ঘরে ঘরে আলোচিত হতো। যেমন- আজ আমরা ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান ইত্যাদি দেশ নিয়ে আলোচনা করে থাকি।

বর্তমান সময়ে যারা সভ্যতার দাবীদার, তারা তখন সাত-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানে এসে ভীড় করতো। এমনকি বিশ্বের অনেক জাতিই তখন আম-মাংস খেয়ে আম্রকাননে ও পর্বত- গুহায় ছিন্ন-বস্ত্র পরিধান করে কোনো মতে জীবন-যাপন করতো। ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজরা এখানে এসে গোলামী করতো।[১৮৩] তখন তারা এদেশবাসীর কাছে 'স্যার-সাহেব' এর পরিবর্তে চাকর-বাকর হিসেবেই বিবেচিত হতো।

আর এসব কিছু কিন্তু মুসলমানদের দ্বারা সম্ভবপর হয়েছিলো। শাহজাহানাবাদ (বর্তমানে যা নতুন দিল্লী),[১৮৪] আওরঙ্গবাদ এরূপ অনেক বাদেরই গোড়াপত্তন হয়েছিলো মুসলমানদের দ্বারা। স্পেন যেমন মুসলমানদের দ্বারা গগনচুম্বী সভ্যতার দিশারী ও লোক-চক্ষুর দৃষ্টিহরণকারী ছিলো; তেমনি ভারতবর্ষ ও তখন মুসলমানদের সংস্পর্শ পেয়ে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সভ্যতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এমন উৎকর্ষতা লাভ করেছিলো যে, তখন বিশ্ববাসীর নিকট এটা একটি অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য আরব্য-উপন্যাসের কল্পনাপুরী বলে সমাদোরিত হতো এবং কার না মন সেখানে পাড়ি জমাতে না চাইতো।[১৮৫]

সবাই একদৃষ্টিতে সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি আগ্রার তাজমহল দেখে, আবুল ফয়েজ ফৈজীর 'সাওয়াতি'উল ইলহাম' (তাফসীরে বে-নুক্বাত) পড়ে ও 'ফাতওয়া-ই-আলমগীরী' পর্যালোচনা করে বিমোহিত হতো। সবাই ভূঁয়সী প্রশংসা করতো এ তিনটি অনন্য সাধারণ কীর্তির, আর তারা বলতো- এ তিনটি অমর কীর্তির জুড়ি আজও হয়নি এবং আগামীতে ও হবে না। সত্যিই

[১৮২]. আব্দুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকাঃ ১৯৬৮, পৃ. ১০১।
[১৮৩]. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকাঃ পৃ. ২১৯।
[১৮৪]. এ,কে,এম, আব্দুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৭৩, পৃ. ৩২১।
[১৮৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম এ উৎকর্ষতার যুগে আজও সেগুলোর কোনো বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায়নি।[১৮৬]

খলিফা হারুনুর রশীদ, আল-মামুন, আব্দুল মালেক ও স্পেনের দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বের স্বর্ণকালের সাথে সম্রাট শাহ্জাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালকে তুলনা করা হতো। এ সময়ই হানাফী মাযহাবের অতন্দ্র প্রহরী আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।[১৮৭]

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় ছিলো এই যে, তিনি ফকীর দরবেশ বাদশাহ্ হিসেবে খ্যাত, সম্রাট আকবর প্রবর্তিত 'দ্বীন-ই-ইলাহী' এর ধ্বংস সাধনকারী এবং ইসলাম ধর্মের পুণর্জীবনদানকারী সম্রাট আওরঙ্গজেবের শিক্ষক ও তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহ (১ম শাহ্ আলম) এর শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুল্লাজীর জীবনের অধিকাংশ সময়টুকু সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-চর্চা ও সাহিত্য সাধনায় কেটেছিলো।[১৮৮]

আল্লামা আবুল ফয়েজ ফৈজীর 'তাফ্সীরে বে-নুক্বাত' (বিশ্বের অনন্য ফোটাবিহীন তাফসীর)[১৮৯] এবং আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসক দেহ্লভী 'ফাত্হুর রহ্মান' তথা বিশ্বের সর্বপ্রথম 'ফার্সী অনুবাদ কুরআন'[১৯০] লিখে যেমন অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেন; তেমনি আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন ও শরীয়াতের বিধি-বিধান সংক্রান্ত ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম তাফসীর 'তাফসীরে আহ্মাদী' নুরু'ল্-আন্ওয়ার' এর মতো যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করে এক অনন্য রেকর্ড স্থাপন করেন।[১৯১]

মুসলমানদের সেই সোনালী ইতিহাস ও ঐতিহ্য আজ আর নেই। ভারতবর্ষের ভাগ্যে আজ অবধি যে সম্মান ও মর্যাদা আর জোটেনি। তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠার মেরেছে। গৌরবগাঁথা সেই সোনালী ইতিহাসকে নিজেরাই নিজেদের পায়ে পদদলিত করেছে; হারিয়েছে তাদের বহু কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত সম্মান ও মর্যাদাকে।

---

[১৮৬]. ড. আলিম কে দাওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাস্সিরীন আওর উন্কী আরবী তাফসীরেঁ,* মাক্তাবাতু জামি'আর লিমিটেড, নতুন দিল্লীঃ ১৯৭৩ (এই গবেষণার উপর মুসলিম আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টোরেট ডিগ্রী' প্রদান করা হয়েছে।) পৃ. ৫৯-৭১।

[১৮৭]. R.C. Majumder, *An Advanced History of India*, 3rd Edition, Macmilan S.T. Martings Press, London:1949, p. 484.

[১৮৮]. খাদিম হুসাইন, *তারীখ্ কাসাবা-ই-আমেথী,* নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯৭৮, পৃ. ১৭৫।

[১৮৯]. আযাদ বিলগ্রামী, *মা'আসিরুল কিরাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

[১৯০]. হযরত মাওলানা আব্দুল হক, *তা'রীখে ইল্মে তাফসীর,* সৌদিয়া কুতুবখানা, ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃ. ১৫৩।

[১৯১]. মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন, *মুসলমানদের উত্থান ও পতন,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯, পৃ. ৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় দু'শত বছর ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির গোলামী করার[১৯২] ফলে তারা আজ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। বলা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে তাদের অবস্থান খুবই শোচনীয় পর্যায়ে।[১৯৩] ১৯৯৯ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যে বছর শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছিলো; তার পরিমাণ ছিলো মাত্র চার পয়সা।[১৯৪] আর সবচেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছিলো- মিশনারী তৎপরতায়। উপরোক্ত তথ্যটি থেকে বোঝা যায়, বৃটিশ ভারতে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে কতোটা নিষ্পেশিত ছিলো।

তবে সুখের বিষয় হলো, শত চেষ্টা করেও ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তি ভারতবর্ষ থেকে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে পারেনি; যেমনটি পেরেছিলো স্পেনে। আর এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিলো আলেম সমাজের। যাঁরা অনেকেই আল্লামা শেখ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ও আল্লামা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহ্‌লভীর ছাত্র ছিলেন। তাঁরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা হারালেও ইসলামী শিক্ষানীতি ধরে রেখেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আজও ভারতবর্ষে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা টিকে আছে।[১৯৫]

তাইতো আমরা কবিতার সুরে বলতে পারিঃ

"ওহে মুল্লাজী! উঠে এসে দেখে যাও মুসলমানদের দূর্গতি
তুমি যখন এসেছিলে, মুসলমান ছিলো শ্রেষ্ঠ জাতি।
সূর্য উঠে আবার অস্ত যায়
অস্ত গিয়ে উঠে আসে পূনরায়।
তুমি অস্ত গেলে; কিন্তু আর উঠিলেনা হায়!"[১৯৬]

---

[১৯২]. নিলুফার আক্তার, *নবাব স্যার সলিমুল্লাহ*, ২য় সংস্করণ, পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পূনর্গঠন সংস্থা, ঢাকাঃ ১৯৬৭, পৃ. ১-২, (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

[১৯৩]. (i) *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০, পৃ. ৩, (কলাম ২-৩)। (ii) *নিবন্ধমালা*, ৮ম খন্ড, উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃ. ২৭৭-২৭৯।

[১৯৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩, (কলামঃ ২-৩)।

[১৯৫]. মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন, *মুসলমানদের উত্থান ও পতন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩।

[১৯৬]. স্ব-রচিত কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

(২১) মুল্লাজীউনের সময়কার রাজা-বাদশাহ্‌গণঃ

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁর গোটা জীবদ্দশায় মোট পাঁচজন মোগল সম্রাটের রাজত্বকাল পেয়েছিলেন। এঁরা হলেন- সম্রাট শাহ্‌জাহান, আওরঙ্গজেব, বাহাদুর শাহ্‌, জাহান্দার শাহ্‌ ও ফররুখ সিয়ার। এঁদের মধ্যে সম্রাট শাহ্‌জাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালটাই সবচেয়ে বেশী পেয়েছিলেন আল্লামা মুল্লাজীউন। অন্যকথায় আমরা বলতে পারি, মুল্লাজী মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ও পতনযুগ উভয়টাই পেয়েছিলেন। আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিম্নে আমরা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের সময়কার পাঁচজন মোগল সম্রাট সম্পর্কে সংক্ষিপ্তকারে আলোচনার প্রয়াস পাবোঃ

(১) সম্রাট শাহ্‌জাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রিঃ)

রক্তপাতের মাধ্যমে সিংহাসনে আরোহণ করলেও সম্রাট শাহ্‌জাহান একজন দয়ালু ও উদার শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ। সিংহাসনে আরোহণের পর শাহজাহান পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন ও হুগলী অধিকার করেন।[১৯৭] দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেছিলেন। দক্ষিণে তিনি আহমদনগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন এবং বিজাপুর ও গোলকুন্ডা আয়ত্বে নিয়ে আসেন। সম্রাট বাহিনী আসামের অহোমদের সাথেও যুদ্ধ করেছিলো এবং এর ফলে সাম্রাজ্য কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরীর মতেঃ

> "সম্রাট শাহজাহানের সাম্রাজ্য সিন্ধু হতে আসামের সিলেট বা
> শ্রীহট্ট জেলা এবং আফগান অঞ্চলের বিস্তৃত দূর্গ হতে
> দাক্ষিণাত্যের আউসা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।"[১৯৮]

শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শাহ্‌জাহান সম্রাট আকবরের গৃহীত নীতি গ্রহণ করেন এবং ন্যায়বিচার ও বদান্যতার জন্য প্রশংসা অর্জন করেন। সম্রাট শাহ্‌জাহানের সময়ে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান ছিলে। রাজস্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলো এবং প্রজাবর্গ সুখী ও সমৃদ্ধশালী ছিলো। দু'-

---

[১৯৭]. Edwards and Garret, *Mughal Rule in India*, Cambridge University Press, New York, America: 1988, p. 247.
[১৯৮]. B.P. Saksena, *History of Shah Jahan*, Madras: 1979, p. 831.

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিদ্রোহ ব্যতীত শাহজাহানের রাজত্বকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা কখনও ব্যাহত হয়নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক B.P. Saksena বলেনঃ

> "সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য
> সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের শীর্ষে উন্নীত হয়েছিলো।"[১৯৯]

ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যে বহু বিদেশীর মন আকৃষ্ট হয়েছিলো এবং তাঁরা এদেশ সম্বন্ধে বহু চমকপ্রদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। ফরাসী পর্যটক Tavernier বলেনঃ

> "সম্রাট শাহজাহান রাজা হিসেবে প্রজাকে শুধু
> শাসন করা নয়; বরং পরিবার ও সন্তানদের ন্যায়
> তিনি প্রজা শাসন করতেন।"[২০০]

সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফি খানও সম্রাট শাহজাহানের সু-শাসনের প্রশংসা করেছেন। ইতালির পর্যটক মনুচিত্ত কাফিখানের মন্তব্য সমর্থন করে শাহজাহানের শাসন ব্যবস্থাকে 'খুব উন্নত' বলেছেন। এসব পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের মন্তব্য গ্রহণ করলে আমরা ড. স্মিথের এ মন্তব্য স্বীকার করে নিতে পারি না যে, সম্রাট শাহজাহানের শাসনব্যবস্থা প্রজাদের প্রতি 'শ্রদ্ধাহীন' ও 'সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন' এক শাসন প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত।[২০১]

শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহান এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর আমলে মোগল শিল্প ও স্থাপত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলো। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের সমাধির উপর তিনি যে 'তাজমহল' গড়ে গিয়েছেন, তা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বাপেক্ষ সুন্দর এক শিল্পকর্ম। তাছাড়া দিল্লীর 'দেওয়ান-ই-আম' ও 'দেওয়ান-ই-খান' এবং আগ্রার 'জাম-ই-মসজিদ' ও 'মতি মসজিদ' শিল্পোৎকর্ষ ও সৌন্দর্যের জন্য আজও পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে। ময়ূর সিংহাসন ও শাহজাহানের সৌন্দর্য-জ্ঞান এবং ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন ছিলো।[২০২]

---

১৯৯. M.A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol-ii, Hyderabad, India: 1972, p. 910.
২০০. Tavernier, *Travels in India*, Eureka Publications Ltd., London, England: 1963, p. 438.
২০১. Ishwari Prasad, *A short History of Muslim Rule in India*, Allahabad: 1939, p. 641.
২০২. B.P. Saksena, *History of Shah Jahan*, op. cit., p.713.

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য ও চিত্রবিদ্যা সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে যথেষ্ঠ উৎকর্ষতা লাভ করেছিলো। নিজে একজন সংস্কৃতিসেবী ও পন্ডিত ছিলেন বলে শিক্ষা ও শিক্ষিতের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। অনেক বিখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে যে সব বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'বাদশাহ্ নামা'র প্রণেতা আব্দুল হামিদ লাহোরী, অন্য একটি 'বাদশাহ্ নামা'র রচয়িতা আমীর কাজীনী, 'শাহজাহান নামা'র লেখক ইনায়েত খান, 'আমল সালিহ' গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মদ সালিহ, আবুল কাসিম ইরানী ও মীর্জা গিয়াসউদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২০৩] আর এ সময় শাহজাদা দারা শিকোহ অনেকগুলো সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে 'সাকিনাতুল্ আউলিয়া', 'হাস্‌নাতুল আরেফী' ও 'রিসালাহ্-ই-হক্‌নামা' প্রধান ও বিখ্যাত।[২০৪]

সঙ্গীতের প্রতি সম্রাট শাহজাহানের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিলো। তিনি নিজে ভালো গান গাইতে ও বাদ্যযন্ত্র বাঁজাতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এতোই মধুর ছিলো যে, অনেক শ্রোতাই তাঁর গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে পড়তেন।[২০৫]

সম্রাট শাহজাহান ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রচুর উৎসাহ দান করতেন। শাহ্জাহানের রাজত্বকালে "ভারতবর্ষ পশ্চিম-এশিয়া ও ইউরোপের সাথে রপ্তানী ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলো।"[২০৬] সরকারী রাজকোষ এ সময় পরিপূর্ণ ছিলো। তাঁর ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিলো। এসব ব্যাপারে পর্যালোচনা করে বলা হয়-

> "সম্রাট শাহ্জাহানের রাজত্বকালে মোগল বংশ ও সাম্রাজ্য
> গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলো।"[২০৭]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদের এতো প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সম্রাট শাহ্জাহানের রাজত্বকালেই সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত অবনতির বীজ রোপিত হয়। শিল্পকলার প্রসার ও সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তিনি রাজকোষের অর্থ অকাতরে ব্যয় করেছেন। এতে পরবর্তীতে অর্থ সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করে এবং সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত পতনের পথ প্রশস্ত হয়। কান্দাহার ও

---

২০৩. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, Kanpur, India: 1946, p. 327.
২০৪. Tara Chand, *Influence of Islam on India Culture*, Bani Shilpa Prokashoni, Calcutta, India: 1987, p. 117.
২০৫. Muhammad Noman, *Muslim India*, Islamic Publications Ltd., Lahore, Pakistan: 1978, p. 238.
২০৬. V.A. Smith, *Oxford History of India*, Delhi, India: 1962, p. 406.
২০৭. Ibid, p. 391.

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য-এশিয়ায় দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে লোক ও অর্থের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিলো[২০৮] উপর্যুপরি তিনবার কান্দাহার অভিযানের ব্যর্থতার ফলে মোগলদের দূর্বলতা ও অক্ষমতা বহির্বিশ্বে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে মারাঠাদের পুনর্জাগরণ ঘটে এবং ব্রিটিশদের রাজ্যলিপ্সা দেখা দেয়।[২০৯] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Bernier মতানুসারেঃ

> "প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কু-শাসনের ফলে কৃষক কারিগর শ্রেণীর মধ্যে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দেখা দিয়েছিলো। বিরাট সাম্রাজ্যের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং ব্যয়বহুল সৌধাদি নির্মাণ কার্যের ব্যয়ভার বহন করার জন্য কৃষকবর্গ ও কারিগর শ্রেণীর উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়েছিলো। বিরাট অট্টালিকা ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যয়-বাহুল্যের জন্য জাতীয় অর্থের যে অপচয় হয়, তা আর পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি। এ অর্থ সঙ্কট পরবর্তীকালে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"[২১০]

(২) আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ) ঃ

সম্রাট আওরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম ছিলেন। একজন সুদক্ষ সেনাপতি, আদর্শ শাসক, সরল ও ধার্মিক লোক, নিরপেক্ষ বিচারক এবং প্রজাহিতৈষী হিসেবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে তিনি উচ্চাসন লাভ করেছিলেন। সারল্য, নিরপেক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সৎ উদ্দেশ্য তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিলো। তিনি তাঁর অদম্য সাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও অক্লান্ত কর্মগুণের দ্বারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন।[২১১]

রাজত্বের প্রথমভাগে সিংহাসন অধিকার করার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব নিষ্ঠুর উপায় গ্রহণ করলেও পূর্বপুরুষদের ধারানুক্রমিক কার্যাবলী ও তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার বিচারে তিনি

---

২০৮. H.G. Keene, *The Fall of the Mughal Empire*, Cambridge University Press, New York, America: 1988, p. 519.
২০৯. Ibn Hasan, *The Central structure of the Mughal Empire*, India Office Library, London: 1973, p. 201.
২১০. Abdul Aziz, *Mansabdari System and The Mughal*, India Office Library, London: 1958, p.430.
২১১. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol-iv, op. cit., p. 9120.

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমার পাত্র। সিংহাসন অধিকার করার পর তিনি কখন ও বৃথা রক্তপাতকে প্রশ্রয় দেননি; বরং তিনি নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা কোমল স্বভাবের অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন।[২১২]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজ্য-শাসনের আদর্শ ছিলো মহান। যেমন, সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজেই বলেছেনঃ

> "I was sent into the World by Providence to live
> and labour, non for myself but for others, that it is
> my duty not to think of my own happiness except
> so for as it is inseparably connected with the
> happiness of my people."[২১৩]

অর্থাৎ- নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য পরিশ্রম করে বাঁচতে আমি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। আমার প্রজাদের সুখের জন্য আমার যে সুখ সম্পর্কিত নয়, সে সুখের জন্য চিন্তা না করাই আমার কর্তব্য।

সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর মহান আদর্শে অবিচল ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি প্রজাদের সুবিধার্থে ন্যূনপক্ষে ৮০টি কর তুলে দিয়েছিলেন। রাজনীতির দ্বারা ধর্মকে তিনি কলুষিত হতে দিতেন না। সেজন্য তিনি 'ভবিষ্যত বিপদের' ইঙ্গিত করেছিলেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ইসলামকে পবিত্রতা ও সম্পূর্ণতার মধ্যে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। এ কথাও সত্য যে, একজন প্রকৃত মুসলিম শাসক হিসেবেই তিনি ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন। এজন্য সম্রাট আকবরের সময় যে সমস্ত লোক প্রশ্রয় পেয়েছিলো, তারা সম্রাট আওরঙ্গজেবকে পছন্দ করতো না।[২১৪]

সম্রাট আওরঙ্গজেব শাসন-দক্ষতা, তীক্ষ্মবুদ্ধি ও প্রচন্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারের যুদ্ধ, বিদ্রোহ দমন ও দাক্ষিণাত্য অভিযানে সৈনিক ও সেনাপতি হিসেবে তাঁর শক্তিমত্তা এবং বুদ্ধির পরিচয় দেন।

কূটনীতি, সেনাপতিত্ব ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ কেউ ছিলো না। মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হতে পারেন নি সত্য, তবে তিনি তৎকালীন

---

২১২. Wairvine, *Later Mughals*, Danforth University Press, London: 1912, p. 178.
২১৩. Ibid, p. 259.
২১৪. Edward and Garret, *Mughal Rule in India*, op. cit., p. 251.

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা-ই এই অকৃতকার্যতার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলো; একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[২১৫]

শাসক হিসেবে সম্রাট আওরঙ্গজেব রাষ্ট্রের সকল বিভাগের শাসনকার্য পরিদর্শন করতেন। অন্যায় কর, দুর্নীতি ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের উপর তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। কৃষি-কাজে তিনি উৎসাহ দান করতেন এবং অনেকগুলো রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করেছেন। তিনি নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। তাঁর নিকট দরিদ্র, ধনী, অভিজাত ও সাধারণ মানুষ সমান বিচার লাভ করতো। ব্যক্তিগত জীবনে সরল হলেও সর্বদা নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে তিনি দরবারের মর্যাদা রক্ষা করতেন।[২১৬]

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষাকার্যে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে তিনি অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। কুরআনের সূরাগুলো তাঁর মুখস্ত ছিলো এবং হাদীস তাঁর জানা ছিলো। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিলো। আরবী ও ফার্সী সাহিত্যেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগারী' রচিত হয়। তিনি একজন হস্তলিপি বিশারদ ছিলেন এবং অতি সহজে ও দক্ষতার সাথে 'কুরআনুল কারীম' 'সিকাস্ত' ও 'নাস্তালিক' পদ্ধতিতে লিখতেন।[২১৭]

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন একনিষ্ঠ মুসলমান হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে রাজা যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহের ন্যায় অনেক হিন্দু রাজ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের তুলনায় তাঁর সময়ে হিন্দু রাজ-কর্মচারীদের সংখ্যা অধিক ছিলো। কিন্তু ইসলামী শরীয়াতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তিনি অধিকতর সচেতন ছিলেন।[২১৮]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কাফী খান এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

> "Of all the Sovereign's of the house Timunay, of all the Sovereign's of Delhi.... no one since Sikandar Lodi has ever been apparently so distiuguished for devotion, austerity and justice. In courage, long sufferings and sound judgement, he was unrivalled."[২১৯]

---

২১৫. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol-ii, op. cit., p. 487.
২১৬. Ibid, p. 312.
২১৭. Edwards and Garret, *Mughal Rule in India*, op. cit., p. 463.
২১৮. Ray Chowdhury, *An Advanced Histroy of India*, Princeton University Press, New Jersey, America: 1963, p.236.
২১৯. A.B.M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Kutub Khana Rashidiá, Delhi, India: 1938, p. 64.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ- কেবল তৈমুরের বংশের সুলতান নয়, দিল্লীর সকল সুলতানদের মধ্যে সিকান্দার লোদীর পর ধর্মানুরক্তি, কঠোর পবিত্র জীবন ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁর (আওরঙ্গজেব) ন্যায় আর কারো ছিলো না। অধিকন্তু সাহস, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব যদি তাঁর ও কর্মচারীদের উপর অবিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তাহলে তা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হয়েছিলো। এ অবস্থায় তিনি যদি অতি সচেতন ও সর্বদা সতর্ক থেকে থাকেন, তাহলে এর জন্য তাঁকে দোষ দেয়া যায় না।[২২০]

সম্রাট আওরঙ্গজেব অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন এবং অতি স্পষ্টবাদী একজন মানুষ ছিলেন। রাজ-ভান্ডারকে তিনি পবিত্র 'আমানত' মনে করতেন এবং নিজের জন্য তা হতে একটি পয়সাও ব্যয় করতেন না। পবিত্র কুরআন শরীফ নকল করে ও নিজের হাতে টুপী সেলাই করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।[২২১] তিনি কখন ও প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়েননি এবং নিষিদ্ধ খাদ্য, পানীয় ও পোশাক ইত্যাদি গ্রহণ করতেন না।

কাজেই ব্যক্তিগত জীবনে সরল ও নিরাসক্ত, ধর্মীয় জীবন-যাপনে কঠোর, একজন উচ্চ শিক্ষাবিদ, দরিদ্র ও শিক্ষিতদের পৃষ্ঠপোষক, উন্নত ধরণের পত্রলেখক, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক এবং মসী ও অসির একজন সুদক্ষ ধারক ও বাহক হিসেবে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ্ গাজী প্রকৃতপক্ষেই একজন মহান, সুদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন।[২২২]

(৩) বাহাদুর শাহ্ বা শাহ্ আলম (প্রথম) (১৭০৭-১৭১২ খ্রিঃ)

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়। তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তা রক্ষা করার মতো যোগ্যতা তাঁর উত্তরাধিকারীদের ছিলো না। তাঁরা নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে তাঁর পুত্রগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ আলম (মুয়াজ্জম) অন্যান্য ভ্রাতাকে পরাজিত করে 'বাহাদুর শাহ্'

২২০. M.A. Rahim, *Social and Political History of Bengal*, op. cit., p.713.
২২১. J.N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol-i, op. cit., p.453.
২২২. Ibid, p.174.

Dhaka University Institutional Repository

উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২২৩] ভ্রাতাগণের মধ্যে বাহাদুর শাহ্ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি রাজপুতদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের সর্বপ্রধান ঘটনা শিখ নায়ক 'বান্দার' অভ্যুত্থান। শিখ নায়ক বান্দা ও তাঁর অনুচরগণ পাঞ্জাবের অন্তর্গত 'সিরহিন্দ' শহরে লুট-পাট আরম্ভ করলে বাহাদুর শাহ্ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পরবর্তীতে শিখ নায়ক বান্দা জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন।[২২৪]

(৪) মু'ইযুদ্দীন জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-১৭১৩ খ্রিঃ) ঃ

১৭১২ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহ্ বা শাহ্ আলম (প্রথম) ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসন দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অবশেষে অন্যান্য ভ্রাতাদের পরাজিত করে জ্যেষ্ঠ পুত্র মু'ইযুদ্দীন জাহান্দার শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় এক বছর রাজত্ব করার পর আজিম-উস-শানের পুত্র ও বাহাদুর শাহের পৌত্র ফররুখ শিয়ারের হাতে নিহত হন।[২২৫]

(৫) ফররুখ্ শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রিঃ)ঃ

সম্রাট মু'ইযুদ্দীন জাহান্দার শাহ্ নিহত হলে ফররুখ শিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈয়দ হোসেন আলী ও সৈয়দ আব্দুল্লাহ নামক দুই ভ্রাতা ফররুখ্ শিয়ারকে সিংহাসন লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দেন। তখন হতে তারাই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসক হয়ে দাঁড়ালেন। আর ফররুখ শিয়ার হলেন তাদের হাতের পুতুল।[২২৬]

আমীরগণ ছিলেন তিন দলে বিভক্ত - হিন্দুস্থানী (ভারতের জাঠ), ইরানী (পারস্য ও খোরাসান হতে আগত) এবং তুরানী (মধ্য এশিয়া হতে আগত)। বিভিন্ন দলের পারস্পরিক ষড়যন্ত্র ও বিবাদের ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি দূর্বল হতে লাগলো। এ সময় মারওয়াড়ের রাজা অজিত সিংহ

---

২২৩. Kafi Khan, *Muntakhab-ul-Lubab*, Vol-vii, Matba Nizami, Vupal, India: 1942, p. 936.
২২৪. Beni Prasad, *Religious Policy of the Mughal*, Nawal Kishor Press, Lucknow: 1964, p. 471.
২২৫. H.G. Keene, *The Fall of the Mughal Empire*, op. cit., p.320.
২২৬. S.M. Jaffar, *The Mughal Empire*, British Colombia Publications, Toronto, Canada: 1974, p. 234.

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহী হন। কিন্তু পরে সম্রাট ফররুখ শিয়ারের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সাথে নিজের কন্যার বিয়ে দেন।[২২৭]

শিখ নায়ক বান্দা সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে পুনরায় মাথা তুলতে চেষ্টা করলে সম্রাট তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করেন। কিন্তু মারাঠা জাতি নতুন করে রাজ্যে উৎপাত শুরু করলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাদেরকে দমন করতে না পেরে তাদের হাতে দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবা হতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার ছেড়ে দেন। সম্রাট তাদের এ আচরণে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাত হতে মুক্তি পাবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তা জানতে পেরে মারাঠাদের সাহায্যে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করেন।[২২৮]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা মুল্লাজীউন সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব পেয়েছিলেন ২১ বছর, আওরঙ্গজেবের ৫০ বছর ৩ মাস, বাহাদুর শাহের ৫ বছর, জাহান্দার শাহের ১ বছর এবং ফররুখ শিয়ারের ৬ বছর।[২২৯]

আওরঙ্গজেব বাদে বাকী চারজন সম্রাটের রাজত্ব পেয়েছিলেন ৩৩ বছর। সে অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, মুল্লাজীর জীবনের বৃহৎ অংশটুকুই কেটেছে আওরঙ্গজেবের শাসনামলে। যিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ইসলামের অনুগত একজন শাসক। তিনি যদিও খলীফা ছিলেন না, তথাপি তাঁর রাজ্য পরিচালনা খেলাফতের নিয়ম-কানুন বহির্ভূত ছিলো না। তাই তাঁর রাজ্য-ব্যবস্থাকে যদি খেলাফতের সাথে তুলনা করা হয়, তবে খলীফা হারুনুর রশীদ, আল-মামুন ও আব্দুল মালেকের চেয়ে কোনো অংশ কম ছিলো না।[২৩০]

তাই সম্রাট আওরঙ্গজেবকে যদি ভারতবর্ষের মোগল খলীফা বলা হয়, তবে তা অত্যুক্তি হবে না। এই খলীফা ও তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহেরই শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুল্লাজীউন; যা তাঁর মর্যাদাকে আরও সমুজ্জ্বল করেছে।

---

২২৭. Ibid, p.176.
২২৮. Mohammad Noman, *Muslim India*, op. cit., p. 308.
২২৯. ফকীর মুহাম্মদ, *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬।
২৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং আমরা বলতে পারি, আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের জন্ম হয়েছিলো মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে, কর্মজীবন শুরু হয়েছিলো মোগল সাম্রাজ্যের সংস্কার যুগে, আর মৃত্যু হয়েছিলো মোগল সাম্রাজ্যের পতন যুগে।[২৩১]

(২২) দেশ- বিদেশ ভ্রমণে মুল্লাজীউনঃ

আমরা জানি জ্ঞানার্জনের দু'টি মাধ্যম রয়েছে। একটি হলো বই পড়া, অপরটি হলো দেশ ভ্রমণ করা।[২৩২] যার ভেতর এ দু'টি বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে, সে-ই বিজ্ঞতা তথা জ্ঞানের চরম শীর্ষে আরোহণ করেছে। বিশেষ করে ইসলামী শরীয়াতের আইন-কানুনে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য পবিত্র নগরীদ্বয় তথা 'মক্কাতুল মুকাররামাহ্' ও 'মদীনাতুল মুনাওওয়ারাহ্' ভ্রমণ করাও আবশ্যক। কেননা, ইসলামী শরীয়াতের অন্যতম একটি মৌলিক ভিত্তি 'হাজ্জ্ব' এর অনেক মাস্আলা মাসায়িল এ দুই পবিত্র স্থানে সাথে সম্পৃক্ত।[২৩৩]

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের পবিত্র এ দু'টি নগরী ভ্রমণের শুধু সুযোগই হয়নি, বরং দীর্ঘ নয়টি বছর মুল্লাজীউন উক্ত দু'টি পবিত্র নগরী তথা মক্কা ও মদীনাতে অবস্থানের সুযোগ পেয়েছিলেন। আর এ দীর্ঘ নয়টি বছরে মুল্লাজী যে একাধারে শুধুমাত্র মক্কা ও মদীনাতেই অবস্থান করেছিলেন তাও কিন্তু নয়; বরং সময়ের ফাঁকে ফাঁকে, সুযোগ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশ-পাশের আরও অনেক স্থান ও তিনি ভ্রমণ করেছেন। যা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বিবেক সিদ্ধ একটি ব্যাপার।[২৩৪]

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন পবিত্র মক্কা ও মদীনা যাবার পথে পথিমধ্যে অসংখ্য দেশ ও শহর ভ্রমণ করেছেন। যার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান আমরা ইতিহাস থেকে পাইনা। কেননা, তৎকালীন সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের লোকেরা মক্কা ও মদীনায় যেত ইরাক ও ইরানের মধ্যদিয়ে; হয় পায় হেঁটে নতুবা নৌযানে। আর যেতেও সময় লাগতো কয়েক মাস। অনেকের তো বছর ও কেটে যেত যাত্রাপথে।[২৩৫]

---

২৩১. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্রুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

২৩২. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ্, ১৪২ নং আয়াত। এবং *বই কেনা*, প্রমথ চৌধুরী, (বাংলা সাহিত্য সংকলন, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী জন্য), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড, ঢাকাঃ ১৯৮৮, পৃ. ১৬৮।

২৩৩. *দায়িরাতু মা'আরিফ ইসলামিয়্যা*, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ১৫ তম খন্ড, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৭৫, পৃ. ১৩৯৫।

২৩৪. মুহাম্মাদ ইবন্ মু'তামাদ খান, *তা'রীখ-ই-মুহাম্মাদী*, ২য় সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খন্ড, হায়দারাবাদ, হিন্দু (ভারত)ঃ ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ২৮৩৪।

২৩৫. আযাদ বিলগ্রামী, *সুবহাতুল মারজান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ যাত্রাপথে কত দেশ, কত নগরী, কত পথ, কত মাঠ, কত ঘাট, কত বিদ্যাপীঠ, কত মানুষের কত মনোভাব, নানান দেশের মানুষের নানান স্বভাব, নানান জাতির উপর নানান পরিবেশের নানানো প্রভাব, নানান দেশের জলবায়ুর নানান বৈচিত্র্য ইত্যাদির সাথে আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের পরিচয় ঘটা একান্তই স্বাভাবিক ও বিবেক সম্মত। আমাদের অভিমত ও সেটি। আর প্রখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন উপরোক্ত কথাগুলোকেই প্রতিধ্বনিত করে গেছেন।[২৩৬]

এতো গেল আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের বিদেশ ভ্রমণের কথা। এবার আসা যাক মুল্লাজীউনের স্বদেশ ভ্রমণের কথায়। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষ ছিলো যেন মর্ত্যের এক স্বর্গপুরী বা ভূ-স্বর্গ। আর এ ভূ-স্বর্গ ভ্রমণ করাটা ছিলো যেন সবার কাছেই একটি চরম গৌরব ও মর্যাদার বিষয়।[২৩৭]

তাই আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন ও মর্ত্যের স্বর্গপুরী এ ভারতবর্ষে কম ভ্রমণ করেননি। ভারতবর্ষের দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, ফতেহ্পুর, লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর ইত্যাদি শহরে তিনি বসবাস করেছিলেন, যা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য। আর ঐ সময়ে মুল্লাজী যে ভারতের অন্যান্য নগরী তথা পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইত্যাদি ভ্রমণ করেননি; একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা তৎকালে এদেশগুলোর মাঝে কোনো ভৌগলিক সীমারেখা ছিলো না, যেমনটি এখন আছে; বরং এই সবগুলো দেশই ছিলো ভারতবর্ষের অধীনে।[২৩৮]

তারপরও আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন আবার ছিলেন একজন রাজ-পন্ডিত। তাই রাজ-রাজাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করা এবং বিভিন্ন দেশের ভাষা আয়ত্ব করাও তাঁর পক্ষে ছিলো স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। এভাবে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ফলে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিলো (যেমন-রাষ্ট্র-নীতি, পররাষ্ট্র-নীতি, সমাজ-নীতি, পর্যটন-নীতি ও শিক্ষা-নীতি) সেটার

---

২৩৬. গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত, *আল- মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন*, ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৮১, পৃ. ১১২, ৩৭৯, ৩৮৫।

২৩৭. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন শর্মা অনূদিত, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, প্রগতি প্রকাশনী, মস্কোঃ ১৯৮৬, পৃ. ৩৫৫।

২৩৮. Sir Wolseley Haig, *The Cambridge History of India*, Vol-iv, (Edited by Sir Richard Burn), Chand and Company, New Delhi: 1979, p. 227.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি মুগ্ধ হয়েই সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং বাহাদুর শাহ্ লাহোর মুল্লাজীকে সাথে করে নিয়ে যান ও কাছে রাখেন।[২৩৯]

যেমন- উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, সম্রাট আলেকজান্ডার দার্শনিক এরিস্টোটলকে,[২৪০] সুলতান আলাউদ্দীন ইস্পাহানী প্রাচ্যের Aristotle ইবনে সীনাকে[২৪১] প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রী বানিয়ে কাছে রেখেছিলেন এবং তৈমুর লং দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ইবনে খাল্‌দুনকে সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন।[২৪২]

সুতরাং আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একদিকে যেমন ছিলেন জ্ঞান-তাপস, অপরদিকে ছিলেন সুবিজ্ঞ প্রব্রিাজক ও শ্রেষ্ঠ পর্যটক।

(২৩) মুল্লাজীউনের মাতৃভাষার রহস্য উদ্‌ঘাটনঃ

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের ভাষা কী ছিলো, তা নিয়ে ঐতিহাসিক, জীবনী লেখক ও পাঠক সমাজের মাঝে একটি জটলা পেকে আছে। যে জটলার সমাধান আজ পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক ও জীবনীলেখক দিয়ে যেতে পারেননি। তাঁরা কেউ নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের ভাষা অমুকটি ছিলো। এ বিষয়টি নিয়ে মূলতঃ তাঁরা অনেক ঘুরপাক খেয়েছেন।

তবে আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন একজন আরবীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন।[২৪৩] তাই স্বাভাবিকভাবে পারিবারিক ভাষা হিসেবে হয়তো তাঁর পরিবারের মধ্যে আরবী ভাষার প্রচলন ছিলো। কেননা মুল্লাজীর আরবী ভাষাতে এতোটাই দক্ষতা ছিলো যে, তাঁর লেখার সামনে যে কোনো ক্ষুরধার আরবী লেখকের লেখা হার মানতে বাধ্য। যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর আরবী রচনাবলী। তাছাড়া আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁর অধিকাংশ মূল্যবান বই আরবীতেই লিখে গিয়েছেন।

---

২৩৯. মুহাম্মদ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *নুযহাতুল খাওয়াতির,* হায়দারাবাদঃ ১৩৭৬ হি./১৯৫৭ খ্রি. পৃ. ৩৬৭।
২৪০. ভবেশ রায়, *শত মনীষীর কথা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।
২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
২৪২. গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত, *আল-মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯।
২৪৩. ইউসুফ আল ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল- মাতবু'আতু'ল আরাবিয়্যাহ ওয়াল মু'আররাবা,* ২য় খন্ড, সারকীস মুদ্রণালয়, মিশরঃ ১৯২৮, পৃ. ১১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সী ভাষাতে লিখেছেন মাত্র ৩/৪টি বই, আর বাকী ৮/৯ টি বড় বই লিখে গিয়েছেন আরবী ভাষাতেই।[২৪৪]

উপরোক্ত রচনাবলীর উপর নির্ভর করে যদি তাঁর মাতৃভাষা নির্ণয় করতে হয়, তাহলে আরবীকেই মুল্লাজীর মাতৃভাষা হিসেবে সাব্যস্ত করতে হয়। কেননা মুল্লাজীর আরবী রচনাবলীর সাথে ফার্সী রচনাবলীর তুলনা করলে যে কারো কাছেই প্রকৃত ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে একথাও ঠিক যে, যদি কেউ মুল্লাজীউনের ফার্সী রচনাবলী পড়ে, তবে সে নির্দ্বিধায় তাঁকে আল্লামা রুমী ও হাফীজের সাথে তুলনা করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।[২৪৫]

এবার লেখনীর পালা বাদ দিয়ে যদি আমরা 'কথ্য-ভাষা' এর উপর নির্ভর করি; তাহলেও তাঁর মাতৃভাষা নির্ণয় করা যায় না। কেননা, আরবী-ফার্সী উভয় ভাষাতেই তিনি ছিলেন এক চলমান অশ্ব-ঘোড়া। যখন রাজ-দরবারে যেতেন বা ভারতীয় লোকদের সাথে কথোপোকথন করতেন; তখন তিনি যেন ফার্সী ভাষার লালিত্য-ভূমিতে বিচরণ করতেন। আবার যখন আরব দেশে গিয়ে মক্কা-মদীনার হেরেমদ্বয়ের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পাঠ দান করতেন, তখন আরবী ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ চূঁড়ায় বিচরণ করতেন। এমনকি একজন খোদ্ আরবীয় পন্ডিতের মনেও এ ব্যাপারে একটু সংশয় জাগতো না যে, তিনি একজন ভারতীয় আলেম। যা আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী তাঁর নুয্হাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।[২৪৬]

তাই আমাদেরকে ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষার ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায় যে, ১৮৩৭ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিলো ফার্সী। যা ঐ সালের, ঐ তারিখে 'লর্ড মেক্লে' ও 'জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং' এর ঘোষণার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যায়।[২৪৭]

এর পূর্ব পর্যন্ত আমেথী, জৌনপুর, দিল্লী, আজমীর, ফতেহ্পুর, আগ্রা ও লাহোরের ভাষা ছিলো ফার্সী। আর এ সমস্ত এলাকাতেই আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের বিচরণ ছিলো। সে হিসেবে মুল্লাজীর মাতৃভাষা ছিলো ফার্সী।[২৪৮]

---

২৪৪. রহমান আলী, *তাযকিরা-ই-উলামা-ই-হিন্দ*, ২য় সংস্করণ, নিউল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯১৪ খ্রি., পৃ. ২৯৪।
২৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।
২৪৬. আল্লামা আব্দুল হাই আল হাসানী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২২।
২৪৭. *অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৭, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ.১ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।
২৪৮. আব্দুল হামিদ লাহোরী, *বাদশাহ-নামা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের মাতৃভাষা যে ফার্সী ছিলো, এর সমর্থনে আমরা একটি জোরালো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি। আর তা- হলো এই, যখন মুল্লাজীর বয়স ১৩ বছর; তখন তিনি 'আদাব-ই-আহ্মাদী' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।[২৪৯] যা ফার্সী ভাষায় লিখিত ছিলো।

এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মুল্লাজীর মাতৃভাষা ফার্সীই ছিলো। কেননা এতো অল্প বয়সে তিনি যদি আরবী ভাষাতে এটা সংকলন রচনা করতেন, তাহলে আমরা বুঝে নিতাম যে তাঁর মাতৃভাষা আরবীই ছিলো; পরবর্তীতে তিনি ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। কিন্তু তা না করে তিনি সর্বপ্রথম ফার্সী ভাষাতেই কিতাব রচনা করেছেন, তা-ও আবার ১৩ বছর বয়সে।[২৫০]

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের মাতৃভাষা ফার্সী ছিলো। পরবর্তীতে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে এতো সুনাম কুড়িয়েছেন।

(২৪) মুল্লাজীউনের চিন্তাধারায় বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাবঃ

- **পারিবারিক ও শিক্ষকদের আদর্শেঃ**

একজন লেখক বা সাহিত্যিকের জীবনে বিভিন্ন মণীষী ও আদর্শের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে আল্লামা শেখ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের জীবনেও সেরূপ কিছু ঘটেছিলো। প্রাথমিক জীবনে তাঁর মাঝে তাঁর পরিবারের আদর্শই পরিস্ফূটিত হয়, যা প্রাগুক্ত স্বপ্নের ঘটনা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি।

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের পিতা ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহ-ভীরু ও উঁচু স্তরের একজন সূফী। তাছাড়া মুল্লাজী যাঁদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন তাসাওউফ-পন্থী। বিশেষ করে তাঁর উস্তাদ 'শায়খ মুহাম্মদ সাদেক সাতারখী চিশ্তী' এর নাম

[২৪৯]. ড. সালিম কে দওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাস্‌সিরীন আওর উন্‌কী আরবী তাফসীরেঁ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।
[২৫০]. মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, ৪র্থ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ, ১৯৯৩, পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৫১] তাই তাঁর প্রাথমিক জীবনেই সূফীবাদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। যে প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি 'সূফী-মতবাদ' এর উপর বেশ কয়েকটি রচনা ও লিখে ফেলেন।

লেখনী জগতে আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন যে সমস্ত মনীষী ও তাঁদের লেখা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, সেগুলো হলোঃ

(১) মাওলানা রুমীর- "আল-মাস্‌নুভী আল- মা'নুভী'।"[২৫২]

(২) হাফীজ ইব্রাহীমের -"দীওয়ানে হাফীজ"।[২৫৩]

আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরক্ত থাকায় আল্লামা শেখ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন উপরোক্ত দু'টি রচনার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। কেননা, এ দু'জনের কাব্যের অবস্থান ছিলো আধ্যাত্মিকতার চরম মার্গে।

(৩) আল্লামা বুসীরীর- "ক্বাসীদাতুল বুরদা"।[২৫৪]

এটা ছিলো হযরত রাসূলে কারীম (সা.) এর প্রেম-সংক্রান্ত কবিতা। তিনি যেহেতু আশেকে-রাসূল ছিলেন, সে কারণে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

(৪) আল্লামা কাজী নাসীরুদ্দীন বায়জাভীর- "তাফসীরে বায়জাভী"।

(৫) আল্লামী ফখরুদ্দীন রাযীর- "তাফসীরে কবীর।"

(৬) আল্লামা জালাল উদ্দীন আস্‌-সুয়ূতীর - "আল-ইত্‌কান ফী উলুমীল কুরআন।"

(৭) ইমাম বুরহান উদ্দীন মারগেনানীর- "আল-হেদায়া।"

(৮) সাদ্‌রুশ শারীয়াহ্‌ আল- আস্‌গারের- "শরহে্‌ বীকায়াহ্‌"।

(৯) আল্লামা তাফ্‌তাযানীর- "শারহুল আকাঈদ।"

উপরোক্ত রচনাবলীর সাহায্যে আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'তাফ্‌সীরাতুল আহ্‌মাদিয়্যা' টি লেখেন। সে সম্পর্কে তিনি তাঁর তাফসীরের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।[২৫৫]

---

[২৫১]. *The Islamic University Studies*, Vol-i, 1990, (Published by the Registrar), Islamic University, Kushtia, Bangladesh: 1991, p. 43.

[২৫২]. মুনীর আল-বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ*, দারুল ইলম লিল সালায়ীন, বৈরুত, লেবাননঃ ১৯৮৮, পৃ. ৭৭৩।

[২৫৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭২, এবং প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ (Biographical Names).

[২৫৪]. *আরবী সাহিত্য, (আলিম শ্রেণী)*, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাঃ ১৯৮৮, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) আবুল বারাকাত আন্-নাসাফীর- "আল-মানার"।

উপরোক্ত রচনাটির দ্বারা মুল্লাজী শুধু প্রভাবিতই হননি, বরং এর উপর একটি অত্যন্ত মূল্যবান শরাহ্ গ্রন্থও (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) লিখেছেন। যেটির কারণেই মূলতঃ তিনি আমাদের কাছে আজ সবচেয়ে বেশী পরিচিত।[২৫৬]

এছাড়াও ইমাম আল-গাযালী, আবু বকর বাক্কেল্লানী, মুহীউদ্দীন ইব্নুল আরাবী, কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী এবং পূর্বযুগের অনেক সাল্ফে-সালেহীনের মতবাদ ও আদর্শ তাঁর মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে।[২৫৭] যা তাঁর সমগ্র রচনাবলী পড়লে (বিশেষ করে 'তাফসীরে আহ্মাদী' ও 'নূরুল্-আনওয়ার' এর আদ্য-পান্ত পড়লে) জানা যায়।

<u>রাজ-রাজাদের আদর্শেঃ</u>

মুল্লাজী যদিও পাঁচজন মোগল সম্রাটের শাসনকাল পেয়েছিলেন, কিন্তু কোনো সম্রাটই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেননি; তবে সম্রাট আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহ্ ব্যতীত। কেননা, এ দু'জন শাসকই ছিলেন আল্লাহ-ভীরু, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও প্রজাদরদী। তাই তাঁদের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মুল্লাজী তাঁদের সাথে দীর্ঘ ১২টি বছর একাধারে রাজ-দরবারেই কাটিয়েছিলেন।

এমনকি সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্পর্কে আল্লামা মুল্লাজীউন তাঁর 'তাফসীরে আহ্মাদী' এর ভূমিকায় এমনই প্রশংসামূলক মন্তব্য করেছেন, যাতে মনে হয় আওরঙ্গজেব একজন খাঁটি আবেদ ও অত্যন্ত উচুঁমানের একজন সূফী-সাধক ছিলেন।[২৫৮]

যা পাঠ করে একজন পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর কতো বড় মাপের একজন সূফী-সাধক ছিলেন। এমনকি সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবন ইতিহাস ঘেঁটে আমরা পাই, তিনি তাঁর জীবনে তিন ঘন্টার বেশী কখনো ঘুমাননি।[২৫৯] আরও বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, তিনি অনেক সময় প্রচন্ড যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ও সালাতের ওয়াক্ত হলে

---

[২৫৫]. শায়খ আহমাদ মুল্লাজীউন, *আত-তাফ্সীরাতুল আহমাদিয়্যা ফী বায়ানিল আয়াতি'শ্ শার'ইয়্যাহ্*, (টীকাকার (মুহাশ্শী) মাওলানা রাহীম বখ্শ), প্রকাশকঃ আব্দুল করীম, সাতবা'আ কারীমিয়্যা (করীম মুদ্রণালয়), দেওবন্দ, বোম্বেঃ ১৩২৭ হি./১৯০৬ খ্রি., পৃ. ২ (ভূমিকা ঃ দীবাজাতুল কিতাব)।

[২৫৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭।

[২৫৭]. ড. সালিম কে. দাওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাস্সিরীন আওর উন্কী আরবী তাফসীরেঁ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-৩৩৭।

[২৫৮]. মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন অনূদিত, *মুসলমানদের উত্থান ও পতন*, পৃ. ৩৫৫-৩৫৭।

[২৫৯]. অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরু'ল ইসলাম, *ইসলামের ইতিহাস*, জমজম প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৮, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধের কঠিন ময়দানেই সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। মৃত্যুকে কখনোই তিনি পরওয়া করতেন না।

এমনকি ইতিহাস থেকে আমরা ঘটনাও খুঁজে পাই যে, একবার যুদ্ধের ময়দানে আসরের সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি হাতীর পিঠ থেকে নেমে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় শত্রু-প্রধান তাঁকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, তিনি আল্লাহর অনুগত একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তাই তাঁর সাথে সন্ধি করলেন এবং তাঁর (আওরঙ্গজেব) কাছে 'বাইআত' গ্রহণ করলেন।[২৬০]

তাছাড়া সম্রাট আওরঙ্গজেব 'কর প্রথা' বাতিল করে 'জিযিয়া প্রথা' চালু করেন এবং সম্রাট আকবর প্রবর্তিত 'দ্বীন-ই-ইলাহী মতবাদ' চিরতরে বিলোপ সাধন করেন। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের এরূপ বহু খেদ্‌মাত তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। অদ্রুপ তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহ ও ছিলেন অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট ও ন্যায়পরায়ণ একজন শাসক। আর এ সমস্ত কারণেই আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন এ দু'জন শাসকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং সামান্য খোর-পোষের বিনিময়ে তাঁদের রাজ-দরবারে একজন ধর্মগুরু ও ধর্মপোদেষ্টা হিসেবে ১২টি বছর অতিবাহিত করেন।[২৬১]

আর বাকী তিনজন মোগল সম্রাটের প্রভাবে মুল্লাজীউন কখনোই প্রভাবিত হননি। যদিও বা মাঝে মধ্যে সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজ-দরবারে বিভিন্ন লোকদের জন্য সুপারিশ করতে যেতেন এবং সম্রাট ও তাঁর কথা গ্রহণ করতেন ও বহু লোক তাঁর (সম্রাট) দ্বারা উপকার ভোগ করতো; তথাপি শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন কখনও তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হননি এবং রাজ-দরবারে থাকেননি।[২৬২]

(২৫) বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) মাযার যিয়ারতঃ

আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁর বিখ্যাত রচনা 'আস্-সাফরু' (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেনঃ

"হাজ্জের দ্বিতীয় সফরে একদা আমি আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর মাযার যিয়ারত করি এবং তথায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের ফলে আমি লক্ষ্য করলাম, বহু লোক এখানে শারীয়াত-বিরোধী কাজ-কর্ম করছে। তখন আমি মসজিদের প্রধান

---

২৬০. *জাওয়াহিরু'ল উর্দু*, (৭ম শ্রেণী), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাঃ ১৯৮৩, পৃ. ৬৬।
২৬১. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্‌রুল মুহাস্‌সিলীন্ বি আহ্‌ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।
২৬২. মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমামের সাথে পরামর্শ করে একটা বৈঠকের আয়োজন করলাম। সেখানে তাঁরা সকলে আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তাদের একান্ত অনুরোধে আমি আরবী ভাষায় বক্তৃতা দিলাম। আমার বক্তৃতায় (আল্লাহর ফযলে) তারা এতোটাই আকৃষ্ট হলো যে, তারা অনুরোধ করলো- আমি যেন হাজ্জ্ব শেষে পুনরায় এখানে আসি এবং কিছুদিন তাদেরকে ওয়াজ-নসীহাত করি।"

অতঃপর হাজ্জ্ব সমাপনান্তে আমি পুনরায় তাদের অনুরোধে সেখানে আসি এবং প্রায় একমাসের ও বেশী সময় সেখানে অবস্থান করি। এ সময় আমি সেখানকার কয়েকটি মাদ্রাসা সফর করি এবং কিছু ক্লাশ গ্রহণ করি। তাদের অনেকেই অনেক কিছু আমাকে উপহার দিয়ে বলে- আমি যদি কখন ও কা'বা শরীফে যাই; তাহলে যেন অবশ্যই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা আর হয়নি।"[২৬৩]

উপরোক্ত ঘটনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন অসাধারণ একজন বাগ্মী, আরবী ভাষায় সু-পন্ডিত এবং মাযার যিয়ারতের পক্ষে কিন্তু তথায় শির্‌ক-বিদ্‌আতের বিপক্ষে।

এ থেকে অনুমান করে অনেকে বলেন যে, আল্লামা শায়খ মুল্লাজীউন সম্রাট আওরঙ্গজেবকে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত অনেক শিরক ও বিদ্‌আতের মূলোৎপাটনের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর তা কার্যকর ও করেছিলেন। এটা কথিত হলেও সত্য হতে পারে। কেননা মুল্লাজী ছিলেন আওরঙ্গজেবের রাজ-দরবারের একজন রাজ পন্ডিত ও ধর্মপোদেষ্টা।[২৬৪]

---

২৬৩. *বুরহান (Burhan),* (উর্দু মাসিক), সম্পাদক, আহ্‌মাদ সাঈদ, ৫ম সংখ্যা, দিল্লী (ভারত)ঃ ১৯৩৫, পৃ. ১২।
২৬৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্, *তাযকিরা-ই-উলামা-ই-জৌনপুর,* ২য় সংস্করণ, কলিকাতাঃ ১৯৬২, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

(২৬) কুমিরের সাথে সংঘর্ষঃ

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন তাঁর বিখ্যাত রচনা 'আস্-সাফরু' শীর্ষক গ্রন্থে একটি লোমহর্ষক কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন, যা ছিলো তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া অত্যন্ত ভয়াবহ একটি ঘটনা ও অতি কঠিনতম একটি বিপদ। ঘটনাটি হলো- শেখ আহমাদ মুল্লাজীউন যখন ফতেহপুরে লেখা-পড়া শেষ করেন, তখন একদা তাঁর এক বন্ধুকে (সহপাঠী) নিয়ে গঙ্গা নদী ভ্রমণে বের হন।

গঙ্গা নদীর তীরে পৌঁছে নদীর অকৃত্রিম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি নদীতে গোসল করতে চাইলেন তাঁর বন্ধুকে নিয়ে। বন্ধুর কাছে ইচ্ছাটি করতেই বন্ধু বলে উঠলো- "এখানে গোসল করা আমাদের জন্য মোটেও নিরাপদ হবে না। কেননা এ নদীর তীরে প্রায়ই কুমির আসে এবং কুমীর এ পর্যন্ত অনেক গোসলরত মানুষকে ধরে নিয়ে গেছে।" বন্ধুর কথায় মুল্লাজীর কোনো টনক নড়লো না এবং বন্ধুকে গোসলে রাজী করাতে না পেরে তিনি জেদ ধরে বসে থাকলেন। অবশেষে সেদিনকার মতো তিনি নদীর তীর থেকে চলে আসলেন এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন-কীভাবে কুমির শিকার করে বা পানির উপর ভেসে ওঠে; তা তিনি স্বচক্ষে দেখবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই নদীর পাড় দিয়ে একাকী ভ্রমণ করতেন।

একদিন সকালে নদীর পাড়ে হাঁটতে গিয়ে তিনি দেখলেন, অনেক লোক নদীতে গোসল করছে। তখন তিনি নদীতে গোসল খায়েশকে দমন করতে না পেরে তাদের সাথে পানিতে নেমে পড়লেন। তিনি যখন হাঁটু পানি পর্যন্ত নেমেছেন, তখন হঠাৎ দেখতে পেলেন; দূরে কাঠের মতো কী যেন একটা ভাসছে। তখন তিনি এ দৃশ্য দেখে গভীর পানিতে নামার আর সাহস করলেন না। একটু পরেই তিনি দেখলেন যে, কাঠটি আর আগের স্থানে নেই; তখন তিনি ভয় পেয়ে নদীর তীরের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। এবার তিনি লক্ষ্য করলেন একটি কুমির তার পূর্বস্থানে পানি ঘোলাটে করছে আর কী যেন তালাশ করছে। দেখতে দেখতে কুমির তাঁর বাম পায়ে লেজ দ্বারা আঘাত হানলো, যখন তাঁর ডান পা পানির উপরে।

তখন মুল্লাজীর হাতে একটি রুমাল ছিলো। সেটি দিয়ে তিনি কুমিরটি লেজ ধরে ফেললেন এবং কুমিরটিকে নদীর তীরে টেনে তুললেন। তারপর লোকজন ও মুল্লাজী সকলে মিলে কুমিরটাকে ধরাশায়ী করলেন এরপর লোকেরা বলে উঠলো- "মুল্লাজী! বাচ্চা কুমির বলে আজ আপনি রক্ষা পেয়েছেন, নইলে ঠিকই আপনাকে পানির নীচে টেনে নিয়ে যেত।" এ ঘটনার দ্বারা বোঝা যায়, মুল্লাজী খুবই কৌতূহলী ছিলেন।[২৬৫]

---

২৬৫. গল্পটি মুফতী আখ্‌তারুজ্জামানের ডাইরী থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি যখন সাহারানপুরে ইফ্‌তা শ্রেণীতে পড়েন, তখন একদা তিনি আমেথীতে মুল্লাজীউনের মাদ্রাসা পরিভ্রমণে যান। ঐ সময় মাদ্রাসার একটি দেয়ালিকাতে তিনি গল্পটি পেয়েছিলেন। (তারিখ ২১ শে জানুয়ারী- ১৯৮৮)। তিনি বর্তমানে উত্তর বঙ্গের 'ষোল মাইল' নামক একটি মাদ্রাসায় মুহ্‌তামীম (অধ্যক্ষ) হিসেবে কর্মরত।
এ গল্পের মূল উৎস 'আস্-সাফরু' (ভ্রমণ কাহিনী) শীর্ষক রচনা, যার লেখক আল্লামা শেখ আহমাদ মুল্লাজীউন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০ পর্যন্ত দেয়া আছে, তারপর আর নেই। শেষ পৃষ্ঠায় একটি গল্পের কিয়দংশ দেয়া আছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, উহার পরে আরও অনেক পৃষ্ঠা ছিলো। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটি মুল্লাজীর নিজের হাতের লেখা নয়, বরং তাঁরই এক ছাত্র আব্দুর রহমান তা নকল

Dhaka University Institutional Repository

(২৭) ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতকের এক বিস্ময়কর মনীষীঃ

মহামতী সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) সময় আবুল ফজল ও ফৈজী (সভাকবি) যেমন বিস্ময়কর দু'জন মনীষী ছিলেন,[২৬৬] তেমনি ষষ্ঠদশ সপ্তদশ শতকে ও দু'জন কালজয়ী বিস্ময়কর মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিলো। তাঁদের একজন হলেন- আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন (১৬৩৭-১৭১৭ খ্রিঃ); আর অপরজন হলেন- আল্লামা শাহ্‌ওয়ালী উল্লাহ্‌ মুহাদ্দিস দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২ খ্রিঃ)।[২৬৭]

তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব-স্ব যুগের একেকজন পথিকৃত। যাঁরা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যদিও পূর্বোক্ত 'নবরত্ন সদস্যের' অন্যতম দু' পন্ডিত সমালোচিত ছিলেন বিভিন্ন কারণে; কিন্তু তাঁদের পান্ডিত্য ও মনীষা ছিলো সর্বজন স্বীকৃত ও প্রশংসিত।[২৬৮] মূলতঃ প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু লোক থাকেন, যাঁরা স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট যুক্তি-তর্ক দিয়ে ধর্ম-সূত্রের একটা ভাষ্য ও রূপ দাঁড় করিয়ে যান। যাঁরা সর্বদা ধর্মে, কর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নতুন কিছু করতে চান।[২৬৯] এরূপ নতুন কিছু করতে যেয়েই আবুল ফজল ও ফৈজীর পদস্থলন ঘটেছিলো। আর যারা ধর্মভীরু, তাদের কাছে হয়েছিলো নিন্দিত।

পক্ষান্তরে আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ও শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ মুহাদ্দিস দেহলভী সত্যপথের সেবক হয়েছিলেন এবং সর্বজন প্রশংসিত হয়েছিলেন। তন্মোধ্যে মুল্লাজীউন ছিলেন পূর্ব-পথিকৃত। শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ্‌ যখন উষালগ্নে, মুল্লাজী তখন মধ্যগগণ পেরিয়ে পরপারের যাত্রায় পাড়ি জমানোর অপেক্ষায়।

আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী', ফৈজীর 'সাওয়াতিউল ইলহাম' ও আল্লামা শাহ্‌ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' লিখে যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন;

করেছেন; তাও পান্ডুলিপির শেষে লেখা রয়েছে। তিনি লিখেছেনঃ "মুল্লাজীর পান্ডুলিপিগুলো যখন নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো, তখন আমার উপর এ পান্ডুলিপিগুলো নকল করার দায়িত্ব আসে। আমি এগুলোর যথার্থই নকল করলাম।" তারপর তাঁর নাম ও তারিখ লেখা রয়েছে। মুল্লাজীর হাতের লেখাসহ কয়েকটি পান্ডুলিপির নকল কপি তিনি দেখে এসেছেন। যোগাযোগের ঠিকানাঃ 'মাদ্রাসা-ই-উস্তাদ 'আলমগীর মুল্লাজীউন' আমেথী, (সুলতানপুর) জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ, উত্তর-প্রদেশ, ভারত।

[২৬৬]. আব্দুল কাদির আল-বাদায়ুনী, *মুন্তাখাবুত্ তাওয়ারীখ,* ৩য় খন্ড, (Biblo, Indica), কলিকাতাঃ ১৯৬৯, পৃ. ২৯৯, ৩৯৩।

[২৬৭]. Dr. Mohammad Ishaq, *Indian's contribution to the study of Hadith Literature*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka: The University of Dhaka: 1976, p. 172.

[২৬৮]. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, *জীবন পথের দিশা,* (মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

[২৬৯]. আব্দুল মওদূদ, *মুসলিম মনীষী,* নওরোজ কিতাব খানা, ঢাকাঃ ১৯৭০, পৃ. ৯ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

মুল্লাজী ও তেমনি তাঁর যুগে আহ্কাম সম্পর্কিত ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম তাফ্সীর, 'তাফ্সীরে আহ্মাদী' লিখে এক নব দিগন্তের দিক উন্মোচন করে চাঞ্চল্যকর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তবে আমাদের নিকট তিনি 'নূরুল আন্ওয়ার' এর গ্রন্থকার রূপেই বেশী পরিচিত।[২৭০]

আহ্মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন ঐ শ্রেণীর মানুষ, যাঁর সম্পর্কে ফরাসী চিন্তানায়ক Carradc Vaux এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

যেমন তিনি বলেছেনঃ

> "তাঁরা সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা ছিলেন যুক্তিতে বিশ্বাসী, যাঁরা তর্ক-শাস্ত্রের বিধান মেনে আলোচনা করতেন, প্রত্যেক সমস্যার সবরকম সম্ভাব্য অনুমান চিন্তা করতেন এবং তাঁরা জানতেন যে; সত্য চিরন্তন। তাঁদের চিত্ত ছিলো উদার ও প্রশস্ত এবং যুক্তিবাদকে সসীম জেনেও তাঁরা তার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়েই পারদর্শী হওয়ার স্পর্ধা ও রাখতেন।"[২৭১]

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিলো জ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন সে যুগের ভারতবাসীর জন্যে এক জীবন্ত মডেল। যে সব মনীষীদের অবদানে মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে, যাঁদের চিন্তা-ভাবনার সাথে সাথে সমাজ-জীবন ও আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে; আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।[২৭২]

আল্লামা মুল্লাজীউন তাঁর জীবনকালেই ছিলেন বিকশিত ব্যক্তিত্বের এক প্রতিচ্ছবি। তিনি ঊর্ধ্বাধ (Vertical) মেরুদন্ডের মানুষ ছিলেন। মানবীয় চিন্তা ও মনন শক্তির বিচিত্র ধারার বিকাশের পথে মুসলিম জ্ঞান-সাধক আল্লামা মুল্লাজী ষষ্ঠদশ-সপ্তদশ শতকে যে অমর অবদান রেখে গেছেন, তার সম্যক সমোঝ্দারী সহজসাধ্য নয়। যে কারণে আজও তিনি আমাদের নিকট এক

---

[২৭০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৭১।
[২৭১]. *নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র,* ৭ম খন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ৬০।
[২৭২]. মুহাম্মাদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্রুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময়কর মনীষীরূপে অমর হয়ে আছেন এবং ইতিহাসের পাতায় আজও তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রয়েছে।[২৭৩]

সুতরাং আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন সর্বকালের, সর্বযুগের, সকল মানুষের মনের মাঝে একজন বিস্ময়কর মনীষী হিসেবে চির জাগরুক থাকবেন।

(২৮) আহ্মাদ মুল্লাজীউনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বঃ

ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টীয় এয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত 'ফিক্হ' ও 'উসূলে ফিক্হ' শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করাই ছিলো পান্ডিত্য ও সামাজিক মর্যাদা লাভের চাবিকাঠি।[২৭৪] আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন যুগোপযোগী চিন্তার নায়ক। তাই তিনি এই দিকটাকেই তাঁর জীবনে প্রাধান্য দেন। তিনি ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুজ্তাহিদ। তাঁর চিন্তাধারা ইমাম আল-গাযালী, মাওয়ারদী ও ইবনুল আরাবীর সাথে অনেকটা মিলে যায়।

আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন ইজ্তিহাদের শর্তের ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল আরাবীর ন্যায় শরীয়াতের বিধি-নিষেধের সাথে সম্পর্কিত ৫০০ আয়াত এবং ৩০০০ হাদীসকে সমর্থন করেন। সুতরাং তাঁর মতে, এ সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমকে 'মুজতাহিদ' বলা যাবে।[২৭৫] অতএব 'মুজ্তাহিদ' হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে বিজ্ঞ হওয়া শর্ত না।

মুল্লাজীউন যে ফিক্হ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, তাঁর জ্বলন্ত প্রমাণ 'তাফসীরে আহমাদী'। তুলনামূলকভাবে ২১ বছরের ন্যায় কম বয়সে তিনি শুধুমাত্র কুরআন হতে প্রতিপাদ্য 'আহক্াম-ই-শারইয়্যাহ' এর উপর আলোকপাতকারী আরবী তাফসীর রচনা করেন। যা একজন বিজ্ঞ 'ফকীহ' এর পক্ষেও করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য একটি ব্যাপার।[২৭৬]

---

২৭৩. *The Islamic University studies*, Vol-i, 1990, (Published by the registrar), Islamic University, Kushtia, Bangladesh: 1991, pp. 42-48.

২৭৪. ড. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ১২-১৩।

২৭৫. মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল আহাদ আল-কাসিমী ও মাওলানা উবায়দুল হক আল-জালালবাদী, *নূরুল্ আনওয়ার মা'তনা আয্হারুল আয্হার*, এমদাদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯৭৬, পৃ. ৫।

২৭৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ১১তম খন্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের মূলনীতির উপরও তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মুল্লাজীর অনবদ্য রচনা 'নূরু'ল আন্‌ওয়ার'। এ রচনার প্রতি মুগ্ধ হয়ে বহুগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা সাইয়্যেদ মুফ্‌তী আমীমুল ইহ্‌সান, এর ভূঁয়সী প্রশংসা করেছেন। যে কারণে আমীমুল ইহ্‌সান তাঁর রচিত 'কাওয়া'ইদুল্ ফিক্‌হ্' শীর্ষক গ্রন্থে মুল্লাজীর বহু মতামতকে সন্নিবেশিত করেছেন এবং তাঁর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২৭৭]

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের মতে, ইজ্‌তিহাদের দ্বার চির উন্মুক্ত। যে কোনো সময় যে কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ সময়ের আলিমগণের উপর 'ইজতিহাদ' করা 'ফারদুল কিফায়া'[২৭৮] হয়ে দাঁড়ায়। কারণ যুগ পরিবর্তিত হয়। যুগ পরিবর্তিত হবার সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যার ও উদ্ভব হয়। আর নতুন এ সমস্যা সমাধানের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'য়ালা নতুন নতুন আলেম ও প্রেরণ করেন।

এখন কেউ যদি নতুনত্বকে গ্রহণ না করে পুরাতনকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, তবে এটি সুস্পষ্ট একটি ভ্রষ্টতা। কেননা সে আল্লাহ তা'য়ালার নিম্নোক্ত আয়াতের বিরুদ্ধাচারণ করলো। যেমন, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ করছেনঃ

"ফা'তাবিরু ইয়া উ'লীল্ আব্‌সার। (আল্-কুরআন)[২৭৯]

অর্থাৎ, হে চক্ষুস্মানগণ! তোমরা যুগ-সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর।

সুতরাং কোনো যুগের যিনি বড় আলিম হবেন, তাঁর উপর অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো- সে যুগের সমস্যাকে দূরীভূত করার জন্য কুরআন, হাদীস, ইজ্‌মা (ঐকমত্য) ও 'সাল্‌ফে সালিহীন' (বিগত যুগে যাঁরা সত্যপথে ছিলেন) দের মতামতের উপর গবেষণা করে নতুন এমন একটি ধর্মমত দাঁড় করানো; যা ইসলাম বহির্ভূত হবে না এবং মানুষের জন্য তা পালন দুঃসাধ্যও হবে না।

---

২৭৭. সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান, *কাওয়া'ইদুল্ ফিক্‌হ*, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৯১, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

২৭৮. *ফারদুল কিফায়া* ঃএকজন করলে পুরো জাতি সে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়, আর কেউ না করলে ঐ যুগের সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন, জানাযার সালাত। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭)।

২৭৯. আল-কুরআন, *সূরা আল্-হাশ্‌র*, ৬৯ নং আয়াত।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলেই ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বাড়বে এবং ইসলামকে যুগোপযোগী ধর্ম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করবে; অন্যথায় বোঝা মনে করে এড়িয়ে যাবে।[২৮০]

অতএব, ইসলাম সর্বকালের জন্যই চির নতুন, চির সবুজ একটি ধর্ম। সকল জাতির জন্যই প্রযোজ্য এবং কুরআনের প্রতিটি আয়াত রহস্যপূর্ণ। সে রহস্যকে উদ্ঘাটন করে ইসলামকে যুগোপযোগী করার মধ্যেই একজন আলিমের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

আর আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন তেমনি একজন কৃতিত্বসম্পন্ন যুগ শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ, ফকীহ্ ও ঝানু উসূল-ই-ফিক্হবিদ ছিলেন।[২৮১]

(২৯) বিবাহ্ ও সন্তান-সন্ততিঃ

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের পারিবারিক জীবনটা আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়। কেননা, এ ব্যাপারে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোনো কিছু পাই না। যেমন- মুল্লাজী কত সালে, কত বছর বয়সে বিবাহ্ করেন; তা আমাদের জানা নেই। কিংবা তিনি কয়টি বিবাহ্ করেন, কোথায় করেন, তাঁর সন্তানাদিই বা কয়জন ছিলো; এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনও আমাদের কাছে অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। তবে এসব প্রশ্নের উত্তরও হয়তো একদিন আমাদের সামনে উদঘাটিত হবে, যা সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে একথা সকল ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকগণই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মুল্লাজী বিবাহিত ছিলেন এবং তারই ফসল স্বরূপ 'আব্দুল কাদির' নামে এক সুযোগ্য পুত্র এ ধরায় আসেন; যার দ্বারা ইসলাম ও ইল্মের বহু খেদ্মাত হয়।[২৮২]

(৩০) আহ্মাদ মুল্লাজীউনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের চরিত্র ছিলো পবিত্র ও নিষ্কলুষ। তাঁর মতো একজন ন্যায়-নিষ্ঠাবান আলিম বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সমাজসেবক। সমাজে দ্বীনি-পরিবেশ কায়েম করবার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। এমনকি এরজন্যে তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ও ছিলেন।[২৮৩]

---

২৮০. খাদিম হুসাইন, *তা'রীখ কাসাব-ই-আমেথী*, ইদারায়ে আদাবিয়্যাত, নতুন দিল্লীঃ ১৯৫৭, পৃ. ১৩৭।

২৮১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ১০১-১০২।

২৮২. *The Islamic University studies*, Vol-i, op. cit., p. 46.

২৮৩. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

উপরন্তু আল্লামা মুল্লাজীউন একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাকে তিনি সর্বদা যথার্থ মর্যাদা দিতেন এবং সারাটি জীবন দরস্-তাদ্‌রীস (নিজে শিক্ষার্জন করা ও অপরকে শিক্ষা দেয়া) এবং রচনা সংকলনে অতিবাহিত করেছেন। মুল্লাজী 'আপন-ভোলা শিশুর ন্যায়' সরল চরিত্রের এবং ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বিশ্বের ইতিহাসে একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন।[২৮৪]

এছাড়া ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এর মতানুসারে, আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন মহৎগুণের অধিকারী একজন আদর্শবান মানুষ।[২৮৫]

আল্লামা মুল্লাজীউন অত্যন্ত সরল ও সাধারণ জীবন-যাপন করতে পছন্দ করতেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ ও আল্লাহভীরু একজন মানুষ। একজন 'মুমীন' যে মিথ্যা কথা বলতে পারে, তিনি এ নীতি বিশ্বাস করতেন না।[২৮৬] এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ আমরা আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জীবনের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাবো।

যা থেকে পাঠক সমাজ মুল্লাজীর উন্নত জীবন-পদ্ধতি ও সরলতা সম্পর্কে কিছুটা জানার সুযোগ পাবেন। ঘটনাগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) একদা এক ব্যক্তি এসে বললো যে, "মুল্লাজী! আপনার স্ত্রীতো বিধবা হয়ে গিয়েছেন।" ব্যক্তিটির মুখ থেকে একথা শুনে মুল্লাজী কাঁদতে শুরু করলেন। তৎক্ষণাৎ অপর এক ব্যক্তি বলে উঠলো- "মুল্লাজী! আপনি বেঁচে থাকতে কীভাবে আপনার স্ত্রী বিধবা হয়?" মুল্লাজী তখন জবাবে বললেন, "আমার স্ত্রীর মৃত্যু শোকে আমি কাঁদছি না; বরং একজন মুমীন কীভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে! আমি সেই কষ্টেই কাঁদছি।"

(খ) একবার আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব আলমগীরের কাছে কিছু সৈনিক চাইলেন। বাদশাহ্ আলমগীরও উস্তাদের কথা মান্য করার জন্য মুল্লাজীকে কিছু সৈনিক দিলেন। অতঃপর সৈনিকদেরকে তিনি তাঁর বাড়ী ঘেরাও করতে বললেন। আদেশ পেয়ে সৈনিকরাও তা-ই করলো। তারপর স্বীয় স্ত্রীকে বললেন, আজ তরকারীতে লবণ কম হয়েছে। অতঃপর সৈনিকদেরকে বিদায় করে দিলেন।

---

২৮৪. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী অনূদিত, *তাফসীরে আহ্‌কামুল কুরআন*, মদীনা শরীফ পারফিউমারী হাউজ, ঢাকাঃ ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি. পৃ. (অভিমত ও দোয়া দ্রষ্টব্যঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। এটা মূলত তাফসীরে আহমাদিয়্যাহ্ এর বঙ্গানুবাদ)।

২৮৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

২৮৬. আল-বাগদাদী, *ইযাহুল মাকনুন*, ২য় খন্ড, কায়রো, মিশরঃ পৃ. ৫৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) একবার সম্রাট বাহাদুর শাহ্ (শাহ্ আলম ১ম) মুল্লাজীকে প্রতিনিধি বানিয়ে বাইরে একটি অভিযানে যান। তখন একব্যক্তি এসে বললো- "মুল্লাজী আপনার বাড়ীর উপর দিয়ে পুল যাচ্ছে। আপনি যদি পাঁচ হাজার টাকা দেন, তবে ওটাকে বাঁকা পথে নিয়ে যাওয়া হবে।" তখন মুল্লাজী সরল বিশ্বাসে লোকটিকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। অতঃপর পরবর্তীতে সম্রাট হিসাবে দেখলেন যে, ওখানে লেখা আছে- 'পুল ওঠানোর জন্য পাঁচ হাজার টাকা' তিনি বিস্মিত হয়ে এটি লেখার কারণ জিজ্ঞেস করলে মুল্লাজী ব্যাপারটি সম্রাটকে খুলে বললেন। মুল্লাজীর কথা শুনে সম্রাট বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন এবং উপলব্ধি করতে পারলেন এ মহান জ্ঞান-তাপসের সরলতা সম্পর্কে। এমনকি মুল্লাজী ঐ লোকটির নাম-ঠিকানা মনে রাখার ও কোনো প্রয়োজন মনে করেননি। তাই সম্রাট লোকটির নাম-ঠিকানা জানতে চাইলে, মুল্লাজী তাঁকে কিছুই বলতে পারেননি।

(ঘ) মুল্লাজী হক্ব কথা বলতে কাউকে পরওয়া করতেন না। এমনকি বাদশাহ্‌র দরবারেও তিনি হক্ব কথা বলতেন। তিনি ইবাদাতের মাধ্যম মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে যে কোনো সমস্যার সমাধান করে নিতেন।[২৮৭] এ প্রসঙ্গে কথিত আছে যে-

শরীয়াতের কোনো একটি মাস্‌আলা নিয়ে[২৮৮] সম্রাট শাহজাহানের সাথে তর্ক-বিতর্ক হলে তিনি তাঁর ছাত্র যুবরাজ আলমগীরকে বললেন, "তুমি তোমার পিতাকে সৈনিক নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলো। কেননা আমি তাঁর সাথে যুদ্ধ করবো। তুমি আমার একঘটি পানি নিয়ে এসো।
আমি ওযু করে, প্রার্থনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবো।"

এ সংবাদ সম্রাট শাহজাহানের কাছে পৌছলে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং মুল্লাজীর অভিমতকেই সমর্থন করলেন।

(ঙ) আরেকবার বাদশাহ্ শাহজাহানের সাথে মুল্লাজীর শরয়ী-মাস্‌আলা নিয়ে বিতর্ক হলো। তখন তিনি বাদশাহকে সৈনিক প্রস্তুত করতে বললেন। বাদশাহ্ বললেন- আগে আপনার সৈনিক প্রস্তুত করুন। একথা শুনে মুল্লাজী তাঁর ছাত্রদেরকে প্রস্তুত হতে বললেন। এরপর তাদের দু'হাতে

---

২৮৭. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী অনূদিত, *তাফসীরে আহ্‌কামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. (অভিমত ও দোয়া দ্রষ্টব্যঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)।

২৮৮. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহীসহ অনেকে বলেন, উহা ছিলো পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক নিষেধের বিধান। কেননা সম্রাট শাহজাহান তা পরিধান করতেন আর মুল্লাজী তা নিষেধ করতেন। (হানীফ গাংগুহী, যাফরুল *মুহাস্‌সিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭।)

Dhaka University Institutional Repository

দুটি করে লাঠি দিলেন এবং মুখে কালি মেখে বাদশার সামনে চক্কর মারতে বললেন। তারা যখন বাদশার সামনে বলছিলো -"লাল ডান্ডা কালা হোগা, কালা ডান্ডা লাল হোগা"- তৎক্ষণাৎ তাই-ই হচ্ছিলো। তখন বাদশাহ মুল্লাজীর কারামাত দেখে অবাক হয়ে গেলেন এবং চিন্তা করলেন-এটাই প্রকৃত বাদশাহী। কেননা কোনো সৈন্যই আমার এরূপ আদেশ তৎক্ষণাৎ মুখে কালি মেখে এরূপ করবে না।

তাই বাদশাহ্ শাহ্জাহান এবারেও মুল্লাজীর মতামতকে স্বানন্দে মেনে নিলেন।

(চ) আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন যে শুধুমাত্র সহজ-সরল ও অত্যন্ত সাদা-সিদে একজন মানুষ ছিলেন, তা কিন্তু নয়। বরং কোনো কোনো সময় তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সে কারণেই হয়তো হাদীসে বলা হয়েছে- 'আস্হাবুল্ জান্নাতি বুল্হুন্' অর্থাৎ বেহেস্তবাসীগণ একটু সরল প্রকৃতির হবে। মূলতঃ তাঁরা হবে অত্যন্ত বিচক্ষণশীল।[২৮৯]

ঠিক আমাদের আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের জীবনেও অনুরূপ প্রতিচ্ছবি ফুঠে উঠেছিলো। এ প্রসঙ্গে কথিত আছে যে-

একদা আলমগীর আহ্মাদ মুল্লাজীউনের পদযুগল স্বীয় পাগ্ড়ী দ্বারা মুছে দিলেন এবং বললেনঃ "এইছাভী আপকা শাগরেদ থা" অর্থাৎ আপনার এরূপই একজন (বাধিত) শিষ্য। অতঃপর আলমগীর যখন দারাশিকো, মুরাদ ও শাহ্ সুজাকে পরাজিত করে এবং সম্রাট শাহ্জাহানকে বন্দী করে সম্রাট হলেন;[২৯০] তখন মুল্লাজী সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে একটি 'ক্ষমা-পত্র' নিয়ে এসে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের হাতে দিলেন এবং বললেনঃ

"ইহ্ছাভী আপ্ কা উস্তাদ থা।"

অর্থাৎ এরূপই তোমার একজন শিক্ষক ছিলো।

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর এর রহস্য জানতে চাইলে মুল্লাজী বললেনঃ

"তোমার পিতা আমার প্রতি খুশি হয়ে কোনো একদিন বলেছিলেন, আপনি যা চাইবেন তাই-ই দিবো। তখন আমি তাঁর কাছ থেকে এ কথাটি লিখে নিয়েছিলাম এবং তখন থেকে আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, তোমাদের চার ভাইয়ের মাঝে সিংহাসন নিয়ে কলহ লাগতে পারে অথবা

---

[২৮৯]. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ আগস্ট, ১৯৯১, পৃ. ৩।
[২৯০]. এ, কে,এম, আব্দুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৭৩, পৃ. ৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট অন্য কাউকে সিংহাসনে বসাতে পারেন; তখন আমি আমার বাসনাটি সম্রাটকে জানাবো এবং তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্যটি চেয়ে নিয়ে তোমার পাগড়ী দিয়ে পদযুগল মুছে দেবার প্রতিদান দেব। আজ সেই লিখিত কাগজটি নিয়ে সম্রাটের কাছে গিয়েছিলাম। অনেক মন কষা-কষির পর তিনি তোমায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। সেই 'ক্ষমানামা' পত্রটি দিয়ে তোমার সেই খেদ্‌মাতের বিনিময় প্রদান করলাম।"

আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের এ কথা শুনে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর তাঁর হাতে চুমু খেলেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।[২৯১]

---

২৯১. এ ঘটনাগুলো যদিও কিংবদন্তী এবং রূপকথার ন্যায়, তবুও এগুলো এতেই জনশ্রুত যে-যারা মুল্লাজীর নাম জানেন; তারাই এ ঘটনাগুলো শুনেছেন এবং লোকদের কাছে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় উপস্থাপন করে আসছেন। উপরোক্ত ঘটনাবলীর মধ্যে 'ক' নং ঘটনাটি সর্বজন স্বীকৃত ও শ্রুত। 'গ' ও 'চ' নং ঘটনা দু'টি আব্দুল মাজীদ ঢাকুভী হুজুরের কাছ থেকে শ্রুত। যিনি লালবাগ মাদ্রাসার একজন বিজ্ঞ ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে খুব সম্ভবত তিনি আর বেঁচে নেই। এরপর 'খ' ও 'ঙ' নং ঘটনা দু'টি মুফ্‌তী দেলওয়ার হুসাইন থেকে শ্রুত। যিনি 'দারুল উলুম করাচী' মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। 'ঘ' নং ঘটনাটি মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ্ ও শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক থেকে শ্রুত। এ দু'জন বাংলাদেশের অত্যন্ত বিজ্ঞ ও প্রবীন দু'জন মাদ্রাসা শিক্ষক।

তবে তাঁদেরকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সবাই বলেছেন- কোথায় পড়েছি তা জানা নেই। তখণ এ ৬টি ঘটনা চিঠিতে লিখে মুফ্‌তী দেল্‌ওয়ার হোসেনের মাধ্যমে মাওলানা তাকী উসমানী (বিচারপিত, শরীয়া কোর্ট, পাকিস্তান) এর নিকট পত্র লিখলে, তিনি জবাবে বলেন- এসব ঘটনা সত্য। আর সবগুলো ঘটনাই তিনি নাকি 'আল-ইব্‌কা' নামক মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর বক্তৃতা সংকলনে পড়েছেন। তখন আমি নিম্নলিখিত সনের 'আল্- ইক্‌বা' সংখ্যাগুলো আদ্য-পান্ত অধ্যয়ন করি; কিন্তু তাতে ঐ ঘটনাগুলো আমি পাইনি। বাকী সংখ্যাগুলো আর সংগ্রহ করা ও সম্ভবপর হয়নি। তাই রে সঠিক তথ্যও সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর হয়নি।

'আল-ইব্‌কা' এর নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলো মুফ্‌তী দেলওয়া হেসেনের বাড়ীতে রয়েছে। তিনি বর্তমানে তাঁর গ্রামের বাড়ী কুমিল্লার লাকসামে বসবাস করছেন।

নিম্নে আমার পঠিত মাওলানা আশরাফ আলী থান্‌বী (রহ.) এর বক্তৃতা সংকলন 'আল-ইক্‌বা' এর সংখ্যা গুলোর একটি তালিকা প্রদানের চেষ্টা করছিঃ

আল-ইব্‌কা-	জিলদ	সন	আল-ইব্‌কা	জিলদ	সন
"	১৪	১৩৬১/৬২ হিঃ	"	২৮	১৯৫৭ খৃঃ
"	১৬	১৯৪৪ খৃঃ	"	২৯	১৯৫৮ খৃঃ
"	১৭	১৯৪৫খৃঃ	"	৩০	১৯৫৯ খৃঃ
"	১৮	১৯৪৬ খৃঃ	"	৩১	১৯৬০ খৃঃ
"	১৯	১৯৪৮ খৃঃ	"	৩৩	১৯৬২ খৃঃ
"	২১	১৯৫০ খৃঃ	"	৩৪	১৯৬৩ খৃঃ
"	২৩	১৯৫২ খৃঃ	"	৩৫	১৯৬৪ খৃঃ
"	২৪	১৯৫৩ খৃঃ	"	৫৬	১৯৮৫ খৃঃ
"	২৬	১৯৫৫ খৃঃ	"	৫৮	১৯৮৭ খৃঃ
"	২৭	১৯৫৬ খৃঃ			

(সর্বমোট ১৯ বছরের সংখ্যা, প্রকাশকঃ আব্দুল মান্না; মাক্‌তাবাতে থানভী, বন্দর রোড, করাচী।)

Dhaka University Institutional Repository

(ছ) আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের সময়ে শীয়াদের দৌরাত্ম্য অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। এমনকি রাজ-দরবারের অনেকেই সে মতবাদে বিশ্বাসী ছিলো। ফলে দিন দিন শীয়াদের দল ভারী হতে থাকে। কেননা, রাজ-রাজাদের প্রভাবে জনগণ প্রভাবিত হয়ে থাকেন।[২৯২]

আর মোগল রাজ-দরবারটা সম্রাট বাবরের সময় থেকেই শীয়া প্রভাবে প্রভাবিত ছিলো। যদিও সম্রাট বাবর ব্যক্তিগতভাবে একজন সুন্নী মুসলিম ছিলেন; তথাপি শীয়াদের সাথে তাঁর একটি গভীর সম্পর্কের বন্ধন ছিলো। বিশেষ করে ইরানের 'সাফাভী' বংশের সাথে তাঁর খুবই ঘনিষ্ট মিত্রতা ছিলো।[২৯৩] সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত জগাখিচুড়ি মার্কা ধর্ম 'দ্বীন-ই-ইলাহী' তে আক্রান্ত হয়ে শীয়া মতবাদের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর আরও অধঃপতন ঘটে।[২৯৪] যে কারণে তৎকালীন সময়ের আলেম সমাজ তাদেরকে মুসলমান বলতে লজ্জাবোধ করেছেন। আর তাদের কার্যকলাপও প্রমাণ করেছিলো যে, তারা নামে মাত্র মুসলমান ছিলো।

বিভিন্ন সময় এ শীয়াদের সাথে রাষ্ট্রীয়ভাবে তর্ক-বিতর্কের আয়োজন করা হতো। একবার শীয়াদের সাথে এমনি একটি বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছিলো। এতে সুন্নী দলের প্রধান তার্কীক ছিলেন আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন।[২৯৫]

আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন বিতর্ক-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে একটি অদ্ভুত কান্ড করে বসলেন। সেটি হলো, তিনি তাঁর জুতো জোড়া বগোল দাবা করে মঞ্চে উপবেশন করলেন। জবাবে মুল্লাজীউন বললেন- আমার যতটুকু মনে পড়ে, হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) এর জুতো শীয়ারা চুরি করেছিলো। আজ তারা এখানে এসেছে, হয়তো তারা আমার জুতোও চুরি করতে পারে। তাই এই ভয়ে আমি জুতো জোড়া বগোলদাবা করে রেখেছি।[২৯৬]

আল্লামা মুল্লাজীউনের কথার প্রতিউত্তরে শীয়ারা বলে উঠলো-রাসূল (সা.) এর যুগে কোনো শীয়া ছিলো না। তাই আপনার কথা ঠিক নয়। তখন তিনি বললেন, বয়সের ভারে ভুলে গিয়েছি। তারা ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) এর জুতো চুরি করেছিলো। তখন উপস্থিত

---

২৯২. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, *ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি,* সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৬, পৃ. ১০।

২৯৩. এ,কে,এম, আব্দুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

২৯৪. মাওলানা খুরশিদ উদ্দীন অনূদিত, *মুসলমানদের উত্থান ও পতন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

২৯৫. আযাদ বিলগ্রামী, *সুবহাতুল মারজান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

২৯৬. ইউসুফ আলইয়ান সারকিস, *মুজামুল মাতবুআতুল-আরাবিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

শীয়ারা সমস্বরে বলে উঠলো- না-না, হযরত আবু বকর (রা.) এর সময় কোনো শীয়া ছিলো না। তখন মুল্লাজী বললেন, ওহ্! তারা হযরত ওমর (রা.) জুতা চুরি করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা বললোঃ না, না, হযরত ওমর (রা) এর যুগে কোনো শীয়া ছিলো না। তখন তিনি বললেন- তাহলে হযরত ওসমান (রা.) এর বেলায় ঘটেছিলো। জবাবে তারা বললো- হযরত ওসমানের (রা.) সময়তো কোনো শীয়া ছিলো না। এবার মুল্লাজী বললেন- তাহলে তারা নিশ্চিতভাবে হযরত আলী (রা.) এর জুতো চুরি করেছিলো। জবাবে শীয়া কিছুটা উত্তেজিত ও বিরক্ত হয়েই বললো- জনাব! হযরত আলী (রা.) এর সময়েও তো কোনো শীয়া ছিলো না।[২৯৭]

অতঃপর শীয়ারা উল্লাস প্রকাশপূর্বক অট্টহাসি হেসে বললো- মুল্লাজী বয়োঃবৃদ্ধ এবং জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এরূপ আবোল-তাবোল বলছে।

একথা শুনে আহ্মাদ মুল্লাজীউন বললেন, উপস্থিত সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী! আপনারা নিজেরাই নিজেদের কানে শুনলেন যে, তারা বলছে- হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) এর সময়ে কোনো শীয়া ছিলো না। তাহলে বোঝা গেল, তারা নতুন একটি বেদ'য়াতী সম্প্রদায়। আর বেদ'য়াতীদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৯৮]

অতএব যারা তাদের অনুসরণ করবে, তারা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট হবে। আর পথভ্রষ্টদের পরিণাম হলো জাহান্নাম; যা রাসূলে মাকবুল (সা.) আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। ফলে আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও বিচক্ষণতায় এ বিতর্ক অনুষ্ঠানে সুন্নীরা জয়লাভ করলো এবং শীয়ারা পরাজিত হলো। আর এ ঘটনার ফলশ্রুতিতে রাজ-দরবারে 'শীয়া মতবাদ' সেদিন থেকেই বিলোপ সাধিত হতে লাগলো এবং 'সুন্নী মতবাদ' পুনর্জীবন লাভ করলো।[২৯৯]

---

[২৯৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭, ২২৯।

[২৯৮]..মুহাম্মদ হুমায়ুন আযাদ, *দরবারে আকবরী*, মাকতাবাতে মাজিদিয়্যাহ, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৪৭, পৃ. ২১৭।

[২৯৯]. আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সময়কার 'শীয়া-সুন্নী বিতর্ক অনুষ্ঠান'টি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের আগ্রায় অনুষ্ঠিত হয়। 'শীয়া- সুন্নী বিতর্ক অনুষ্ঠান' এ উপস্থিত 'আহ্লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল্ জামাত' এর একজন তার্কীক উক্ত ঘটনাটি উপস্থাপন করেন। পরে যা উর্দু ভাষায় বুলেটিন (Bulletin) রূপে প্রকাশিত হয়। তাতে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর বক্তৃতা সংকলন 'আল-ইব্কা' এর উদ্ধৃতি রয়েছে। আর হাত বুলেটিন (Hand Bulletin) টি বর্তমানে পুরোনো

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে আল্লামা শায়খ মুল্লাজীউনের মনস্তত্ত্ব (Psychology) আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি কীভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এভাবে জুতো জোড়া বগোলদাবা করে মঞ্চে উঠলে লোকেরা তাঁকে এ জাতীয় প্রশ্ন করবে এবং এভাবে উত্তর দিয়ে তাদেরকে নিরুত্তোর ও নিশ্চুপ করে দেয়া যাবে? মূলতঃ বাহ্যিক দৃষ্টি কোণ থেকে একে মনস্তত্ত্ব (Psychology) বলে এবং অন্তর্নিহিত দৃষ্টিকোণ থেকে একে ওলী-আউলিয়াদের আল্লাহ্ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা 'কারামাত' বলা হয়ে থাকে।[৩০০]

সুতরাং, আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন একজন প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন মনোস্তত্ত্ববিদ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় যাঁর ছিলো অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। চরম সংকটকালে শীয়াদের খপ্পর ও ভ্রান্তির জাল থেকে সাধারণ মুসলমানদের রক্ষার জন্যে তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।[৩০১]

(৩১) মুল্লাজীউনের মৃত্যু ও দু'কবরের রহস্যঃ

এ রহস্যময় জ্ঞান-তাপসের রহস্যময় মৃত্যু হয়েছিলো। যাঁর দু'টি কবর আজ অবধি এ পৃথিবীর বুঁকে বিদ্যমান আছে। একটি হলো দিল্লীর জামে মসজিদ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিম দিকে খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.) এর কবরের পাশে[৩০২] এবং সূফী সাধক মীর মুহাম্মদ শাফেয়ী দেহলভীর মাযার সংলগ্ন এলাকায়;[৩০৩] আর অপরটি নিজ মাতৃভূমি আমেথী-তে,[৩০৪] যা দিল্লী থেকে প্রায় ৩৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।[৩০৫]

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী 'লালবাগ মাদ্রাসা'র লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। (মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্রুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭)।

৩০০. আ,ন,ম বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী-সাধক*, ২য় সংস্করণ, বায়তুশ্ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান (চট্টগ্রাম)ঃ ১৯৮৫, পৃ. ৩৬-৩৭।

৩০১. ওমর রেজা কাহ্হালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, তারাজিমু মুসান্নিফিল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম খন্ড, বৈরুত, লেবাননঃ ১৯৫৭, পৃ. ২৪৭।

৩০২. মাওলানা এরশাদ হোসাইন, গ্রামঃ দেইচর, পোঃ চান্দ্রা, জেলাঃ চাঁদপুর। তাঁর কাছে আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের মাযারের চিত্রটি রয়েছে। তিনি একদল আলিমসহ মুল্লাজীর মাযার যিয়ারত করেন। সবাই একই কথা বলেছেন। আর তাঁর কবরের উপর লেখা রয়েছেঃ 'কব্রে উস্তাদে আলামগীর মুল্লাজীউন রাহিমাহুল্লাহ'। তথ্য সংগ্রহেঃ মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, এম,এ, আরবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩০৪. মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

৩০৫. *The oxford school Atlas*, Delhi University Press, 28th Revised Edition, Bombay, India: 1993, p.18.

Dhaka University Institutional Repository

দু'টি কবরই পাঁকা ইটে একই আকারে বাঁধাইকৃত। দু'টি কবরের উপরে একই ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy) তে লাল কালিতে লেখা-

"কব্‌রে উস্তাদে আলাম্‌গীর মুল্লাজীউন রাহিমাহুল্লাহ্‌।"[৩০৬]

কবর দু'টি দেখে মনে হয়, একই ব্যক্তির দু'বার মৃত্যু হয়েছিলো। ইতিহাসেও লেখা রয়েছে তাঁকে দু'বার কবর দেয়া হয়। একবার দিল্লীতে, আরেকবার ৫০ দিন পর আমেথীতে।[৩০৭] এ থেকে সাধারণ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, একবার মৃত্যুর পর তিনি হয়তো পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন এবং কবর থেকে উঠে এসে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করেছিলেন। নতুবা ৫০ দিন মরদেহ অক্ষত থাকে কীভাবে, আর কেনো-ই বা তাঁর দু'টি কবর ইত্যাদি।

মূলতঃ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে প্রাণীকুলের একবারই মৃত্যু হয়। আমাদের আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের মৃত্যুও একবারই হয়েছিলো। দু'টি কবরের রহস্য হয়তো এই হতে পারে যে, তাঁর লাশ যখন কবরে নামানো হয় তখন অথবা কবরস্থ্‌ করার পর জনমনে প্রশ্ন জাগে তাঁর লাশ তাঁর মাতৃভূমিতে সমাধিস্থ্‌ করাই শ্রেয়। তখন তারা তাঁর লাশ কবর থেকে তুলে মোমি করে তাঁর মাতৃভূমিতে লোক পাঠায়। তাদের আসতে বিলম্ব হওয়ায় দীর্ঘ ৫০ দিন পরে তাঁর লাশ দ্বিতীয়বার সমাধিস্থ হয়।

অথবা, তাঁরা মুল্লাজীর মৃত্যুর পর তাঁর লাশ মোমি করে রেখে তাঁর উত্তরাধিকারীদের নিকট লোক পাঠায়। সুদূর 'আমেথী' থেকে দীর্ঘ ৫০ দিনেও কোনো লোক না আসায় তাঁকে কবরস্থ্‌ করে ফেলবে এমন সময় মুল্লাজীর উত্তরাধিকারীগণ উপস্থিত হন এবং তাঁর লাশ তাঁর জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়ার দাবী করেন। তখন তারা তাঁর লাশ আমেথীতে নিয়ে আসেন। অতঃপর মুল্লাজীর সম্মানার্থে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন টুকু ধরে রাখার জন্যে তথায় সেই লাশ-শূণ্য কবরটিও অনুরূপ কবরের আকৃতিতে বাঁধাই করা হয়।[৩০৮]

অথবা, মুল্লাজীকে যখন সমাধিস্থ করে লোকজন চলে যাবে, এমন সময় তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এসে উপস্থিত হন এবং মুল্লাজীকে তাঁর নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেন। তখন লোকজন তাঁর লাশ পুনরায় কবর থেকে তুলে মোমি করে আমেথীতে পাঠানোর ব্যবস্থা

---

[৩০৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২ এবং প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
[৩০৭]. সাইয়্যিদ মোঃ মিঞা, *উলামায়ে হিন্দ্‌কা শানদার মাযী*, আমিন কোম্পানী, দিল্লীঃ ১৯৩১, পৃ. ২১৯।
[৩০৮]. ফকীর মুহাম্মদ, *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ্‌*, পৃ. ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

করে। আর আমেথীতে আসতে তাদের দৈবক্রমে ৫০ দিন লেগে যায়। ফলে ৫০ দিন পর তাঁর লাশ পুনঃসমাধিস্থ করা হয়।[৩০৯] এ কারণেই হয়তো জীবনীকারগণ ৫০ দিন পর দ্বিতীয়বার কবরস্থের কথা বলেছেন, যা স্বাভাবিক ও বটে। কেননা দিল্লী থেকে আমেথী ৩৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

অথবা, মুল্লাজীকে কবরস্থ করবার ৫০ দিন পর তাঁর কোনো শিষ্য স্বপ্ন দেখেন, তাঁর লাশ আমেথীতে স্থানান্তরিত করার জন্য; তখন তাই-ই করা হয়। আর ৫০ দিনে বা ততোধিক দিনে অনেক ওয়ালীরই লাশ কিছু হয় না। যার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণও রয়েছে।[৩১০]

অথবা, লেখার ভেতর একটু ওলট-পালট হয়ে যাবার কারণেই এরূপ হয়ে গিয়েছে। যিনি সর্বপ্রথম তাঁর জীবনী লিখে গিয়েছেন, তিনি ৫০ ঘন্টার পরিবর্তে ৫০ দিন লিখে গিয়েছেন। পরবর্তী নকলকারীরা আজ অবধি সেই ভুলই নকল করে আসছেন।[৩১১]

অথবা, পরবর্তী নকলকারীরা ভুল করে আসছেন। তারা হয়তো আরবী গাণিতিক সংখ্যার মাধ্যমে পাঁঞ্চ (পাঁচ) লিখেছিলেন, তারপর বিরাম চিহ্ন দাঁড়ি (.) ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তী লেখকগণ তাদের ঐ কপি থেকে নকল করার সময় মনে করেছিলেন এটা বিরাম চিহ্ন দাঁড়ি (.) নয়, বরং গাণিতিক শুণ্য-চিহ্ন (Zero) বা (.)। আরবীতে দাঁড়ি (Full stop) ও শুন্য (Zero) র সাংকেতিক চিহ্ন একইরূপ। যথা . (বিন্দু)।[৩১২] ফলে তাঁরা পাঁচ (৫) দিনের স্থানে পঞ্চাশ (৫০) দিন নকল করেছেন। যে ভুল আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

অথবা, এটা যদি গাণিতিক চিহ্নে না লিখে আরবী বর্ণমালার রীতিতে লিখে থাকেন, তাহলে তারমধ্যেও ওলট-পালট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো লেখক 'আল-খামীস' লিখেছিলেন, যার অর্থ- বৃহস্পতিবার। অর্থাৎ মুল্লাজীর মৃত্যু হয়েছিলো মঙ্গলবারে, তারপর দিল্লী থেকে লাশ নিয়ে বৃহস্পতিবার আমেথীতে দাফন করা হয়েছিলো।

কিন্তু নকলকারীদের কলম 'আল-খামীস' না লিখে 'আল-খাম্সীন' লিখেছে। অর্থাৎ 'ইয়া' বর্ণের দু'টি ফোটা 'মীম' বর্ণের পরে না লিখে 'সিন' বর্ণের পরে লিখেছেন, আর 'সিন' এর বর্ধিত

---

[৩০৯]. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।
[৩১০]. অধ্যাপক আব্দুল করিম সম্পাদিত, *ইসলামী সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৯।
[৩১১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৭।
[৩১২]. John Wortabet and Harvey Porter, *Arabic-English Dictionary*, Libratiredu Liban, Paris, France: 1984, p. 174.

Dhaka University Institutional Repository

অংশকে 'নূন' বর্ণরূপে পড়েছেন। যার অর্থ- পঞ্চাশ দিন। ফলে অর্থের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেখানে অর্থ- হবে- তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো মঙ্গলবারে আর দাফনকার্য সম্পন্ন হয়েছিলো বৃহস্পতিবারে; সেখানে অর্থ দাঁড়িয়েছে- তাঁকে পঞ্চাশ (৫০) দিন পরে দাফন করা হয়েছিলো। এটাই সঠিক বলে মনে হয়। কেননা দু'দিনের ব্যবধানে লাশের তেমন কিছু হয় না।[৩১৩]

ড. সালিম, কে, দাওয়ায়ীর মতে- আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের লাশ দিল্লীর কবর হতে আমেথীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো বটে, কিন্তু তা ৫০ দিন পর নয় বরং কিছুক্ষণ পর। এটাই বিবেকসম্মত ও সর্বজন বিশ্বাসযোগ্য; যদিও তা ইতিহাসের সাথে বিরোধপূর্ণ।[৩১৪]

এ মহামনীষী ও জ্ঞান তাপস দিল্লীর জামে মসজিদে স্বীয় 'যাবিয়া' তে[৩১৫] ১১৩০ হিঃ/১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৯ই যিল্‌কদ, মঙ্গলবার রাতে ইন্তিকাল করেন।[৩১৬] তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউনের মৃত্যু সন ১১৩০ হিজরীর পরে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৩১৭] আর মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৩[৩১৮]/৮২/[৩১৯]৮১/৮০ বছর।[৩২০]

---

৩১৩. Muhammad Gayur Jubaed Ahmed, *Contribution of India to Arabic Literature*, 3rd Edition, Alahabad, India: 1946, p. 379.

৩১৪. ড. সালিম, কে, দাওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাস্‌সিরীন আওরউন্‌কী আরবী তাফসীরেঁ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৩১৫. যাবিয়াঃ এটি আরবী শব্দ, যার অর্থ হলো- সূফী সাধকদের ধ্যানমগ্ন হবার স্থান। (আবুল ফজল আব্দুল হাফীজ বালইয়াভী সংকলিত, *মিস্‌বাহুল লুগাত*, মাকতাবাতে বুরহান, দিল্লীঃ ১৩৬৯ হি./ ১৯৫০ খ্রি., পৃ. ৩৫৩।)

৩১৬. *ইসলামী বিশ্ব*কোষ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত, ১১তম খন্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ৬১৩।

৩১৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মিফ্‌তাহুল উলুম ওয়াল ফুনুন*, (প্রকাশকঃ গ্রন্থকার নিজেই), মাদ্রাসা-ই-দারুল উলুম, সিলেটঃ (তা. বি.) পৃ. ১০০ (টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩১৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, *কামরুল আকমার শারহু নূরিল আনওয়ার* (আরবী), মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দঃ ১৯৮৩, পৃ. ৩১৮. (১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩২০. প্রাগুক্ত কিতাব সমূহে তাঁর যে জন্ম ও মৃত্যু তারিখ দেয়া হয়েছে, তা যোগ-বিয়োগ করলে দেখা যায়- তাঁর আয়ু ছিলো ৮১/৮০ বছর। মতটি শক্তিশালী।

Dhaka University Institutional Repository

কবি মুল্লাজীর মৃত্যু তারিখকে নিম্নোক্ত কবিতায় 'আব্জাদ' হিসাবে (আরবী বর্ণমালার গাণিতিক মানে) প্রকাশ করেছেনঃ

"শায়খ আহ্মাদ চু বে ফজ্লে ঈযদে+
সুদ আযেঁ দুন্ইয়া বে- জান্নাত বারইয়াব।
মাহ্দিয়ে হক শায়খ আহ্মাদ ওছল আদান্ত +
নীজ শায়খ আলী জনাব।"[৩২১]

ভাবানুবাদঃ

পন্ডিত আহ্মাদ অসীম অনুগ্রহে+
পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গ-দ্বারে।
সত্যের পথিক পন্ডিত আহ্মাদ +
পৌঁছে-ছে আজ স্বর্গ চুড়ে ॥[৩২২]

মুল্লাজীর মৃত্যু স্মরণে মুহাম্মদ হানীফ গাংগুভী (রহ.) বিশ্বকবি আল্লামা ইকবালের নিম্নোক্ত কবিতাটি উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

"আহ্ ইস্ আবাদে ভীরানী মেঁ গাবরাতো হোঁ মায়ঁ +"
রখ্ছত আয় বয্খে জাহাঁ হোয়ী ওয়াতন্ জাহাহো নামী"। (শেষ পর্যন্ত)

ভাবানুবাদঃ

"হায়! আমি ভীতু পুণ্যার্জনের ভূমি ধ্বংস হওয়াতে।
ফসল কাটতে এসে জীবন দিলাম মিছে
একটি ফসলের দানা নাইকো আমার জীবন শীষে॥
খালি শীষে ফিরছি আমি জীবন দিয়েছি শয়তানে পিছে
আপন বন্ধুরে ভুলে দৌড়েছি ধোকাবাজের পিছে
আয়ু শেষে দেখছি এসব কিছুই মিছে॥
ফসল কাটতে এসে

---

[৩২১]. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্রুল মুহাস্সিলীন বি আহওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
[৩২২]. স্ব-অনূদিত।

Dhaka University Institutional Repository

ফিরছি খালি হাতে।

পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে

ছুটছি প্রভূর সাক্ষাতে॥

ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবী ছেড়ে

যাত্রা তুলেছি অনন্ত অসীমের তরে।

যাঁর ক্ষয় নাই যাঁর শেষ নাই

তিনি অনন্ত অসীম চিরদিন ধরে॥

সে পথের পথিক আমরা

পাল তুলেছি পাপ-পঙ্কীল পৃথিবী ছেড়ে।

যাঁরা মানুষ হয়ে মরে

প্রভূরে সন্তুষ্টি করে।

তাঁদের লাশ মাটিও ভক্ষণ করিতে নাহি পারে

পঞ্চাশ দিন কেন পঞ্চাশ সহস্র বছর পরে

কেননা মাটিও তো প্রভুর তা'বেদারী করে॥

তাঁরা মরে না তাঁরা শুধু দেহ স্থানান্তরিত করে॥"[৩২৩]

স্মর্তব্য যে, আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের যখন জন্ম হয়েছিলো, তখন বাংলাদেশের (পশ্চিম-বঙ্গসহ) সুবাদার ছিলেন- শাহ্‌ সুজা (১৬৩৭-১৬৫৮ খ্রিঃ);[৩২৪] যিনি ছিলেন মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র।[৩২৫] তখন বাংলার রাজধানী ছিলো জাহাঙ্গীরনগর।[৩২৬]

আর যখন শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের মৃত্যু হয়, তখন বাংলার বা বাংলাদেশের সুবাদার ছিলেন- মুর্শিদ কুলী খান।[৩২৭] আর রাজধানী ছিলো মকসুদাবাদ। পরে মুর্শিদ কুলীর নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হয়। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে এটা স্থানান্তরিত হয়।[৩২৮]

---

৩২৩. মুহাম্মদ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮৪।
৩২৪. J.N. Sarkar, *History of Bengal*, Vol-ii, Dhaka:1948, p. 332, (Foot Note).
৩২৫. R.C. Majumder, *An Advanced History of India*, Macmillan S.T. Martings Press, 3rd Edition, London: 1970, p. 604.
৩২৬. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, Dhaka: 1964, p.17.
৩২৭. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Time*, Dhaka: 1963, pp. 48-76.
৩২৮. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ কথাঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন কালের ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষ। যিনি স্বীয় প্রতিভা ও জ্ঞানের দ্যুতি ছড়িয়ে সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে গেছেন। যাঁর অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার বিকশিত আলো ইসলামী শারীয়াতের গন্ডিতে থেকে যুগ সমস্যার সমাধান দিয়েছে; উন্মোচন করেছে ধর্মের নতুন দিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় যাঁর ছিলো স্বচ্ছন্দ পদচারণা।[৩২৯]

মুল্লাজীউন একদিকে যেমন ছিলেন সরলমনা, অপরদিকে ছিলেন দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মূর্ত প্রতীক। যেমন ছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর। তিনি একদিকে ছিলেন 'ফকীর-বাদশাহ্'; অপরদিকে ছিলেন সম্রাটদের সম্রাট ও ধূর্তবাজদের যমদূত।[৩৩০] যাঁকে শায়খ মুল্লাজীউন তাঁর নিজের হাতে গড়েছিলেন।

সুতরাং অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার অধিকারী এবং জ্ঞান তাপস ও সরলমনা আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন আমাদের মাঝে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। তাইতো তাঁর জীবন সম্পর্কে মহাকবি আল্লামা ইকবালের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্যঃ

"ওলী বামান বাও আঁন দীদাহ্ ওয়ার কীস্ত
কেহ্ খারে দীদু আহ্‌ওয়াল চুমন গুপ্ত।"[৩৩১]

অর্থঃ বন্ধু! বলতে পার কি বিজ্ঞ পন্ডিতের সন্ধান?
যে কাটা দেখে সবকিছু করতে পারে অনুমান।
সরলমনা তাঁর দু'টি আঁখি ছিল বিচক্ষণতায় ভরা
সে জন্য তাঁর কদর সম্রাটের কাছে ছিল অতি চড়া ॥[৩৩২]

---

৩২৯. আল্লামা সুলাইমান নদ্‌ভী কর্তৃক সম্পাদিত, *মা'আরিফ (মাসিক উর্দু)*, আযমগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারতঃ (তা. বি.) ভলিউমঃ ২৭, নং-৭, পৃ. ৩৭৯।

৩৩০. Dr. R.P. Tripathy, *Rise and Fall of the Mughal Empire*; 5th Edition, Mollika Publications, New Delhi, India: 1979, pp. 481-490.

৩৩১. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, *জীবন পথের দিশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

৩৩২. **কবিতার পূর্বোক্ত দু'লাইন স্ব-অনূদিত এবং শেষের দু' লাইন স্ব-রচিত।**

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞান চর্চায় আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞান চর্চায় আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অবদান

- প্রাককথন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও জ্ঞান বিতরণে আত্মনিয়োগ
- সম্রাট আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহের শিক্ষাগুরু হিসেবে আবির্ভাব
- আল্‌-ফাতওয়া আল্‌ হিন্দীয়াহ্‌তে মুল্লাজীউনের অবদান
- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের রচনাবলী এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্য
  - আত্‌-তাফ্‌সীরাতুল্‌ আহ্‌মাদিয়্যাহ্‌ ফী বায়ানিল্‌ আয়াতি'শ্‌ শার'ইয়্যাহ্‌ মা'আ তা'রিফাতিল্‌ মাসায়িল্‌ আল্‌-ফিক্‌হিয়্যাহ্‌
  - নূরুল্‌ আন্‌ওয়ার ফী শারহীল্‌ মানার
  - মানাকিবুল আওলিয়া
  - আদাব-ই-আহ্‌মাদী
  - খুতাবুল জুমা'-ই ওয়াল্‌ আ'ইয়াদ
  - মুজ্‌দাওয়াজাহ্‌ (জোড় ছন্দ প্রকরণ)
  - দেওয়ানে শে'র (কবিতা গুচ্ছ)
  - "আস্‌-সাওয়ানিহ্‌" জামী এর "আল্‌-লাওয়াইহ্‌"
  - ক্বাসিদা (সাত চরণের পঙ্‌ক্তি/কবিতামালা)
  - আল্‌-সুওয়ালাতু আল্‌-আহমাদিয়্যাহ্‌ ফী রাদ্দিল মালাহিদাহ্‌
  - আশ্‌রাকুল আব্‌সার ফী তাখ্‌রীজে আহাদীসে নূরিল্‌ আন্‌ওয়ার
  - নূরুল আন্‌ওয়ার ফী শারহীল্‌ আব্‌সার
  - আন্‌ওয়ারুল ফুরকান
  - আস্‌-সাফ্‌রু (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)
  - জিমাউল্‌ ইল্‌মে (জ্ঞান-পিপাসা)
- আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের কাব্য প্রতিভা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞান চর্চায় আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অবদান

প্রাককথনঃ

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে-

"Man is the best creature of Allah.[১] The best study for mankind is man."[২]

মানুষ 'আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত' তথা স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষই মানুষের কাছে আজ চরম বিস্ময়ের একটি বিষয়; মানুষই মানুষের কাছে আজ অধ্যয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়। এ পৃথিবীতে মানুষ আসে আর যায়, আসা-যাওয়ার এ চরম বাস্তবতার মধ্যদিয়েই কিছু মানুষ ইতিহাসের পাতায় ও মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চির অমর হয়ে রয়। প্রতিনিয়ত যাঁদের নাম উচ্চারিত হয়, যাঁদের জীবন-পাঠে চিত্ত বিকশিত হয়; এরূপ মানুষের আবির্ভাব কালে খুব কমই হয়। যাঁদের কাছে পৃথিবী ঋণী; যাঁদের অবদানে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি হয় এবং যাঁরা ব্যক্তির চেয়ে সমাজ নিয়ে বেশী ভাবেন। যেমন, কবি বলেছেনঃ

"আয় দেল তামাম নফা' হায় সোদায়ে ইশ্‌ক মেঁ
আগ জান্‌কা যিয়ান হায় সো এইছা যিয়ান নেহেঁ।"[৩]

অর্থাৎ, হে অবুঝ মন! প্রেমের মাঝেই রয়েছে সব কল্যাণ
একটি জীবনের কোরবানীর মাঝে যে শত প্রাণ।

যাঁদের অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার বিকশিত আলো ইসলামী শরীয়াতের গন্ডিতে থেকে যুগ-সমস্যার সমাধান দিয়েছে এবং উন্মোচন করেছে ধর্মের নতুন দিগন্ত; তাঁদের মধ্যে জ্ঞান-তাপস, সরলমনা আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন অন্যতম। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যাঁর

---

[১]. এম.এ.সামাদ, *Methods of Learning Correct English*, ৪৫ তম সংস্করণ, গ্রীন বুক হাউজ, (রচনা অধ্যায়), বগুড়াঃ ১৯৮৫, পৃ. ১৬৬।

[২]. সৈয়দ আব্দুস্ সুলতান, *বড় মানুষদের ছোটকালের কথা*, রুনা প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৫।

[৩]. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *জীবন পথের দিশা*, (মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ্ অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

আছে আকাশ ছোঁয়া অবদান। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তথা কুরআন, হাদীস, তাফ্সীর, আকাঈদ (ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত বিদ্যা), মান্তিক (যুক্তিবিদ্যা), তাসাওউফ (আধ্যাত্মবাদ), নাহু (বাক্য প্রকরণ ও শব্দের শেষ অক্ষরের স্বরচিহ্ন নির্ণয় শাস্ত্র), সর্ফ (শব্দ প্রকরণ বিদ্যা), বালাগাত (বাক্যালংকার শাস্ত্র), ফিক্হ (ইসলামী আইন শাস্ত্র), উসূল-ই-ফিক্হ (ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি), এবং আরবী ও ফার্সী সাহিত্যে যাঁর ছিলো একটি স্বচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ ও রাজসিক পদচারণা।[৪]

আল্লামা শায়খ্ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত ভারতীয় ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আযাদ বিলগ্রামী বলেছেনঃ

"মুল্লাজীউন ছিলেন আল্লাহর কালামের সংক্ষিপ্ত সার;[৫] এবং আকলী ও নকলী তথা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক অকুল সমুদ্র।"[৬]

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন এর অবদান সম্পর্কে বলেনঃ

> "তাঁর আগমন হয়েছিলো ঐ যুগে, যখন ভারতবর্ষে আলোড়ন
> সৃষ্টি করা ও মর্যাদা লাভের মূল চাবি-কাঠি ছিলো 'ফিক্হ' ও
> 'উসূল-ই-ফিক্হ'।[৭] এ ক্ষেত্রেই রয়েছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।
> অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্
> মুহাদ্দিস্ দেহ্লভী যেমন ভারতবর্ষে 'হাদীস' শাস্ত্রের যুগস্রষ্টা;[৮]

---

৪. ওমর রেযা কাহ্হালা, *মুজামুল মুআল্লিফীন,* (১ম খন্ড), তারাজিমু মুসান্নিফীল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, বৈরুত, লেবাননঃ ১৯৫৭, পৃ. ২৩৩।

৫. মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা, *আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য,* ১ম খন্ড, (মাওলানা সিদ্দীকুর রহ্মান অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৯।

৬. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্রুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন,* মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তানঃ ১৯৮৬, পৃ. ২১৮।

৭. আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *হিন্দুস্তান কী-কাদীম দরস গাঁহে,* মা'আরিফ প্রেস, আযমগড়, ভারতঃ ১৯৩৬, পৃ. ৮৯-১০০।

৮. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ৫ম সংস্করণ,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ৬৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি মুল্লাজীউন 'ফিক্হ' ও 'উসূল-ই-ফিক্হ' এর স্রষ্টা ও মুজ্তাহিদ।[৯] 'তাফসীরে আহ্মাদী' ও 'নূরুল- আন্ওয়ার' এ দু'টি কালজয়ী গ্রন্থের প্রণেতা; বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব ও তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহের শিক্ষক ও ধর্মোপোদেষ্টা।[১০] বোধকরি এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়।"

সুতরাং অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার অধিকারী এবং জ্ঞান তাপস ও সরলমনা আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন; সেজন্য তিনি আমাদের তথা গোটা বিশ্ব মুসলিম মিল্লাতের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

অতএব, আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন একদিকে যেমন ছিলেন সরলমনা, অপরদিকে ছিলেন দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মূর্ত প্রতীক। মোট কথা, তাঁর মাঝে সরলতা ও বিচক্ষণতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিলো।

তাইতো আহ্মাদ মুল্লাজীউনের জীবন সম্পর্কে মহাকবি আল্লামা ইকবালের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্যঃ

"ওলী বামান বাগু আঁন দীদাহ্ ওয়ার কীস্ত
কেহ খারে দীদু আহ্ওয়াল চুমন গুপ্ত।"[১১]
অর্থঃ বন্ধু! বলতে পার কি বিজ্ঞ পন্ডিতের সন্ধান?
যে কাটা দেখে সবকিছু করতে পারে অনুমান।
সরলমনা তাঁর দু'টি আঁখি ছিল বিচক্ষণতায় ভরা
সে জন্য তাঁর কদর সবার কাছে ছিল অতিচড়া॥[১২]

আলোচনার ধারাবাহিকতায় আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে অপরিসীম ও অমূল্য অবদান রেখে গেছেন, তন্মোধ্য থেকে নিম্নে আমরা কিঞ্চিৎ আলোকপাতের প্রয়াস পাবোঃ

---

[৯]. অধ্যাপক আব্দুল করিম সম্পাদিত, *ইসলামী ঐতিহ্য*, বায়তুশ্ শরফ ইসলমী গবেষণা প্রতিষ্ঠান (চট্টগ্রাম)ঃ ১৯৮৫, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৬-৩৭।

[১০]. ইউসুফ আলইয়ান সারকিস, *মু'জামুল মাতবু'আতু'ল আরাবিয়্যাহ,* ২য় খন্ড, সারকিস মুদ্রণালয়, মিশরঃ ১৯২৮, পৃ. ১১৬৫।

[১১]. আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *জীবন পথের দিশা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

[১২]. **কবিতার পূর্বোক্ত দু'লাইন স্ব-অনূদিত এবং শেষের দু'লাইন স্ব-রচিত।**

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও জ্ঞান-বিতরণে আত্মনিয়োগঃ

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের প্রাথমিক শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয় নিজ শহর আমেথীতে। তিনি এখানে একটি মাদ্রাসা ও স্থাপন করেন এবং নিয়মিত পাঠদান কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। সময়ের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর লিখিত তাফসীর খানার সংশোধনী দেখেন। এভাবে এখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁর ৪০টি বছর কেটে যায়।

অতঃপর তিনি আজমীর ও দিল্লীতে যান। এখানেও তিনি শিক্ষাদানে ব্রতী হন। বহুলোক তাঁর কাছ থেকে ইসলামের মৌলিক বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন।[১৩] এ পেশায় মুল্লাজীর কেটেছিলো প্রায় ৬১/৬২ বছর।[১৪]

শিক্ষকতা পেশায় তিনি যেখানেই নিয়োজিত হতেন; সেখানেই তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে শরীর চর্চা, কুচ্‌কাওয়াজ ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, একজন মুমীনকে যেমন নফ্‌স (প্রবৃত্তি) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন;[১৫] ঠিক অনুরূপভাবে প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শারীরিক শক্তির ও প্রয়োজন রয়েছে।[১৬] সুতরাং, তাঁর মতে- যুদ্ধ দুই প্রকার। যথা-

(i) আধ্যাত্মিক যুদ্ধ (Spiritual Fight/Fight with Devils).

(ii) শত্রুর সাথে যুদ্ধ (Fight with Enemies).

উপরোক্ত দু'প্রকার যুদ্ধের সমন্বয়েই মূলতঃ একজন মুমীনের জীবন। তিনি শিষ্যদের পাঠদানের সময় বলতেনঃ

"তোমরা জিহাদের আয়াত পড়বে, এবং রাসূল (সাঃ), সাহাবী ও পূর্ব পুরুষদের যুদ্ধের কাহিনী পড়বে; অথচ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্জন করবে না, তা কখনো হতে পারে না। বরং সন্তরন, ঘোড়্‌-সওয়ারী এবং অসি চালনা শিক্ষা দেয়া প্রত্যেক শিক্ষকের উপরই অত্যাবশ্যক। কেননা, পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে একজন পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শবান মানুষ হবার জন্যই তো বিদ্যালয়ে পাঠান।"[১৭]

---

১৩. শাকির আখতার, *ইযাহু'ল মাকনুন*, ২য় খন্ড, (তা. বি.) পৃ. ৫৫৪।

১৪. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

১৫. শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *আত্‌ তাফসীরাতুল্‌ আহ্‌মাদিয়্যাহ্‌ ফী বায়ানিল আয়াতি'শ্‌ শার'ইয়্যাহ্‌*, (টীকাকারঃ মাওলানা রহীম বখ্‌শ, প্রকাশকঃ আব্দুল করিম), দেওবন্দ, বোম্বে, ভারতঃ ১৩২৭ হি./১৯০৬ খ্রি., পৃ. ৭৪০।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৭৩।

১৭. Mohammad Jubaer Ahmed, *Contribution of India to Arabic Literature*, Alahabad, India:1946, p. 218.

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাঁর ছাত্রদেরকে সন্তরন, ঘৌড় সওয়ার এবং অসি চালনা শিক্ষা দিতেন। একদা সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীতে যান কোনো একটি কারণে। তিনি সকালে প্রাসাদ থেকে দেখলেন, এক মুল্লা মাদ্রাসার ছেলেদের ঐরূপ প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। অতঃপর সম্রাট আওরঙ্গজেব লোক মারফত তাঁকে ডেকে এনে প্রশ্ন করলেন; আপনার দায়িত্ব হলো কেবল পাঠদান করা, আপনি কেনো তাদেরকে এরূপ সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন? সম্রাটের প্রশ্নের জবাবে মুল্লাজী বললেন, ইসলাম আমাদেরকে ঐরূপই শিক্ষা দেবার কথা বলেছে; তাই আমি এমনটি শিক্ষা দিচ্ছি। এতে লেখা-পড়ার কোনো ক্ষতি হয় না, বরং ছেলে-মেয়েরা আনন্দই পায়। আর সে কারণেই হয়তো আমার মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। সম্রাট আওরঙ্গজেব এ কথা শুনে তাঁর প্রতি অত্যন্ত খুশী হয়ে যান। এরপর থেকেই মুল্লাজীকে সব সময় সম্রাট সাথে রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। অতঃপর তাঁকে রাজ-দরবার ও সেনানিবাসের প্রশিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন।[১৮]

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন যে দাক্ষিণাত্যে সামরিক বাহিনীতে একটানা ছয়টি বছর কাটিয়েছিলেন, তা সকল ঐতিহাসিক ও জীবনীলেখকগণই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন।[১৯] আমরা জানি, যারা সেনাবাহিনীতে থাকে; তাদের আত্মরক্ষামূলক কিছু প্রশিক্ষণ নিতে হয়। আর যারা সেনাবাহিনীতে থাকে, তাদেরকে সৈনিকরূপেই চিহ্নিত করা হয়; চাই যুদ্ধ করুক বা নাই করুক। তাই অনেক ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকগণ তাঁর এই ছয়টি বছরেকে সৈনিক জীবন বলে উল্লেখ করেছেন।[২০]

এটা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে মুল্লাজী তাঁর জীবনের কোনো এক সময়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ছাত্রদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণের ঘটনা থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে, তিনি হয়তো ছাত্রজীবনেই অথবা রাজ-দরবারে আসার পূর্বেই কোনো এক সময়ে সামরিক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। আর এ বিষয়টি মূলতঃ অস্বাভাবিক নয় এবং একজন সূফী সাধকের জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় কোনো প্রতিবন্ধক ও নয়। যেমন- আল্লামা কারামাত আলী জৌনপুরীর

---

[১৮]. *আত্-তাযকীরা,* (স্মরণিকা) বার্ষিকী, মাদ্রাসা-ই-উস্তাদ আলমগীর মুল্লাজীউন, আমেথী, ভারতঃ ১৯৮৬, পৃ. ৩, উৎসমূলঃ *'আস্সাফর' (মুল্লাজীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত)* নামক পান্ডুলিপি, যা ঐ মাদ্রাসায় সংরক্ষিত আছে।

[১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

[২০]. ওমর রেযা কাহ্হালা, *মু'জামুল মুআল্লিফিন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮০০-১৮৭৩ খ্রিঃ) জীবনীতেও দেখা যায় যে, তিনি একজন দক্ষ সামরিক জান্তা ছিলেন। এজন্যে তিনি কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ ও নিয়েছিলেন।[২১] সুতরাং তিনি ছিলেন পাঠ্যপুস্তকের (Text Book) ঝানু আদর্শ শিক্ষক; অপরদিকে আধ্যাত্মিক ও সামরিক বিদ্যার দক্ষ একজন প্রশিক্ষক।

অতএব বলা যায়- মুল্লাজীর বিদ্যালয় ছিলো আধুনিক 'Cadet College' এর মানে আর তিনি ছিলেন সেই কলেজের সর্বাধিনায়ক। এ কারণেই হয়তো আওরঙ্গজেব তাঁকে বেশী সম্মান করতেন। কেননা তিনি ছিলেন একদিকে 'জিন্দাপীর' (Living Saint) অপরদিকে পবিত্র ধর্মযোদ্ধা।[২২]

সম্রাট আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহের শিক্ষাগুরু হিসেবে আবির্ভাবঃ

বাদশাহ্ আলমগীর[২৩] ও তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ্,[২৪] তাঁরা দু'জনেই আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউনের ছাত্র ছিলেন।[২৫] যা একবাক্যে সকল ঐতিহাসিকগণই স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাঁরা কোন্ সময় মুল্লাজীর নিকট হতে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তার কোনো প্রমাণ সরকারী কাগজ-পত্রে নেই। কেননা যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে মোগল আমলের অনেক তথ্যই সংরক্ষিত হয়নি, যা কিছু হয়েছিলো তার অনেক তথ্যই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে সঠিক কোনো তথ্যও

---

[২১]. আব্দুল বাতিন, *সীরাত-এ-কারামাত আলী জৌনপুরী*, আসরারে করিমী প্রেস, এলাহাবাদ, ভারতঃ ১৩৬৮ হি., পৃ. ৯-১১।

[২২]. অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের ইতিহাস*, জমজম প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৮৮।

[২৩]. এটা সম্রাট আওরঙ্গজেবের উপাধি। তিনি যখন তাঁর তিন ভাই দারাশিকো, শাহসুজা ও মুরাদকে যুদ্ধ সমূহে পরাজিত করে সিংহাসন লাভ করেন, তখন ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুলাই অভিষেক অনুষ্ঠানে আবুল মুজাফ্ফর মুহীউদ্দীন (ধর্মসংস্কারক) মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর (বিশ্ব সম্রাট/বিশ্বকে মুষ্ঠিবদ্ধকারী) বাদশাহ্ গাজী (মহান যোদ্ধা) নামটি ধারণ করেন। বাদশাহ্ আলমগীর বা আওরঙ্গজেব নামেই সুপরিচিত। (R.C. Majumder, *An Advanced History of India*, Macmillan S.T. Martings Press, London, England : 1970, p. 484)

[২৪]. তাঁর পুরো নাম ঃ আবু মোজাফ্ফর সিরাজউদ্দীন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ (সাহসী সম্রাট) শাহ্ আলম (বিশ্ব সম্রাট) 'মুয়ায্যম (সম্মানিত)। তিনি আযম ও কামবখ্শকে পরাজিত করে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে অভিষেক অনুষ্ঠানে শাহ্ আলম বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বাহাদুর শাহ্, শাহ্ আলম (১ম) বা মুয়ায্যম; এ তিনটি নামেই সুপরিচিত। (মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন, *মুসলমানদের উত্থান ও পতন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯, পৃ. ৩৬৮)

[২৫]. আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী, *মুফীদুল মুফতী*, লক্ষ্ণৌঃ ১৯৩৭ খ্রি., পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়নি।[২৬] এক্ষেত্রে বে-সরকারী কাগজ-পত্রেও তেমন কোনো কিছু উল্লেখ নেই। তাই ইতিহাসের গতিধারা ধরে বা সন-তারিখের উপর নির্ভর করে এর একটা সমাধান দেয়া যেতে পারে।

খুব সম্ভব আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন যখন দিল্লীতে যান, তখন তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ই সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। অতঃপর মুল্লাজীর বিদ্যা-বুদ্ধি, জাহেরী ও বাতেনী ইলমের কামালাত বা গভীরতা দেখে তাঁর নিকট কিছু ধর্মীয় কিতাব পড়েন এবং পিতা-পুত্র উভয়ই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[২৭] এ মতটি বহু মনীষীই স্বীকার করেন ও সমর্থন করেন। কেননা উহা তাঁর বয়সের সাথে, শিক্ষা জীবনের সাথে ও কর্ম-জীবনের সাথে সংগত।

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জন্ম হয় ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে, শিক্ষা সমাপনী সনদ লাভ করেন মাত্র একুশ বছর বয়সে এবং আমেথীতে শিক্ষকতা করেন ৪০ বছর পর্যন্ত।[২৮] সে অনুপাতে মুল্লাজীর দিল্লীতে আগমন ঘটেছিলো (১৬৩৭ খ্রিঃ+ ৪০) তথা ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে।

আর এ সময় সম্রাট আওরঙ্গজেব ও শাহ্ আলমের বয়স ছিলো যথাক্রমে ৬০ ও ৪৫ বছর। এটা সবচেয়ে নূন্যতম হিসাব। সে হিসেবে তাঁরা কখনও তাঁর কাছে বাল্যশিক্ষা করেননি।[২৯] সে কারণেই হয়তো রাষ্ট্রীয় দলীল-পত্রে মুল্লাজীকে তাঁদের শিক্ষকরূপে চিহ্নিত করা হয়নি। যা যুক্তিসংগত।

অথবা সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তখন দেশ-বরেণ্য আলেমদেরকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে ধর্মীয় ব্যাপারে বিভিন্ন

---

[২৬]. এ,কে,এম, আব্দুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৭৩, পৃ. ১ (উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য)।

[২৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫।

[২৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

[২৯]. *'যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি আহ্‌ওয়ালিল মুসান্নিফীন'* এর গ্রন্থকার আল্লামা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহীসহ কতিপয় ঐতিহাসিক ও জীবনীকার বলেছেনঃ সম্রাট শাহজাহান তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন এবং স্বীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮) যে ভাষ্যে বোঝা যায় তিনি তাঁর বাল্যশিক্ষক ছিলেন। কিন্তু এ মতটি ইতিহাসের সাথে বিরোধপূর্ণ। কেননা মুল্লাজীর যখন জন্ম হয় তখন আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের গভর্ণর। তখন তাঁর বয়স ১৮-২০ বছর। এমনকি তাঁর পুত্র শাহ আলম (১ম) ও মুল্লাজী থেকে পাঁচ বছর বড়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫) মুল্লাজীর জন্মের পূর্বেই যেহেতু আওরঙ্গজেব ও তদীয় পুত্র শাহ আলমের শিক্ষক হওয়া বাস্তব বিরোধী। তাই এ মতটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরামর্শ গ্রহণ করেন।[৩০] সম্ভবতঃ আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁকে ধর্মীয় সংস্কার কার্যে বিভিন্ন পরামর্শ দেন; যা সম্রাটের মনোপুত ও হয়। আর মনোপুত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা মুল্লাজী তৎসময়েই শিক্ষা সমাপনী সনদ লাভ করেছেন এবং 'আদাব-ই- আহ্মাদী' ও 'তাফ্সীরে আহ্মাদী' সহ বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই লিখে ফেলেছিলেন।[৩১] ফলশ্রুতিতে মুল্লাজীর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া আগ্রা থেকে আমেথী বেশী দূরবর্তী শহর ও না। হয়তো এমন ও হতে পারে, যখন তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো; তখন এ সুনামের খবর রাজ-দরবারে ও পৌঁচেছিলো। ফলে বাদশাহ তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন।

আর এটা অসম্ভবের কিছুই না। কেননা তৎকালীন সময়ে জৌনপুর শিক্ষা-দীক্ষায় খুবই অগ্রগামী ছিলো।[৩২] আর সেই শহরের অধীনস্থ শহর হলো আমেথী। সেখানে বসে এরূপ যুগান্তকারী একটি তাফ্সীর লিখে ফেলেছেন; আর সে খবর জৌনপুরবাসী জানবেন না বা সে খবর রাজ-দরবারে পৌঁছবেনা-এটা কখনো হতে পারে না, এবং এটা অসংগত ও সম্পূর্ণরূপে বিবেক বহির্ভূত একটি ব্যাপার।

অথবা আলমগীর নতুন সম্রাট হওয়ার পর যখন প্রতি শহরের মসজিদ, মাদ্রাসা ও বড় বড় আলেমদেরকে ভাতা প্রদান করেন,[৩৩] তখন মুল্লাজীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিলো। অথবা আওরঙ্গজেব সিংহাসন লাভ করবার বহু পূর্বেই মুল্লাজীর সাথে রাজ-দরবারে তাঁর পরিচয় ঘটেছিলো। কেননা তাঁর পরিবার ছিলো হযরত সালিহ্ (আ.) এর বংশোদ্ভূত ঐতিহ্যবাহী আরবীয় সূফী পরিবার।[৩৪] যে পরিবারের প্রভাব রাজ-দরবারে পূর্ব-পুরুষ হতেই ছিলো। কেননা, ভারতবর্ষ হলো সূফী-সাধকের দেশ। যাঁদের মাধ্যমে ইসলাম বেশী প্রচারিত হয়েছিলো। তাঁদের সাথে বেয়াদবী করলে পরিণাম যে ভালো হয় না, তা রাজ-কর্মচারীদের অনেকেরই জানা ছিলো।

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫।
৩১. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
৩২. W. Haig, *The Cambridge History of India*, Vol-iii, Delhi, India: 1971, p. 253 (Foot note).
৩৩. ওমর রেযা কাহ্হালা, *মুজামুল মুআল্লিফীন- তারাজিমু মুসান্নিফিল কুতুব আল আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, কিছুকাল পূর্বে সম্রাট আকবর সূফী-সাধক হযরত মুজাদ্দিদ-ই- আল্‌ফে সানী (রহ.) এর সাথে বেয়াদবী করার ফলে মাথায় খুঁটির আঘাত লাগে। আর সে আঘাতের কারণেই পরবর্তীতে যে আকবরের মৃত্যু হয়েছিলো তা ইতিহাস কেন, বরং রাজ-পরিবারের অনেকের মাঝেই তা কাহিনী হিসেবে প্রচলিত ছিলো।[৩৫] সে কারণেই হয়তো মোগল সম্রাটরা সূফী-সাধক, আলেম ও পন্ডিতদের মাঝে 'ইনাম' বা 'মদদ-ই- মা'আশ্' দিতো।[৩৬] সে জাতীয় পরিবারের মাঝে হয়তো তিনি পূর্বকাল থেকেই ছিলেন।

অথবা মুল্লাজীর পরদাদা শাহ্ মাখদুম এর পূর্ব বাসস্থান যেহেতু দিল্লীতে ছিলো,[৩৭] সে কারণে দিল্লী, আগ্রা, আজমীর ও আমেথীতে বেশ কিছু খান্‌কা ছিলো। সে সব খান্‌কা পরিদর্শন কালেই মাঝে- মধ্যে রাজ-দরবারে তাঁদের মুরীদদের সাথে অথবা বাপ-চাচার সাথে রাজ-দরবারে মুল্লাজী আসা-যাওয়া করতেন। তিনি যেহেতু বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ছিলেন, সেহেতু সম্রাট শাহ্জাহান সহ রাজ-পরিবার ও রাজ-কর্মচারীদের অনেকেই কুরআন, হাদীস, তাফসীর, তাসাউফ এবং ইসলামী ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[৩৮]

বয়সে ছোট হয়েও মুল্লাজী তাদের শিক্ষা দিতেন, যা অস্বাভাবিক নয়। এ সময়ই যদি তাঁর রাজ-দরবারে যাতায়াত, পরিচয় ও শিক্ষা প্রদানের কথা সাব্যস্ত হয়; তাহলে সম্রাট শাহ্জাহান ও মুল্লাজীকে নিয়ে যে সমস্ত প্রচলিত ঘটনা রয়েছে তা সত্য।

তবে একথা দিব্য সত্য যে- যে কোনো ভাবেই হোক, যে কোনো বয়সেই হোক, যে কোনো মাধ্যমেই হোক আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের সাথে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজ-দরবারেই পরিচয় ঘটেছিলো এবং আওরঙ্গজেব ও শাহ্ আলম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে উস্তাদ রূপেই সম্মান করতেন।[৩৯] চাই তা বাল্য শিক্ষা হোক, ধর্মীয় শিক্ষা হোক অথবা আধ্যাত্মিক শিক্ষা হোক। জানিনা সেই 'ওস্তাদের কদর' কবিতাটি কবি তাঁকে কেন্দ্র করেই লিখছেন কি-না। যেমন কবি বলছেনঃ

"বাদশাহ্ আলমগীর,
কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবী দিল্লীর।
....
আজ হতে চির উন্নত হল শিক্ষা গুরুর শির
সত্যিই তুমি মহান উদার বাদশাহ্ আলমগীর।"[৪০]

---

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
৩৬. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ১ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৫১।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
৩৮. আযাদ বিলগ্রামী, *সুবহাতুল মারজান,* মাকতাবাতে থানবী, বোম্বে, ভারতঃ ১৯৮৫, পৃ. ২১৮।
৩৯. শাহ নাওয়ায খান, *মা'আছিরু'ল উমারা,* ৩য় খন্ড, আসরারে করিমী প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ পৃ. ৭৯৪।
৪০. *সাহিত্য সওগাত,* ৫ম শ্রেণী, সিটি লাইব্রেরী, (ওস্তাদের কদরঃ কাজী কাদের নওয়াজ), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃ. ৩২-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও কবি এখানে মৌলবীর নাম উল্লেখ করেননি; তবে একথা সত্য যে এ মৌলবী হয় আল্লামা আহমাদ মুল্লাজীউন হবে নতুবা আল্লামা মুল্লা নিযাম হবে। কেননা এ দু'জনই রাজ-পন্ডিত ও ধর্মীয় গুরু ছিলেন। তবে উল্লেখিত কবিতায় 'মৌলবী' দ্বারা মুল্লাজীউন হবারই সম্ভাবনা বেশী। কেননা, মুল্লাজীউন মুল্লা নিযামের চেয়ে সবদিক দিয়ে বেশী যোগ্য ও পারদর্শী ছিলেন।[৪১]

আর সে কারণেই সম্রাট আলমগীর ও বাহাদুর শাহ্ তাঁকে বেশী সম্মান করতেন এবং তাঁকে রাজ-দরবারে রাখা প্রয়োজন বোধ করে দীর্ঘ ১২টি বছর একাধারে রাজ-পন্ডিত ও ধর্মীয় উপদেষ্টা (The Religious Teacher and Guide) হিসেবে রেখেছিলেন।[৪২] অথচ মুল্লা নিযামের ভাগ্যে এমন সম্মান জোটেনি। যদিও মুল্লা নিযাম 'ফাত্ওয়া-ই- আলমগীরী' এর মতো মূল্যবান একটি কিতাবের সম্পাদক ছিলেন।[৪৩]

আর উপরোক্ত 'মৌলবী' যে আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনই ছিলেন তার সবচেয়ে বড় শক্তিশালী দলীল হলো, মুল্লা নিযামের পদবীটি। কেননা মুল্লা নিযামের পদবী হলো কাজী। এ পদবীটি প্রমাণ করে যে, তিনি কখনও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন, বরং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন মুফ্তী বা মুল্লা। যেমন, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেনঃ

"The Qazi was the Chief Judge in Criminal suits, ... Muslim law assisted by a Mufti (Mulla), who consulted the old Arabic Books."[৪৪]

তাছাড়া মুল্লা নিযাম সম্পাদিত 'ফাত্ওয়া আলমগীরী' প্রমাণ করে যে, তিনি ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন না; বরং ছিলেন একজন কাজী বা ফৌজদারী বিভাগ প্রধান। কেননা তাতে 'মুল্লা' উপাধি নেই। সেখানে লেখা রয়েছে- 'মাওলানা শায়খ্ নিযাম'।[৪৫]

তাহলে বোঝা গেল যে, তিনি 'মুল্লা' নন। আর তিনি যদি 'মুল্লা'ই না হন তাহলে তিনি মুফতী বা ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ ও না। আর যখন তিনি 'ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ' এর গুণটি হারালেন, তখন তিনি রাজপুত্রদের শিক্ষক হওয়ার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হলেন। কেননা কাজী কখন ও

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

৪২. খাজা আব্দুল্লাহ, *মাবলিগুর রিজাল*, নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৫৭, পৃ. ১৯-২১।

৪৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪তম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৫৬০।

৪৪. J.N. Sarkar, *Mughal Administration*, 2nd Edition, Calcutta, India: 1963, p. 26.

৪৫. মাওলানা শায়খ নিযাম এবং একদল ভারতীয় 'উলামা' পরিষদ কর্তৃক সংকলিত, *আল-ফাতওয়া আল-আলাম-গীরিয়্যাহ*, ২য় সংস্করণ, মাকতাবাতু মাজিদিয়্যাহ, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৮৩, পৃ. ২ (১ম খন্ডের সূচী দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

পড়ানোর সময় পান না বরং তাঁর অধীনে থাকে একাধিক বিভাগের দায়িত্ব। 'আইন-ই-আকবরী'-র মতে ৪টি,[৪৬] পি, সারন এর মতে ১২টি[৪৭] বিভাগের দায়িত্ব পালন করতে হতো। তাই তাঁকে নিয়মিত অফিস করতে হতো।

পক্ষান্তরে 'মুল্লা' বা 'মুফ্‌তী'র কাজের পরিধি কম ছিলো। তাঁকে নিয়মিত অফিসে যেতে হতো না। যেমন ঐতিহাসিক পি, সারন বলেনঃ

"Mufti (Mulla) was a short of unofficial legal refree... recognized to be an authority or religious law, and the Mufti's duty was only to state the law applicable to the case under reference.[৪৮]

অতএব 'মুল্লা' বা 'মুফতী'র হাতে সময় থাকতো। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, রাজ-পরিবার ও রাজ-দরবারে শিক্ষা-দীক্ষা, মাসয়ালা-মাসায়েল ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া তাঁর কাজ ছিলো। সুতরাং বাদশাহ্‌ আলমগীরের ছেলে-মেয়ে তাঁর কাছ থেকেই ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো। অতএব কাজী কাদের নেওয়াজের 'ওস্তাদের কদর' কবিতায় উল্লেখিত 'মৌলবী' বা 'মুল্লা' দ্বারা যে আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনই উদ্দেশ্য; তা ইতিহাসের নিরিখেই প্রমাণিত।

তবে একথা স্মরণীয় যে, 'মুল্লা' বা 'মুফ্‌তী'র চেয়ে কাজীর নাম Record-Book এ বেশী লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো।[৪৯] সে কারণেই কাজী নিযামের নাম সরকারী কাগজ-পত্রে বেশী পাওয়া যায়। আর এ কারণেই কাজী নিযামের নাম 'ফাত্‌ওয়া-ই-আলমগীরী' তে সম্পাদকরূপে লিখিত আছে। মূলতঃ তাঁর চেয়ে মুল্লাজীই (মুফ্‌তী/মুল্লা) বেশী দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের ঐ ধারার কারণে আজ তাঁর নাম লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গিয়েছে।

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন যে শুধুমাত্র বাদশাহ্‌ আলমগীর ও বাহাদুর শাহের শিক্ষক ছিলেন তাও নয়। কেননা কবিতার ছন্দে পুত্রের নাম নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই এ পুত্র বলতে

---

[৪৬]. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খন্ড, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ভারতঃ ১৯৭৮, পৃ. ৪৩।

[৪৭]. P. Saran, *The Provincial Government of Mughals*, 2nd Edition, Bombay, India: 1973, p.p321-325.

[৪৮]. Ibid, pp. 325-326.

[৪৯]. ওমর রেযা কাহ্‌হালা, *মু'জামুল মুআল্লিফিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ্ আলমগীরের যে কোনো পুত্র হতে পারে। আর তাঁর পুত্র ছিলো পাঁচজন। যা ছকের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হলো ঃ

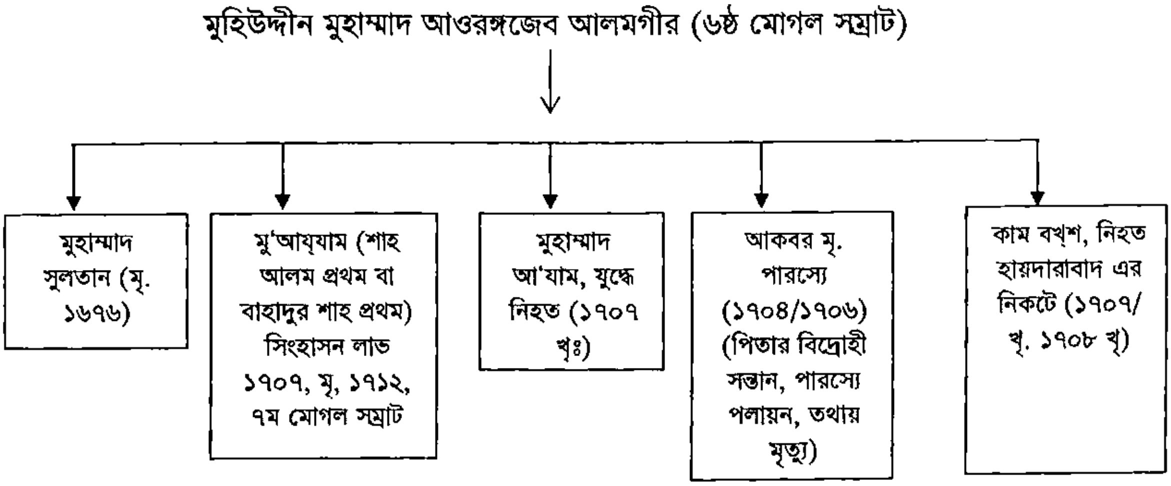

(৩) 'আল-ফাত্ওয়া আল্হিন্দীয়াহ্তে মুল্লাজীউনের অবদানঃ

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর দু'লক্ষ টাকা ব্যয় করে,[৫০] তৎকালীন সময়ের চল্লিশ-পঞ্চাশ জন সুবিজ্ঞ আলিমদের দিয়ে 'আল্-ফাত্ওয়া আল্হিন্দীয়াহ্' শীর্ষক মহামূল্যবান কিতাবটি সংকলন করেন। যে কারণে তাঁর নামানুসারে এটা 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরী' নামেও সুপরিচিত।[৫১]

এ মহামূল্যবান কিতাবটি হানাফী মাযহাবের বিরাট মূল্যবান একটি আইন শাস্ত্র। একদল উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, এ মহান কাজে আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অবদান অনস্বীকার্য এবং তাঁর সার্বিক সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। যা আমাদের দেশের অন্যতম প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমে দ্বীন- মাওলানা মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন খান ও 'তাফসীরে আহ্কামুল কুরআন' এর ভূমিকায় লিখেছেন।[৫২]

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁরা কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে সকল ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকগণ এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি আল্লামা

---

৫০. মাওলানা নিজাম এবং একদল ভারতীয় 'উলামা' পরিষদ কর্তৃক সংকলিত, *আল-ফাতওয়া-আল-আলামগীরীয়্যাহ্*, পৃ. ২ (১ম খন্ডের সূচী দ্রষ্টব্য)।

৫১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪ তম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৫৬০।

৫২. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী অনূদিত, *তাফসীরে আহ্কামুল কুরআন*, মদীনা শরীফ পারফিউমারী হাউজ, ঢাকাঃ ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., পৃ. (অভিমত ও দোয়াঃ মাওলানা মুহীউদ্দীন খান। এটা মূলতঃ তাফসীরে আহম্মাদিয়্যাহ্ এর বঙ্গানুবাদ)।

Dhaka University Institutional Repository

সুলাইমান নদ্ভী 'মা'আরিফ' নামক গবেষণামূলক পত্রিকায় 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরী' এর উলামাদের জীবনীর উপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন; তাতেও তাঁর নাম উল্লেখ নেই।[৫৩] তিনি যে কোনো নীরব ভূমিকা পালন করলেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

তবে সকলেই একথা বলেছেন যে, আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের দু'জন সুযোগ্য শিষ্য এতে বিরাট অবদান রেখেছেন। একজন হলেন- আহ্মাদ গোপামুঈ, আর অপরজন হলেন ফাসীহুদ্দীন ফুলওয়ারী।[৫৪] তাই অনুমানের ভিত্তিতে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি খাড়া করা যায়। যা ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণও বটে।

বিপক্ষে যুক্তিসমূহঃ

(১) এ ফাতওয়ার কিতাবটি লেখা শুরু হয় (১০৭৪-৭৫হিঃ/১৬৬৪-৬৫ খ্রিঃ) সনে, আর শেষ হয় (১০৮২ হিঃ/১৬৭২ খ্রিঃ) সনে। সম্পাদনার কাজ শেষ হতে সময় লেগেছিলো ৭/৮ বছর।[৫৫]

তখন আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন নিজ শহর 'আমেথী'তে শিক্ষকতা করছিলেন এবং তাফসীরের সংশোধনী দেখছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ২৭ মতান্তরে ২৮ বছর।[৫৬] সুতরাং এ কারণে তিনি 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরী' বা 'আল্-ফাত্ওয়া আল্ হিন্দীয়াহ্' এর সম্পাদনার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কেননা তিনি ৪০ বছর বয়সে দিল্লীতে যান,[৫৭] তারপর চতুর্দিকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্রাটের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে।

(২) আল্লামা শায়খ্ আহ্মাদ মুল্লাজীউন যদি 'আল্-ফাত্ওয়া আল্-হিন্দীয়াহ' এর সম্পাদনার কাজে অংশগ্রহণ করতেন, তাহলে উক্ত কিতাবের তালিকায় তাঁর নাম লিখিত থাকতো।

---

৫৩. আল্লামা সুলাইমান নদ্ভী কর্তৃক সম্পাদিত, *মা'আরিফ* (মাসিক উর্দু), আযমগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারতঃ (তা. বি.) ভলিউম, ২৭, পৃ. ৩১৭।
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০-৫৬২।
৫৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়িরাতু মা'আরিফ ইসলামিয়্যাহ্*, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ১৫ তম খন্ড, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ১৪৯-১৫১।
৫৬. মাওলানা আব্দুল হাই আল-হাসানী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, ২য় সংস্করণ, ৮ম খন্ড, হায়দারাবাদ, হিন্দ ভারতঃ ১৩৯৮ হি./ ১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ১৯-২০।
৫৭. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্রুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, তাঁর ছাত্রদ্বয় 'আহ্মাদ গোপামুঈ' ও 'ফাসীহুদ্দীন ফুল্ওয়ারী' এর নাম উক্ত কিতাবের তালিকায় লিখিত রয়েছে।[৫৮]

(৩) আল্লামা মুল্লাজীউন যদি 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরী' বা 'আল্-ফাতওয়া আল্-হিন্দীয়াহ্' এর সম্পাদনা ও সংকলনের কাজে কোনো না কোনো ভাবে শরীক থাকতেন; তাহলে কোনো না কোনো ঐতিহাসিক বা জীবনী লেখক তাঁর জীবন ইতিহাসে এ অবদানের কথাটি উল্লেখ করতেন। কেননা এটা ছিলো তাঁর জীবনের বিরাট এক স্মরণীয় অবদান।[৫৯]

(৪) অথবা, আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন নিজেই এ অবদানের কথাটি তাঁর বিখ্যাত 'মানাকিবুল্ আওলিয়া' শীর্ষক গ্রন্থে লিখে যেতেন। কেননা, তিনি তাতে তাঁর প্রায় সকল অবদানের কথাই উল্লেখ করে গিয়েছেন। এমনকি মাত্র ১৩ বছর বয়সেই তিনি তাঁর দাদা ও চাচার সংকলনের পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধনী দেখেছেন; তা-ও তিনি তাঁর 'মানাকিবুল আওলিয়া' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।[৬০] অথচ এতো বড় একটি 'ইল্মী খিদমাত' এর কথা তিনি তাঁর কিতাবে লিখে যাবেন না, তা বুঝে আসে না। যা বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকগণও মেনে নিতে চান না। অতএব, মুল্লাজীউন যে উক্ত কিতাবের লেখক বা সহযোগী ছিলেন, একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কেননা উহার স্বপক্ষে ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই। যদিও মাওলানা মুহীউদ্দীন খানের মত অনেকেই বলেছেন।[৬১]

স্বপক্ষে যুক্তিসমূহঃ

(১) 'আল্-ফাত্ওয়া আল্-হিন্দীয়াহ্' বা 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরী' যে ১৬৬৪-১৬৭২ সনের মধ্যে সংকলিত হয়েছে তা আনুমানিক হিসাব, যা একবাক্যে সকল ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন।[৬২] এটা যেহেতু আনুমানিক হিসাব সেহেতু এ দিকটারও সম্ভাবনা

---

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬১-৫৬২।
৫৯. মাওলানা আহ্মাদ সাঈদ সম্পাদিত, *বুরহান* (উর্দু মাসিক পত্রিকা), ৮ম সংখ্যা, দিল্লী, ভারতঃ ১৯৩৫, পৃ. ৪৩।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
৬১. মানযুর নু'মানী কর্তৃক সম্পাদিত, *আল্- ফুরকান* (উর্দু মাসিক পত্রিকা), ৩২ তম সংখ্যা, বেরিলী (Bariely): ১৯৩৫, পৃ. ৩৫।
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০-৫৬১।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে যে, উক্ত কিতাবটি আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের ৪০ বছর অতিক্রম হওয়ার পর দিল্লীতে যাওয়ার পর লেখা হয়েছে।

অথবা, উক্ত কিতাব সংকলনে অংশগ্রহণ করার জন্য দিল্লীতে যেতে হবে অথবা ৪০ বছর পূর্ণ হতে হবে বা রাজ-দরবারে পরিচয় ঘটতে হবে ইত্যাদি চিন্তা-প্রসূত শর্ত। কেননা 'আমেথী' থেকে ৪০ বছর বয়সের কমে রাজার সাথে পরিচয় ব্যতিরেকেই উক্ত কিতাবে লিখতে পারেন অথবা সহযোগিতা করতে পারেন; যেমন অন্যান্য লেখকদের জীবন ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁরা কখনও রাজ-দরবারে যাননি, দিল্লীতে পদার্পণ করেননি; অথচ 'আল্-ফাত্ওয়া আল-হিন্দীয়াহ্' তে লিখেছেন বা সহযোগিতা করেছেন। হয়তো তাঁরা ডাকযোগে অথবা লোক-মারফত পাঠিয়েছেন, যা ফাত্ওয়ার কিতাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।[৬৩]

(২) দুই নম্বরের জবাবে বলা যায় যে, উক্ত ফাত্ওয়ার কিতাবে সম্পাদনা পরিষদের চল্লিশ-পঞ্চাশজন সদস্যের সকলের নাম লিখিত নেই। মাত্র প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম লিখিত আছে।[৬৪] অথবা আল্লামা শায়খ্ আহ্মাদ মুল্লাজীউন হয়তো তখন রাজ-দরবারে চাকুরী করতেন না। তাই তিনি উক্ত কিতাব সংকলন ও সম্পাদনে মূখ্য ভূমিকা রাখতে পারেন নি।

পক্ষান্তরে তাঁর ছাত্রদ্বয় আহ্মাদ গোপামুঈ ও ফাসীহুদ্দীন ফুলওয়ারী রাজ-দরবারে চাকুরী করতেন; এমনকি একজনতো বাদ্শাহর বিশিষ্ট কাজী ছিলেন। সে কারণে তাঁর ছাত্রদ্বয়ের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৬৫]

(৩) অথবা ঐতিহাসিক বা জীবনী লেখকগণ আল্লামা মুল্লাজীউনের জীবনের সকল দিক লিখে যাননি। যদি লিখতেন, তাহলে তা এক বিশাল গ্রন্থের আকার নিতো। যেমন- তাঁর মায়ের নাম, মাতৃকুল, শিক্ষকবৃন্দের নাম, তাঁর সন্তানাদি কয়জন ছিলো, তিনি কোথায় বিয়ে করেছিলেন, কয়টি বিয়ে করেছিলেন ইত্যাদি বাদ পড়েছে। সুতরাং এভাবে তাঁর জীবনের এ দিকটাও বাদ পড়ে গিয়েছে।[৬৬]

---

[৬৩].আযাদ বিলগ্রামী, *মা'আসিরুল কিরাম*, ৩য় সংস্করণ, আগ্রা, ভারতঃ ১৩২৮ হি./ ১৯১০ খ্রি., পৃ. ১৯৭।
[৬৪]. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়িরাতু মা'আরিফল ইসলামিয়্যাহ্*, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ১৫ তম খন্ড, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ১৪৯-১৫১।
[৬৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০-৫৬২ এবং প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
[৬৬]. মাওলানা রাফীক আহ্মাদ, *ইরশাদুত্তালিবীন ফী আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, পটিয়া, চট্টগ্রামঃ ১৩৯৯ হিজরী, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) চার নং প্রশ্নের জবাব ও অনুরূপ। কেননা, আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মানাকিবুল আওলিয়া' শীর্ষক গ্রন্থে সব কিছু লিখে যাননি। মাত্র কয়েকটি প্রসঙ্গে লিখে গিয়েছেন, যা তাঁর মনে চেয়েছে। তাই এই ব্যাপারটি বাদ পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।[৬৭]

(৫) 'আল-ফাত্‌ওয়া আল-হিন্দীয়াহ্‌' বা 'ফাতওয়া-ই-আলমগীরী' নামক বিশ্ববিখ্যাত 'ফাতওয়া'র কিতাবটি ১৩০টি গ্রন্থের সহায়তায় লেখা হয়েছে। সবগুলো কিতাবের নাম তাতে লেখা হয়নি অথবা কেউ এ পর্যন্ত উহার সে তথ্য পরিবেশন করেননি।[৬৮] তাই আমাদেরকে অনেকটা আনুমানিক তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়; যা যুক্তি বহির্ভূত ও না আবার ইতিহাসের সাথে সংঘাতপূর্ণ ও না।

দ্বন্দ্বের সমাধানঃ

উপরোক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান আমরা এভাবে করতে পারি যে, আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন 'আল-ফাতওয়া আল-হিন্দীয়াহ' বা 'ফাত্‌ওয়া-ই-আলমগীরী' নামক বিশ্ববিখ্যাত 'ফাতওয়া'র কিতাবের লেখক ছিলেন।

কেননা 'তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদী' 'নূরুল আনওয়ার' ও 'আল-ফাত্‌ওয়া আল হিন্দীয়াহ' বা 'ফাত্‌ওয়া-ই-আলমগীরী' পড়লে দেখা যায় যে, এগুলোর অনেক মাস্‌আলাই আল্লামা মুল্লাজীউনের মতের সাথে মিলে যায়।[৬৯] হয়তো তিনি এ তথ্য পরিবেশন করেছেন অথবা মুল্লাজীর ছাত্রদ্বয় আহ্‌মাদ গোপামুঈ ও ফাসীহুদ্দীন ফুল্‌ওয়ারী এ তথ্য পরিবেশন করেছেন; যা 'ফাত্‌ওয়া'র কিতাবে আজও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আর সকলেই একথা স্বীকার করে মুল্লাজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন যে, তাঁর এ দু'ছাত্র তাঁর কাছ থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।[৭০]

---

৬৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়িরাতু মা'আরিফল ইসলামিয়্যাহ্‌*, ৭ম খন্ড, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৭১, পৃ. ৬১০।

৬৮. মাওলানা জামীল আহ্‌মাদ, *কুতুল আখ্‌ইয়ার শারহ্‌ নূরিল আনওয়ার*, মাক্‌তাবাতুল বালাগ, ১ম খন্ড, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৮৯, পৃ. ২১৭।

৬৯. যেমন- কতল, জিহাদ, যুদ্ধের জন্য বের হওয়া, সালাতে ফার্সিতে কেরাত পড়া, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ ও তালাক ইত্যাদি মাস্‌আলা।

৭০. মুহাম্মদ আলী আল- নাজ্জার, *তাকরীবুত তাহযীব*, মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, মদীনা, সৌদি আরবঃ ১৩৮০ হি., পৃ. ৫৬০-৫৬১।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন উক্ত কিতাব সংকলন ও সম্পাদনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাই যতোদিন এ 'ফাত্ওয়া'র কিতাবটি বিশ্বের বুকে টিকে থাকবে, ততোদিন তাঁদের নামের পাশে আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।[৭১]

(৪) আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের রচনাবলী এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্যঃ

ড. সালিম কে, দাওয়ায়ীর মতে- আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অসংখ্য রচনাবলী ছিলো।[৭২] যা কালের গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছে। আর হারিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা তৎকালীন সময়ে ছাপাখানা বা কাগজের কল ছিলো না। হাতেই লিখতে হতো, হাত দ্বারাই কাগজ তৈরী করা হতো।

এইতো সেদিনই ভারতীয় উপমহাদেশে ছাপাখানার কল এলো। ইংরেজরাই সর্বপ্রথম ছাপাখানার কল ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তারা একটি মাত্র ছাপাখানা স্থাপন করে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলাতে।[৭৩] কাগজের কল আসে আরও পরে। কেননা, কাগজের কল সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডেই আবিষ্কার হয় ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে।[৭৪]

তখনকার দিনে এতো বই-পত্র ছিলো না, এতো লাইব্রেরী ও ছিলো না। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে তখনকার মানুষ লাইব্রেরী সম্পর্কে কতোটা অজ্ঞ ছিলো। সারা বাংলায় সর্বপ্রথম একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হয় সুদূর বরিশালে ১৮৫৪ সালে।[৭৫] তাই, সে কালে বই-পত্র সংরক্ষণ করা সম্ভবপর ছিলো না। আর এ কারণেই হয়তো আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অনেক লেখা আমাদের পর্যন্ত আর পৌঁছেনি। তারপর জলবায়ুর ব্যাপারটি তো আছেই; যে কারণে হাতের উৎপাদিত কাগজের লেখা বেশীদিন টিকতো ও না।

---

[৭১]. ফকীর মুহাম্মদ, *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ্*, ৩য় সংস্করণ, লক্ষ্ণৌ, ভারতঃ ১৩২৪ হি./১৯০৬ খ্রি., পৃ. ৫৫৪।

[৭২]. ড. সালিম কে, দাওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাসসিরীন আওর উন্‌কী আরবী তাফসীরেঁ*, মাকতুবাতু জামেয়া লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, নতুন দিল্লী, ভারতঃ ১৯৭৩, পৃ. ২৩৪। (এই গবেষণার উপর মুসলিম আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে 'ডক্টোরেট ডিগ্রী' দেয়া হয়।)

[৭৩]. মুহাম্মদ সিদ্দীক খান, *বাংলা মুদ্রন ও প্রকাশনের গোড়ার কথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৩৭১ হি., পৃ. ২১।

[৭৪]. ড. গোলাম সাক্‌লায়েন, *একের ভেতর পাঁচ*, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিমিটেড, ঢাকাঃ ১৯৮৫, পৃ. ১৮০।

[৭৫]. মোবাশ্বের আহ্‌মাদ, *বাংলা ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর প্রকাশিত প্রকাশনার গ্রন্থপঞ্জী*, থিসিস, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাঃ ১৯৮৫,পৃ. ১ (মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

ড. সালিম দাওয়ায়ীর কথা যে সত্য হতে পারে তার প্রমাণ 'তাফসীরে আহ্‌মাদী' ও 'নূরুল আনওয়ার' গ্রন্থ দু'টিই। কেননা এ দু'টি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রিত হয় বহু পরে। সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 'নূরুল আন্‌ওয়ার' ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে।[৭৬] অতঃপর এর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার পরই লেখকের অন্যান্য বইয়ের প্রতি প্রকাশক ও পাঠকদের ঝোঁক বেড়ে যায়। তারপর ১৮৪৬[৭৭]/১৮৪৭[৭৮] খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফসীরে আহ্‌মাদী'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের জীবদ্দশায় কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। যে বইটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তা-ও তাঁর মৃত্যুর ১০২ বছর পর। এরপর তাঁর অন্যান্য বইগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো কি-না, আজ অবধি তা জানা যায়নি। শুধুমাত্র উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমিত হয় যে, তাঁর অন্যান্য বইগুলোর ও পান্ডুলিপি ছিলো, যা কালের চক্রে হারিয়ে গেছে। তবে তার নামগুলো বইয়ের পাতায় বা জীবনী- লেখকদের খাতায় নাম হিসেবেই রয়ে গেছে। এ কারণেই হয়তো ঐতিহাসিক ও জীবনী-লেখকদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।[৭৯]

এছাড়াও আল্লামা মুল্লাজীউনের আরও কিছু পান্ডুলিপি রয়েছে, যা স্বীয় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা 'আমেথী' তে সংরক্ষিত রয়েছে। যার প্রথম ও শেষাংশের অনেক পৃষ্ঠাই নেই কিন্তু উপরে লেখা রয়েছে 'মুল্লাজীউনের পান্ডুলিপি' বলে। তবে এগুলো যে মুল্লাজীর নিজস্ব পান্ডুলিপি, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা এগুলোর সাথে মুল্লাজীউনের হাতে লেখা সংযোজিত রয়েছে; যার নীচে অপরের হাতের লেখায় এ ভাষ্যটি লেখা রয়েছেঃ

"মাখ্‌তুতাতে উস্তাদে আলাম্‌গীর মুল্লাজীউন রাহিমাহুল্লাহ্,"[৮০]

অনুরূপভাবে মুল্লাজীর সুযোগ্য পুত্র আব্দুল কাদিরেরও বেশ কিছু পান্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। সেখানে এখনও 'মুল্লা পাড়া' নামে একটি পাড়া রয়েছে। তাঁরা না-কি নিজেদেরকে

---

৭৬. *ফাহ্‌রাস্‌'ল তাইমুরিয়্যাহ্*, ১ম খন্ড, বাগদাদ, ইরাকঃ (তা. বি.) পৃ. ১২৮।
৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩।
৭৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ৪৬।
৭৯. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি আহওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।
৮০. ইউসুফ আল্‌ইয়ান সারকীস, *মু'জামু'ল মাতবূ'আতুল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আররাবা*, ২য় খন্ড, সারকীস মুদ্রণালয় মিশরঃ ১৯২৮, পৃ. ১১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুল্লাজীউনের বংশোদ্ভূত বলে দাবী করেন। তাঁদের মধ্যে এখনও অনেক লোক দ্বীনদার-পরহেযগার-মুত্তাকী ও সরলমনা সূফী- সাধক রয়েছেন, যা 'আব্দুল্লাহ'[৮১] তার পত্রে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি এ কথাটিও লিখে দিয়েছেনঃ

"কুল্লু শাইয়ীন ইয়ারজী'উ ইলা আস্‌লিহি"

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই তার মূলের দিকে ধাবিত হয়।

জানিনা এ প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে তিনি মুল্লাজীউন ও তাঁর বংশের সরলতা ও স্মৃতিশক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন কি-না।

অতঃপর তিনি এ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি 'নূরুল আন্‌ওয়ার' গ্রন্থটি তাঁর বংশের দাবীদারদের তিনজন মেধাবী লোককে পড়তে দেন। তাঁরা এর কিয়দংশ পড়ে নাকি হুবহু বলে দিতে পারেন। শেষে আব্দুর রহমান নামে ৯৭ বছরের এক বৃদ্ধ এ কিতাবের কয়েক লাইন পড়েই নাকি কেঁদে ফেলেন আর বলেনঃ

"হায়! এটাতো আমার পরদাদার দাদা মুল্লাজীউনের লেখা।
আমাদের মাঝে আজ সেরূপ 'মুল্লা' নেই, যাঁরা ঐরূপ কিছু লিখে
বিশ্বকে চমক লাগিয়ে দেবে। কবে আবার সেরূপ মুল্লার জন্ম
হবে আমাদের বংশের মাঝে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।"[৮২]

অতঃপর তিনি কুরআনুল্‌ কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন-

"ওয়া তু'ইযযু মান তাশাউ' ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ'
বিইয়াদিকাল খায়রু, ইন্নাকা 'আলা কুল্লি শাইয়ীন কাদীর।"[৮৩]

(আল কুরআন)

---

[৮১]. এ তথ্যটি চিঠির মাধ্যমে দিয়েছেন 'আব্দুল্লাহ' নামক জনৈক একজন ব্যক্তি। যিনি আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের মাদ্রাসার হাদীস শেষ বর্ষের একজন ছাত্র।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ 'মাদ্রাসা-ই-উস্তাদ আলামগীর মুল্লাজীউন', আমেথী (সুলতানপুর), জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

[৮২]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, ২য় সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খন্ড, হায়দারাবাদ, হিন্দ (ভারত)ঃ ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ৭৫-৭৬।

[৮৩]. আল্‌-কুরআন, *সূরা আলে-ইমরান*, আয়াত নং-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ- আল্লাহ্ যখন যাকে চান মর্যাদাশীল বানান, আবার যখন যাকে চান লাঞ্ছিত করেন। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর উপর মহাশক্তিমান।

অতএব আব্দুর রহমান নামক বৃদ্ধের দাবী সত্য হতে পারে। কেননা তাঁর জন্মকাল ও মুল্লাজীউনের মৃত্যুকালের মধ্যে পার্থক্য দাঁড়ায় (১৯৯৫-৯৭=১৮৯৮-১৭১৭=১৮১) একশত একাশি বছর, যা স্বাভাবিক। মাত্র দু'-তিন পুরুষ পূর্বে। (ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস্ সাওয়াব) অর্থাৎ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন।

সুতরাং আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অনেক কিছুই আমাদের নিকট অজ্ঞাত। অতএব, ড. সালিম কে, দওয়ায়ীর[৮৪] অভিমত সত্য বলে বিবেচিত।[৮৫]

আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিম্নে আমরা আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অবদানস্বরূপ যে সমস্ত মহামূল্যবান ও কালজয়ী গ্রন্থাবলী তোহ্ফা হিসেবে গোটা বিশ্ববাসীর সামনে রেখে গেছেন; তার একটি তালিকা ও অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছিঃ

(১) আত্-তাফ্সীরাতুল্ আহমাদিয়্যাহ্ ফী বায়ানিল আয়াতি'শ্ শারইয়্যাহ্ মা'আ তা'রিফাতিল্ মাসায়িল্ আল্-ফিকহিয়্যাহ্ঃ

যা 'তাফ্সীরে আহ্মাদী' নামে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। এটি আরবী ভাষায় লিখিত। যা ভারতীয় উপমহাদেশে আহ্কাম (বিধি-বিধান) সম্পর্কিত প্রথম[৮৬] এবং তাফসীর হিসেবে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে।[৮৭] এটি আল্লাম্মা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ রচনাকর্ম।

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন 'তাফ্সীরে আহ্মাদী' এর ভূমিকায় বলেছেনঃ

"আমি বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছিলাম যে, ইমাম গাযালী (রহ.) ৫০০ আয়াতকে একত্রিত করে একখানি গ্রন্থ লিখেছেন; যা থেকে শরীয়াতের আহ্কাম (বিধি-বিধান) উদ্ঘাটন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আমি এর কোনো সন্ধান পেলাম না; জানতে পারলাম, তিনি আসলে এ

[৮৪]. ড. সালিম কে, দাওয়ায়ী, অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, মুসলিম আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়।
[৮৫]. তথ্য সংগ্রহে সাহায্য নেয়া হয়েছেঃ ভারতীয় হাইকমিশন, ঢাকা, বাংলাদেশঃ এবং মাওলানা মুফ্তী আখ্তারুজ্জামান (সাহারানপুরী), মুহাদ্দিস, ষোল মাইলমাদ্রাসা, যশোর, বাংলাদেশ।
[৮৬]. *The Islamic University Studies*, Vol-i, (Published by the Registrar), Islamic University, Kushtia, Bangladesh: 1991, p. 44.
[৮৭]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২ তম খন্ড, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করেননি। তাই তখন আমি নিজেই এটা লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আমার বয়স ১৬/১৭ বছর। তখন আমি নিজ শহর 'আমেথী' তে 'হুস্‌সামী' কিতাব পড়ি। এ বছর থেকে কুরআনের আয়াত এক এক করে পড়ি এবং এর উপর গবেষণা করে শরীয়াতের মাস্‌আলা উদ্‌ঘাটন করতে থাকি। আর যখন আমার বয়স ২১/২২ বছর, তখন আমি 'শর্‌হে মাতালে' কিতাব (নিজ শহর আমেথীতে) পড়ি। ঐ সময়ই এ কিতাব আমার লেখা হয়ে যায়।"[৮৮]

সুতরাং আল্লামা মুল্লাজীউনের এ তাফসীরখানা ছাত্রাবস্থায় মাত্র পাঁচ বছরে (১০৬৪-৬৯হিঃ/১৬৫৩-৫৮ খ্রিঃ) সংকলিত হয়েছে।[৮৯]

ফিক্‌হ (ইসলামী আইন শাস্ত্র) ও উসূলে তাফসীর (তাফসীর রচনার মূলনীতি) এর দৃষ্টিকোণ থেকে 'তাফসীরে আহ্‌মাদী' এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। প্রথমে মুল্লাজীউন মাস্‌আলা বা বিধানের নাম লিখেছেন। তারপর সেই সংক্রান্ত আয়াত এনেছেন। অতঃপর শানে নুযুল (আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট) বর্ণনা করেছেন। তারপর সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা থাকলে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৯০]

এরপর শব্দ ও অভিধানের (লুগাত) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতঃ ইমামদের মায্‌হাব সমূহ উল্লেখ করে হানাফী মায্‌হাব যে যুক্তিগ্রাহ্য, সর্বদিক দিয়ে শরীয়াত সম্মত ও সহজ-সাধ্য; তা প্রমাণ করেছেন। মাঝে মাঝে তারকীব (বাক্য বিশ্লেষণ), এ'রাব (যের, যবর, পেশ ইত্যাদি) ও নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। পরিশেষে কোন্ কোন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি টেনেছেন, তা-ও উল্লেখ করেছেন।[৯১]

তাফ্‌সীরখানার প্রথমে তিনি ভূমিকা টেনেছেন। তাতে আল্লাহ, রাসূলের প্রশংসান্তে কোন্ কোন্ কিতাবের সাহায্য নিয়েছেন তা উল্লেখ করতঃ সম্রাট মুহীউদ্দীন আওরঙ্গজেবের ভূঁয়সী প্রশংসা করে ভূমিকার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এতে মনে হয় উহা তাঁর নামে উৎসর্গিত।

---

[৮৮]. শায়খ আহমাদ মুল্লাজীউন, *আত্‌ তাফ্‌সীরাতুল্ আহ্‌মাদিয়্যাহ্‌*, (টীকাকার (মুহাশ্‌শী) মাওলানা রাহীম বখ্‌শ), মাতবা'আ কারিমিয়্যাহ্‌, দেওবন্দ, বোম্বে, ভারতঃ ১৩২৭ হি./ ১৯০৬ খ্রি. পৃ. ৭৪৭।

[৮৯]. Dr. M.M. Rahman, *An Introduction of Al-Maturidi's Tawilat*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka: 1981, p. 90.

[৯০]. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী অনূদিত, *তাফ্‌সীরে আহ্‌কামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭।

[৯১]. মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল আহাদ আল কাসেমী ও মাওলানা উবাঈদুল হক জালালবাদী সংকলিত, *নূরুল আন্‌ওয়ার মা'আ আযহারুল আয্‌হার*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯৭৬, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর সূরা ফাতিহাতে যে সমস্ত কোরানের সমন্বয় ঘটেছে, তা উল্লেখ করেছেন। তবে এটা বিধানমুক্ত। তারপর 'সূরা বাক্বারা' এর উল্লেখ করে বলেছেন, এতে বহুবিধ বিধানের সমাহার ঘটেছে। এরপর এক এক করে বিধান (মাস্‌আলা) উদ্‌ঘাটন করেছেন। এভাবে সূরা ফাতিহা হতে সূরা কাউসার পর্যন্ত গিয়েছেন। আর কোন্ কোন সূরা বিধানমুক্ত তাও বলে দিয়েছেন।[৯২]

গ্রন্থের সমাপনীতে আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁর নিজের নাম, বংশ, মাযহাব, কোন্ সময় কিতাব লেখা শুরু করেছেন, কোন সময় শেষ করেছেন এবং কোন্ সময় দ্বিতীয়বার সংশোধনী দেখেছেন; তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। গ্রন্থের শেষে প্রার্থনা বাক্যটি ছিলো নিম্নরূপঃ

> "আল্-হামদু লিল্লাহি 'আলা নাওয়ালিহ্, ওয়াস্ সালাতু
> ওয়াস্ সালামু 'আলা রাসূলিহ্, ওয়ালিহি ওয়া আস্‌হাবিহি
> আজ্‌মা'য়ীন, বি-রাহ্‌মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।"[৯৩]

(২) নূরুল আন্‌ওয়ার ফী শারহীল্ মানারঃ

এটাই গ্রন্থকার কর্তৃক তথা আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন কর্তৃক রাখা নাম।[৯৪] মাওলানা ইউসুফ আলইয়ান সারকীস এর নাম উল্লেখ করেছেন- 'নূরুল্ আনওয়ার ফী শারহীল আবসার'; যার ভাষা হুবহু 'নূরুল্ আন্‌ওয়ার' এর ভাষায় ন্যায়।[৯৫] যা 'কাশফুল আসরার শারহে 'আলাল মানার এর সাথে মুদ্রিত।[৯৬] এ কারণেই হয়তো 'মু'জামুল মুয়াল্লিফীন' গ্রন্থকার এটাকে ভিন্ন একটি সংকলনরূপে গণনা করেছেন।[৯৭]

---

[৯২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।
[৯৩]. ড. সালিম কে. দাওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাস্‌সিরীন আওর উন্‌কী আরবী তাফসীরেঁ,* ১ম প্রকাশ, মাক্‌তাবাতু জামিয়া লিমিটেড, নতুন দিল্লী, ভারতঃ ১৯৭৩, পৃ. ২৩৪-৩২৮।
[৯৪].মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, *কামরুল আকমার শারহে নূরুল্ আন্‌ওয়ার (আরবী),* মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৮৩, পৃ. ৫।
[৯৫]. *'মু'জামুল মাতবু'আতুল আরাবিয়্যাহ্'* গ্রন্থে ইউসুফ আলইয়ান সারকীস এ মতটি ব্যক্ত করেছেন।
[৯৬]. ইউসুফ আলইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবু'আতুল্ আরাবিয়্যাহ্,* ২য় খণ্ড, সারকীস মুদ্রণালয়, মিসরঃ ১৯২৮, পৃ. ১১৬৫।
[৯৭]. ওমর রেজা কাহ্‌হালাহ্, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ এটা একই গ্রন্থ, এবং এটি 'নূরুল আন্ওয়ার ফী শারহে মানারুল আন্ওয়ার' নামেও পরিচিত।[৯৮] প্রকৃতপক্ষে এগুলো 'নূরুল্ আন্ওয়ার ফী শারহীল্ মানার' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আল্লামা মুল্লাজীউন ঐগুলোর লেখক না। মূলতঃ 'নূরুল্ আন্ওয়ার' হলো 'আল-মানার' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আর ঐগুলো হলো 'নূরুল্ আন্ওয়ার' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলী।

এই কালজয়ী ও অমর গ্রন্থটি হিজরী একাদশ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ করা হয়।[৯৯] এটি লেখার উৎস ও সময়কাল সম্পর্কে লেখক আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন নিজেই উল্লেখ করেছেন যে-

"ইবনে আহ্মাদ আন্-নাসাফী (মৃঃ ৭১০ হিঃ) এর রচিত 'আল-মানার' গ্রন্থখানা 'উসূলে ফিক্হ' এর কিতাবগুলোর মধ্যে ভাষা ও বক্তব্যের দিক দিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত অথচ উপকারী এবং সূক্ষ্মদর্শিতা ও বাস্তবতার বোধগম্যের বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিলো; কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী কোনো ব্যাখ্যাকার এর কোনো স্বার্থক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেননি। আর যাঁরা এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছেন, তারাও ভুল ত্রুটি হতে মুক্ত থাকতে পারেননি। কেননা এদের কোনো কোনোটি অত্যধিক সংক্ষিপ্ত হওয়াতে উদ্দেশ্য অনুধাবনে অসুবিধাজনক হয়েছে। [যেমন, মূল গ্রন্থকার (নাসাফী) কর্তৃক শরাহ্ "কাশ্ফুল আসরার ফী শারহীল মানার।"] আবার কোনো কোনোটি অতি দীর্ঘ হওয়ার দরুন উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে বিরক্তিজনক হয়েছে।

তাই বহু পূর্বেই আমার মনে এই সংকল্পের উদয় হয়েছিলো যে, আমি এর (আল-মানার) এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করবো, যাতে এর সমস্ত জটিল মাস্আলাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। আর এর কঠিন -কঠিন আলোচনাগুলো সুস্পষ্ট ও সহজেই বোধগম্য হবে।

অথচ না কোনোরূপ অভিযোগ উত্থাপন ও খন্ডনের চেষ্টা করবো, আর না সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আলোচনার প্রয়াস পাবো; যা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারগণ হতে প্রকাশ পেয়েছ। কিন্তু নানাবিধ কাজের চাপ আর সময়ের স্বল্পতার দরুন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এটা লেখার সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি।[১০০]

---

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৯৯. এ কালজয়ী গ্রন্থটি মুল্লাজীউন মাত্র ৭৩ দিনের মধ্যে সংকলন করেন। তাঁর কাছে কোনো তথ্যপঞ্জীও তখন ছিলো না। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮)।

১০০. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে যখন আমি পবিত্র মক্কা-মুয়াজ্জ্মাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলাম, তখন হেরেম শরীফ ও মসজিদে নববী শরীফের আমার কতিপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রগণ উল্লেখিত কিতাবখানা (আল্-মানার) আমার নিকট পাঠ করে শোনালেন। তাঁরা আমাকে এর একটি শরাহ্ (ব্যাখ্যা-গ্রন্থ) লেখার মহৎ কাজটি সম্পাদনের অনুরোধ জানালেন। এমনকি আমাকে এমনভাবে বাধ্য করলেন যে, এ ব্যাপারে আমার কোনো ওজর-আপত্তিই তাঁরা শুনলেন না।

সুতরাং সে অবস্থায়ই কোনোরূপ সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে স্মৃতিপটে যা ছিলো তা দিয়েই তাঁদের প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্খিত কাজটি সম্পাদনে মনোনিবেশ করলাম। আর আমি এর নাম রাখলাম- 'নূরুল্-আনওয়ার ফী শারহীল মানার' হিসেবে।"[১০১]

উল্লেখ্য যে, এটা ছিলো আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের মক্কা-মদীনায় প্রথম সফর। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৫৮ বছর। এ কিতাবটি লেখা শুরু করেছিলেন (১১০৫ হিঃ/১৬৯৩ খ্রিঃ) সনের রবিউল আউয়াল মাসে, আর শেষ করেছিলেন ৭ই জুমাদিউল্ উলায়। সময় লেগেছিলো মাত্র ২ মাস ৭ দিন মতান্তরে ১২ দিন।[১০২] যা বিস্ময়করও বটে। যদিও এটি (নূরুল্ আনওয়ার) একটি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ (শরাহ্); তথাপি তা স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বে ভাস্বর।

আলোচ্য গ্রন্থটির নাম কেনো 'নূরুল্- আন্ওয়ার' রাখা হয়েছে, তা সহজেই বোধগম্য। 'নূর' আরবী ভাষার একবচনের শব্দ যার অর্থ- আলো। আর 'আন্ওয়ার' শব্দটিও অনুরূপ 'নূর' শব্দের বহুবচন। অর্থ হলো- আলো সমূহ। এখন 'নূরুল্-আন্ওয়ার' এর একত্রে অর্থ দাঁড়ায়- 'আলো সমূহের আলো' (Light of Lights)।[১০৩]

অর্থাৎ- ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি গুলোকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর সেই শাস্ত্রের একটি আলোক রশ্মি হলো এই 'নূরুল্-আনওয়ার' গ্রন্থটি। তাই এদিক থেকে বিচার

---

১০১. (i) মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল আহাদ আল কাসেমী ও মাওলানা উবাঈদুল হক আল্ জালালাবাদী সংকলিত, *নূরুল্ আন্ওয়ার মা'আ আয্হারুল্ আয্হার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। (ii) খাদিম হুসাইন, *সুবহ্-ই-বাহার* (উর্দু পাণ্ডুলিপি), পৃ. ২১০।

১০২.সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়িরাতু মা'আরিফল ইস্লামিয়্যাহ্*, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ৭ম খন্ড, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৭১, পৃ. ৬০৬।

১০৩. মাওলানা সাইয়্যিদ আব্দুল আহাদ কাসেমী ও মাওলানা উবাঈদুল হক জালালবাদী সংকলিত, *নূরুল আন্ওয়ার মা'আ আয্হারুল আয্হার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য গ্রন্থটির (নূরুল- আন্ওয়ার) নামকরণ যথার্থ ও স্বার্থক হয়েছে।[১০৪]

'নূরুল্-আন্ওয়ার' মূল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লিখিত। পাঠকগণের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য তিনি প্রথমে শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন। তারপর কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের কথা- কাজ ও সাল্ফে- সালেহীন্দের মতামত উপস্থাপন করেছেন। মূল গ্রন্থের (আল্-মানার) সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছেন। ভাষার মাধুর্যতা ও অলংকারিত্বও প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট।[১০৫]

প্রথমে মুল্লাজী 'আল্-মানার' এর ভাষ্য লিখেছেন। তারপর কোনো উহ্য প্রশ্ন থাকলে, তা তুলে ধরেছেন। এরপর কোন্ ইমাম কী বলেছেন, তা স্পষ্ট করেছেন। অতঃপর এক এক ইমামের জবাব হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে দিয়েছেন। ইমাম তাহাভীকে যদি হানাফী মাযহাবের 'Advocate' বলা যায়, তাহলে মুল্লাজীউনকেও 'উসূলে-ফিক্হ' এর 'Advocate' বলা অত্যুক্তি হবে না। আল্লামা ইমাম যামাখ্শারী যেমন প্রশ্নোত্তর আকারে 'তাফসীরে কাশ্শাফ্' লিখে জটিল বিষয়কে সহজ করে দিয়েছেন, মুল্লাজীও তেমনি "উসূল-নীতির দূর্বোধ্য বিষয়গুলোকে বোধগম্য করে সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন।[১০৬]

গ্রন্থ্ শুরু করেছেন- "আল্-হাম্দু লিল্লাহ্ আল্লাযী জা'আলা উসূলাল্ ফিক্হী মাব্নিয়ান্ লিশ্ শারায়ি", আর শেষ করেছেন- "রাব্বানাফ্তাহ্ বায়নানা ওয়া বায়না কাওমিনা বিল-হাক্কে ওয়া আন্তা খাইরু'ল ফাতিহীন" বাক্য দ্বারা।[১০৭]

আর 'নূরুল্-আন্ওয়ার' গ্রন্থটিতে 'ইল্মে উসূলে ফিক্হ' এর আলোচ্য বিষয় দলীল চতুষ্টয় তথা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (সা.), ইজ্মায়ে উম্মাত ও কিয়াস এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

(৩) মানাকিবুল আওলিয়াঃ

এটি সূফী ও মাশাইখ্দের জীবনীমূলক একটি গ্রন্থ্। আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের বৃদ্ধ বয়সে নিজ শহর 'আমেথী' তে এটি সংকলিত। আলোচ্য গ্রন্থটিতে মুল্লাজীর পুত্র 'আব্দুল কাদির' এর একটি সংযোজন ও একটি বিস্তারিত আত্ম-জীবনীমূলক বর্ণনা রয়েছে। এটি সম্ভবতঃ

---

১০৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, *কামরুল্ আক্রাম শারহু নূরিল আন্ওয়ার (আরবী)*, মাক্তাবাতে থানভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৮৩, পৃ. ৩১৮-৩২০।

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬২।

১০৭. মাওলানা রফীক আহ্মাদ, *ইরশাদুত্তালিবীন্ ফী আহ্ওয়ালিল মুসান্নিফীন*, আশ্রাফিয়া লাইব্রেরী, পটিয়া, চট্টগ্রামঃ ১৩৯৯ হিজরী, পৃ. ৫৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষায় লিখিত। কেননা বৃদ্ধ বয়সে আরবী ভাষা শায়খ মুল্লাজীউনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাছাড়া এ গ্রন্থটির নামকরণের ভেতরও আরবী সম্বন্ধপদ রয়েছে। এ থেকে অনুমান সত্য হতে পারে।[১০৮]

(৪) আদাব-ই-আহ্মাদীঃ

এটি সূফীবাদ (Sufism) ও সূফী-সাধকদের 'খান্কাহ্' এর উপর লিখিত আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অনন্য একটি রচনা। আর এ গ্রন্থটিই শায়খ মুল্লাজীউনের সর্বপ্রথম সংকলন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মানাকিবুল আওলিয়া' শীর্ষক রচনায় বলেনঃ

> "আমার বয়স যখন তের বছর, তখন আমার পিতা মারা যান। তখনই আমি এই গ্রন্থখানা সংকলন করি।"[১০৯]

এটি ফার্সী ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থ। এর নামকরণের মধ্যে ফার্সীর সম্বন্ধযুক্ত 'ইয়া' বর্ণটি রয়েছে। যা ফার্সী ভাষার দিকে ইঙ্গিত করে।[১১০]

(৫) খুতাবুল জুমা'-ই ওয়াল্ আ'ইয়াদঃ

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন রচিত এ গ্রন্থটিতে 'সালাতুল জুম্'আ' ও ঈদ সমূহের 'খুত্বাহ্' গ্রথিত হয়েছে।এটি মুল্লাজীর তরুন বয়সে লিখিত একটি কিতাব। আর নিঃসন্দেহে এটি আরবী ভাষাতেই লিখিত একটি কিতাব হবে। কেননা, 'খুত্বাহ্' আরবী ভাষায় হওয়ার স্বপক্ষে আল্লামা মুল্লাজীউন তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফসীরে আহ্মাদী' তে দলীলভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন এবং এ ব্যাপারে নিজস্ব মতামত ও ব্যক্ত করেছেন।[১১১]

(৬) মুজ্দাওয়াজ্হ (জোড় ছন্দ প্রকরণ) ঃ[১১২]

শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন আল্লামা রুমীর 'মস্নভী শরীফ' এর অনুকরণে পঁচিশ হাজার শ্লোকে এ কিতাবটি রচনা করেন। এটি ফার্সী ভাষায় লিখিত অনন্য সাধারণ একটি কিতাব।[১১৩] যা বিশ্বমুস্লিমের হৃদয়ের মাঝে আজো ছন্দের ঝংকার সৃষ্টি করে।

---

১০৮. মাওলানা শায়খ আহ্মাদ, *তান্যীমুল মাখ্যুন*, হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রামঃ ১৪১৪ হিজরী, পৃ. ২০৭।

১০৯. *The Islamic University Studies*, Vol-i, (Published by the Registrar), Islamic University, Kushtia, Bangladesh: 1991, p. 87.

১১০. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্রুল মুহাসসিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২।

১১১. আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *আত্-তাফ্সীরাতুল আহ্মাদিয়্যাহ*, (প্রকাশক আব্দুল করীম), মাত্বা'আ কারীমিয়্যাহ, দেওবন্দ, বোম্বে, ভারতঃ ১৩২৭ হি./১৯০৬ খ্রি. পৃ. ৭৪০।

১১২. ইব্রাহীম মুস্তফা ও মুহাম্মদ আলী আল-নাজ্জার কর্তৃক সংকলিত, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, মাজমাউল লুগাতুল আরাবিয়্যাহ, ইস্তাম্বুল, তুর্কীঃ ১৯৮০, পৃ. ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) দেওয়ানে শে'র (কবিতা গুচ্ছ)ঃ[১১৪]

আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন পারস্য কবি হাফিজের দেওয়ানের ন্যায় এ দেওয়ানটি রচনা করেন। যা পাঁচ হাজার শ্লোক বিশিষ্ট, ফার্সী ভাষায় লিখিত অনন্য একটি কিতাব।[১১৫]

(৮) "আস্‌-সাওয়ানিহ্‌" জামী এর "আল্‌লাওয়াইহ্‌"ঃ

"আস্‌-সাওয়ানিহ্‌" জামী এর "আল-লাওয়াইহ্‌" কবিতা সমূহ (১১১২ হিঃ/ ১৭০০ খ্রিঃ) সনে হিজাযে দ্বিতীয় সফরকালে লিখিত। এটি সম্ভবতঃ ফার্সীতে লেখা একটি কিতাব। কেননা জামী'টা ফার্সী ভাষায় লিখিত।

(৯) ক্বাসিদা (সাত চরণের পঙ্‌ক্তি/কবিতামালা)ঃ

আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত 'মানাকিবুল আওলিয়া' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেনঃ

> "যখন আমি হিজায ভ্রমণ করি, তখন আমি 'ক্বাসিদায়ে বুর্‌দা" এর ন্যায় 'ক্বাসিদা' লিখি। তাতে দু'শত বিশটি শ্লোক ছিলো। অতঃপর যখন আমি সুরাট বন্দরে পৌঁছি, তখন ঐ ক্বাসিদা এর ব্যাখ্যা লিখি। দ্বিতীয়বার আমার ইচ্ছে হলে আমি ২৯টি কবিতা পুনরায় লিখলাম।"

সুতরাং এ কিতাবে ব্যাখ্যাসহ মোট শ্লোকের পরিমাণ ছিলো দু'শত উন-পঞ্চাশটি [২২০+২৯=২৪৯টি]। আর এখানে হিজায সফর বলতে প্রথম সফরই উদ্দেশ্য, যা পূর্বাপর ঘটনা

---

[১১৩]. এ দু'টি কাব্য যে ফার্সী ভাষায় লিখিত, তা মুল্লাজী নিজেই বলেছেন। কেননা তাঁর কথার মাঝেই এটির উল্লেখ আছে, যা ফার্সীর দিকে ইঙ্গিত করে। আর আল্লামা রুমীর *'মস্‌নভী'* ও হাফীজের *'দেওয়ান'* ফার্সী ভাষায় লিখিত। তাছাড়া নামকরণের ভেতরই ফার্সী ভাষার গন্ধ রয়েছে।

[১১৪]. এ দু'টি (৭ ও ৮ নং রচনাবলী) কিতাবের ব্যাপারে তিনি *'মানাকিবুল আওলিয়া'* গ্রন্থে বলেছেন- আমার ৪০ বছর বয়সে আমি দিল্লী ও আজমীরে যাই। ঐ সময় আমাকে চরম আগ্রহ পেয়ে বসলে আমি এ দু'টি কাব্য রচনা করে ফেলি। সুতরাং এ দু'টি কাব্য তাঁর ৪০ বছর বয়সের পরে লেখা। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯)।

[১১৫]. খাদিম হুসাইন, *তারীখ কাসাবা-ই- আমেথী,* নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্মৌ, ভারতঃ ১৯৭৮, পৃ. ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহ্ থেকে বোঝা যায়।[১১৬] এটি আরবী ভাষায় লিখিত একটি কিতাব, যা 'নুজহাতুল খাওয়াতিরে' স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।[১১৭]

(১০) আল্-সুওয়ালাতু আল্- আহ্মাদিয়্যাহ্ ফী রাদ্দিল মালাহিদাহ্ঃ

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন এ কিতাবটি নাস্তিক্যবাদের জবাবে লেখেন। এটি আরবী ভাষায় লিখিত অসাধারণ একটি কিতাব, যাতে নাস্তিক্যবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।[১১৮]

(১১) আশ্রাকুল আব্সার ফী তাখ্রীজে আহাদীসে নূরিল্ আনওয়ারঃ

আলোচ্য গ্রন্থখানা আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন- শায়খ মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামানের জন্য সংকলন করেন। যা ১২৮৮ হিজরী সনে বোম্বে থেকে মুদ্রিত হয়।[১১৯]

(১২) নূরুল আন্ওয়ার ফী শারহীল্ আব্সারঃ [১২০]

---

[১১৬]. মুল্লাজীর কথায় মনে হয় এগুলো (৬ থেকে ৯নং রচনাবলী) তাঁর স্বতন্ত্র রচনাবলী ছিলো। যদিও অনেক ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকগণই তা স্বীকার করেননি। এর কারণ এই হতে পারে যে, এগুলো মূলতঃ পাণ্ডুলিপি ছিলো, যা অন্য বইয়ের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়। অথবা এগুলো ততো সমাদৃত হয়নি। ফলে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছে।

[১১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

[১১৮]. ওমর রেজা কাহ্হালাহ্, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২২৪।

[১১৯]. আযাদ বিলগ্রামী, *সুব্হাতুল্ মারজান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

[১২০]. রচনা নম্বর ১১ এবং ১২ কে যদিও *'মু'জামুল মু'আল্লিফীন'* গ্রন্থকার ওমর রেজা কাহ্হালা এবং *'মু'জামুল-মাতবু'আতু'ল আরাবিয়্যাহ্'* গ্রন্থকার ইউসুফ আলইয়ান সারকীস ভিন্ন ভিন্ন দু'টি রচনা বলে উল্লেখ করেছেন; মূলতঃ এটি 'নূরুল আন্ওয়ার' এর শরাহ (ব্যাখ্যা) গ্রন্থ। ভারতবর্ষের কোনো লেখকই বলেননি যে, এ দু'টি মুল্লাজীউনের লিখিত গ্রন্থ। প্রবাদে আছে- *'ঘরের মালিক ঘরের খবর বেশী জানে'*। সে হিসেবে তাঁরা বড় লেখক হওয়া সত্ত্বেও ওলামাদের কথাই বেশী প্রাধান্য পাবে। (মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল আহাদ কাসেমী ও মাওলানা উবাঈদুল হক জালালাবাদী সংকলিত, *নূরুল-আনওয়ার মা'আ আযহারুল আয্হার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) আরবী বর্ণমালাঃ দাল, *মাতিন আওর শারিহ কে মুখতাসার হালাত*। প্রবাদটি হলোঃ *'সাহিবু'ল্ বায়তে আদরা বিমা ফীহ্'*।)

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, ইউসুফ আল্ইয়ান সারকীস *'আশরাকুল আব্সার ফী তাখরীজে আহাদীসে নূরিল আন্ওয়ার'* রচনাকে শুধু তাঁর রচনাই বলেননি, বরং তাঁর রচনাবলীর এক নম্বরে রেখেছেন। যাতে মনে হয়, এটিই তাঁর রচনাবলীর মধ্যে খ্যাতিমান। আসলেও তাই, যদি এটি *'নূরুল-আন্ওয়ার'* এর শরাহ্ (ব্যাখ্যা) গ্রন্থ হয়। কেননা এ গ্রন্থটিই তাঁর সুনাম আজ অবধি ছড়িয়ে আসছে এবং পূনঃ পূনঃ মুদ্রিত হচ্ছে।

তারপর তিনি আর ও বলেছেন যে, এ কিতাবটি তিনি (মুল্লাজী) শায়খ ওয়াহীদুজ্জামানের জন্য সংকলন করেন। যাতে মনে হয় ওয়াহীদুজ্জামান তাঁর কোনো উস্তাদ ছিলো বা প্রিয় ব্যক্তি ছিলো; যার জন্যে তিনি এ সংকলনটি লেখেন বা উৎসর্গ করেন।

কিন্তু ইতিহাস খুঁজলে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, 'ওয়াহীদুজ্জামান' নামে তাঁর কোনো উস্তাদ বা ছাত্র ছিলো। মূলতঃ প্রমাদটি ঘটেছে হয়তো মুদ্রণজনিত কারণে, নতুবা না বোঝার কারণে। হয়তো 'আল্লাফাহু লিশ্ শায়খে ওয়াহীদুজ্জামান' না হয়ে হবে 'আল্লাফাহু আশ্ শায়খু ওয়াহীদুজ্জামান।' আর হবেও তাই। কেননা ওয়াহীদুজ্জামান নামে একব্যক্তি পার্শ্ব-টীকাসহ *'নূরুল-আন্ওয়ার'* এর একটি শরাহ্ (ব্যাখ্যা) লেখেন, যা ১২৮৮ হিজরী সনে বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়। কলমের খোঁচায় অথবা মুদ্রণের ঘনত্বে 'আলিফ' টা 'লাম' এর সাথে লেগে যাওয়ায় 'দ্বিত্ব লাম' হয়ে গিয়েছে। সুতরাং 'নূরুল-আন্ওয়ার' হলো মূল গ্রন্থ, তার পূর্বাংশ হলো ভাষ্য-গ্রন্থ আর ওয়াহীদুজ্জামান হলেন ভাষ্যকার।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) আনওয়ারুল ফুরকান ঃ[১২১]

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন কর্তৃক লিখিত এ কিতাবটি কোন্ ভাষায় রচিত ছিলো, তা জানা যায়নি। তবে আলোচ্য কিতাবটির নামকরণ দেখে মনে হয়, এটি আরবী ভাষায় লিখিত ছিলো। কেননা আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এতে সম্বন্ধপদ বিদ্যমান।

(১৪) আস্-সাফ্রু (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)ঃ

আলোচ্য কিতাবটি আরবী ভাষায় লিখিত আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন কর্তৃক রচিত একটি বিখ্যাত পান্ডুলিপি। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা আজ অবধি একশত বিশ পর্যন্ত রয়েছে। শেষের দিকে পৃষ্ঠা ছেড়া। যা তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। এতে তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন। কোন্ কোন্ দেশ, কোন্ কোন্ শহর তিনি ভ্রমণ করেছেন; কোন্ দেশের জলবায়ু, আবহাওয়া, পরিবেশ, মাটি কিসের জন্য বিখ্যাত ও মানুষের স্বভাব কিরূপ ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে একটি ভ্রমণ-কাহিনীর মানচিত্র ও তিনি এঁকে গিয়েছেন।[১২২] অতএব, এ পান্ডুলিপিটি একটি 'ভৌগলিক গ্রন্থ' এর স্বীকৃতির দাবী রাখে। সুতরাং এ গ্রন্থের আলোকে আল্লামা মুল্লাজীউনকে একজন 'ভূগোলবিদ' ও বলা যেতে পারে।

আর ১২ নং রচনাটি যে ভিন্ন একটি বই না, তার বড় প্রমাণ-আল্লামা ইউসুফ আলইয়ান সারকীস নিজেই। কেননা তিনি তাঁর গ্রন্থে উহার ভাষ্য তুলে ধরেছেন, যা *নূরুল-আনওয়ার* এরই ভাষ্য। যেমন তিনি বলেনঃ

"আওওয়ালুহু আল-হাম্‌দু লিল্লাহ আল্লাযী জা'আলা উসূলিল্ ফিক্হে মাবনীউশ্ শারায়ে' ওয়াল আহকাম... ইলা আখির।"

১২১. সৈয়দ ফাইয়ায আলী সম্পাদিত, *তারীখ-এ-আদাবিয়াত-এ-মুসলমানান-এ-পাকিস্তান-ওয়া-হিন্দ*, ২য় খন্ড, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৭৭, পৃ. ৩২২-৩২৫।

১২২. পান্ডুলিপি দু'টি পাঠিয়েছেন আল্লামা মুল্লাজীউনের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার হাদীস শ্রেণীর (দাওরায়ে হাদীস) শেষ বর্ষের ছাত্র 'আব্দুল্লাহ'। তিনি মুফ্তি আখ্তারুজ্জামান (সাহারানপুরী) এর সহপাঠী ও বন্ধু। তিনিও সে মাদ্রাসায় কয়েকদিন লেখা-পড়া করেছেন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

(i) আব্দুল্লাহ্, মাদ্রাসা-ই-উস্তাদ-আলামগীর মুল্লাজীউন, আমেথী (সুলতানপুর), জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ, উত্তর-প্রদেশ, ভারত।

(ii) মাওলানা মুফ্তী আখতারুজ্জামান, মুহাদ্দিস, ষোলমাইল মাদ্রাসা, নড়াইল, যশোর, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) জিমাউল্ ইল্ম (জ্ঞান-পিপাসা)ঃ

এটি শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন রচিত আরবী ভাষায় লিখিত কবিতার একটি পাণ্ডুলিপি। এতে প্রায় ৪০টি কবিতা রয়েছে এবং কোনো কোনো কবিতার নামকরণের নীচে খুব সংক্ষেপে কী প্রসঙ্গে কবিতা লিখেছেন; সেটিও মুল্লাজীউন লিখে গিয়েছেন।[১২৩]

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের কাব্য প্রতিভা ঃ

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের কাব্য প্রতিভা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তড়িৎ যে কোন কবিতা তিনি রচনা করতে পারতেন। যার জাজ্জ্বল্যপ্রমাণ "আল-ক্বালব-সুন্দুকুল-আমানাহ" (হৃদয় আমানতের সিন্দুক),"ইলমুল মারিফা" (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) এবং "আল-আলিম ওয়াল-মালিক" (জ্ঞানী ও বাদশাহ) নামক এ তিনটি কবিতা। কেননা তাঁকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে তিনি কবিতার মাধ্যমে তাঁর উত্তর দিতেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর কাব্য প্রতিভা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাঁর "জিমাউল ইলম"[১২৪] পাণ্ডুলিপিটি থেকে একুশটি কবিতা অনুবাদসহ নিম্নে দেয়া হলো-

---

[১২৩]. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান বান্দুভী, *আশ্রাফুল-আন্ওয়ার-শারহে-উর্দু নূরুল- আন্ওয়ার*, মাক্তাবাতে থান্ভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৫৮, পৃ. ১, (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

[১২৪] আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিমাউল ইল্ম*, মাকতাবাতুল বালাগ, দেওবন্দ, ভারতঃ (তা. বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

একদা সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র বাহাদুর শাহ্ (১ম) মুল্লাজীউনকে তাঁর দাদা, পিতা ও চাচাদের মাঝে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এতে বাদশাহ্ অত্যন্ত খুশী হন এবং তাঁকে উপহারে ভূষিত করেন।

القلب صندوق الامانة

١) قلبنا صندوق لكم
وفيه أقوال منكم
٢) ولا أفتح بابه لكم
ولو جاء عذاب منكم
٣) لأنه أمانة منكم
ولا أخون معكم
٤) إن أفتح بابه لكم
زادت فتنة بينكم
٥) فالسكوت نجاة لى ولكم
ولاتفتحوا بابه لنجاتكم[১২৫]

হৃদয় আমানাতের সিন্দুক

১. হৃদয় মোদের সিন্দুক তোদের
বহু কথা রয়েছে তোদের।
২. খুলিবোনা দরজা
যদিও আসে সাজা।
৩. তোদের আমানত
করিবোনা খিয়ানত।
৪. যদি খুলি দ্বার
বেড়ে যাবে কলহের ঝড়।
৫. তাই চুপে মুক্তি সবার
খুলিওনা দরজা আবার।[১২৬]

---

[১২৫] আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
[১৩০] স্ব-কাব্যিক অনুবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

একদা তাঁকে 'ইলমে মারেফাত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেনঃ

علم المعرفة

١) كنز العلوم قرآننا

وفيه فضول ربنا

٢) بحر العلوم رسولنا

وفيه معرفة ربنا

٣) إن كنت عطاش معرفة ربنا

فاشرب عن قلب رسولنا

٤) إن كنت فتاش حقيقة ربنا

فابحث عن كتاب رسولنا

٥) القرآن مرأة ربنا

وفيه ظل ربنا

٦) القرآن كتاب رسولنا

وفيه خلق رسولنا

٧) القرآن كلام ربنا

وفيه تلألأ نور ربنا

٨) إذا قرأنا كلام ربنا

وفيه نرى معرفة ربنا

٩) هذا العلم من علوم ربنا

وصل إلينا من قلب رسولنا

١٠) إذا فنى نفسنا فى ربنا

فنرى الله أمامنا

Dhaka University Institutional Repository

١١) إذا صفى من الشرك قلبنا

فقرب الله إلينا

١٢) إذا سبحنا فى عشق ربنا

فلقى الله معنا

١٣) إذا سبحنا بدموع عيننا

فمسح الله عيننا

١٤) إذا تضرع نفسنا

فاستجاب الله لنا

١٥) إذا تفكرنا فى قرآننا

فنرى الله فى كل آياتنا

١٦) إذا تفكر نا فى خلق ربنا

فرجع البصر إلينا

١٧) إذا تفكرنا فى خالقنا

فسجد الله رؤوسنا[১২৭]

আধ্যাত্মিক জ্ঞান

১. জ্ঞানের খনি হল আমাদের কুরআন

আর তাতে আমাদের প্রভূর বহু অনুগ্রহ রয়েছে।

২. জ্ঞানের সাগর হলেন আমাদের নবী

আর তাঁর কাছে রয়েছে আমাদের প্রভূর মা'রিফাত

৩. যদি তুমি আমাদের প্রভূর মা'রিফাতের পিপাসু হও,

তাহলে আমাদের রাসূল (সাঃ) হৃদয় থেকে পান করে নাও।

---

[১২৭] আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্‌ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

*জ্ঞানতত্ত্ব বা প্রভূ পরিচিতি বিদ্যা, এটা সূফী সাধক বা পীরদের পরিভাষা।

Dhaka University Institutional Repository

৪. যদি তুমি আমাদের প্রভূর হাক্বীকত [১২৮](প্রকৃত তত্ত্ব)এর অন্বেষক হও, তাহলে আমাদের রাসূল (সাঃ) এর কিতাব (বই) থেকে অনুসন্ধান করে নাও।

৫. কুরআন হল আমাদের প্রভূর আয়না
আর তাতে আমাদের প্রভূর ছায়া রয়েছে।

৬. কুরআন হল আমাদের রাসূল (সাঃ)এর কিতাব, আর তাতে আমাদের রাসূল (সাঃ) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৭. কুরআন হল আমাদের প্রভূর বাণী
আর তাতে আমাদের প্রভূর নূর চমকায়

৮. যখন আমরা আমাদের প্রভূর বাণী পড়ি
তখন তাতে আমাদের প্রভূর মা'রিফাত দেখতে পাই।

৯. এ' জ্ঞান আমাদের প্রভূর জ্ঞান সমূহ থেকে[১২৯]
আর যা আমাদের কাছে পৌঁছায় আমাদের রাসূল (সাঃ) এর হৃদয় থেকে।

১০. যখন আমাদের আত্মা প্রভূর সন্ধানে নিঃশেষ হয়ে (চরম পর্যায়ে) যায়, তখন আল্লাহকে আমাদের সামনে দেখতে পাই।

১১. যখন আমাদের হৃদয় শির্ক (আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা) থেকে নির্মল হয়, তখন আল্লাহ্ আমাদের নিকটে আসেন।

১২. যখন প্রভূর মহব্বতে সন্তরন করি ,
তখন আল্লাহ্ আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৩. যখন চোখের জলে সন্তরন করি,
তখন আল্লাহ্ চোখ মুছিয়ে দেন।

১৪. যখন আত্ম-বিনয়ী হই,
তখন আল্লাহ্ উত্তর দেন।

১৫. যখন কুরআন নিয়ে চিন্তা করি,
তখন প্রতিটি আয়াতে আল্লাহকে দেখি,

১৬. যখন সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করি,
তখন দৃষ্টি ফিরে আসে।

১৭. যখন স্রষ্টা নিয়ে চিন্তা করি,
তখন মাথা নীচু হয়ে আসে।[১৩০]

---

[১২৮]. এটি সূফীদের একটি পরিভাষা। এ বিদ্যার মাধ্যমে প্রভূর রহস্য উদঘাটন করা যায়। এটি এমন এক প্রকার বিদ্যা, যা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে দেখা যায়।

[১২৯]. এটি বাহ্যিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। প্রভূর জন্যে সর্বস্ব হলেই প্রভূ ধরা দেয়। তাদের মতে যেখানে কাগজী বিদ্যার শেষ, সেখানে আধ্যাত্মিক বিদ্যার শুরু।

[১৩০]. মাথা নিচু অর্থ আল্লাহকে সিজদা করা। উহা রূপক অর্থে ব্যবহৃত। পরিভাষায়, সিজ্দা বলা হয়, মাথাকে মাটির সাথে লাগিয়ে আল্লাহর উপাসনা করা বা তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করা।

Dhaka University Institutional Repository

একদা কেউ তাঁকে বাদশাহ্ ও আলিমের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

العالم والمالك

١) ملك المالك محدودة
ومك العالم غير محدود

٢) المالك يحتاج إلى جيوش
والعالم لا يحتاج الى جيوش

٣) المالك يحرص على مال
والعالم لا يحرص على مال

٤) إذاجاء المال إلى المالك
ففرح كيف يأكله

٥) إذا جاء المال إلى العالم
فحزن كيف ينفقه

٦) إذا جاء المال فى يد المالك
فقال قد وجدت ربى

٧) إذا جاء المال فى يد العالم
فقال قد وجدت عدوّى

٨) جميع المال عند المالك أحب
ونفق المال عند العالم أحب

٩) العشر عند المالك أحب
والسحر عند العالم أحب

١٠) المالك يجرح يجيوشه
والعالم يجرح بقلمه

١١) المالك يتفكر كيف يزيد ملكه
والعالم يتفكر كيف يزيد علمه

١٢) المالك يدور بحاربه
والعالم يدور بخالقه

١٣) المالك يتفكر كيف يظلم على عبده
والعالم يتفكر كيف يغفر على عبده

١٤) المالك فزع إذا جاء أحد هل هو قاتله
العالم فرح إذا جاء احد هل هو صديقه

١٥) المالك فزع فإنه ظالم
والعالم فرح فإنه عادل

١٦) المالك فزع دائما
فالعالم فرح دائما

١٧) الدنيا سجن للمالك
الدنيا كجنة للعالم

١٨) الدنيا مشوك للمالمالك
الدنيا مزين للعالم[১৩১]

জ্ঞানী ও বাদশাহ্

১. রাজার রাজ্য সসীম
জ্ঞানীর রাজ্য অসীম।

২. রাজার সৈনিকের প্রয়োজন
জ্ঞানীর নাহি উহা প্রয়োজন।

৩. রাজা মালের লোভী
জ্ঞানী হন না লোভী।

৪. রাজার কাছে মাল আসে যখন
খুশি হয় তখন
ভাবে, কীভাবে ভোগ করা যায়।

৫. জ্ঞানীর কাছে মাল আসে যখন
চিন্তিত হয় তখন
ভাবে, কীভাবে খরচ করা যায়।

[১৩১] আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্‌ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

৬. রাজার হাতে মাল আসে যখন
রাজা বলে তখন,
হাতে পেয়েছি মোর প্রভূরে।

৭. জ্ঞানীর হাতে মাল আসে যখন
জ্ঞানী বলে তখন,
হাতে পেয়েছি মোর শত্রুরে।

৮. সম্পদ পুঞ্জীভূত করা রাজার প্রিয়
জ্ঞানীর প্রিয় তা ব্যয়।

৯. ভোগ-বিলাস রাজার প্রিয়
রাত্রি জাগরণ জ্ঞানীর প্রিয়।

১০. রাজা জখম করে তাঁর সৈন্য দ্বারা
আর জ্ঞানী জখম করে তাঁর কলম দ্বারা।

১১. রাজা চিন্তা করে কীভাবে তাঁর রাজ্য বাড়ানো যায়
আর জ্ঞানী চিন্তা করে কীভাবে তাঁর জ্ঞান বাড়ানো যায়।

১২. রাজা ঘোরে তাঁর প্রহরীর সাথে
আর জ্ঞানী ঘোরে তাঁর প্রভূর সাথে।

১৩. রাজা চিন্তা করে কীভাবে তাঁর অধিনস্তদের উপর জুলুম করা যায়
আর জ্ঞানী চিন্তা করে কীভাবে তাঁর অধিনস্তদের ক্ষমা করা যায়।

১৪. রাজা ভীতু হয়, যখন কেউ তাঁর নিকটে আসে,
সে তাঁর হত্যাকারী কিনা ?
আর জ্ঞানী খুশি হয়, যখন কেউ তাঁর নিকটে আসে;
সে তাঁর বন্ধু কিনা?

১৫. রাজা ভীতু হয়,কেননা সে অত্যাচারী
আর জ্ঞানী খুশি হয়, কেননা সে ন্যায় বিচারকারী।

১৬. রাজা সর্বদা ভীতু থাকে
আর জ্ঞানী সর্বদা খুশী থাকে।

১৭. পৃথিবী রাজার জন্যে দোযখ স্বরূপ
আর পৃথিবী জ্ঞানীর জন্য বেহেশ্ত স্বরূপ।

১৮. দুনিয়া রাজার জন্যে কণ্টকময়
আর দুনিয়া জ্ঞানীর জন্যে সুশোভামর।

دعاء اهل السماء

١) أنتم تمد حون الملائـكة
فنحن نمدح الإنسان
٢) الله أبعد من الملائكة
فإنه أقـرب إلى الإنسان
٣) إن كان السماء أفضل من الدنيا
فأرسل الله الإنسان فى السماء
٤) أنتم تحبون أن تكونوا أهل السماء
فنحن نحب ان نـكون أهل الدنيا
٥) انتم تنظرون إلى كبد السماء نظرة
فإن الله ينظر إلى ظهر الأرض مائة[১৩২]

আকাশ বাসীর প্রার্থনা

১. তোমরা ফেরেশতার প্রশংসা কর
আর আমরা মানুষের প্রশংসা করি।

২. আল্লাহ্ ফেরেশতা থেকে বহু দূরে
আর মানুষের অতি নিকটে।

৩. যদি আকাশ পৃথিবী থেকে উৎকৃষ্ট হতো
তাহলে আল্লাহ মানুষকে আকাশে পাঠাতো।

৪. তোমরা আকাশবাসী হতে আশা কর
আর আমরা পৃথিবীবাসী হতে আশা করি।

৫. তোমরা আকাশের দিকে একবার তাকাও
আর আল্লাহ্ পৃথিবীর দিকে শতবার তাকান।

---

[১৩২] আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

ترحيب الحفاظ

١) كل أية من كتابنا
كالجوهر من جنتنا
٢) كل حرف من كتابنا
كاللؤلؤ من جنتنا
٣) كل نقطة من كتابنا
كالقدح من جنتنا
٤) حافظ القرآن منا
كشارب الكوثرمنا
٥) حفظ القران علينا
كفرض الصلاة علينا
٦) فوت الآية من حفظنا
كخروج الروح من جسمنا
٧) تلاوة آلقران لدينا
كتلاوة الله علينا
٨) أصوات التلاوة لدينا
كأصوات تلاوة رسولنا
٩) من قرأ رضاء ربنا
وجد ريحانة الله منا
١٠) فاقرؤوه مرات علينا
فإن فيه أقوات قلبنا
١١) وفى كل مرة لذيذة وجديدة لدينا
ومن كل مرة لذ ربنا وأجزى علينا
١٢) وفى كل تلاوة زاد عشق ربنا
ومن كل دورة صار لقاء بيننا
١٣) القران شفاء قلبنا

اذا مرض فدواؤه تلاوتنا

١٤) القرآن معجزة رسولنا
وحفظه معجزة لنا
١٥) قوة الحفظ معجزة ربنا
اعطئ الله لحفظه إلينا
١٦) القرآن نعمة كبرى لنا
اعطى الله بلا عوض إلينا
١٧) خدمة الحفاظ مقبول عند ربنا
بخدمتهم قد وصل القران إلينا
١٨) من حفظ القرآن منا
فهو خير عند ربنا
١٩) سيسقاه الله بيده فى جنتنا
مرحبا ومرحبا بمن كان حفاظا منا[১৩৩]

হাফিজদের অভিনন্দন

১. আমাদের গ্রন্থের প্রতিটি আয়াত
বেহেশ্‌তের জহুর এর ন্যায়।
২. আমাদের গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর
বেহেশ্‌তের লু'লু' পাথরের ন্যায়।
৩. আমাদের কিতাবের প্রতিটি ফোটা
বেহেশ্‌তের পেয়ালার ন্যায়।
৪. আমাদের মাঝে যে কুরআনের হাফিজ
সে কাওছার পানকারীর ন্যায়।
৫. কুরআন মুখস্ত আমাদের উপর
নামাজের ফরযের ন্যায়।
৬. আমাদের মুখস্ত থেকে একটি আয়াত ছুটে যাওয়া
দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার ন্যায়।
৭. কুরআন পাঠ আমাদের নিকট
আল্লাহর পাঠের ন্যায়।

[১৩৩] আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্‌ম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৮. তিলাওয়াতের শব্দ আমাদের নিকট

রাসূল (সাঃ) এর তিলাওয়াতের ন্যায়।

৯. যে প্রভূর সন্তুষ্টির জন্যে পড়ে

সে আল্লাহর সুগন্ধি পায়।

১০. সুতরাং তোমরা উহা বারবার পড়

উহাতে আমাদের হৃদয়ের খোরাক রয়েছে।

১১. প্রতিবারে স্বাদ ও নতুনত্ব রয়েছে

প্রতিবারে প্রভূর স্বাদ ও বিনিময় রয়েছে।

১২. প্রতি তিলাওয়াতে প্রভূ-প্রেম বাড়ে

প্রতি চক্ররে প্রভূর সাক্ষাৎ ঘটে।

১৩. কুরআন অন্তরের মহাঔষধ

যখন (হৃদয়) রোগাক্রান্ত হয় তখন উহার ঔষধ আমাদের পাঠ।

১৪. কুরআন রাসূল (সাঃ) এর মু'জিযা (Miracle)।

আর উহা মুখস্ত করা আমাদের মু'জিযা (Miracle)।

১৫. মুখস্ত করার শক্তি প্রভূর মু'জিযা

(কুরআন) সংরক্ষনের জন্যে যা আমাদের দিয়েছেন।

১৬. কুরআন আমাদের জন্যে বড় নিয়ামত

যা আল্লাহ্ দিয়েছেন বিনিময় ছাড়া।

১৭. হাফিজদের খিদমাত (Contribution) প্রভূর নিকট গ্রহণীয়

তাঁদের অবদানের কারণেই কুরআন আমাদের নিকট পৌছেছে।

১৮. আমাদের মাঝে যে কুরআনের হাফিজ

সে প্রভূর নিকট সর্বোত্তম।

১৯. স্বীয় হস্তে আল্লাহ্ তাঁকে বেহেশ্তে পিয়াবে

সু-স্বাগতম যাঁরা আমাদের মাঝে হাফিজ।

Dhaka University Institutional Repository

يا اخى النوم

١) إذاجاء نومنا

قلنا يا أخ نومنا

٢) لا تضر مطالعتنا

والقبر منا متنا

٣) هذا الوعد بيننا

والله شاهدنا

٤) وسحر الليالى عادتنا

وترك الفراش دوامنا [১৩৪]

হে মোর ভাই নিদ্রা

১. যখন আমাদের নিদ্রা আসে

আমরা বলি, হে ভাই নিদ্রা!

২. তুমি আমাদের অধ্যয়নের ক্ষতি করো না।

কবর তো আমাদের নিদ্রার জায়গা।

৩. এ অঙ্গীকার আমাদের মাঝে রইল

আর আল্লাহই আমাদের স্বাক্ষী

৪. রাত্রি জাগরন আমাদের অভ্যাস

আর বিছানা ছাড়া আমাদের নিয়মিত।

[১৩৪] আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *জিমাউল ইল্‌ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

الطلاب أقوى من االملاكة

١) الطلاب كعصا أيدينا

إذا قرب الشيطان إلينا

٢) فنضرب الشيطان بطلابنا

كأنهم شهاب أيدينا

٣) الملائكة يضربونه بشهاب ربنا

ونحن نضربه بطلابنا

٤) الطلاب أقوى من شهاب ربنا

والملائكة أضعف من طلابنا

٥) لأن النور فى أيد طلابنا

وليس فى ايد ملائكة ربنا

٦) القرالمنزل نورربنا

فمن كان بيده فهو منورنا

٧) القران معجزة كبرى لرسولنا

فمن كان فى يده فهو قوى منا

٨) القران هدية كبرى لنا

فمن يأخذه فى حياته فهو منور فيها

٩) القرآن نور وهداية لنا

فمن كان فى قلبه فلا يمسه عدونا

١٠) الإلبيس عدو مبين ودوام لنا

وليس معلوم هذا عند كثيرنا

Dhaka University Institutional Repository

١١) القرآن دليل قوى لنا

فمن جاء بمقابلته فهو ضل من سبيل ربنا

١٢) القرآن دليل ظاهر لنا

ومقابلته الإبليس فهو مغلوب عندنا

١٣) الطلاب كالجيوش لدينا

إذا نرى ضد أحكام شريعتنا

١٤) فنقاتل معهم بطلابنا

الله معوّننا وما توقيف الا ربنا

١٥) الطلاب كقنبلة أيدينا

إذا اردنا نرمى على عدونا

١٦) الطلاب كبوق أيدينا

إذا غالبنا نضرب بوقنا

١٧) ايها ا لعدو تعالوا إلى شريعتنا

وليست النجاة الا شريعة رسولنا

١٨) الله خالقنا ورازقنا

وأنزل الكتاب لهدايتنا

١٩) لماذا انكرت ربنا ونبينا

يا الله سيهدى أخانا وحبيبنا[১৩৫]

---

[১৩৫] আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্ররা ফেরেশ্‌তাদের চেয়ে শক্তিশালী

১. ছাত্ররা আমাদের হাতের লাঠীর মত
যখন শয়তান আমাদের নিকটে আসে।

২. তখন শয়তানকে আমাদের ছাত্রগণ দ্বারা প্রহার করি
তারা যেন আমাদের হাতের নিক্ষিপ্ত তারকা (উল্কাপিন্ড)।

৩. ফেরেশ্‌তারা তাকে প্রহার করে আমাদের প্রভূর উল্কা দিয়ে
আমরা তাকে প্রহার করি আমাদের ছাত্র মন্ডলী দ্বারা।

৪. ছাত্ররা আমাদের প্রভূর উল্কা পিণ্ড (Meteor) থেকে শক্তিশালী
আর ফেরেশ্‌তারা অমাদের ছাত্রগণ হতে অতি দূর্বল।

৫. কেননা আমাদের ছাত্রদের হাতে নূর (Light) রয়েছে
পক্ষান্তরে আমাদের প্রভূর ফেরেশ্‌তাদের হাতে তা নেই।

৬. অবতারিত কুরআন আমাদের প্রভূর নূর (আলো)
সুতরাং তা যার হাতে থাকবে সে আমাদের আলোকিতকারী।

৭. কুরআন আমাদের রাসূল (সাঃ) এর বড় মু'জিযা
সুতরাং তা যার হাতে থাকবে সে আমাদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী।

৮. কুরআন আমাদের জন্যে বড় উপহার
সুতরাং তা যার জীবনে বাস্তবায়ন করবে,সে আমাদের মাঝে আলোকিত।

৯. কুরআন আমাদের জন্যে আলো এবং উপহার
সুতরাং তা যার হৃদয়ে থাকবে তাকে আমাদের শত্রু স্পর্শ করতে পারবেনা।

১০. ইবলীস আমাদের প্রকাশ্য চিরশত্রু
অথচ এই ব্যাপারটি আমাদের অনেকের নিকট জানা নেই।

১১. কুরআন আমাদের শক্তিশালী প্রমাণ
যে এর বিরুদ্ধে সে প্রভূর পথচ্যুত।

১২. কুরআন আমাদের প্রকাশ্য দলীল
উহার বিরোধী ইবলীস; সে আমাদের নিকট পরাজিত।

১৩. ছাত্ররা আমাদের নিকট সৈনিকের মত

যখন আমরা আমাদের শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ দেখি,

১৪. তখন আমাদের ছাত্রগণ দ্বারা তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেই

আল্লাহই আমাদের সাহায্যকারী,তাঁর তাওফীক ছাড়া কোন উপায় নেই।

১৫. ছাত্ররা আমাদের নিকট হাত-বোমার মত

যখন ইচ্ছা করি তখন উহা শক্রর উপর নিক্ষেপ করি।

১৬. ছাত্ররা আমাদের নিকট হাত-বাঁশীর (Trumpet) মত

যখন বিজয়ী হই তখন উহা বাঁজিয়ে আনন্দ উপভোগ করি।

১৭. হে শক্র! আমাদের শরীয়তের দিকে আস,

আমাদের রাসূল (সাঃ) এর শরীয়াত ছাড়া কোন মুক্তি নেই।

১৮. আল্লাহ্ আমাদের স্রষ্টা এবং রিযিক দানকারী

আর তিনি আমাদের হেদায়েতের জন্যে (এ) কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

১৯. কেন তুমি আমাদের প্রভূ এবং নবীকে অস্বীকার কর?

হে আল্লাহ! অতি শীঘ্রই আমাদের ভাই এবং বন্ধুকে হেদায়াত দান কর।

Dhaka University Institutional Repository

العبادة محتاج إلى العلم

١) الله أحبناوبعده نبينا

٢) وبعده قرأتنا وبعده عبادتنا

٣) فالعلم حاجتنا قبل عبادتنا

٤) فعبادات ربنا محتاج إلى علمنا

٥) وبعلو منا يعرف ربنا

٦) هذه شريعتنا هذه عقيدتنا [১৩৬]

উপাসনা জ্ঞানের প্রতি মুখাপেক্ষী

১. সবার চেয়ে আল্লাহ্ প্রিয়
তার পরেতে রাসূল (সাঃ) প্রিয়।

২. তার পরেতে লেখা-পড়া
তার পরেতে উপাসনা।

৩. জ্ঞান আগে
উপাসনা পরে।

৪. মোদের জ্ঞানের কাছে
প্রভূর উপাসনা ভিক্ষা মাঙ্গে।

৫. মোদের জ্ঞানের কলে
প্রভূর পরিচয় মিলে।

৬. এটাই মোদের (জীবন) বিধান
এটাই মোদের (পূর্ণ) ঈমান।[১৩৭]

---

[১৩৬]. আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

[১৩৭]. এখানে শরীয়াতকে জীবন-বিধান অর্থে এবং আক্বীদাকে পূর্ণ ঈমান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

الطلب للمكتبة فى الجنة

١) تحقيق الألفاظ لدينا

كالملح فى طعامنا

٢) إذا فاتت كلمة من ذكري نا

نظن قد خسف القمر من أيدينا

٣) إذا حلت مسئلتنا

وجدنا القمر فى أيدينا

٤) إذا غابت أية من ذكري نا

نظن قد خرجت الروح من جسمنا

٥) إذا جاء مرة فى ذكري نا

نظن دخلت الروح فى جسمنا

٦) إذا تحفظنا لفظا من كتابنا

طلعت الشمس فى قلبنا

٧) إذا زالت الحفظ من دماغنا

غابت الشمس فى قلبنا

٨) إذا دخلنا فى مكتبتنا

غلبت السكر علينا

٩) إذا خرجنا من مكتبتنا

رجعت العقل فينا

١٠) إذا غرقنا فى كتابنا

وجدنا ريح جنتنا

(١١ إذا قال ربنا

ما تشهى أنفسكم منا

(١٢ قلنا يا ربنا

إصنع مكتبة فى جنتنا

(١٣ جنة الدنيا مكتبتنا

وفيها راحة نفسنا[১৩৮]

<u>বেহেশ্তে পাঠাগারের জন্যে আবেদন ঃ</u>

১. শব্দাবলী বিশ্লেষন

খাবারের লবন যেন।

২. স্মৃতি থেকে শব্দ যখন চয়ে যায়

হাত থেকে চাঁদ যেন খসে গেল হায়!

৩. যখন বিধান সমাধান হয়

হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেলাম হায়!

৪. স্মৃতি থেকে আয়াত যখন চলে যায়

দেহ থেকে আত্মা যেন চলে গেল হায়!

৫. যখন স্মরণে আসে পুনঃরায়

দেহে আত্মা যেন প্রবেশ করল পুনঃরায়।

৬. কিতাব থেকে শব্দ যখন মুখস্ত করা হয়

মোদের হৃদয়ে সূর্য যেন উদিত হয়।

৭. মেধা থেকে শব্দ যখন ছুটে যায়

মোদের হৃদয়ে সূর্য যেন অস্ত গেল হায়!

---

[১৩৮]. আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

৮. যখন পাঠাগারে প্রবেশ করা হয়
মোদের উপর জ্ঞান-নেশা বিজয়ী হয়।

৯. যখন পাঠাগার থেকে বেরিয়ে আসা হয়
মোদের মাঝে হুঁশ ফিরে আসে পুনঃ রায়।

১০. যখন কিতাবের মাঝে ডুবে যাই
বেহেশতের খুশ্‌বু তখনই পাই।

১১. যখন প্রভূ বলবেন মোদের
তোদের নফ্‌স কি-বা চায় বলনা মোদের।

১২. বলব মোরা, হে প্রভূ মোদের !
বানাওনা পাঠাগার জান্নাতে মোদের।

১৩. দুনিয়ার জান্নাত ছিল পাঠাগার মোদের
তাতে ছিল হৃদয়ের প্রশান্তি মোদের।

Dhaka University Institutional Repository

لذة الرب

١) انتم تقرؤن كتاب ربنا

لم تجدوا فيه لذة ربنا

٢) نحن نقرأ كتاب ربنا

فنجد فيه لذة ربنا

٣) انتم تشربون ماء ربنا

نحن نشرب نور ربنا

٤) أنتم تتأخرون طلوع شمس ربنا

نحن نتأخر طلوع نور ربنا

٥) انتم تحيون بضوء شمس ربنا

نحن نحيى بضوء نور ربنا

٦) انتم تأكلون طعام ربنا

نحن نأكل حروف قرآ ننا

٧) أنتم تتفكرون فى رزق ربنا

نحن نتفكر فى عبادة ربنا[১৩৯]

---

[১৩৯] . আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্‌ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভূর স্বাদ

১. তোমরা পড় প্রভূর কিতাব
প্রভূর স্বাদ পাওনা তাতে।

২. আমরা পড়ি প্রভূর কিতাব
প্রভূর স্বাদ পাই তাতে।

৩. তোমরা পিয়ো প্রভূর পানির শরাব
আমরা পিয়ি প্রভূর নূরের শরাব।

৪. তোমরা অপেক্ষা কর প্রভূর সূর্য উঠবে কবে দিগন্তে
আমরা অপেক্ষা করি প্রভূর নূর উঠবে কবে হৃদয় মাঝে।

৫. তোমরা জীবিত থাকো প্রভূর সূর্য-কিরনে
আমরা জীবিত থাকি প্রভূর নূর-কিরনে।

৬. তোমরা খাও প্রভূর খানা
আমরা খাই কুরআনের দানা। [১৪০]

৭. তোমরা ভাবো প্রভূর রিযিক নিয়ে
আমরা ভাবি প্রভূর ইবাদাত নিয়ে।

---

[১৪০]. এখানে হরফ তথা অক্ষর দানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

شغلنا

١) التعليم شغلنا
والتعلم عبادتنا
٢) الصلاة غذاءنا
والمسجد جنتنا
٣) الطلاب أولادنا
والمدرسة بيننا
٤) الكتاب جليسنا
والدفتر حبيبنا
٥) القلم سيفنا
والبيان سلاحنا
٦) الغفلة عدونا
والنسيان آفتنا
٧) الجهلة جراحتنا
والسوال شفائنا
٨) التبسم شيمتنا
والغفران خصلتنا
٩) الله نورنا
ومصدره ربنا
٠) القرآن منيرنا
وزيته حديثنا
١١) ومشكواته قلبنا
وشعلته شريعتنا[১৪১]

[১৪১]. আহ্‌মাদ মুহ্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্‌ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের পেশা

১. শিক্ষাদান পেশা মোদের
শিক্ষার্জন উপাসনা মোদের।

২. নামায খাদ্য মোদের
মসজিদ জান্নাত মোদের।

৩. ছাত্ররা সন্তান মোদের
মাদ্রাসা গৃহ্ মোদের।

৪. কিতাব সঙ্গী মোদের
খাতা বন্ধু মোদের।

৫. কলম তরবারী মোদের
বক্তৃতা অস্ত্র মোদের।

৬. অলসতা শত্রু মোদের
ভুলে যাওয়া নিরাপদ মোদের।

৭. অজ্ঞতা ঘাঁ/ক্ষত মোদের
প্রশ্ন চিকিৎসা মোদের।

৮. মুচ্‌কি হাঁসি বৈশিষ্ট্য মোদের
ক্ষমা করা স্বভাব মোদের।

৯. আল্লাহ্ জ্যোতি মোদের
সে জ্যোতির উৎস প্রভূ মোদের।

১০. কুরআন প্রদ্বীপ মোদের
সে প্রদ্বীপের তেল হাদীস মোদের।

১১. উহার তাক হৃদয় মোদের
উহার শিখা শরীয়াত মোদের।

Dhaka University Institutional Repository

براقنا

١) وفى كل أية بينات ربنا

وفى كل أية هداية لنا

٢) وفى كل كلمة حقيقة ربنا

وفى كل كلام معرفة ربنا

٣) وفى كل أية أية ربنا

وفى كل أية حكمة ربنا

٤) وفى كل حرف ريحانة ربنا

وفى كل حرف زينة ربنا

٥) وفى كل نقطة صبغة ربنا

وفى كل حركة معجزة ربنا

٦) وفى كل كلمة بهجة ربنا

وفى كلا كلام صورة ربنا

٧) وفى كل سورة أجزاء ربنا

وفى كل قرآن هيكل ربنا

٨) وفى كل كلمة خفية ربنا

وفى كل كلام أسرار ربنا

٩) إذا قرأنا أية ربنا

بكل اية رفع الله سترا لنا

١٠) وفى كل تلاوة راحة نفسنا

وفى كل مرة زاد إيماننا

١١) كل حرف من كتابنا

كبراق معراج رسولنا

١٢) براق الرسول واحد ما قال علمائنا

وبراقنا كثير ماقال ربنا

١٣) نحن سافرنا به جنتنا

اذا اردنا هذا توفيق ربنا[১৪২]

[১৪২]. আহ্মাদ মুস্তাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

মোদের স্বর্গীয় যান

১. প্রতিটি আয়াতে আমাদের প্রভূর দীপ্ত প্রমাণাবলী রয়েছে
প্রতিটি আয়াতে আমাদের জন্যে হেদায়াত (সৎপথ) রয়েছে।

২. প্রতি-শব্দে আমাদের প্রভূর হাক্বীকত (প্রকৃত রহস্য) রয়েছে
প্রতি-বাক্যে আমাদের প্রভূর মা'রিফাত (পরিচয়) রয়েছে।

৩. প্রতি-আয়াতে আমাদের প্রভূর নিদর্শন রয়েছে
প্রতি-আয়াতে আমাদের প্রভূর বিজ্ঞতা রয়েছে।

৪. প্রতি-বর্ণে আমাদের প্রভূর সুঘ্রান রয়েছে
প্রতি-বর্ণে আমাদের প্রভুর সৌন্দর্য রয়েছে।

৫. প্রতি-ফোঁটায় আমাদের প্রভুর রঙ রয়েছে।
প্রতি-হরকতে (যবর,যের,পেশ) আমাদের প্রভূর মু'জিযা রয়েছে।

৬. প্রতি-শব্দে আমাদের প্রভূর চাক্‌চিক্য রয়েছে
প্রতি-বাক্যে আমাদের প্রভূর চিত্র রয়েছে।

৭. প্রতি-সূরাতে আমাদের প্রভূর অঙ্গ-পতঙ্গ রয়েছে
সম্পূর্ণ কুরআনে আমাদের প্রভূর মূর্তি (দেহ কাঠামোর বর্ণনা) রয়েছে।

৮. প্রতি-শব্দে আমাদের প্রভূ লুকিয়ে আছেন (বা প্রভূর গোপনীয়তা রয়েছে)
প্রতি-বাক্যে আমাদের প্রভূর রহস্যাবলী রয়েছে।

৯. যখন আমরা আমাদের প্রভূর আয়াত পড়ি
তখন প্রতি আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের জন্যে একটি করে পর্দা উন্মোচন করেন।

১০. প্রতি-তিলাওয়াতে আমাদের দেহের প্রশান্তি
প্রতি-বারে আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।

১১. আমাদের কিতাবের প্রতিটি বর্ণ
রাসূল (সাঃ) এর মি'রাজের বুরাকের ন্যায়।

১২. রাসূল (সাঃ) এর বুরাক মাত্র একটি, যা আমাদের আলিমগণ বলেন
আমাদের বুরাক বহু, যা আমাদের প্রভূ বলেন।

১৩. আমরা উহার দ্বারা আমাদের জান্নাত ভ্রমণ করি
যখন আমরা ইচ্ছা করি, এটা আমাদের প্রভূর অনুগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

وصف العلم

١) العلم نور ربنا

فالعلم نور قلبنا

٢) ينوّر العلم قلبنا

فيخرج الشرك من قلبنا

٣) قلبنا خزينة علوم ربنا

فنحن نرى هداية ربنا

٤) ولا يجد الفرصة إبليسنا

أن يدخل فى قلبنا

٥) فالتوحيد مملوٌ فى قلبنا

الله حافظ إيماننا

٦) إذا كثرت علومنا

فزادت إيماننا

٧) إذاكثرت علومنا

فزادت عزّتنا

٨) من اجتهد فنال منا

ومن لا اجتهد فخرج فينا

٩) فنحن يحصله منا

فحياته منور فينا

١٠) فمن لا يحصله منا

فهو اعمى فينا

Dhaka University Institutional Repository

١١) ولا يرى هداية ربنا

يا الله سيهدى من أعمى فينا

١٢) العلم مرشد ربنا

يرشد صراطا لنا

١٣) فمن يمشى بإرشاد ربنا

فله صراط مستقيم ما قال ربنا

١٤) العلم مرأة عيبنا

وفيها نرى عيوبنا[১৪৩]

<u>জ্ঞানের গুন</u>

১. জ্ঞান আমাদের প্রভূর নূর

সুতরাং জ্ঞান আমাদের মনের নূর।

২. জ্ঞান আমাদের মনকে আলোকিত করে

সুতরাং জ্ঞান আমাদের মন থেকে শির্ক বের করে দেয়।

৩. আমাদের মন আমাদের প্রভূর জ্ঞান সমূহের ভান্ডার

সুতরাং আমরা প্রভূর সৎপথ দেখতে পাই।

৪. আমাদের (শত্রু) ইবলীস সুযোগ পায় না

যে, আমাদের মনে প্রবেশ করবে।

৫. সুতরাং আমাদের মনে তাওহীদ (একত্ববাদ) পূর্ণ রয়েছে

আল্লাহ্ আমাদের সংরক্ষক।

৬. যখন আমাদের জ্ঞান বেড়ে যায়

তখন আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।

৭. যখন আমাদের জ্ঞান বেড়ে যায়

তখন আমাদের সম্মান বেড়ে যায়।

---

[১৪৩]. আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৮. আমাদের মাঝ থেকে যে চেষ্টা করে সে পায়
যে চেষ্টা করে না সে আমাদের মাঝে ধবংস হয়।

৯. সুতরাং আমাদের মাঝ থেকে যে উহা অর্জন করে
তার জীবন আমাদের মাঝে আলোকিত হয়।

১০. আর আমাদের মাঝ থেকে যে উহা অর্জন করে না
সে আমাদের মাঝে অন্ধ।

১১. সে আমাদের প্রভূর হিদায়াতের পথ দেখে না
হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝে যে অন্ধ,তাকে শীঘ্রই হিদায়াত দান করুন।

১২. জ্ঞান হলো আমাদের প্রভূর নির্দেশক
সে আমাদের পথ দেখায়।

১৩. যে প্রভূর নির্দেশ মত চলে
তার জন্যে সরল পথ যা প্রভূ বলেছেন।

১৪. জ্ঞান আমাদের দোষের আয়না
তাতে আমরা আমাদের দোষাবলী দেখতে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

وصف الكتاب

١) الكتاب رفيقنا ونصيرنا

فإنه ينصرنا ولا يخدعنا

فإن الجليس قد يخذعنا ولا ينصرنا

٢) الكتاب خير تركتنا

فإنه يرسل ثوابنا ولاينسانا

فان المال ينسانا ولايرسل ثـوابنا

٣) الكتاب أفضل من أولادنا

فإنه يبقى إسمنا ويذكرنا

فإن الأولاد قد ينسانا ولا يذكرنا

٤) الكتاب خير مرشدنا

فانه يرشـدنا ولا يضلنا

فان المرشد قد يضلنا ولا يهدينا

٥) الكتاب برهان أيدينا

إذا بدى المباحثة بيننا

ند ل بكتاب ايدينا

٦) الكتاب مصباح قلبنا

إذا جاءت الظلمات فينا

قرأنا ونخرج به ظلماتنا

٧) الكتاب وسادة نومنا

فنتله تحت رأسنا

إذا غالب النوم على عيننا

٨) الكتاب كمفتاح جنتنا

إذا أردنا أن نفتح جنتنا

٩) كل كتاب كجنة واحدة

جنة الرب فى ثمانية ومحدودة

جنتنا كبيرة غير محدودة

Dhaka University Institutional Repository

١٠) كل كتاب كدنيا واحدة

دنيا الرب فى أقاليم سبعة

دنيا كبيرة غير معدودة

١١) كل كتاب كعالم

عالم الرب معدوم

وعالمنا غير معدوم

١٢) الكتاب كمرأة ربنا

وفيها صورة عالمى ربنا

إذا قرأنا سافرنا عالمى ربنا

١٣) الكتاب كخريطة أيدينا

وفيها طريقة عالمى ربنا

نسئلك بارشاد كتاب ربنا

١٤) الكتاب كفلك نوحنا

إذا نرى بحر المصائب امامنا

نقرى ونجرى فى المصائب بكتابنا

١٥) الكتاب كمحل شريعتنا

اذا بدى المجادلة عن ديننا

ونشاور ونصالحه بكتابنا

١٦) الكتاب كروح

العالم بلا كتب

كالجسد بلاروح

١٧) الكتاب كسلاح

العالم بلاكتب

كالجيوش بلاسلاح[১88]

---

[১88]. আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *জিমাউল ইল্‌ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবের গুন

১. কিতাব আমাদের বন্ধু এবং সাহায্যকারী
সে আমাদের সাহায্য করে এবং ধোঁকা দেয় না,
কিন্তু বন্ধু (সহচর) মাঝে মাঝে আমাদের ধোকা দেয় এবং সাহায্য করেনা।

২. কিতাব আমাদের সর্বোত্তম উত্তরাধিকার
কেননা সে আমাদের পূণ্য পাঠায় এবং ভুলে যায়না,
কিন্তু মাল আমাদেরকে ভুল যায় এবং পুণ্য পাঠায়না।

৩. কিতাব আমাদের সন্তানাদি থেকে ভাল
কেননা সে আমাদের নাম জিয়ে রাখে এবং স্মরণ করে
কিন্তু সন্তানাদি মাঝে মাঝে আমাদের ভুলে যায় এবং স্মরণ করে না।
কেননা তারা অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের কিতাব নিঃশেষ হবেনা।

৪. কিতাব আমাদের সর্বোত্তম নির্দেশক
সে আমাদের সৎপথের নির্দেশ দেয় এবং পথভ্রষ্ট করে না
কিন্তু নির্দেশক মাঝে মাঝে আমাদের পথভ্রষ্ট করে এবং সৎপথ দেখায় না।

৫. কিতাব আমাদের হাতের শক্তিশালী প্রমাণ
যখন আমাদের মাঝে পরস্পর গবেষনা শরু হয়,
তখন আমরা আমাদের হাতের কিতাব দিয়ে প্রমাণ দেই।

৬. কিতাব আমাদের হৃদয়ের প্রদ্বীপ
যখন আমাদের মাঝে অন্ধকার সমূহ আসে
তখন আমরা পড়ি এবং উহার দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করি।

৭. কিতাব আমাদের নিদ্রার বালিশ
যখন নিদ্রা আমাদের চোখের উপর বিজয়ী হয়,
তখন উহা আমাদের মাথার নীচে রাখি
যখন চলে যায় তখন উহা খুলি এবং পড়ি।

৮. কিতাব হলো আমাদের বেহেশ্তের চাবি
যখন আমরা ইচ্ছা করি যে, আমরা আমাদের বেহেশ্ত খুলব,
তখনই উহা দ্বারা খুলি এবং আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করি।

৯. প্রতিটি কিতাব এক একটি জান্নাত সদৃশ
প্রভূর জান্নাত আটটিতে সীমিত,
আমাদের জান্নাত বহু এবং অগণীত।

Dhaka University Institutional Repository

১০. প্রতিটি কিতাব এক একটি পৃথিবী সদৃশ
প্রভূর পৃথিবী সাতটি ভূখন্ডে
আমাদের পৃথিবী বহু এবং অসংখ্য।

১১. প্রতিটি কিতাব একটি বিশ্ব[১৪৫] সদৃশ্য
প্রভূর বিশ্ব ধ্বংসশীল
আমাদের বিশ্ব ধবংসশীল নয়।

১২. কিতাব প্রভূর আয়না স্বরূপ
তাতে প্রভূর বিশ্ব সমূহের চিত্র রয়েছে
যখন উহা পড়ি তখনই প্রভূর বিশ্বসমূহ ভ্রমণ করি।

১৩. কিতাব আমাদের হাতের মানচিত্র স্বরূপ
তাতে প্রভূর বিশ্ব সমূহের রাস্তা রয়েছে
আমরা আমাদের প্রভূর কিতাবের নির্দেশানুযায়ী চলি।

১৪. কিতাব আমাদের (নবী) নূহের নৌকা স্বরূপ
আমাদের সামনে যখন বিপদের সাগর দেখি
তখন পড়ি এবং বিপদাবলী আমাদের কিতাব দিয়ে পাড়ি।

১৫. কিতাব আমাদের শরীয়াতের সমাধান সরূপ
যখন ধর্ম নিয়ে তর্ক যুদ্ধ শুরু হয়
তখন পরস্পর পরামর্শ করি এবং আমাদের কিতাব নিয়ে সমাধান করি।

১৬. কিতাব প্রাণ স্বরূপ
কিতাবাদি ছাড়া বিদ্বান
প্রাণ ছাড়া দেহ স্বরূপ

১৭. কিতাব যুদ্ধাস্ত্র স্বরূপ
কিতাবাদি ছাড়া বিদ্বান
অস্ত্র ছাড়া সৈনিক স্বরূপ।

---

[১৪৫] . দুনিয়া এবং বিশ্ব (আলাম-عالم) এক না। একটি বিশ্বে বহু গ্রহ-উপগ্রহ থাকতে পারে। যেমন আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ। সূফীবাদে কুরআনে যতগুলো অক্ষর রয়েছে ততোগুলো বিশ্ব রয়েছে। আমরা মাত্র একটি বিশ্বের একটি গ্রহে বাস করি। (আক্সামূল'ইলম, লেখক: যয়নুল আবদীন, ইদারা প্রকাশনী, তেহরান, ইরানঃ (তা. বি.) পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

زينة الرب

1) العلم زينة ربنا

فمن يلبسه منا

٢) فقال يا عبدنا

مرحبا لك منا

٣) الناس يلبس زينة الدنيا

نحن نلبس زينة ربنا

٤) زينة الدنيا فائتة

وزينة ربنا قائمة

٥) الناس يثلب زينة الدنيا

ولا يستطيع أن يثلب زينة ربنا

٦) زينة الدنيا قالت يا ربنا

لماذا عبادك يميلون إلينا

٧) ليست الزينة فينا بمثل ربنا

فاستغفرلى وطالب الزينة يا ربنا[১৪৬]

---

[১৪৬]. আহ্‌মাদ মুস্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্‌ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভূর গহনা

১. জ্ঞান (বিদ্যা) হল আমাদের প্রভূর গহনা

সুতরাং আমাদের মাঝ থেকে যে উহা পরিধান করবে,

২. আমাদের প্রভূ তাকে বলেন, হে আমার বান্দা!

আমার পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগতম।

৩. মানুষ পরিধান করে দুনিয়ার গহনা

আমরা পরিধান করি প্রভূর গহনা।

৪. দুনিয়ার গহনা ক্ষণস্থায়ী

প্রভূর গহনা চিরস্থায়ী।

৫. দুনিয়ার গহনা মানুষ ছিনিয়ে নিতে পারে

প্রভূর গহনা মানুষ ছিনিয়ে নিতে পারে না।

৬. দুনিয়ার গহনা বলে, হে মোদের প্রভূ!

আপনার বান্দারা কেন আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে?

৭. আমাদের মাঝে আমাদের প্রভূর তুলনায় কোন সৌন্দর্য নেই,

সুতরাং আমাকে এবং সৌন্দর্য অন্বেষককে ক্ষমা কর, হে মোদের প্রভূ!

Dhaka University Institutional Repository

السفر

١) الناس يسافر عن الدولة إلى الدولة

نحن نسافر عن الكلمة إلى الكلمة

٢) الناس يسافر على الطرف بالدابة

نحن نسافر على الحروف بالرغبة

٣) الناس يظن خيل العرب أسرع

نحن نظن فرس القلب أسرع

٤) الناس يحافر بطن الأرض للخزينة

نحن نحافر أية الفرض للشريعة

٥) الناس يرى بهجة الأشياء فى العالم

نحن نرى بهجة الله فى العلم

٦) الناس يسافر إلى الفلس للكسب

نحن نسافر إلى العلم للطب

٧) الناس يشرب الماء من البحر

نحن نشرب من قلب الحبر

٨) الناس يغسل فى ماء البحر

نحن نغتسل فى بحر الحبر

٩) الناس يدخر الأموال فى البيت

نحن ندخر الكتب فى البيت

١٠) الناس يبنى عمارة باللبنة

نحن نبنى مكتبة بالكتبة [১৪৭]

---

[১৪৭] . আহ্মাদ মুহাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমণ

১. মানুষ ভ্রমণ করে দেশ হতে দেশান্তরে
আমরা ভ্রমণ করি শব্দ হতে শব্দান্তরে।

২. মানুষ ভ্রমণ করে রাস্তায়-রাস্তায় যানবাহনে চড়ে
আমরা ভ্রমণ করি বর্ণে-বর্ণে আগ্রহে ভর করে।

৩. মানুষ মনে করে আরবের ঘোড়া দ্রুত দৌড়ে
আমরা মনে করি হৃদয়ের ঘোড়া দ্রুত দৌড়ে।

৪. মানুষ জমিনের পেট খোড়ে ধনসম্পদ বের করিবারে
আমরা ফরয আয়াত খুড়ি শরীয়াতের বিধান বের করিবারে।

৫. মানুষ বস্তুর চাক্-চিক্য দেখে ভূবনে
আমরা আল্লাহর চাক্চিক্য দেখি জ্ঞানে।

৬. মানুষ ঘোরে পয়সা উপার্জন করা যায় কী করে
আমরা ঘুরি জ্ঞানার্জন করা যায় কী করে।

৭. মানুষ পানি পান করে সমুদ্র হতে
আমরা (জ্ঞান) পান করি পন্ডিতের হৃদয় হতে।

৮. মানুষ স্নান করে সমুদ্রের পানিতে
আমরা স্নান করি কালির সমুদ্রে।

৯. মানুষ সম্পদ জমা করে বাড়ীতে
আমরা কিতাবাদি জমা করি বাড়ীতে।

১০. মানুষ অট্টালিকা গড়ে ইট দিয়ে
আমরা গ্রন্থাগার গড়ি কিতাব দিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

وصف الاستاد

١) الأستاذ كرسولنا

إذا جاء أمامنا

نظن قد جاء رسولنا

٢) اذا تلقى أستاذنا

نظن قد تلقى جبريلنا

٣) إذا تلقى قرآننا

نظن قد تلقى ربنا

٤) إذا تلقى حديثنا

نظن قد تلقى رسولنا

٥) العلم كشرابنا

اذا سقى أستاذنا

نظن قد سقى حور جنتنا[১৪৮]

---

১৪৮. আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্‌ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকের গুন

১. রাসূল সম শিক্ষক মোদের
আসেন যখন সামনে মোদের
মনে করি এসেছেন রাসূল মোদের।

২. শিক্ষক যখন শিক্ষা দেন মোদের
ভাবি জিব্রাইল শিখাচ্ছেন মোদের।

৩. কুরআনের শিক্ষা যখন দেন মোদের
ভাবি মোদের প্রভূ শিখাচ্ছেন মোদের।

৪. হাদীস শিক্ষা যখন দেন মোদের
ভাবি রাসূল শিখাচ্ছেন মোদের।

৫. জ্ঞান হল শরাব মোদের
শিক্ষক যখন পিলায় মোদের
ভাবি জান্নাতের হুর পিলাচ্ছে মোদের।

Dhaka University Institutional Repository

حـرص الدنيا

١) حياة الدنيا قليلة

ومدة الآخرة طويلة

٢) نعمة الدنيا قليلة

ونعمة الآخرة جزيلة

٣) كل قليلة وأنفق جزيلة

فيجزيك الله جزيلة

٤) ترك الدنيا حرص الآخرة

علامة المؤمن باهرة

٥) حب الدنيا وحرص النعمة

علامة الحريص ظاهرة

٦) قلب المؤمن معلقة بالكعبة

وقلب الحريص معلق بالفلسة[১৪৯]

[১৪৯]. আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ার লোভ

১. পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী

পারলৌকিক জীবন দীর্ঘস্থায়ী।

২. পার্থিব নিয়ামাত সামান্য পরিমাণ

পারলৌকিক নিয়ামাত বিপুল পরিমাণ।

৩. কম খাও বেশী দাও

বিনিময়ে আল্লাহ্ বেশী দেবেন।

৪. দুনিয়াত্যাগী,পর জগতের আসক্তি

ঈমানদারের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

৫. দুনিয়ার মোহ, প্রাচুর্যের লোভ

লোভীর সুস্পষ্ট নিদর্শন।

৬. ঈমানদারের হৃদয় কাবার সাথে

লোভীর হৃদয় পয়সার সাথে।

Dhaka University Institutional Repository

شمس الشمس

١) قال المؤمن :

نحن تعجبنا على نوركم يا أيها النجم

٢) فقالت النجم :

نحن تعجبنا على نوركم يا أيها المؤمن

٣) نحن وجدنا النور من نوركم

وأنتم وجدتم النور من ربكم

٤) فقالت الشمس : نور الله قلب المؤمن

ونور نا قلب المؤمن

٥) فقالت الشاعر : شمس الدنيا الشمس

وشمس الشمس المؤمن

٦) إذا فات المؤمن فات الشمس

فاذا فاتت الشمس فاتت الدنيا

٧) فدعا الشمس يا ربنا

ارحم على المؤمنين[১৫০]

১৫০. আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্‌ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সূর্যের সূর্য

১. ঈমানদার বলল ঃ

হে তারকা! তোমাদের জ্যোতিতে আমরা আশ্চার্যান্বিত।

২. তারকা বলল ঃ

হে ঈমানদার!তোমাদের জ্যোতিতে আমরা আশ্চার্যান্বিত।

৩. আমরাতো তোমাদের জ্যোতি থেকে জ্যোতিকৃত

আর তোমরা প্রভূর জ্যোতি থেকে জ্যোতিকৃত।

৪. সূর্য তখন বলল ঃ

আল্লাহ্ ঈমানদারদের হৃদয় জ্যোতিকৃত করেছেন।

আর আমাদেরকে ঈমানদারের হৃদয় জ্যোতিকৃত করেছে।

৫. কবি তখন বলল ঃ

পৃথিবীর সূর্য হল সূর্য

সূর্যের সূর্য হল ঈমানদার।

৬. যখন ঈমানদার থাকবে না, তখন সূর্য থাকবে না।

আর যখন সূর্য থাকবে না, তখন দুনিয়া থাকবে না।

৭. সূতরাং সূর্য প্রার্থনা করে হে প্রভূ !

ঈমানদারের উপর অনুকম্পা কর।

Dhaka University Institutional Repository

الزهرة

١) الطفل قال : يا أيها الزهرة

من أين وجدت لونك ؟

٢) الزهرة فقالت : يا أيها الطفل

من أين وجدت إيمانك ؟

٣) لونى فائتا ** ولو نك دائما

٤) زينتى قطرة ** وزينك كثرة

٥) فإن زينة الإيمان من زينة ربى

فان ترد زينة ربى فاسجد لربى[১৫১]

ফুল

১. শিশু বলল ঃ হে ফুল!

কোথা হতে এ রঙ পেয়েছো?

২. ফুল তখন বলল ঃ হে শিশু!

কোথা হতে ঈমান পেয়েছো ?

৩. আমার রঙ ধবংসশীল

তোমার রঙ চিরদিন।

৪. আমার সৌন্দর্য বিন্দু

তোমার সৌন্দর্য সিন্দু।

৫. ঈমানের সৌন্দর্য মোর প্রভূর

যদি পেতে চাও সিজ্‌দা কর মোর প্রভূর।

---

[১৫১]. আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্‌ম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

الحريص عدو الله

١) الحريص عدو ربنا

ومن يكون حريصا منا

٢) فلا رحمة له من ربنا

سيهلكه غضب ربنا

٣) ছن كنت حريصا فينا

فتأخر لعذاب ربنا[১৫২]

লোভী আল্লাহর শত্রু

১. লোভী আমাদের প্রভূর শত্রু

আমাদের মাঝে যে লোভী হয়,

২. তার জন্যে প্রভূর দয়া থাকে না।

অচিরেই প্রভূর ক্রোধ তাকে ধ্বংস করবে।

৩. যদি তুমি আমাদের মাঝে লোভী হও

তাহলে আমাদের প্রভূর শাস্তির অপেক্ষায় থাক।

---

[১৫২]. আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *জিয়াউল ইল্ম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ কথাঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অনন্য সাধারণ এক ব্যাক্তিত্ব। যাঁর প্রতিভা ও জ্ঞানের বিচ্ছুরিত আলোয় আজো আলোকিত হয়ে আছে বিশ্ব মুসলিমের হৃদয় কোণ।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অবদান রীতিমত ঈর্ষণীয়। যা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছি। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তিনি যুগ-সমস্যার সমাধান এবং উন্মোচন করেছেন ধর্মের নতুন নতুন দিগন্ত।[১৫৩]

আল্লামা মুল্লাজীউন ছিলেন আল্লাহর কালামের সংক্ষিপ্ত সার এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক অকুল সমুদ্র। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি মৌলিক শাখা-প্রশাখায় তাঁর ছিল একটি স্বচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ ও রাজসিক পদচারনা; যার জন্যে গোটা বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহ্ আজও তাঁর কাছে ঋণী হয়ে আছে।

সুতরাং অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার অধিকারী এবং জ্ঞান-তাপস ও সরলমনা আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন; সেজন্যে তিনি আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

তাইতো কবির ভাষায় বলতে হয়-

"ফুলের সৌরভ কুলের গৌরব
থাকে না চিরদিন।
হে জ্ঞান সাধক !
তোমার স্মৃতি তোমার গৌরব
চিরদিন রবে অমলিন"॥ [১৫৪]

---

১৫৩. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮।

১৫৪. মাহ্যুযা হক, *ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ঃ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে*, ১ম প্রকাশ, (প্রকাশকঃ মাহ্যুযা হক), ঢাকাঃ ১৯৯১, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী আইন চর্চায় আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী আইন চর্চায় আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইনের লালন ও বিকাশে মুল্লাজীউন

- শুরুর কথা
- ইসলামী আইনের মৌলিক গ্রন্থাবলী রচনা
- শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ
- আল্-ফাত্ওয়া আল্-হিন্দীয়াহ্‌তে মুল্লাজীউনের অবদান
- ধর্মপোদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন
- কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন
- বিদ্যালয় স্থাপন ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন
- শিরক্ ও বিদ্আতের মূলোৎপাটন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইন বিষয়ে আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা

- তাফসীরে আহ্‌মাদী
  - তাফ্সীরে আহ্‌মাদী লেখার বাসনা
  - তাফ্সীরে আহ্‌মাদীর বৈশিষ্ট্যাবলী
  - তাফসীরে আহমাদীর নমূনা গ্রন্থাবলী
  - তাফ্সীরে আহ্‌মাদীতে আলোচনায় স্থান পাওয়া সূরা, আয়াত ও বিষয়সমূহ
  - তাফ্সীরে আহ্‌মাদী থেকে নির্গত বিধান সমূহ
  - তাফ্সীরে আহ্‌মাদীর কিছু নমূনা
- নূরুল-আন্ওয়ার ফী শারহীল্ মানার
  - উৎস ও সময়কাল
  - নামকরণের স্বার্থকতা
  - ভাষারূপ ও বৈশিষ্ট্য
  - আলোচ্য বিষয়
  - 'নূরুল-আনওয়ার' কালজয়ী অমর গ্রন্থ হলো কী করে; তার খতিয়ান এবং প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য
  - 'নূরুল-আন্ওয়ার' এর ব্যাখ্যা-গ্রন্থসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী আইন চর্চায় আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইনের লালন ও বিকাশে মুল্লাজীউন

শুরুর কথাঃ

এই নশ্বর পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁরা নিজেদের শ্রম-সাধনা দিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন। এর ফলে তাঁরা মানুষের হৃদয়ে চির অমর হয়ে আছেন, থাকবেন আজীবন। যাঁদের কাছে পৃথিবী ও মানুষ ঋণী, যাঁদের অবদান শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রীক নয়; বরং ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র তথা ব্যক্তির সমাগ্রীক জীবনে।[১]

যাঁদের অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার বিকশিত আলো ইসলামী শরীয়াতের গন্ডীর মধ্যে থেকে যুগ-সমস্যার সমাধান দিয়েছে এবং উন্মোচন করেছে ধর্মের নতুন দিগন্ত; আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন তাঁদেরই একজন। যাঁর অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তথা- কুরআন, হাদীস, তাফসীর, আকাঈদ, মানতিক, তাসাওউফ, ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ এবং আরবী ও ফার্সী সাহিত্যে।[২]

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অসংখ্য পরিচয় আছে। তন্মোধ্যে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো; তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ও তাফসীরবিদ। তবে তিনি আমাদের নিকট ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ হিসেবেই বেশী খ্যাত। মুসলিম বিশ্বে তিনিই প্রথম পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে আহ্কাম (বিধি-বিধান) সম্পর্কিত ৫০০টি আয়াত চয়ন করে সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলো যেহেতু শরীয়াতের আহ্কাম (বিধি-বিধান), সেহেতু তা যেমন তাফসীর বিষয়ক; তেমনি তা ফিক্হ বিষয়কও বটে।[৩]

---

১. সৈয়দ আব্দুল সুলতান, *বড় মানুষদের ছোটকালের কথা,* রুনা প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ১৭।

২. আল্লামা ইউসুফ আলইয়ান সারকীস, *মু'জামু'ল- মাতবু'আতুল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আররাবা,* ২য় খন্ড, সারকীস মুদ্রণালয়, কায়রো, মিশরঃ ১৯২৮, পৃ. ১১৫৭।

৩. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফ্রুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল মুসান্নিফীন,* মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তানঃ ১৯৮৬, পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন মাত্র ২১ বছর বয়সে 'তাফসীরে আহ্মাদী' রচনা করার মধ্যদিয়ে গোটা জগতকে তাঁর নিকট ঋণী করে গেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় জীবনের শেষ ভাগে লেখেন চিরকালীন এক অমর ও অক্ষয় গ্রন্থ, 'আল-মানার' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নূরুল-আনওয়ার' তাঁর রচিত এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি বর্তমান মুসলিম সমাজে একটি প্রামাণ্য আইন শাস্ত্র হিসেবেই বিবেচ্য।[৪]

ইমাম তাহাভী ছিলেন হানাফী মাযহাবের ইমাম। তিনি হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইমাম মালিকের (রহঃ) মুয়াত্তায় যেমন কিছু ইসলামী আইন বিষয়ক হাদীস আছে, তেমনি তাহাভী শরীফেও হানাফী মাযহাবের সমর্থনে হাদীস আছে। কিন্তু তাতে বিস্তারিতভাবে ফিক্হ বিষয়ক কোনো মাস্আলার বিবরণ নেই।[৫]

দ্বিতীয়ত, হানাফী মায্হাবকে টিকিয়ে রাখতে হলে যে উসূল বা মূলনীতির প্রয়োজন, তা ইমাম তাহাভী রচনা করে যাননি। এই কাজ প্রথমে করেছেন ইমাম বাযদুভী। আর দ্বিতীয়বার করেছেন 'আল-মানার' গ্রন্থের লেখক আল্লামা আবুল বারাকাত আহ্মাদ নাসাফী, যা 'উসূলে ফিক্হ' (ইসলামী আইনের মূলনীতি) এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে আল্লামা আবুল বারাকাত আহ্মাদ নাসাফী ইসলামী আইনের যে নীতিমালা রচনা করেছেন, তাকে বিস্তারিত রূপ দিয়ে জনসাধরণের বোধগম্যের আওতাভূক্ত করেছেন আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন।[৬]

কাজেই ইমাম তাহাভীকে যেমন হানাফী মাযহাবের হাদীস বিষয়ক ইমাম বলা চলে, তেমনি আহ্মাদ মুল্লাজীউনকেও হানাফী মাযহাবের আইন বিষয়ক ইমাম বলা চলে। সেজন্যই আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেছেনঃ

> "শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন ভারতবর্ষে হাদীস শাস্ত্রের
> যুগ স্রষ্টা; তেমনি আহ্মাদ মুল্লাজীউন ও ইসলামী আইন

---

৪. ওমর রেজা কাহ্হালা, *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, তারাজিমু মুসান্নিফিল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম খন্ড, বৈরুত, লেবাননঃ ১৯৫৭, পৃ. ২৮৭।

৫. আল্-মু'আল্লিম বাতরুস আল-বুস্তানী সংকলিত, *দায়িরাতু'ল মা'আরিফ*, ২য় খন্ড, মা'আরিফ প্রেস, বৈরুত, লেবাননঃ ১৯৭৮, পৃ. ৫৭৯।

৬. মাওলানা শায়খ আহ্মাদ, *তান্যীমুল যাখ্যুন*, হাট হাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রামঃ ১৪১৪ হিজরী, পৃ. ২৭০।

শাস্ত্র ও ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতির যুগ-স্রষ্টা।"[৭]

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আরও বলেনঃ

"শায়খ মুল্লাজীউনের আগমন হয়েছিলো ঐ যুগে, যখন
ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও মর্যাদা লাভের মূল চাবি-কাঠি
ছিলো 'ফিক্হ' ও 'উসূলে ফিকহ' চর্চা।"[৮]

আর আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত ভারতীয় ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আযাদ বিলগ্রামী বলেছেনঃ

"মুল্লাজীউন ছিলেন আল্লাহর কালামের সংক্ষিপ্ত সার;[৯]
এবং আকলী ও নকলী তথা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের
এক অকূল সমুদ্র।"[১০]

আলোচনার ধারাবাহিকতায় আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ইসলামী আইন চর্চায় যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন, সে সম্পর্কে নিম্নে আমরা কিছুটা আলোকপাতের প্রয়াস পাবোঃ

(১) ইসলামী আইনের মৌলিক গ্রন্থাবলী রচনাঃ

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। তন্মোধ্য থেকে ইসলামী আইনের উপর লিখিত দু'টি রচনা আজো বিশ্ববাসীর সামনে অমর হয়ে আছে। তারমধ্যে একটি হলো 'তাফসীরে আহ্মাদী', আর অপরটি হলো ''নূরুল-আনওয়ার।

নিম্নে আমরা মুল্লাজীউনের ইসলামী আইন চর্চায় অবদান স্বরূপ লিখিত এ দু'টি রচনার উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাতের প্রয়োজন মনে করছিঃ

---

৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ৫ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ৬৩৭।

৮. আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদ্ভী, *হিন্দুস্তান কী- কাদীম দরস গাঁহে,* মা'আরিফ প্রেস, আযমগড়, ভারতঃ ১৯৩৬, পৃ. ৯৫-৯৭।

৯. মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা, *আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য,* ১ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৯।

১০. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন,* মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তানঃ ১৯৮৬, পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

(i) আত্-তাফসীরাতুল আহ্মাদিয়্যাহ্ ফী বায়ানিল্ আয়াতিশ্' শার'ইয়্যাহ্ মা'আ তা'রিফাতিল মাসায়িল আল-ফিকহিয়্যাহ্ঃ

যা 'তাফসীরে আহ্মাদী' নামেই বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। এটি আরবী ভাষায় লিখিত। যা ভারতীয় উপমহাদেশে আহ্কাম (বিধি-বিধান) সম্পর্কিত প্রথম[১১] এবং তাফসীর হিসেবে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে।[১২] এটি ইসলামী আইনের উপর আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের একটি স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ রচনাকর্ম।

আল্লামা মুল্লাজীউন তাঁর 'তাফ্সীরে আহ্মাদী' এর ভূমিকায় বলেছেনঃ

"আমি বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছিলাম যে, ইমাম গাযালী (রহ.) ৫০০ আয়াতকে একত্রিত করে একখানি গ্রন্থ লিখেছেন; যা থেকে শরীয়াতের আহ্কাম (বিধি-বিধান) উদ্‌ঘাটন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আমি এর কোনো সন্ধান পেলাম না; জানতে পারলাম, তিনি আসলে এ কাজ করেননি। তাই তখন আমি নিজেই এটা লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আমার বয়স ১৬/১৭ বছর। তখন আমি নিজ শহর 'আমেথী' তে 'হুস্সামী' কিতাব পড়ি। এ বছর থেকে কুরআনের আয়াত এক এক করে পড়ি এবং এর উপর গবেষণা করে শরীয়াতের মাস্আলা উদ্‌ঘাটন করতে থাকি। আর যখন আমার বয়স ২১/২২ বছর, তখন আমি 'শরহে মাতালে' কিতাব (নিজ শহর আমেথীতে) পড়ি। ঐ সময়ই এ কিতাব আমার লেখা হয়ে যায়।"[১৩]

সুতরাং, আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের এ তাফসীর খানা ছাত্রাবস্থায় মাত্র পাঁচ বছরে (১০৬৪-৬৯ হিঃ/১৬৫৩-৫৮ খ্রিঃ) সংকলিত হয়েছে।[১৪]

ফিক্হ (ইসলামী আইন শাস্ত্র) ও উসূলে তাফসীর (তাফ্সীর রচনার মূলনীতি) এর দৃষ্টিকোণ থেকে 'তাফ্সীরে আহ্মাদী' এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। প্রথমে মুল্লাজীউন মাস্আলা বা বিধানের নাম লিখেছেন, তারপর সেই সংক্রান্ত আয়াত এনেছেন। অতঃপর শানে

---

[১১]. *The Islamic University Studies*, Vol-i, (Published by the Registrar), Islamic University, Kushtia, Bangladesh: 1991, p. 44.
[১২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।
[১৩]. শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *আত্-তাফসীরাতুল আহ্মাদিয়্যাহ*, মাতবা'আ কারিমিয়্যাহ, দেওবন্দ, বোম্বেঃ ১৩২৭ হি./১৯০৬ খ্রি., পৃ. ৭৪৭।
[১৪]. Dr. M.M. Rahman, *An Introduction of Al-Maturidi's Tawilat*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka: 1981, p. 90.

Dhaka University Institutional Repository

নুযুল (আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট) বর্ণনা করেছেন। তারপর সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা থাকলে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১৫]

এরপর শব্দ ও অভিধানের (লুগাত) ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করতঃ ইমামদের মাযহাব সমূহ উল্লেখ করে হানাফী মাযহাব যে যুক্তিগ্রাহ্য, সর্বদিক দিয়ে শরীয়াত সম্মত ও সহজ-সাধ্য; তা প্রমাণ করেছেন। মাঝে মাঝে তারকীব (বাক্য বিশ্লেষণ), এ'রা (যের, যবর, পেশ ইত্যাদি) ও নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। পরিশেষে কোন্ কোন্ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি টেনেছেন, তা-ও উল্লেখ করেছেন।[১৬]

তাফসীর খানার প্রথমে তিনি ভূমিকা টেনেছেন। তাতে আল্লাহ্-রাসূলের (সাঃ) প্রশংসান্তে কোন্ কোন্ কিতাবের সাহায্য নিয়েছেন তা উল্লেখ করতঃ সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের ভূঁয়সী প্রসংসা করে ভূমিকার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এতে মনে হয় উহা তাঁর নামে উৎসর্গিত।

অতঃপর সূরা ফাতিহাতে যে সমস্ত কোরানের সমন্বয় ঘটেছে, তা উল্লেখ করেছেন। তবে এটা বিধানমুক্ত। তারপর 'সূরা বাক্বারা' এর উল্লেখ করে বলেছেন, এতে বহুবিধ বিধানের সমাহার ঘটেছে। এরপর এক এক করে বিধান (মাস্আলা) উদ্ঘাটন করেছেন। এভাবে সূরা ফাতিহা হতে সূরা কাউসার পর্যন্ত গিয়েছেন। আর কোন্ কোন্ সূরা বিধানমুক্ত তা-ও বলে দিয়েছেন।[১৭]

গ্রন্থের সমাপনীতে আল্লামা মুল্লাজীউন তাঁর নিজের নাম, বংশ, মাযহাব, কোন্ সময় কিতাব লেখা শুরু করেছেন, কোন্ সময় শেষ করেছেন এবং কোন্ সময় দ্বিতীয়বার সংশোধনী দেখেছেন; তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। গ্রন্থের শেষে প্রার্থনা বাক্যটি ছিলো নিম্নরূপঃ

> "আল্-হামদু লিল্লাহি 'আলা নাওয়ালিহ্, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্
> সালামু 'আলা রাসূলিহ, ওয়ালিহি ওয়া আস্হাবিহি আজ্মা'য়ীন,
> বি-রাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।"[১৮]

---

[১৫]. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী অনূদিত, *তাফসীরে আহ্কামুল কুরআন,* মদীনা শরীফ পারফিউমারী হাউজ, ঢাকাঃ ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খ্রি., ৩৭।

[১৬]. প্রাগুক্ত।

[১৭]. আল-বাগদাদী, *হাদয়াতুল আরেফীন,* মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ্, মিশরঃ ১৯৮৫, পৃ. ৩২৬।

[১৮]. ড. সালিম কে. দাওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাস্সিরীন আওর উন্কী আরবী তাফসীরেঁ,* মাক্তাবাতু জামিয়া লিমিটেড, ১ম . প্রকাশ, নতুন দিল্লী, ভারতঃ ১৯৭৩, পৃ. ২৩৪-২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

(ii) নূরুল্ আনওয়ার ফী শারহীল্ মানারঃ

এটাই গ্রন্থকার আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন কর্তৃক রাখা নাম।[১৯] এ গ্রন্থটিও ইমলামী আইন চর্চায় আল্লামা মুল্লাজীউনের অপরিসীম অবদানের অন্যতম আরেকটি বড় স্বীকৃতি। এই কালজয়ী ও অমর গ্রন্থটি হিজরী একাদশ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ করা হয়।[২০] এটি লেখার উৎস ও সময়কাল সম্পর্কে লেখক আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন নিজেই উল্লেখ করেছেন যে-

"ইবনে আহ্মাদ আন্-নাসাফী (মৃঃ ৭১০ হিঃ) এর রচিত 'আল্-মানার' গ্রন্থখানা 'উসূলে ফিক্হ' এর কিতাবগুলোর মধ্যে ভাষা ও বক্তব্যের দিক দিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত অথচ উপকারী এবং সূক্ষ্মদর্শিতা ও বাস্তবতার বোধগম্যের বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিলো; কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী কোনো ব্যাখ্যাকার এর কোনো স্বার্থক ব্যাখ্যা- গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেননি। আর যাঁরা এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছেন, তারাও ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকতে পারেননি। কেননা এদের কোনো কোনোটি অত্যধিক সংক্ষিপ্ত হওয়াতে উদ্দেশ্য অনুধাবনে অসুবিধাজনক হয়েছে। [যেমন, মূল গ্রন্থকার (নাসাফী) কর্তৃক শরাহ্ "কাশ্ফুল আসরার ফী শারহীল মানার"। আবার কোনো কোনোটি অতি দীর্ঘ হওয়ার দরুন উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে বিরক্তিজনক হয়েছে।]

তাই বহু পূর্বেই আমার মনে এই সংকল্পের উদয় হয়েছিলো যে, আমি এর (আল্-মানার) এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করবো, যাতে এর সমস্ত জটিল মাস্আলাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। আর এর কঠিন-কঠিন আলোচনাগুলো সুস্পষ্ট ও সহজেই বোধগম্য হবে।

অথচ না কোনোরূপ অভিযোগ উত্থাপন ও খন্ডনের চেষ্টা করবো, আর না সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আলোচনার প্রয়াস পাবো; যা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারগণ হতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নানাবিধ কাজের চাপ আর সময়ের স্বল্পতার দরুন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এটা লেখার সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি।[২১]

যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে যখন আমি পবিত্র মক্কা-মুয়াজ্জমাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছলাম, তখন হেরেম শরীফ ও মসজিদে নববী শরীফের আমার কতিপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রগণ উল্লেখিত কিতাবখানা (আল-মানার) আমার নিকট পাঠ করে শোনালেন। তাঁরা আমাকে

---

[১৯]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, *কামরুল আক্রাম শরহে নূরুল্ আনওয়ার (আরবী)*, মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৮৩, পৃ. ৫।

[২০]. এ কালজয়ী গ্রন্থটি আল্লামা মুল্লাজীউন মাত্র ৭৩ দিনের মধ্যে সংকলন করেন। তাঁর কাছে কোনো তথ্যপঞ্জীও তখন ছিলো না। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮)।

[২১]. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এর একটি শরাহ্ (ব্যাখ্যা-গ্রন্থ) লেখার মহৎ কাজটি সম্পাদনের অনুরোধ জানালেন। এমনকি আমাকে এমনভাবে বাধ্য করলেন যে, এ ব্যাপারে আমার কোনো ওজর-আপত্তিই তারা শুনলেন না।

সুতরাং সে অবস্থায়ই কোনোরূপ সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে স্মৃতিপটে যা ছিলো তা দিয়েই তাঁদের প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্খিত কাজটি সম্পাদনে মনোনিবেশ করলাম। আর আমি এর নাম রাখলাম- 'নূরুল্-আনওয়ার ফী শারহীল মানার' হিসেবে"।[২২]

উল্লেখ্য যে, এটা ছিলো আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের মক্কা-মদীনায় প্রথম সফর। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৫৮ বছর। এ কিতাবটি লেখা শুরু করেছিলেন ১১০৫ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে, আর শেষ করেছিলেন ৭ই জুমাদিউল্ উলায়। সময় লেগেছিলো মাত্র ২ মাস ৭ দিন মতান্তরে ১২ দিন।[২৩] যা বিস্ময়করও বটে। যদিও এটি (নূরুল্ আন্ওয়ার) এটি শরাহ্ (ব্যাখ্যা-গ্রন্থ); তথাপি তা স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বে ভাস্বর।

আলোচ্য গ্রন্থটির নাম কেনো 'নূরুল্-আন্ওয়ার' রাখা হয়েছে, তা সহজেই বোধগম্য। 'নূর' আরবী ভাষার একবচনের শব্দ, যার অর্থ-আলো। আর 'আন্ওয়ার' শব্দটিও অনুরূপ 'নূর' শব্দের বহুবচন। অর্থ হলো- আলো সমূহ। এখন 'নূরুল্-আনওয়ার' এর একত্রে অর্থ দাঁড়ায় 'আলো সমূহের আলো' (Light of Lights)।[২৪] অর্থাৎ ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর সেই শাস্ত্রের একটি আলোকরশ্মি হলো এই 'নূরুল-আনওয়ার' গ্রন্থটি। তাই এদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণ যথার্থ ও স্বার্থক হয়েছে।[২৫]

'নূরুল্-আন্ওয়ার' মূল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লিখিত। পাঠকগণের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য তিনি প্রথমে শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন। তারপর কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের কথা

---

[২২]. মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল আহাদ কাসেমী ও মাওলানা উবাইদুল হক জালালাবাদী সংকলিত, *নূরুল-আন্ওয়ার মা'আ আয্হারুল্ আযহার*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯৭৬, পৃ. ১-২।

[২৩]. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়িরাতু মা'আরিফ ইসলামিয়্যাহ্*, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ৭ম খন্ড, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৭১, পৃ. ৬০৬।

[২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

[২৫]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, *কামরুল্ আক্মার শারহু নূরিল্ আন্ওয়ার (আরবী)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮-৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

কাজ ও সাল্ফে সালেহীনদের মতামত উপস্থাপন করেছেন। মূল গ্রন্থ 'আল-মানার' এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছেন। ভাষার মাধুর্যতা ও অলংকারিত্ব ও প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট।[২৬]

প্রথমে আল্লামা মুল্লাজীউন 'আল-মানার' এর ভাষ্য লিখেছেন। তারপর কোনো উহ্য প্রশ্ন থাকলে, তা তুলে ধরেছেন। এরপর কোন্ ইমাম কী বলেছেন, তা স্পষ্ট করেছেন। অতঃপর প্রত্যেক ইমামের জবাব হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে দিয়েছেন। ইমাম তাহাভীকে যদি হানাফী মাযহাবের 'Advocate' বলা যায়, তাহলে মুল্লাজীউনকেও 'উসূলে ফিক্হ' এর 'Advocate' বলা অত্যুক্তি হবে না।

আল্লামা ইমাম যামাখ্শারী যেমন প্রশ্নোত্তর আকারে 'তাফ্সীরে কাশ্শাফ' লিখে জটিল বিষয়কে সহজ করে দিয়েছেন; মুল্লাজীউন ও তেমনি 'উসূল-নীতির' দূর্বোধ্য বিষয়-গুলোকে বোধগম্য করে সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন।[২৭] আর 'নূরুল্-আন্ওয়ার' গ্রন্থটিতে 'ইলমে উসূলে ফিক্হ' এর আলোচ্য বিষয় দলীল চতুষ্টয় তথা 'কিতাবুল্লাহ্' 'সুন্নাতে রাসূল (সা.) 'ইজ্মায়ে উম্মাত' ও 'ক্বিয়াস' এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

আর মুল্লাজীউন গ্রন্থটি শুরু করেছেন- "আল্-হাম্দু লিল্লাহ্ আল্লাযী জা'আলা উসূলাল্ ফিক্হী মাব্নিয়ান্ লিশ্ শারায়ি", আর শেষ করেছেন- "রাব্বানাফ্তাহ্ বায়নানা ওয়া বায়না কাওমিনা বিল-হাক্কে ওয়া আন্তা খাইরুল্ ফাতিহীন" বাক্য দ্বারা।[২৮]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, উপরোক্ত গ্রন্থ দু'টি ইসলামী আইন চর্চায় আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অতুলনীয় অবদানের দু'টি অমর কীর্তি; যা আজও গোটা বিশ্ব-মুসলিমের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

---

[২৬]. মাওলানা রফীক আহ্মাদ, *ইরশাদুত্তালিবীন ফী আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, পটিয়া, চট্টগ্রামঃ ১৩৯৯ হিজরী, পৃ. ৫৬৭।

[২৭]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, ৬ষ্ঠ খন্ড, হায়দারাবাদ, ভারতঃ ১৩০৫ হিজরী, পৃ. ২৭।

[২৮]. মাওলানা রফীক আহ্মাদ, *ইরশাদুত্তালিবীন ফী আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৭।

Dhaka University Institutional Repository

(২) শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগঃ

ইসলামী আইন চর্চায় আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের আরেকটি বড় অবদান হলো শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ। মূলতঃ ইসলামী আইনকে যথাযথভাবে চর্চা ও অনুশীলনের জন্যেই তিনি এ পেশায় নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন।

আল্লামা মুল্লাজীউনের প্রাথমিক শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয় নিজ শহর 'আমেথী'তে। তিনি এখানে একটি মাদ্রাসাও স্থাপন করেন এবং নিয়মিত পাঠদান কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। সময়ের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর লিখিত তাফসীরখানার সংশোধনী দেখেন। এভাবে এখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ইসলামী আইনের চর্চায় তাঁর ৪০টি বছর কেটে যায়।[২৯]

অতঃপর তিনি আজমীর ও দিল্লীতে যান। এখানেও তিনি শিক্ষাদানে ব্রতী হন। বহুলোক তাঁর কাছ থেকে ইসলামের মৌলিক বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন।[৩০] এ পেশায় আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের কেটেছিলো প্রায় ৬১/৬২ বছর।[৩১] বলা যায়, তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন শিক্ষকতা পেশায়।

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন শিক্ষকতা পেশায় যেখানেই নিয়োজিত হন; সেখানেই তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শরীর চর্চা, কুচ্‌কাওয়াজ ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, একজন মুমীনকে যেমন নফ্স (প্রবৃত্তি) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন;[৩২] ঠিক অনুরূপভাবে প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শারীরিক শক্তির ও প্রয়োজন রয়েছে।[৩৩] সুতরাং, আহ্মাদ মুল্লাজীউনের মতে- যুদ্ধ দুই প্রকার। যথাঃ

(i) আধ্যাত্মিক যুদ্ধ (Spiritual Fight/Fight with Devils)

(ii) শত্রুর সাথে যুদ্ধ (Fight with enemies)

---

[২৯]. ফকীর মুহাম্মদ, *হাদাইকুল হানাফিয়্যাহ্*, নওয়াল কিশের প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ভারতঃ ১৮৮৬, পৃ. ৪৩৬।

[৩০]. শাকির আখতার, *ইযাহু'ল মাকনুন*, ২য় খন্ড, মাকতাবাতুল ইসতিকামাহ, কায়রো, মিশরঃ ১৯৩৯ খ্রি., পৃ. ৫৫৪।

[৩১]. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

[৩২]. শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন, *আত্-তাফ্সীরাতুল আহ্মাদিয়্যাহ্*, (প্রকাশকঃ আব্দুল করিম), দেওবন্দ, বোম্বে, ভারতঃ . ১৩২৭ হি./১৯০৬ খ্রি., পৃ. ৭৪০।

[৩৩].শাহ্ নওয়াজ খান, *মা'আছিরু'ল উমারা*, ৩য় খন্ড, আসরারে করিমী প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ পৃ. ৭৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত দু'প্রকার যুদ্ধের সমন্বয়েই মূলতঃ একজন মুমীনের জীবন। তিনি তাঁর শিষ্যদের পাঠদানের সময় বলতেনঃ

"তোমরা জিহাদের আয়াত পড়বে, এবং রাসূল (সাঃ), সাহাবী ও পূর্ব-পুরুষদের যুদ্ধের কাহিনী পড়বে; অথচ যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার্জন করবে না, তা কখনো হতে পারে না। বরং সন্তরন, ঘৌড়-সওয়ারী এবং অসি চালনা শিক্ষা দেয়া প্রত্যেক শিক্ষকের উপরই অত্যাবশ্যক। কেননা, পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে একজন পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শবান মানুষ হবার জন্যই তো বিদ্যালয়ে পাঠান।"[৩৪]

আল্লামা মুল্লাজীউন প্রতিদিন সকাল-বিকাল তার ছাত্রদেরকে সন্তরন, ঘৌড় সাওয়ার এবং অসি চালনা শিক্ষা দিতেন। একদা সম্রাট আওরঙ্গজেব কোনো একটি কারণে দিল্লিতে যান। তিনি সকালে প্রাসাদ থেকে দেখলেন, মুল্লাজী মাদ্রাসার ছেলেদেরকে ঐরূপ প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। অতঃপর সম্রাট লোক মারফত মুল্লাজীকে ডেকে এনে প্রশ্ন করলেন- "আপনার দায়িত্ব হলো কেবল ইসলামী বিষয়ে পাঠদান করা, তবে আপনি কেনো তাদেরকে এরূপ সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন?"
সম্রাটের প্রশ্নের জবাবে মুল্লাজী বললেনঃ

"ইসলাম আমাদেরকে ঐরূপই শিক্ষা দেবার কথা বলেছে, তাই আমি এমনটি শিক্ষা দিচ্ছি। এতে লেখা-পড়ার কোনো ক্ষতি হয় না, বরং ছেলে মেয়েরা আনন্দই পায়। আর সে কারণেই হয়তো আমার মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।"[৩৫]

সম্রাট আওরঙ্গজেব একথা শুনে তাঁর প্রতি অত্যন্ত খুশী হয়ে যান। এরপর থেকেই মুল্লাজীকে সব সময় সম্রাট সাথে রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। অতঃপর তাঁকে রাজ- দরবার ও সেনানিবাসের প্রশিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন।

এছাড়া আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন তাঁর হাজ্জের দ্বিতীয় সফরে মক্কা-মদীনায় এসে বোখারী- মুসলিমের পাঠদানে ব্যাপৃত থাকেন এবং কোনো রকম শরাহ্-শরুহাত ছাড়াই অত্যন্ত যশ ও দৃঢ়তার সাথে গবেষণালব্ধ পাঠদান করেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন স্থানে নিজেকে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত করে প্রকারান্তরে ইসলামী আইনের চর্চা ও বিকাশ সাধন করে গিয়েছেন।[৩৬]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন শিক্ষকতা পেশার মাধ্যমে ইসলামী আইন চর্চা যে অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন, সেজন্য তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

---

৩৪. Mohammad Jubaer Ahmed, *Contribution of India to Arabic Literature*, Alahabad, India: 1946, p. 218.

৩৫. *আত্-তায্কীরা,* (স্মরণিকা) বার্ষিকী, মাদ্রাসা-ই-উস্তাদ আলমগীর মুল্লাজীউন, আমেথী, ভারতঃ ১৯৮৬, পৃ. ৩।

৩৬. মানযুর নোমানী কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-ফুরকান,* (উর্দু মাসিক), বেরিলী (Barielly)ঃ ১৯৩৫, ৩২তম সংখ্যা, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) আল-ফাত্ওয়া আল্-হিন্দীয়াহ্তে মুল্লাজীউনের অবদানঃ

ইসলামী আইন চর্চায় আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অন্যতম আরেকটি অবদান হলো 'আল্-ফাতওয়া আল-হিন্দীয়াহ্' নামক মহামূল্যবান কিতাবটি। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর দু'লক্ষ টাকা ব্যয় করে,[৩৭] তৎকালীন সময়ের চল্লিশ-পঞ্চাশজন সুবিজ্ঞ আলিমদের দিয়ে 'আল্-ফাত্ওয়া আল-হিন্দীয়াহ্' শীর্ষক মহামূল্যবান কিতাবটি সংকলন করেন। সে কারণে তাঁর নামানুসারে এটা 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরী' নামেও সুপরিচিত।[৩৮]

এ মহামূল্যবান কিতাবটি হানাফী মাযহাবের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন শাস্ত্র। একদল উলামায়ে কিরাম বলেছেন, এ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি সংকলনে আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের অবদান অনস্বীকার্য এবং তাঁর সার্বিক সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। যা আমাদের দেশের অন্যতম প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমে- দ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন খানও 'তাফসীরে আহ্কামুল কুরআন' এর ভূমিকায় লিখেছেন।[৩৯]

এ ফাতওয়ার কিতাবটি লেখা শুরু হয় (১০৭৪-৭৫ হিঃ/১৬৬৪-৬৫) সনে, আর শেষ হয় (১০৮২ হিঃ/১৬৭২ খ্রিঃ) সনে। সম্পাদনার কাজ শেষ হতে সময় লেগেছিলো ৭/৮ বছর।[৪০] যতোদিন এ ফাতওয়ার কিতাবটি বিশ্বের বুকে টিকে থাকবে, ততোদিন এ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি সংকলনে অতুলনীয় অবদান রাখার জন্য আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।[৪১]

(৪) ধর্মপোদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ

[৩৭]. মাওলানা নিজাম এবং একদল ভারতীয় উলামা কর্তৃক সংকলিত, *আল-ফাত্ওয়া আল-আলামগীরীয়্যাহ্*, মাকতাবাতু মাজিদিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, পাকিস্তানঃ ১৯৮৩, পৃ. ২ (১ম খন্ডের সূচী দ্রষ্টব্য)।

[৩৮]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪ তম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ৫৬০।

[৩৯]. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী অনূদিত, *তাফসীরে আহ্কামুল কুরআন*, মদীনা শরীফ পারফিউমারী হাউজ, ঢাকাঃ ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., পৃ. (অভিমত ও দোয়াঃ মাওলানা মুহীউদ্দীন খান)। এটা মূলতঃ তাফসীরে আহ্মাদিয়্যাহ্ এর বঙ্গানুবাদ।)

[৪০]. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়িরাতু মা'আরিফুল ইসলামিয়্যাহ*, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ১৫শ খন্ড, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানঃ ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি., পৃ. ১৪৯।

[৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২-৫৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর ও বাহাদুর শাহের রাজ-সভার ধর্মপোদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন ইসলামী আইন চর্চায় আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের আরেকটি বিরাট অবদান। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করতঃ রাজ-পরিবার ও রাজ দরবারের লোকদেরকে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় তথা কুরআন, হাদীস, তাফসীর, আকাঈদ (ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত বিদ্যা), মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), তাসাওউফ (আধ্যাত্মবাদ), নাহু (বাক্য প্রকরণ ও শব্দের শেষ অক্ষরের স্বরচিহ্ন নির্ণয় শাস্ত্র), সরফ (শব্দ প্রকরণ বিদ্যা), বালাগাত (বাক্যালংকার শাস্ত্র), ফিক্‌হ (ইসলামী আইন শাস্ত্র), উসূল-ই-ফিক্‌হ (ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি), আরবী, ফার্সী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।[৪২]

আল্লামা মুল্লাজীউন দীর্ঘ ১২টি বছরেরও বেশী সময় একাধারে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর ও তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহের রাজ-দরবারের একজন রাজ-পন্ডিত ও ধর্মপোদেষ্টা হিসেবে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[৪৩]

প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা মুল্লাজীউনের সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজ-দরবারের একজন রাজপন্ডিত ও ধর্মপোদেষ্টা (The Religious Teacher and Guide) হিসেবে যোগদানের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে পারি, সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষ্যে অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তখন তিনি দেশ-বরেণ্য আলেমদেরকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে ধর্মীয় ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন।[৪৪] আল্লামা মুল্লাজীউন সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্রাটকে ধর্মীয় সংস্কার কার্যে পরামর্শ দেন; যা সম্রাটের মনোপুতও হয়।

আর মনোপুত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা মুল্লাজী তৎসময়েই শিক্ষা সমাপনী সনদ লাভ করেছেন এবং 'আদাব-ই-আহ্‌মাদী' ও 'তাফসীরে আহ্‌মাদী' সহ বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই লিখে ফেলেছিলেন।[৪৫] ফলশ্রুতিতে মুল্লাজীর সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখন এ সুনামের খবর রাজ-দরবারেও পৌছেছিলো। অতঃপর সম্রাট তাঁকে স্বীয় রাজ-দরবারের রাজ-

[৪২]. ওমর রেজা কাহ্‌হালা, *মুজামুল মুআল্লিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।
[৪৩]. মাওলানা আজাদ বিলগ্রামী, *সুবহাতুল মারজান*, বোম্বে, ভারতঃ ১৩০৩ হি./১৮৮৫ খ্রি., পৃ. ২৭৫।
[৪৪]. মাওলানা বদীউল আলম ও মাওলানা আব্দুল্লাহ অনূদিত ও সংকলিত, *ইযাহুল আসরার ফী শারহি নূরুল আনওয়ার*, ২য় প্রকাশ, ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃ. ২৭০।
[৪৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

পন্ডিত ও ধর্মপোদেষ্টা হিসেবে যোগদানের প্রস্তাব করলে মুল্লাজীউনও ইসলামী আইন চর্চার একটি মোক্ষম সুযোগ মনে করে সম্রাটের কথায় সাঁয় দিয়ে রাজ-দরবারের একজন রাজ-পন্ডিত ও ধর্মপোদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৪৬]

এখানে পাঠকদের মনের মাঝে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। আর তা হলো-আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন অন্যান্য আলেম ও সূফী-সাধকের ন্যায় মাদ্রাসায় ও নির্জনে না থেকে কেনো রাজ-দরবারে চাকুরী করলেন বা রাজ-রাজাদের সংস্পর্শে থাকাটাকে বেশী পছন্দ করলেন-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী তাঁর বিখ্যাত 'নুযহাতুল খাওয়াতির' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেনঃ

"মুল্লাজী মানুষের উপকার করার জন্যই রাজ-দরবারে চাকুরী নিয়েছিলেন; অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। তিনি চেয়েছিলেন, রাজ-রাজাদের যদি সূফী-সাধক ও মুত্তাকী বানানো যায়; তবে ইসলামের বড় উপকার হবে। শত-শত শির্ক- বিদ্আতের বিলোপ হবে। আর হয়েছিলো ও তাই। কেননা তাঁরই প্রভাবে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর একজন ধর্মভীরু বাদশাহ্ হয়ে যায়। যার মাধ্যমে সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত 'দ্বীন-ই-ইলাহী' মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধিত হয়ে যায়; যদিও এ মতবাদের বিলোপ সাধনের সূচনা হয়েছিলো 'শায়খুল হিন্দ' হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্ফে সানী (রহ.) এর সময় থেকে। তিনি নিজের জন্য রাজ-দরবারে কোনো কিছু কোনোদিন চাননি। কিন্তু বহু মানুষের জন্য রাজ-দরবারে সুপারিশ করেছেন।"[৪৭]

অতএব, আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভীর উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারাই শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনে রাজ-রাজাদের সংস্পর্শে থাকার কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হলো। আর এর ভেতর দিয়ে এটাই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হলো যে, মূলতঃ তিনি রাজ-দরবারে ইসলামী আইনের চর্চা, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যেই নিজেকে রাজ-দরবারের রাজ-পন্ডিত ও ধর্মপোদেষ্টা হিসেবে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

---

[৪৬]. খাদিম হুসাইন, *তারীখ কাসাবা-ই-আমেথী*, নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ভারতঃ ১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ৪৪৭।

[৪৭]. মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *নুযহাতুল খাওয়াতির*, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২য় সংস্করণ, হায়দারাবাদ, হিন্দ (ভারত)ঃ ১৩৯৮ হি./ ১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ

কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের ইসলামী আইনের প্রচার প্রসার ও চর্চায় বিশাল অন্যতম আরেকটি অবদান। এ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে মুল্লাজীউন রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করেন এবং বিভিন্ন জটিল ও স্পর্শকাতর বিচারাদির সুষ্ঠু বিচার ফায়সালা করেন। কাজীর দায়িত্ব পালনকালে তাঁকে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতো হতো। কেননা তাঁর অধীনে ছিলো একাধিক বিভাগের দায়িত্ব। যেমন-'আইন-ই-আকবরী'র মতে ৪টি,[৪৮] এবং 'পি' সারন' এর মতে- ১২টি[৪৯] বিভাগের দায়িত্ব তৎকালীন সময়ে একজন 'কাজী' কে পালন করতে হতো। এতো সব দায়িত্ব আল্লামা মুল্লাজীউন অত্যন্ত সুচারুরূপেই সম্পাদন করেছেন। ইতিহাস আমাদের তা-ই বলে।

(৬) বিদ্যালয় স্থাপন ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনঃ

অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন ইসলামী আইনের চর্চা ও লালনে আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অন্যতম মৌলিক আরেকটি অবদান।

আল্লামা মুল্লাজীউন সর্বপ্রথম নিজ শহর 'আমেথী'তে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এখানেই প্রাথমিকভাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। এছাড়াও মুল্লাজী দিল্লী ও আজমীর সহ আরও বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করে ইসলামী আইনের চর্চাকে সহজসাধ্য করেছেন।[৫০]

আল্লামা মুল্লাজীউন ছিলেন একজন আদর্শ সমাজ-সেবক। সমাজে দ্বীনি পরিবেশ কায়েম ও ইসলামী আইনের প্রচার-প্রসার ও চর্চার জন্যই মূলতঃ তিনি এতোগুলো বিদ্যালয় তথা মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও অনেক গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৫১] তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ও ছিলেন। শিক্ষাকে তিনি যথার্থ মর্যাদা

---

৪৮. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, ২য় খন্ড, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ভারতঃ ১৯৭৮, পৃ. ৪৩।

৪৯. P. Saran, *The Provincial Government of Mughals*, 2nd Edition, Bombay, India: 1937, pp. 321-325.

৫০. *The Islamic University Studies*, Vol-i, (Published by the Registrar), Islamic University, Kushtia, Bangladesh: 1991, pp. 53-54.

৫১. খাদিম হুসাইন, *তারীখ কাসাবা-ই-আমেথী*, ইদারায়ে আদাবিয়্যাত, নতুন দিল্লী, ভারতঃ ১৯৫৭, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দিতেন। তিনি তাঁর সারাটি জীবন 'দর্স-তাদ্রীস' (নিজে শিক্ষার্জন করা ও অপরকে শিক্ষা দেয়া) এবং রচনা সংকলনে অতিবাহিত করেন। তিনি আপন-ভোলা শিশুর ন্যায় সরল চরিত্রের এবং ভারতীয় উপমহাদেশে একজন মহাজ্ঞানী আলেম ছিলেন।

(৭) শির্ক ও বিদ্আতের মূলোৎপাটনঃ

আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন ইসলামী আইনের চর্চাকে জীবন্ত রাখতে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শির্ক-বিদ্আতের মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে মুল্লাজী তাঁর 'আস্-সাফ্রু' (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত) শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেনঃ

"হাজ্জের দ্বিতীয় সফরে একদা আমি আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর মাযার যিয়ারত করি এবং তথায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের ফলে আমি লক্ষ্য করলাম, বহুলোক এখানে শরীয়াত-বিরোধী কাজ-কর্ম (শির্ক-বিদ্আত) করছে। তখন আমি মসজিদের প্রধান ইমামের সাথে পরামর্শ করে একটা বৈঠকের আয়োজন করলাম। সেখানে তারা সকলে আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তাদের একান্ত অনুরোধে আমি শির্ক-বিদ্আতের কুফল সম্পর্কে বক্তৃতা দিলাম। আমার বক্তৃতায় (আল্লাহর অনুগ্রহে) তারা এতোটাই আকৃষ্ট হলো যে, তারা অনুরোধ করলো- আমি যেন হাজ্জ্ব শেষে পুনরায় এখানে আসি এবং কিছুদিন তাদেরকে ওয়াজ-নসীহাত করি। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা আর হয়নি।"[৫২]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুল্লাজী ছিলেন মাযার যিয়ারতে পক্ষে, কিন্তু শির্ক-বিদ্আতের চরম বিপক্ষে। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবকেও তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত অনেক শির্ক-বিদ্আতের মূলোৎপাটনের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সম্রাট তা কার্যকরও করেছিলেন। এভাবেই আল্লামা মুল্লাজীউন ইসলামী আইনের চর্চা ও লালনে শির্ক-বিদ্আতের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন।[৫৩]

---

[৫২]. *বুরহান,* (উর্দু মাসিক), সম্পাদকঃ আহমাদ সাঈদ, ৫ম সংখ্যা, দিল্লীঃ ১৯৯৩, পৃ. ১৭।
[৫৩]. অধ্যাপক মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, *তাযকিরা-ই-উলামা-ই-জৌনপুর,* ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ভারতঃ ১৯৬২, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী আইন চর্চায় আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের অবদান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইন বিষয়ে আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনাঃ

আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য গ্রন্থাবলী রচনা করে গিয়েছেন, যার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা অত্র থিসিসের 'তৃতীয় অধ্যায়' এ আমরা উপস্থাপন করেছি। মুল্লাজীউনের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে দু'টি গ্রন্থ সরাসরিভাবে ইসলামী আইনের সাথে সম্পর্কিত। তন্মোধ্যে একটি হলো- 'তাফসীরে আহ্‌মাদী', আর অপরটি হলো- 'নূরুল্‌-আন্‌ওয়ার'।

আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিম্নে আমরা ইসলামী আইন বিষয়ে রচিত আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের উক্ত দু'টি মহামূল্যবান ও কালজয়ী গ্রন্থাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস পাবোঃ-

(i) আত্‌-তাফ্‌সীরাতুল্‌ আহ্‌মাদিয়্যাহ ফী বায়ানিল্‌ আয়াতি'শ্‌ শার'ইয়্যাহ্‌ মা'আ তা'রিফাতিল্‌ মাসায়িল আল্‌-ফিক্‌হিয়্যাহ্‌ঃ

যা 'তাফসীরে আহ্‌মাদী' নামে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। এটি আরবী ভাষায় লিখিত একটি কিতাব। যা ভারতীয় উপমহাদেশে আহ্‌কাম (বিধি-বিধান) সম্পর্কিত প্রথম[৫৪] এবং তাফসীর হিসেবে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে।[৫৫] এটি আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের একটি স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ রচনাকর্ম।

---

৫৪. *The Islamic University Studies*, op. cit., p. 44.

৫৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২শ খন্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীরে আহ্‌মাদী লেখার বাসনাঃ

আল্লামা শায়খ মুল্লাজীউন 'তাফসীরে আহ্‌মাদী' এর ভূমিকায় বলেছেনঃ

"আমি বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছিলাম যে, ইমাম গাযালী (রহ.) ৫০০ আয়াতকে একত্রিত করে একখানি গ্রন্থ লিখেছেন; যা থেকে তিনি শরীয়াতের আহ্‌কাম (বিধি-বিধান) উদ্‌ঘাটন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আমি এর কোনো সন্ধান পেলাম না; জানতে পারলাম, তিনি আসলে এ কাজ আদৌ করেননি। তাই তখন আমি নিজেই এটা লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

তখন আমার বয়স ১৬/১৭ বছর। তখন আমি নিজ শহর 'আমেথী' তে 'হুস্‌সামী' কিতাব পড়ি। এ বছর থেকে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত এক এক করে পড়ি এবং এর উপর গবেষনা করে শরীয়াতের মাস্‌আলা উদ্‌ঘাটন করতে থাকি। আর যখন আমার বয়স ২১/২২ বছর, তখন আমি 'শরহে মাতালে' কিতাব (নিজ শহর আমেথীতে) পড়ি। ঐ সময়ই এ কিতাব আমার লেখা হয়ে যায়।"[৫৬]

সুতরাং, আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের এ তাফসীর খানা ছাত্রাবস্থায় মাত্র পাঁচ বছরে (১০৬৪-৬৯হিঃ/১৬৫৩-৫৮ খ্রিঃ) সংকলিত হয়েছে।[৫৭]

তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদীর বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

ফিক্‌হ (ইসলামী আইন শাস্ত্র) ও উসূলে তাফসীর (তাফসীর রচনার মূলনীতি) এর দৃষ্টিকোণ থেকে 'তাফসীরে আহ্‌মাদী' এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। প্রথমে আল্লামা মুল্লাজীউন মাস্‌আলা বা বিধানের নাম লিখেছেন। তারপর সেই সংক্রান্ত আয়াত এনেছেন। অতঃপর শানে নুযুল (আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট) বর্ণনা করেছেন। তারপর সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা থাকলে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৫৮]

---

৫৬. শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *আত্‌-তাফ্‌সীরাতুল্‌ আহ্‌মাদিয়্যাহ্‌*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৭।
৫৭.Dr. M.M. Rahman, *An Introduction of Al-Maturidi's Tawilat*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka: 1981, p. 90.
৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী অনূদিত, *তাফসীরে আহ্‌কামুল কুরআন*, মদীনা শরীফ পারফিউমারী হাউজ, ঢাকাঃ ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৩৭।

এরপর শব্দ ও অভিধানের (লুগাত) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতঃ ইমামদের মাযহাব সমূহ উল্লেখ করে হানাফী মাযহাব যে যুক্তিগ্রাহ্য, সর্বদিক দিয়ে শরীয়াত সম্মত ও সহজ-সাধ্য; তা প্রমাণ করেছেন। মাঝে মাঝে তারকীব (বাক্য বিশ্লেষণ), এ'বার (যের, যবর, পেশ ইত্যাদি) ও নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। পরিশেষে কোন্ কোন্ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি টেনেছেন, তা-ও উল্লেখ করেছেন।[৫৯]

তাফসীরখানার প্রথমে তিনি ভূমিকা টেনেছেন। তাতে আল্লাহ-রাসূলের প্রশংসান্তে কোন্ কোন্ কিতাবের সাহায্য নিয়েছেন তা উল্লেখ করতঃ সম্রাট মুহীউদ্দীন আওরঙ্গজেবের ভূঁয়সী প্রশংসা করে ভূমিকার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এতে মনে হয় উহা তাঁর নামে উৎসর্গিত।

অতঃপর সূরা ফাতিহাতে যে সমস্ত কোরানের সমন্বয় ঘটেছে, তা উল্লেখ করেছেন। তবে এটা বিধানমুক্ত। তারপর 'সূরা বাক্বারা' এর উল্লেখ করে বলেছেন, এতে বহুবিধ বিধানের সমাহার ঘটেছে। এরপর এক এক করে বিধান (মাস্আলা) উদ্ঘাটন করেছেন। এভাবে সূরা ফাতিহা হতে সূরা কাউসার পর্যন্ত গিয়েছেন। আর কোন্ কোন্ সূরা বিধানমুক্ত তা-ও বলে দিয়েছেন।[৬০]

গ্রন্থের সমাপনীতে আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন তাঁর নিজের নাম, বংশ, মাযহাব, কোন্ সময় কিতাব লেখা শুরু করেছেন, কোন্ সময় শেষ করেছেন এবং কোন্ সময় দ্বিতীয়বার সংশোধনী দেখেছেন; তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। গ্রন্থের শেষে প্রার্থনা বাক্যটি ছিলো নিম্নরূপঃ

"আল্-হাম্দু লিল্লাহি 'আলা নাওয়ালিহ্, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্
সালামু 'আলা রাসূলিহ', ওয়ালিহি ওয়া আসহাবিহি আজ্মা'য়ীন,
বি-রাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।"[৬১]

<u>তাফসীরে আহ্মাদীর নমূনা গ্রন্থাবলীঃ</u>

বর্তমানে 'তাফসীরে আহমাদী' গ্রন্থের ৬ প্রকার নমূনা পাওয়া যায়। তা নিম্নরূপঃ-

(i) আত্-তাফসীরাতুল আহ্মাদিয়্যাহঃ এটি (১৩২৭ হিঃ/১৯০৬ খ্রিঃ) সনে বোম্বের 'কারিমিয়্যাহ্ প্রকাশনা' থেকে প্রকাশিত হয়। এতে আরবী হাশিয়া (ব্যাখ্যা)

---

[৫৯]. মাওলানা সাইয়্যিদ আব্দুল আহাদ আল-কাসেমী ও মাওলানা উবাঈদুল হক জালালাবাদী সংকলিত, *নূরুল্ আন্ওয়ার মা'আ আয্হারুল আয্হার*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯৭৬, পৃ. ৬৪।

[৬০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

[৬১]. ড. সালিম কে, দাওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাস্সিরীন আওর উন্কী আরবী তাফসীরেঁ*, মাকতাবাতু জামিয়া লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, নতুন দিল্লী, ভারতঃ ১৯৭৩, পৃ. ২৩৪-২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

লেখেন- মাওলানা রহীম বখ্‌শ। প্রকাশকঃ আব্দুল করিম, প্রথম প্রকাশ, সংখ্যাঃ ২০০ কপি, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১-৭৪৪।[৬২]

(ii) তাফসীরাতে আহ্‌মাদিয়্যাহ্ ফী বায়ানিল্ আয়াতি'শ্ শার'ইয়্যাহ্ঃ প্রকাশকঃ মুহাম্মদ শাকির আখতার, প্রকাশনীঃ মাকতাবাতে মুজতাবায়ী (মুজ্‌তাবায়ী লাইব্রেরীর মালিক), দেওবন্দ, শাহারানপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত। মুহাম্মদ শাকির আখতার (১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ খ্রিঃ) সনে এর একখানা উর্দু অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যার পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১-৫০২।[৬৩]

(iii) তাফসীরে আহ্‌কামুল কুরআনঃ মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী অনূদিত; প্রকাশনায়ঃ মদীনা শরীফ পারফিউমারী হাউজ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ কালঃ অক্টোবর ১৯৯৩ খ্রিঃ/ ১৪১৪ হিঃ, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১-৪২৩। আর এটিই সর্বপ্রথম বাংলায় অনুবাদ গ্রন্থ। অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী এর নাম পরিবর্তন করে 'তাফসীরে আহ্‌কামুল কুরআন' রেখেছেন। অনুবাদ কার্যে শুধুমাত্র মৌলিক অনুবাদ করেছেন। ফলে বইয়ের কলেবর ছোট হয়ে গিয়েছে। তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্য 'তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন' (মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী) ও 'তাফসীরে বায়ানুল কুরআন' (মাওলানা আশরাফ আলী থানভী) এর সহায়তা নিয়েছেন।[৬৪]

(iv) তাফসীরে ফাত্‌হুল কালামঃ এটি 'তাফ্‌সীরে আহ্‌মাদী' রই উর্দু অনুবাদ। যেটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা খান বাহাদুর আব্দুল করিম খাকী।[৬৫]

(v) তাফসীরে আহম্মাদীঃ (১৩০০ হিজরী/ ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ) সনে ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১-৬১৬।[৬৬]

---

৬২. প্রাগুক্ত, (এর জিরোক্স কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে রয়েছে। ক্যাটালগ নং- R.B.A. 297. 13, SHT)।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. (ভূমিকাঃ লেখকের কলাম দ্রষ্টব্য)।

৬৫. বড় সাইজের ১৪২ পৃষ্ঠা জোড়া এ অনুবাদ গ্রন্থটি (১৩০৭ হি./১৮৮৯ খ্রি.) সনে কলকাতার গাওসিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।)

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬৫ (এর জিরোক্স কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রয়েছে। ক্যাটালগ নং- A-207. 13,. SHT)।

Dhaka University Institutional Repository

(vi) তাফসীরে আহ্‌মাদিয়্যাহ্‌ঃ এটিও (১৩২৭ হিঃ/১৯০৪ খ্রিঃ) সনে ভারতের কলকাতা প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১-৬৭১।[৬৭]

উপরোক্ত ১, ৫ ও ৬নং মৌলিক গ্রন্থ তিনটি বর্তমানে বাজারে নেই। তবে কোনো কোনো লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এগুলোর জিরোক্স কপি রয়েছে।

তাফসীরে আহ্‌মাদীতে আলোচনায় স্থান পাওয়া সূরা, আয়াত ও বিষয়সমূহঃ

যদিও আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউনের পাঁচশত (৫০০) আয়াত নিয়ে তাফসীর লেখার কথা ছিলো,[৬৮] কিন্তু তিনি তা লেখেননি। বরং তিনি চারশত ছিচল্লিশ (৪৪৬) টি আয়াত নিয়ে তাফসীর লিখেছেন। মুসলিম আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় যে 'থিসিস' (Thesis)[৬৯] এর উপর ড. সালিম কে. দাওয়ায়ীকে 'ডক্টোরেট ডিগ্রী' (Doctorate Degree) প্রদান করেছে, তাতে তিনি ৪৫০টি আয়াতের কথা বলেছেন।[৭০] মূলতঃ ৪৪৬ টি আয়াত; ৪৫০টি আয়াত নয়। তাঁর লেখাতে 'প্রায়' শব্দটি আছে। তাই এটা তেমন কিছু নয়। বরং তিনি (ড. সালিম কে, দাওয়ায়ী) প্রায় কাছাকাছি সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।

সূরা বাক্বারায়৭৫টি, আলে 'ইমরানে ১২টি, নিসায়-৪৭টি, মায়িদায়-২০টি, আন-'আমে ১৫টি, আ'রাফে-৮টি, আনফালে-১১টি, তাওবায়-১৮টি, ইউসুফে-৩টি, নাহ্‌লে-৯টি, বনী ইসরাঈলে-৭টি, কাহাফে-২টি, মারইয়ামে-২টি, ত্ব-হায়-৩টি, আম্বিয়ায়-৪টি, হাজ্জে-৭টি, মু'মিনুনে-৩টি, নূরে-২১টি, ফুরকানে-৩টি, শু'আরায়-৯টি, কাসাসে-২টি, রূ'মে-৭টি, লুকমানে-৩টি, আহযাবে ১৭টি, ইয়াসীনে-৭টি, সাফ্‌ফাতে-৫টি, সাদে-৫টি, যুমারে-৪টি, শু'রায়-৬টি, যুখরুফে-২টি, দুখানে-৩টি, আহ্‌কাফে-৪টি, মুহাম্মাদে-৪টি, ফাত্‌হে-৭টি, হুজুরাতে-৪টি, যারিয়াতে-২টি, ওয়াক্বিয়ায়-৬টি, মুজাদালায়-৪টি, হাশরে-৯টি, মুম্‌তাহিনায়-৫টি, জুম্'আয়-৩টি,

---

[৬৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২ (এর জিরোক্স কপিটিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রয়েছে। ক্যাটালগ নং- A-297. 13, SHT)।

[৬৮]. শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন, *আত্‌-তাফসীরাতুল আহ্‌মাদিয়্যাহ্‌ ফী বায়ানিল আয়াতি'শ্ শার'ইয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৮।

[৬৯]. ড. সালিম কে, দাওয়ায়ীর রচিত থিসিসের নামঃ *"হিন্দুস্তানী মুফাস্‌সিরীন আওর উন্‌কী আরবী তাফসীরে।"* এ বিষয়ের উপর মুসলিম আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি 'ডক্টোরেট ডিগ্রী' প্রাপ্ত হন।

[৭০]. ড. সালিম কে, দাওয়ায়ী, *হিন্দুস্তানী মুফাস্‌সিরীন আওর উন্‌কী আরবী তাফসীরেঁ*, মাক্‌তাবাতু জামি'আ লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, নতুন দিল্লী, ভারতঃ ১৯৭৩, পৃ. ৭৫-৮১।

মুনাফিকুনে-২টি, তাল্লাকে-৪টি, তাহ্রীমে-২টি, নূহে-৩টি, মুয্যাম্মীলে-৫টি, মুদ্দাস্সিরে-১৪টি, ক্বিয়ামাতে-১০টি, ইনশিক্বাকে-৩টি, আ'লায়-২টি, কাওসারে-৩টি আর বাকী সূরাগুলোতে একটি করে আয়াত প্রাধান্য পেয়েছে। সবচেয়ে বেশী আলোচিত হয়েছে সূরা বাক্বারায়।

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের তাফসীরে সর্বমোট ৬১টি সূরা এবং ২৯২টি প্রধান মাস্আলা বা বিধান আলোচিত হয়েছে। অনেক সময় একটি আয়াত থেকে অনেকগুলো মাস্আলা উদ্ঘাটন করেছেন এবং তা থেকে আবার উপ-মাস্আলা বা বিধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। সে হিসেবে তা কয়েক হাজার প্রায়। তবে এখানে মূখ্য মাস্আলা (বিধান) গুলো দেয়া হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

সূরা	আয়াত	বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)
সূরা বাক্বারাহ	২৯	১। প্রত্যেক বস্তুই মানব কল্যাণে সৃষ্টঃ প্রত্যেক বস্তুই মূলত হালাল যতক্ষন নিষেধ না আসে।
সূরা বাক্বারাহ	৪৩	২। জামাতে নামাজ আদায় করার বিধানঃ রুকু ফরজ
সূরা বাক্বারাহ	১০৬	৩। আল্লাহর বিধান নস্খ বা রহিত হওয়ার গতি-প্রকৃতিঃ কেবলা পরিবর্তন।
সূরা বাক্বারাহ	১১৩	৪। মসজিদের জন্য সর্বসাধারণের প্রবেশ অনুমতি অপরিহার্যঃ মসজিদ ধ্বংস করা যাবে না
সূরা বাক্বারাহ	১১৬	৫। আল্লাহর সন্তান হওয়ার ধারণা প্রসঙ্গঃ পিতা-পুত্র আযাদের মাসয়ালা
সূরা বাক্বারাহ	১২৪	৬। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় ও মানুষের ইমাম বানানোর ব্যাপারে আল্লাহর বিধানঃ সমস্ত নবীই নিষ্পাপ, কাফেরকে ইমাম বানানো যাবেনা, ইমাম নিষ্পাপ হওয়া শর্ত না।
সূরা বাক্বারাহ	১১৫	৭। যানবাহনে চড়ে নফল নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা
সূরা বাক্বারাহ	১২৫	৮। কাবা শরীফ ও মাক্বামে ইব্রাহীমের বর্ণনাঃ পবিত্রতা ও নিরাপত্তা
সূরা বাক্বারাহ	১৪৩	৯। উম্মতে মোহাম্মদীই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতঃ ইজ্মা দলীল হওয়ার প্রমাণ
সূরা বাক্বারাহ	১৪৪	১০। কাবা গৃহকে কেবলা করার বর্ণনাঃ কাবার দিকে মুখ করা ফরজ
সূরা বাক্বারাহ	১৫৪	১১। শহীদগণ আল্লাহর কাছে সাধারণ মৃতদের মত নয়ঃ প্রকৃত শহীদ এবং কবরে প্রশান্তি[৭১]
সূরা বাক্বারাহ	১৫৮	১২। সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনঃ দৌড় বা সা'য়ীর মাসয়ালা
সূরা বাক্বারাহ	১৭১-১৭২	১৩। হালাল রুজী খাওয়ার বর্ণনাঃ অপারগাবস্থায় হারাম জিনিস খাওয়া বৈধ।

[৭১]. শহীদদেরকে মৃত না বলা। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো তবে তাঁরা নবীদের পর্যায়ে না; তাঁদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা যাবে; তাঁদের লাশ ও বিকৃত হতে পারে; তাঁদের গোসল ও কাফন দেওয়া যাবে না। শহীদ কত প্রকার? কোন্ প্রকার শহীদকে গোসল দিতে হবে, কোন্ প্রকার শহীদকে দিতে হবে না। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এর বিদ্রোহী ও ডাকাতের গোসল, কাফন ও জানাযা কোনটিই দেওয়া বৈধ নয়। ইত্যাদি মাস্য়ালা অত্র আয়াত থেকে বের করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা বাক্বারাহ	১৭৬-১৭৭	১৪। আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যই মূলতঃ নেক কাজঃ ঈমানে মুফাস্সালের বর্ণনা।
সূরা বাক্বারাহ	১৭৭-১৮০	১৫। কেসাস-দন্ডবিধিঃ কবিরা গুনাহ্কারী ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না।
সূরা বাক্বারাহ	১৮০-১৮২	১৬। অসিয়ত সম্পর্কিত কতিপয় মাসায়েল
সূরা বাক্বারাহ	১৮২-১৮৪	১৭। রোজা রাখার নির্দেশঃ ও উহার বিধানাবলী।
সূরা বাক্বারাহ	১৮৫	১৮। কুরআন অবতরণের সময়কালঃ লায়লাতুল কদর রমজান মাসে।
সূরা বাক্বারাহ	১৮৬।	১৯। আল্লাহ্ মানুষের দোয়া কবুল করেনঃ দোয়ার মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন হয়, মানুষ জড়পদার্থ নয়।
সূরা বাক্বারাহ	১৮৭	২০। রোজার কতিপয় মাসয়ালা
সূরা বাক্বারাহ	১৮৮	২১। অবৈধ উপায়ে মাল উপার্জন হারাম
সূরা বাক্বারাহ	১৮৯	২২। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যঃ হায়েজ, নেফাস, হামল, দুধপান, হাজ্জ্ব ইত্যাদি।
সূরা বাক্বারাহ	১৯১-১৯২	২৩। আশহুরে হুরুম বা নিষিদ্ধ মাসসমূহে জেহাদের বর্ণনা।
সূরা বাক্বারাহ	১৯৩-১৯৫	২৪। আল্লাহ্র দ্বীন দুনিয়াতে কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জেহাদের হুকুম।
সূরা বাক্বারাহ	১৯৬	২৫। ইহরাম বাঁধার পর হাজ্জ্ব ও ওমরা আদায়ে বাঁধা পড়লে তার হুকুম।
সূরা বাক্বারাহ	১৯৬	২৬। যে ব্যক্তি হাজ্জ্ব আদায় করতে যেয়ে কোরবানী দিতে অক্ষম তার হুকুম।
সূরা বাক্বারাহ	১৯৭	২৭। হাজীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজসমূহের বর্ণনা।
সূরা বাক্বারাহ	২০৩	২৮। আইয়ামে তাশ্রীকে বেশী করে আল্লাহর যিকির করাঃ তাকবীর বলা ওয়াজীব।
সূরা বাক্বারাহ	২১৮-২২০	২৯। মদ ও জুয়া গোনাহর কাজ।
সূরা বাক্বারাহ	২২১	৩০। মুশরিক মেয়েদেরকে বিবাহ করার বর্ণনা।
সূরা বাক্বারাহ	২২১-২২২	৩১। হায়েজের হুকুম বর্ণনা।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা বাক্বারাহ	২২৩-২২৪	৩২। কসমের হুকুমের বর্ণনা।
সূরা বাক্বারাহ	২২৬-২২৭	৩৩। ঈ'লার হুকুম বর্ণনাঃ কেউ যদি স্ত্রীর সাথে ৪ মাস সহবাস না করার শপথ করে তার কি হুকুম।
সূরা বাক্বারাহ	২২৮	৩৪। স্ত্রীলোকের ইদ্দতের বর্ণনা।
সূরা বাক্বারাহ	২২৮-২৩০	৩৫। তালাকের বর্ণনা।
সূরা বাক্বারাহ	২৩১	৩৬। তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর হুকুম।
সূরা বাক্বারাহ	২৩২	৩৭। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে অন্যত্র বিবাহ করতে বাধা দেওয়া নিষেধ।
সূরা বাক্বারাহ	২৩৩	৩৮। মা সন্তানকে দুধপান করাবে।
সূরা বাক্বারাহ	২৩৪	৩৯। বিধবা নারীর ইদ্দত।
সূরা বাক্বারাহ	২৩৫	৪০। ইদ্দতকালে বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার হুকুম।
সূরা বাক্বারাহ	২৩৬-২৩৭	৪১। বিবাহের পর সহবাসের আগে তালাক দেয়ার হুকুম।
সূরা বাক্বারাহ	২৩৮-২৩৯	৪২। নামাজের হেফাজতের নির্দেশ।
সূরা বাক্বারাহ	২৪০-২৪২	৪৩। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের প্রাপ্য।
সূরা বাক্বারাহ	২৪৩	৪৪। অতীতের ঘটনা হতে উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশঃ মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন করা জায়েজ নেই।
সূরা বাক্বারাহ	২৫৫	৪৫। আয়াতুল কুরসী এর ফজীলতের বর্ণনাঃ সুপারিশের বিধান।
সূরা বাক্বারাহ	২৬৭	৪৬। উত্তম বস্তু দান কার নির্দেশঃ যার কাছে উত্তম বস্তু নেই, সে খারাপ বস্তু দিতে পারবে।[৭২]
সূরা বাক্বারাহ	২৬৮	৪৭। দান-খয়রাতে শয়তানের প্ররোচনা।

[৭২]. খয়রাতের মাল হালাল। ওশর ওয়াজিব।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা বাক্বারাহ	২৭০-২৭১	৪৮। প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার দানই বৈধ।
সূরা বাক্বারাহ	২৭৫	৪৯। সুদখোরদের পরিণতি।
সূরা বাক্বারাহ	২৭৮-২৮০	৫০। সুদখোরদের প্রতি সতর্কবাণী।
সূরা বাক্বারাহ	২৮২	৫১। কর্জের উপর দলীল করার নির্দেশ।
সূরা বাক্বারাহ	২৮২	৫২। সাক্ষীর জন্য দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা হওয়ার প্রয়োজন।
সূরা বাক্বারাহ	২৮২	৫৩। লেন-দেনের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ হওয়া দরকার।
সূরা বাক্বারাহ	২৮৩	৫৪। বন্ধক রাখার হুকুম।
সূরা বাক্বারাহ	২৮৪	৫৫। সাক্ষ্য গোপন করা হারাম।
সূরা বাক্বারাহ	২৮৬	৫৬। শক্তি পরিমাণ কর্মই ফরজ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা আলে-'ইমরান	৭-৮	৫৭। আয়াতে মুহ্কামাত ও মুতাশাবীহের বর্ণনাঃ কাল্পনিক অর্থ জায়েয না।
সূরা আলে-'ইমরান	৩৩-৩৪	৫৮। ফেরেশ্তাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বঃ জাহেলী যুগের বিবাহ বৈধ।
সূরা আলে-'ইমরান	৮১-৮২	৫৯। মুহম্মদ (সাঃ) সমস্ত নবী হতে শ্রেষ্ঠঃ তাঁর শরীয়ত পরিপূর্ণ।
সূরা আলে-'ইমরান	৯৬	৬০। আল্লাহ্র ঘরে নিরাপত্তা ও হাজ্জের ফরজ হওয়ার বর্ণনা।
সূরা আলে-'ইমরান	১০৪	৬১। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরজ।
সূরা আলে-'ইমরান	১১০	৬২। ইজ্মাও শরীয়াতের একটি দলীল।
সূরা আলে-'ইমরান	১৩১-১৩২	৬৩। সুদ খাওয়া হারাম।

সূরা আলে-'ইমরান	১৮৭	৬৪। ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করার নির্দেশঃ গোপন রাখা যাবে না, বিক্রি করা যাবে না।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা নিসা	৩	৬৫। বহু বিবাহের বর্ণনা।
সূরা নিসা	৪-১২	৬৬। মোহর আদায় করার বর্ণনা।
সূরা নিসা	৫-৬	৬৭। অনভিজ্ঞদের হাতে তাদের মাল সমর্পণ করা নিষেধ।
সূরা নিসা	৭	৬৮। নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব।
সূরা নিসা	৮	৬৯। দূরবর্তী এতীম-মিসকীন ত্যাজ্য সম্পত্তির বন্টনের সময় উপস্থিত হলে কি করতে হবে।
সূরা নিসা	১১	৭০। সন্তানদের অংশ।
সূরা নিসা	১১	৭১। মিরাসে পিতা-মাতার অংশ।
সূরা নিসা	১২	৭২। মিরাসে স্বামী ও স্ত্রীর অংশ।
সূরা নিসা	১২	৭৩। কালালার ওয়ারিসী স্বত্বঃ যে মৃতের উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই।[৭৩]
সূরা নিসা	১৫	৭৪। ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি।
সূরা নিসা	১৮	৭৫। আল্লাহ্ পাপীদের পাপ ক্ষমা করে থাকেনঃ তওবা করা ফরজ, হক নষ্ট করলে তা ফেরত দিতে হবে।
সূরা নিসা	১৯	৭৬। বিবাহের কু-প্রথার বর্ণনা।
সূরা নিসা	২২	৭৭। যেসব নারীকে বিবাহ্ করা হারাম, তাদের বর্ণনা।
সূরা নিসা	২৪	৭৮। সেসব মহিলাকে বিবাহ্ করা জায়েয।
সূরা নিসা	২৫	৭৯। মুসলমান দাসীকে বিবাহ্ করার বর্ণনা।
সূরা নিসা	২৯	৮০। নিজের সম্পদও অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা জায়েজ নয়।
সূরা নিসা	৩৩	৮১। ওয়ারিসী সম্পদের বর্ণনা।
সূরা নিসা	৩৪-৩৫	৮২। স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রাধান্যঃ স্বামী স্ত্রীকে মারলে তার বদলা নেই।
সূরা নিসা	৩৬	৮৩। তাওহীদের বর্ণনা ও পিতা-মাতার হকঃ সঙ্গী-সাথীদের হক।
সূরা নিসা	৪৩	৮৪। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া নিষেধ।

[৭৩]. যে মৃতের কেউ নেই। কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই-বোন আছে। তাহলে ১ ভাই থাকলে $\frac{১}{৬}$ অংশ কিংবা বোন থাকলে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। আর একাধিক থাকলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। এক্ষেত্রে ভাই, বোনের দিগুণ পাবে না। উভয়েই সমান অংশ পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা নিসা	৪৮	৮৫। শিরক-গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন নাঃ জাত ও সিফাত উভয়টাই শিরক।
সূরা নিসা	৫৮	৮৬। আমানত পরিশোধের তাকীদ।
সূরা নিসা	৫৯	৮৭। শাসকবর্গের অনুগত হওয়া।
সূরা নিসা	৭১	৮৮। জেহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা।
সূরা নিসা	৮৬	৮৯। সালামের জবাব দেয়া ফরজঃ এটা ইবাদাত, কোন সময় ফরজ নয়।
সূরা নিসা	৯২	৯০। ভুলবশতঃ হত্যা ও তার প্রতিকার।
সূরা নিসা	৯৩	৯১। 'কত্‌লে আম্‌দ' বা ইচ্ছাকৃত হত্যার হুকুম।
সূরা নিসা	৯৪	৯২। ঘটনার তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেয়া জায়েজ নয়।
সূরা নিসা	৯৭	৯৩। হিজরতের সংজ্ঞাঃ কোন্ সময় ফরজ, কোন্ সময় ফরজ না।
সূরা নিসা	১০০	৯৪। হিজরতের ফযিলাত।
সূরা নিসা	১০১	৯৫। সফর ও কসরের বিধান।
সূরা নিসা	১০২	৯৬। সালাতুল খওফের হুকুম।
সূরা নিসা	১০৩	৯৭। অসুস্থ্য ব্যক্তির নামাজের অবস্থা।
সূরা নিসা	১০৫	৯৮। আল্লাহর রাসূলের ইজতিহাদ করার ক্ষমতা।
সূরা নিসা	১১৫	৯৯। উম্মতের ইজমা শরীয়াতের দলীল।
সূরা নিসা	১২৮	১০০। দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কে কতিপয় মাসয়ালা।
সূরা নিসা	১২৯	১০১। স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার নির্দেশ।
সূরা নিসা	১৩৫	১০২। সত্য সাক্ষ্যদান করার বর্ণনা।
সূরা নিসা	১৪১	১০৩। মু'মিনদের উপর কাফেরদের কোন প্রাধান্য নেই।[৭৪]
সূরা নিসা	১৬০	১০৪। ইয়াহুদীদের জন্য যা হারাম ছিল, তা আমাদের জন্য হালাল।
সূরা নিসা	১৭৬	১০৫। কালালার মীরাস বন্টন।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা-মায়িদা	১-২	১০৬। চুক্তিপত্র ও চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কীয় বর্ণনা।
সূরা-মায়িদা	৩	১০৭। হালাল ও হারাম জানোয়ারের বর্ণনা।
সূরা-মায়িদা	৪	১০৮। কোন ধরণের জানোয়ার দ্বারা শিকার করা জায়েজ।
সূরা-মায়িদা	৫	১০৯। আহলে কিতাবদের জবেহ্ করা জানোয়ার হালাল।
সূরা-মায়িদা	৬	১১০। ওজু, গোসল ও তায়াম্মুম ফরজ হওয়ার বর্ণনা।
সূরা-মায়িদা	৩৪	১১১। ডাকাতের শাস্তির বর্ণনা।

[৭৪]. কাফেরের সাক্ষ্য মুসলমানের জন্য বৈধ না, তার ভোট মুসলমানের জন্য বৈধ না। মুসলমান ভাই বা নিকটতম ব্যক্তি কাফেরের উত্তরাধিকার হতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা-মায়িদা	৩৮	১১২। চুরির শাস্তি
সূরা-মায়িদা	৪৫	১১৩। কেসাসের বর্ণনা।
সূরা-মায়িদা	৫৫	১১৪। 'আমলে ক্বালীল' বা অল্পকাজে নামাজ নষ্ট হয় না।
সূরা-মায়িদা	৫৮	১১৫। আজানের বর্ণনাঃ আজানের শরয়ী বিধান।
সূরা-মায়িদা	৮৯	১১৬। কসমের কাফ্ফারার বর্ণনা।
সূরা-মায়িদা	৯০-৯১	১১৭। মদ ও জুয়া হারাম।
সূরা-মায়িদা	৯৫	১১৮। ইহরাম অবস্থায় শিকার করার নিষেধাজ্ঞা।
সূরা-মায়িদা	৯৬	১১৯। সামুদ্রিক শিকার মুহরিমের জন্য হালাল।
সূরা-মায়িদা	৯৭	১২০। কোরবানীর জানোয়ারকে গলায় হার পরিয়ে নেয়া।
সূরা-মায়িদা	১০১	১২১। অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষেধ।
সূরা-মায়িদা	১০৩	১২২। জানোয়ার সম্পর্কীয় কতকগুলো কু- প্রথা।
সূরা-মায়িদা	১০৬	১২৩। কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা আন্'আম	৬৮	১২৪। বেদ্আ'তীর থেকে দূরে থাকার নির্দেশঃ যেখানে আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী হলে তা বর্জন করা ওয়াজিব।
আন'আম	১১৯-১২২	১২৫। কোন্ জানোয়ার জবেহ্ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা শর্ত।
সূরা আন্'আম	১২২	১২৬। জানোয়ার জবেহ্ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলাঃ ভুলে বর্জন করলে তা বৈধ।
সূরা আন্'আম	১৩৭	১২৭। কাফিরদের কুপ্রথার অবসানঃ আল্লাহ্ ও দেব-দেবীদের অংশ।
সূরা আন্'আম	১৩৮	১২৮। মুশরিকদের আরও একটি কুপ্রথা।
আন'আম	১৪০	১২৯। চতুষ্পদ জানোয়ারের পেটের মৃত বাচ্চা হারাম।
সূরা আন্'আম	১৪২	১৩০। শস্য ক্ষেত্রের যাকাত বা ওশর আদায় করা।
সূরা আন্'আম	১৪২-১৪৪	১৩১। হালালকে হারাম করার আরও একটি কুপ্রথা।
সূরা আন্'আম	১৪৫	১৩২। আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহের তালিকা।
সূরা আন্'আম	১৪৭	১৩৩। ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর অনেক হালাল বস্তুও হারাম করে দেয়া হয়েছিল।
সূরা আন'আম	১৫৪	১৩৪। তেয়াত্তর দলের মধ্যে মাত্র একটি দল মুক্তি পাবেঃ বাতিল দল গুলোর আক্বীদা।
সূরা আন্'আম	১৫৮	১৩৫। কিয়ামাতের আলামতঃ ছোট-বড়।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা	আয়াত	বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)
সূরা-আ'রাফ	৩০	১৩৬। ইবাদাতে কোন সৃষ্টবস্তুকে অংশীদার না করা।
সূরা-আ'রাফ	৩১	১৩৭। সতরে আওরত ফরজঃ নামাযে সতর ঢাকা ফরজ।
সূরা-আ'রাফ	৪৬	১৩৮। আ'রাফবাসীদের পরিচয় এবং বাস্তবতা।
সূরা-আ'রাফ	৮০	১৩৯। পুরুষের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার শাস্তি।
সূরা-আ'রাফ	৯৯	১৪০। আল্লাহর আজাব থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া কুফরীঃ আজাবকে অস্বীকার করা।
সূরা-আ'রাফ	১৫৭	১৪১। শেষ নবী ও তাঁর উম্মতের বৈশিষ্ট্যঃ নাপাকী (খবিসাহ), বাড়াবাড়ি, পুতিরমালা না পরা।
সূরা-আ'রাফ	১৭২	১৪২। আল্লাহর সাথে মানুষের চুক্তিপত্র।
সূরা-আ'রাফ	২০৪	১৪৩। কুরআন তেলাওয়াতের সময় নীরব থাকার হুকুম।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা আনফাল	১	১৪৪। নফল বা গনীমতের মালের হুকুম।
সূরা আনফাল	১১	১৪৫। আসমান থেকে বর্ষিত পানি পাক।
সূরা আনফাল	১৫	১৪৬। কোন্ সময় যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পালিয়ে যাওয়া জায়েজ।
সূরা আনফাল	২৭	১৪৭। খেয়ানত করা হারাম।
সূরা আনফাল	৩৮	১৪৮। মুর্তাদ ব্যক্তি মুসলমান হলে তার হুকুম।
সূরা আনফাল	৪১	১৪৯। গনীমাতের মাল বন্টনের বর্ণনা।
সূরা আনফাল	৫৬	১৫০। সন্ধি-চুক্তি বাতিল করার উপায়।
সূরা আনফাল	৫৯	১৫১। জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করা ফরজ।
সূরা আনফাল	৬৫	১৫২। কাফিরের সংখ্যা দিগুণ থাকলে যুদ্ধ করা ফরজ।
সূরা আনফাল	৬৭	১৫৩। কাফিরদেরকে হত্যা করা ও বন্দী করার হুকুম।
সূরা আনফাল	৭২	১৫৪। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকারী স্বত্ব ছিন্ন।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা তাওবাহ্	৫	১৫৫। কাফিরদেরকে হত্যা করার নির্দেশ।
সূরা তাওবাহ্	৬	১৫৬। মুশরিকদেরকে নিরাপত্তা দান।
সূরা তাওবাহ্	১১	১৫৭। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও কাফির প্রধানদের হত্যার বর্ণনা।
সূরা তাওবাহ্	১৭	১৫৮। মসজিদুল হারামের হেফাজত ও আবাদ রাখার হকদার কাফের নয়।
সূরা তাওবাহ্	২৮	১৫৯। মুশরিকদের জন্য হেরেম শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
সূরা তাওবাহ্	২৯	১৬০। জিযিয়া আদায়ের বর্ণনা।
সূরা তাওবাহ্	৩৪	১৬১। স্বর্ণ ও রূপায় যাকাত ফরজ।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা তাওবাহ্	৩৬	১৬২। বার মাসে বছরঃ শরীয়াতের বিধানগুলো চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত।
সূরা তাওবাহ্	৪১	১৬৩। সমস্ত মুসলমানদের উপরই জেহাদ ফরজ।
সূরা তাওবাহ্	৬০	১৬৪। সদকার ব্যয় খাত।
সূরা তাওবাহ্	৬৫	১৬৫। শরীয়াতের সঙ্গে ঠাট্টা করা কুফরী।
সূরা তাওবাহ্	৮৪	১৬৬। কোন কাফিরের জানাজার নামাজ পড়া দুরস্ত নয়।
সূরা তাওবাহ্	৯১	১৬৭। রুগ্ন-ব্যক্তি অথবা যাদের কাছে জেহাদের উপরকরণ নেই তাদের হুকুম।
সূরা তাওবাহ্	১০৩	১৬৮। সদকা-যাকাত আদায় করে তা যথাযথ খাতে ব্যয় করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
সূরা তাওবাহ্	১০৭	১৬৯। মাসজিদে-দেরার তৈরীর বর্ণনাঃ পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা, পুং অঙ্গ স্পর্শে অজু ভাঙ্গে না।
সূরা তাওবাহ্	১২০-১২১	১৭০। জিহাদের কাজে সাহায্যকারী ও গণীমাতের মালের অংশীদার।
সূরা তাওবাহ্	১২২	১৭১। জেহাদ ফরজে কেফায়া।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা ইউনুস	৮৭	১৭২। ঘরকে মসজিদ রূপে ব্যবহার করাঃ নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা হুদ	১১৪-১১৫	১৭৩। নামাজের ওয়াক্তের বর্ণনা।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা ইউসুফ	২০	১৭৪। আজাদ মানুষকে বিক্রয় করা হারামঃ কাজের ছেলে-মেয়ে দাস-দাসী নয়।
সূরা ইউসুফ	৭২	১৭৫। একে অন্যের পক্ষ থেকে জামীন হওয়া জায়েজ।
সূরা ইউসুফ	৮৮	১৭৬। খাদ্যের বদলে খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা ইব্রাহীম	২৭	১৭৭। আজাবে-কবর সাব্যস্ত ঃ ইয়াক্বীনের সাথে ক্বালিমা পড়লেই সে জান্নাতে যাবে।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা নাহ্ল	৫	১৭৮। উট, গরু ও ছাগলের গোশত খাওয়া হালাল।
সূরা নাহ্ল	৮	১৭৯। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খাওয়া হালাল নয়।
সূরা নাহ্ল	১৪	১৮০। মাছ বিনা জবেহে খাওয়া হালাল।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা নাহ্‌ল	৬৭	১৮১। মাদকদ্রব্য নেশা সৃষ্টি করে বিধায় তা হালাল নয়।
সূরা নাহ্‌ল	৭৫	১৮২। আল্লাহর সত্তার উপর একটি উদাহরণ।
সূরা নাহ্‌ল	৮০-৮১	১৮৩। জানোয়ারের চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা জায়েজ।
সূরা নাহ্‌ল	৯৮	১৮৪। কুরআন তেলাওয়াতের সময় আউযু বিল্লাহ্ পড়ার নির্দেশ।
সূরা নাহ্‌ল	১০৬	১৮৫। জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কুফ্‌রী-কালাম মুখে উচ্চারণ করলে কোন দোষ নেই।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা বনী ইসরাঈল	১	১৮৬। মে'রাজের বর্ণনাঃ মাসয়ালাঃ উহা অস্বীকার করলে কি হুকুম।
সূরা বনী ইসরাঈল	৩৩	১৮৭। কেসাস নেওয়ার অধিকার ওলীর।
সূরা বনী ইসরাঈল	৩৪	১৮৮। এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা।
সূরা বনী ইসরাঈল	৭৮-৭৯	১৮৯। পাঞ্জেগানা নামাজ ও তাহাজ্জুদ নামাজের ওয়াক্তের বর্ণনা।
সূরা বনী ইসরাঈল	১১০	১৯০। নামাজে সশব্দে বা নিঃশব্দে তিলাওয়াত করা।
সূরা বনী ইসরাঈল	১১১	১৯১। আল্লাহর কোন শরীক নেই।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা কাহাফ্	১৯	১৯২। উকিল নিযুক্ত করা জায়েজ।
সূরা কাহাফ্	৯৮	১৯৩। কিয়ামতের আলামত।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা মার্‌ইয়াম	৭১-৭২	১৯৪। পুলসিরাতের বর্ণনাঃ সত্য হওয়ার মাসয়ালা।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা ত্ব-হা	১৩-১৪	১৯৫। নামাজ কায়েম করার বর্ণনা।
সূরা ত্ব-হা	১৩০	১৯৬। নামাজের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা আম্বিয়া'	২২	১৯৭। আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা।
সূরা আম্বিয়া'	২৬-২৭	১৯৮। ফেরেশ্‌তারা মাসুম।
সূরা আম্বিয়া'	৭৮	১৯৯। ইজতিহাদঃ ভুল/ঠিকঃ চার মাযহাবের হাক্বীকত।

সূরা	আয়াত	বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)
সূরা হাজ্জ্ব	২৫	২০০। মক্কার হেরেম শরীফে সকল মুসলমানের সমান অধিকার।
সূরা হাজ্জ্ব	২৬-২৭	২০১। হাজ্জ্ব আদায় করা ফরজ।
সূরা হাজ্জ্ব	৩২-৩৩	২০২। কিরূপ জন্তু কুরবানী করা।
সূরা হাজ্জ্ব	৩৬-৩৭	২০৩। যবেহ্ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা শর্ত।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা মু'মিনূন	১২-১৪	২০৪। মানব সৃষ্টির স্তরঃ ডিম লুণ্ঠনকারী শুধু ডিমের ক্ষতিপূরণ দেবে। যদিও বাচ্চা তার হাতে ফোঁটে।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা নূর	২	২০৫। যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি।
সূরা নূর	৩	২০৬। যিনাকারী পুরুষ যিনাকারিনী নারীর প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে।
সূরা নূর	৪-৫	২০৭। কোন সৎপুরুষ ও কোন স্বতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে তার শাস্তি।
সূরা নূর	৬-১০	২০৮। লেয়ান বা স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ দেয়া।
সূরা নূর	২৭-২৯	২০৯। বিনানুমতিতে কারও ঘরে প্রবেশ করা নিষেধ।
সূরা নূর	৩০-৩১	২১০। নারী ও পুরুষের পর্দা।
সূরা নূর	৩২-৩৩	২১১। বিবাহের হুকুম।
সূরা নূর	৩৩	২১২। দাস-দাসীর সাথে মুকাতাবাত করা।
সূরা নূর	৩৩	২১৩। বাদী বা দাসীদেরকে যিনার উপর জবরদস্তি করা নিষেধ।
সূরা নূর	৫৮-৫৯	২১৪। আত্মীয়-স্বজনদের জন্য বিশেষ সময়ে অনুমতি নেয়ার হুকুম।
সূরা নূর	৬০	২১৫। অতি-বৃদ্ধা নারীর পর্দার হুকুম।
সূরা নূর	৬১	২১৬। ঘরে প্রবেশ করার পরের হুকুম।
সূরা নূর	৬৫	২১৭। সম্মানসূচক শব্দ দ্বারা আল্লাহর রাসূলকে ডাকা জরুরী।

সূরা	আয়াত	বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)
সূরা ফুরকান	৪৮-৪৯	২১৮। পানি নিজে পবিত্র এবং তা দ্বারা অন্যকে পবিত্র করা যায়।
সূরা ফুরকান	৬১	২১৯। রাত্র-দিনকে পরিবর্তশীল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা শু 'আরা'	১৯২	২২০। নামাজে ফার্সী ভাষায় ক্বেরাত পড়া জায়েজ কি-না।
সূরা শু 'আরা'	২২৪-২২৭	২২১। ইসলামে কবিতা পাঠের মানঃ বৈধ-অবৈধ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা নাম্‌ল	৮২	২২২। মাটি গর্ভের জন্তুঃ 'দাব্বাতুল আর্‌দ' বের হওয়া কিয়ামতের লক্ষণ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা কাসাস্‌	২৭-২৮	২২৩। স্ত্রীর কোন কর্ম স্বামী করে দিলে এতে মোহরানা আদায় হবে কিনা?
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা রূম	১-৪	২২৪। জুয়া হারাম।
সূরা রূম	১৭	২২৫। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার দলীল।
সূরা রূম	৩৮-৩৯	২২৬। দানের সঠিক স্থানের বর্ণনা।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা লোকমান	৬	২২৭। গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান।
সূরা লোকমান	১৫	২২৮। যে কাজে আল্লাহর নাফরমানী হয়, এমন কাজে পিতা-মাতার কথা মানা নিষেধ।
সূরা লোকমান	৩৪	২২৯। ইলমে গায়েব বা যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহপাকের।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা সিজ্‌দা	১৩	২৩০। জ্বিন এবং মানব জাতিই দোযখে যাবে।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা আহ্‌যাব	৪-৫	২৩১। নিজ বিবিদের সাথে যিহার করার হুকুম এবং পোষ্যপুত্র আপন পুত্রতুল্য নয়।
সূরা আহ্‌যাব	৬	২৩২। মুমিনদের উপর নবীর হক তাদের প্রাণের চেয়েও বেশী, আর নবীর বিবিগণ মুমিনদের মা।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আহ্যাব	২৮-২৯	২৩৩। তালাকের অধিকার স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা।
সূরা আহ্যাব	৩০-৩২	২৩৪। নবীজীর স্ত্রীগণের ফযিলাত।
সূরা আহ্যাব	৩৬-৩৭	২৩৫। পালক-পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ্ করা জায়েজ।
সূরা আহ্যাব	৪০	২৩৬। মুহম্মদ (সাঃ) শেষ নবী।
সূরা আহ্যাব	৪৯	২৩৭। বিবাহের পর সহবাসের আগে স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হলে তার হুকুম।
সূরা আহ্যাব	৫০	২৩৮। বিনা মোহরে নবীজীর বিবাহ্ জায়েজ।
সূরা আহ্যাব	৫৩-৫৫	২৩৯। পর্দার হুকুম।
সূরা আহ্যাব	৫৬	২৪০। নবীজীর প্রতি দরূদ ও সালাম।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা ইয়াসীন	৭৭-৮৩	২৪১। হাশ্র ও নশ্রের বর্ণনা।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা সাফ্ফাত	১০২-১০৬	২৪২। কেউ ছেলে যবেহ করার মান্নত করলে তার উপর ছাগল যবেহ করা ওয়াজিব।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা স'আদ	২১-২৫	২৪৩। তিলাওয়াত সেজদা নামাজে আদায় হয়।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা যুমার	৭	২৪৪। আল্লাহর পছন্দ কেবল ঈমান।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা মু'মিন	৬৮-৭০	২৪৫। শিংগায় ফুৎকার।
সূরা মু'মিন	৪৬	২৪৬। কবরের আযাব।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা শু'রা	৩৯-৪৩	২৪৭। ক্ষমা ও প্রতিশোধ নেয়ার উত্তম ফয়সালা।
সূরা শু'রা	৫১	২৪৮। ওহীর বর্ণনা।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা	আয়াত	বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)
সূরা যুখরুফ	৬১	২৪৯। ঈসা (আঃ) এর আগমন কিয়ামাতের নিদর্শন।
সূরা যুখরুফ	৮৬	২৫০। সাক্ষীর জন্যে ইলম দরকার।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা দুখান	১০-১২	২৫১। ধূম্র কিয়ামাতের লক্ষণ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা আহ্‌কাফ	১৫	২৫২। গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়।
সূরা আহ্‌কাফ	২৯-৩১	২৫৩। জ্বিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা মুহাম্মদ	৪	২৫৪। যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা ফাত্‌হ	১৬	২৫৫। আরবের মুশরিকদের অবস্থাঃ হয় ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা হত্যা।
সূরা ফাত্‌হ	১৭	২৫৬। বিকলাঙ্গ লোকদের উপর যুদ্ধে গমন ফরয নয়ঃ আবু বকর ও ওমরের খেলাফত সত্য।
সূরা ফাত্‌হ	২৪	২৫৭। মক্কা জবরদস্তিরূপে জয় হয়েছিলোঃ দুর্বলদের কে হত্যা করা জায়েজ নেই।
সূরা ফাত্‌হ	২৫	২৫৮। মক্কায় গমনকারী লোকদের জন্তুকে হেরেম শরীফে জবেহ করতে হয়।
সূরা ফাত্‌হ	২৭	২৫৯। ওমরাকারীদেরকে হলক বা কছর করতে হয়।
সূরা ফাত্‌হ	২৮-২৯	২৬০। ইসলাম সত্য ধর্ম ও সাহাবীদের গুণাবলী।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা হুজরাত	১	২৬১। ঈদুল আযহার নামাজের আগে কুরবানী করা নিষেধ।
সূরা হুজরাত	৬	২৬২। তদন্ত ছাড়া কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দুরস্ত নয়।
সূরা হুজরাত	৯-১০	২৬৩। মুমিনদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হলে তার ফয়সালা।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা যারিয়াত	৩৫-৩৬	২৬৪। ঈমান ও ইসলাম এক।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্‌য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা তুর	২১	২৬৫। ঈমানদারদের সন্তানরাও ঈমানে তাদের অনুগামী।

সূরা	আয়াত	বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)
সূরা কামার	২৮	২৬৬। কোন কাজের পালা নির্ধারণ করা জায়েজ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা আর রাহমান	৬৮	২৬৭। খর্জুর এবং আনার ফল, ফল খাওয়ার মধ্যে গণ্য নয়।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা ওয়াকি'আহ	৭৪-৭৯	২৬৮। কুরআন পবিত্র লোক ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা মুজাদালাহ	১-৪	২৬৯। যিহারের কাফ্ফারা।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা হাশ্র	২	২৭০। কিয়াসের শরীয়াত সম্মত হুকুম।
সূরা হাশ্র	৫-৬	২৭১। 'ফাই' এর মাল রাসূল (স.) এর জন্য নির্দিষ্ট।
সূরা হাশ্র	৭-৮	২৭২। ফাইয়ের মালের বন্টন-বিধি।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা মুমতাহিনাহ	৮-৯	২৭৩। যিম্মীকেও নফল সদকা দেয়া জায়েয।
সূরা মুমতাহিনাহ	১০-১১	২৭৪। মুসলমানদের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে দুরস্ত নয়
সূরা মুমতাহিনাহ	১২	২৭৫। নারীদের নিকট হতে বিস্তারিত শপথ গ্রহণ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা জুম'আঃ	৯-১১	২৭৬। জুমার নামাজ ফরজ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা মুনাফিকুন	১-২	২৭৭। মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা তালাক্ব	১-২	২৭৮। ইসলামী শরীয়াতে তালাক।
সূরা তালাক্ব	৪	২৭৯। যাদের হায়েজ আসে না এবং যারা গর্ভবতী তাদের ইদ্দত।
সূরা তালাক্ব	৬	২৮০। ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষন স্বামীর উপর ওয়াজিব।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা তাহরীম	১-২	২৮১। বিনা প্রয়োজনে কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা নিষেধ।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা	আয়াত	বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)
নূহ	১০-১২	২৮২। ইস্তিগ্ফার বৃষ্টি বর্ষণের উপায়ঃ ইস্তেস্কা নামাযের পদ্ধতি।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
জ্বীন	১৮	২৮৩। মসজিদে দুনিয়ার কথাবার্তা জায়েজ নয়।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা মুয্যাম্মীল	১-৪	২৮৪। তাহাজ্জুদের নামাজ প্রসঙ্গেঃ তেলওয়াতে কুরআন প্রসঙ্গে।
সূরা মুয্যাম্মীল	২০	২৮৫। তাহাজ্জুদের নামাজ মুস্তাহাব।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা মুদ্দাছ্ছির	১-৩	২৮৬। তাকবীরে তাহরীমা ফরজঃ নামাযে কাপড় পবিত্রতা ফরজ।
সূরা মুদ্দাছ্ছির	৩৮-৪৮	২৮৭। মুমিনের জন্য সুপারিশ কবুল হবে বা তার জন্যে সুপারিশ বৈধ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা কিয়ামাহ্	১৬-২১	২৮৮। ইমামের পিছনে মুক্তাদিদের ক্বেরাত না পড়ার একটি দলিল।
সূরা কিয়ামাহ্	২২-২৫	২৮৯। পরকালে মুমিনরা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাসয়ালাঃ (বিধান)**
সূরা ইনশিক্বাক	২১-২৩	২৯০। সিজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা আ'লা	১৪-১৫	২৯১। ঈমান ও চরিত্রগত শুদ্ধিঃ তাকবীরে তাহরীমা নামাযের বাহিরের অংশ।
সূরা	**আয়াত**	**বিষয় বা নির্গত মাস্য়ালাঃ (বিধান)**
সূরা আল-কাওছার	১-৩	২৯২। 'হাওজে কাউসার' এর বাস্তবতা এবং কোরবানী করা ওয়াজেব।
সর্বমোট সূরাঃ ৬১, আয়াত- ৪৪৬		

Dhaka University Institutional Repository

التفسيرات الأحمدية

في بيان

الآيات الشرعية

هذا الكتاب النافع اللبيب المرغوب لأصحاب الآراء السنية تصنيف من العالم الجليل الفاضل النبيل

جامع المعقول والمنقول حاوي الفروع والأصول الشيخ أحمد المدعو بملا جيون الجونفوري

محشى

بالحواشي الرائقة مذيلا بالأذيال الفائقة للعالم العامل والفاضل الكامل

آية من آيات الله ذي العرش العلامة مولوي رحيم بخش

DACCA … LIBRARY

طبع بحسن اهتمام القاضي عبد الكريم ابن المرحوم القاضي نور محمد صاحب

تاجر الكتب

في المطبعة الكريمية الواقعة في مبئي ١٣٢٧ه

المرة الأولى　　　عدد (٢٠٠٠)

UNIVERSITY No 15,678

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب وفصّله تفصيلا واودعه
لطائف واسرارا وآيات وآثارا تذكرةً لاولى الالباب وتبصرةً لمن
اراد تكميلا وجعله اجل الكتب قدرا واعزّها علما واعذبها نظما
وابلغها فى الخطاب واحسنها تفسيرا[له] وتأويلا قُرْاٰناً عَرَبِيًّا غَيْرَ
ذِىْ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ وفرقانا مبينا هدىً وبشرى للمؤمنين
نزله بلسان الروح الامين تنزيلا ليطلعوا على سرائر الاوّلين
والآخرين ويقفوا على غيوب السمٰوت والارضين ويستنبطوا
العلوم الشرعية كلها اصولها وفروعها ويستخرجوا الفنونَ
الادبيةَ والصناعاتِ العربيةَ بانواعها وما اُوتينا من العلم
الا قليلا ففريقًا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فمن يظهره
السعادة ويبديه الهداية فيومن باقواله ويعمل باحكامه ويتلوه
ليلا طويلا ومن يرزق الشقاوة ويحق عليه الضلالة فليتخذه
مذموما مخذولا وسيقول يَا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً

اللفظ هذا ... وانتهما ذوعلى ... الله انه عسى ... بالالفظ هذا ... قام دليل يقطع ... به فيصحح ... وتفسير بالراى ... وهو المنهى عنه ... والتاويل ترجيح ... احد المحتملات ... بدون القطع ... والشهادة ... انه وقال ... ابو طالب

له قوله تفسيرا وتاويلا اقول التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف ويقال هو مقلوب سفر تقول اسفر الصبح اذا اضاء وقيل ماخوذ من التفسرة وهى اسم لما يعرف به الطبيب المرض والتاويل اصله من الاول وهو الرجوع فكانه صرف الاية الى ما يحتمله من المعانى وقيل من الايالة وهى السياسة كان المأول للكلام ساس الكلام ووضع المعنى فيه موضعه واختلف فى التفسير والتاويل فقال ابو عبيدة وطائفة هما بمعنى وقد انكر ذالك قوم حتى بالغ ابن حبيب النيسابورى فقال قد نبغ فى زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتاويل ما اهتدوا اليه وقال الراغب التفسير اعم من التاويل واكثر استعماله فى الالفاظ ومفرداتها واكثر استعمال التاويل فى المعانى والجمل واكثرها استعمل فى الكتب الالهية والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها وقال غيره التفسير بيان لفظ لا يحتمل الا وجها واحدا والتاويل توجيه لفظ متوجه الى معانى مختلفة الى واحد منها بما ظهر من الادلة وقال الماتريدى التفسير القطع على ان المراد من ... وقال الثعلبى التفسير بيان وضع اللفظ اما حقيقة او مجازا كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر والتاويل تفسير باطن اللفظ ماخوذ من الاول وهو الرجوع لعاقبة الامر فالتاويل اخبار عن حقيقة المراد والتفسير اخبار عن دليل المراد لان اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل ... اتقان ... السيوطى ... ١٢

Dhaka University Institutional Repository

سورة الفاتحة ام القران واصله و رئيسه تشتمل اجمالا على جملة ما فى القران تفصيلا كيف لا والكتاب يعرف بعنوانه و ديباجته ففيها شائبة من احكام الفقه وقواعد الاصول ومسائل الكلام وهى اثبات الواجب وتوحيده واختصاص المحامد به وكونه خالقا لافعال العباد كلها وكون الحرام رزقا كالحلال وتنعيم اهل الطاعة وتعذيب الكفار وحقية يوم الحشر وجميع ما فيه واداء العبادة بالاخلاص وكونه تعالى مخصوصا بها واهلا لها وكون الهداية والضلالة من جانبه تعالى خاصة وكون شريعة نبينا عليه السلام موافقة لبعض شرائع اليهود والنصارى دون بعض ووجوب الاتباع لسبيل المؤمنين سيما اهل السنة والجماعة وحجية اجماعهم وامثال ذلك والكل يظهر بالتامل ولما كان كل ما ذكر مما سيأتى مفصلا ولم يكن ايضا ظاهرا ههنا لم اشتغل بتعيين شئ منها وطويت عنها كشح المقال فشرعت بعده فى سورة البقرة ففى مسئلة ان الاباحة اصل فى الاشياء قوله تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هذه بيان نعمة يخاطب بها الكفار والمؤمنون وكلاهما واللام فى لكم للانتفاع والمعنى خلق جميع ما فى الارض لانتفاعكم فى دنياكم باستنفاعكم بها مصالح ابدانكم وفى دينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرف لما يلائمها من لذات الاخرة والامها كذا قالوا فيمكن ان يستدل بها على ان الاصل فى الاشياء الاباحة كما هو مذهب طائفة بخلاف الجمهور فان عندهم الاصل هو الحرمة ولا يظهر ثمرته الا فى قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام الا سواء بسواء فان عندنا الاصل هو اباحة الربوا حتى يبيعه عند عدم القدر والجنس وانما تثبت الحرمة اذا وجد جميع الشرائط وعند الشافعى الاصل هو الحرمة فى كل حال والمساواة مخلص منها كما ذكر فى الهداية فى باب الربوا لان ذلك مبنى على اصل اخر مختلف فيه معروف وبالجملة ففى الاية دليل على كون الاباحة اصلا فى الاشياء صرح به صاحب

سله قوله سورة الفاتحة سميت بذالك لان بها افتتح القران وبها تفتتح كتابة المصاحف وبها تفتتح الصلوة وتسمى ام القران للحديث قال عليه الصلوة والسلام لا صلوة لمن لم يقرأ بام القران ولاشتمالها على المعانى التى فى القران او لانها اصل القران وام كل شئ اصله وقيل هى امام لما يتلوها من السور وسورة الوافية والكافية لانها لا تقسم فى القراءة فى الصلاة كما يقسم غيرها من السور ولانها تكفى عن غيرها فى الصلوة ولا يكفى عنها غيرها وسورة الكنز لقوله عليه السلام حاكيا عن الله تعالى فاتحة الكتاب كنز من كنوز عرشى وسورة الشفاء والشافية لقوله عليه السلام فاتحة الكتاب شفاء من كل داء الا السام وسورة المثانى لانها تثنى فى كل صلوة وسورة الصلوة لما يروى ولانها تكون واجبة او فريضة وسورة الحمد والاساس فانها اساس القران قال ابن عباس رضى الله عنهما اذا اعتللت او اشتكيت فعليك بالاساس ١٢ ملخصا من الخازن والمدارك تغيير يسير ١٢ سله للانتفاع قال الزمخشرى لكم لاجلكم ولانتفاعكم به فى دنياكم ودينكم اما الانتفاع الدنيوى فظاهر واما الانتفاع الدينى فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع الدالة على الصانع القادر الحكيم وما فيه من التذكير بالاخرة وبثوابها وعقابها لاشتماله على اسباب الانس واللذة

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

الكشاف حيث قال قد استدل بقوله تعالى خلق لكم على ان الاشياء التي
يصلح ان ينتفع بها ولم تجر مجرى المحظورات في العقل خلقت في الاصل مباحة
مطلقا لكل احد ان يتناولها وينتفع بها وقد صرح به صاحب المدارك ايضا حيث
قال وقد استدل الكرخي وابو بكر الرازي والمعتزلة بقوله تعالى خلق لكم على
ان الاشياء التي يصلح ان ينتفع بها خلقت مباحة في الاصل وذكر الامام فخر
الاسلام في بحث المعارضة انه اذا تعارض المبيح والمحرم ترجح المحرم لتأخره
دلالة فان الاباحة لما كانت اصلية في الاشياء كان المحرم لتأخره ناسخا للمبيح
واما اذا عملنا بالمبيح وجعلناه مؤخرا تكرر النسخ لان الاباحة لما كانت اصلية
في كل شيء كان المحرم ناسخا له ثم كان المبيح العارضي ناسخا للمحرم ثم قال وهذا
بناء على قول من جعل الاباحة اصلا ولسنا نقول بهذا في اصل الوضع لان
البشر لم يتركوا سدى في شيء من الزمان وانما هذا بناء على زمان الفترة قبل
شريعتنا يعني ان جعل المحرم ناسخا بناء على قول من جعل الاباحة اصلا في الاشياء
كالكرخي وابي بكر الرازي وطائفة من الفقهاء الحنفية والشافعية وجمهور
المعتزلة ولسنا نقول بكون الاباحة اصلا في الوضع لان عباد الله تعالى
لم يتركوا مهملا في شيء من الزمان ولو كان الاباحة اصلا لكانوا مهملين غير
مكلفين وانما جعلنا المبيح اصلا والمحرم ناسخا بناء على زمان الفترة بين
عيسى ومحمد عليهما السلام قبل شريعتنا فانه كان الاباحة اصلا حينئذ ثم
بعث نبينا عليه السلام بيبين الاشياء المحرمة ونفي ما سواها حلالا مباحا
هكذا في حواشيه ثم كون الاصل عندنا الاباحة لاينافي ان يكون الشيء حراما
لعينه كالزنا والخمر او لغيره كاكل مال الغير او مكروها كراهة تنزيه او
تحريم كاكل الفرس او سور الهرة لان كل ذلك يثبت بالادلة القاطعة او
الظنية وانما الكلام فيما لم يوجد فيه دليل اصلا واما ما تمسك به المباحيون
من ان مال المسلمين مباح لكل واحد ان يأخذ ما شاء لايمنع احد احدا وان الله
تعالى اذا احب عبدا لم يضره ذنب ومباشرة حرام كما صرح به الامام الزاهد
نعاذ الله منه واين هذا من ذلك ولهذا قال القاضي البيضاوي في جوابه وهو

له قوله قد استدل بقوله
اقول هذا استدلال فرقة
من القدرية ذهبت الى ان
حكم الله تعالى الاباحة في
ذوات المنافع التي لا يدرك
العقل على تحريمها قبل ورود
الرسل تلقيا من العقل
وزعموا انها اشتملت على
منافع وحاجة الخلق
داعية اليها لخلقها مع
حظرها على العباد خلاف
مقتضى الحكمة فوجب عندهم
بمقتضى العقل ان يعتقدوا
اباحتها في حكم الله عز وجل
وهذا زلل ناشئ عن القاعدة
التحسين والتقبيح الباطلة
واما استدلال الزمخشري
لهذه الفرقة بالاية فغير
مستقيم فان دعواهم
ان العقل كاف في اباحة
هذه الاشياء فان دلت
الاية على الاباحة فنحن
نقول بموجبها ويكون
اذا اباحة شرعية سمعية
وان لم تدل على الاباحة
لم يبق في الاستدلال
بها مطمع والمستدل له
هو الكرخي وابو بكر الرازي والمعتزلة كما قال المصنف وقد صرح به صاحب المدارك ايضا حيث قال الخ ١٢

Dhaka University Institutional Repository

يقتضى باحة الاشياء النافعة ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض لاسباب عارضة فانه يدل على ان الكل للكل لا ان كل واحد لكل واحد سيأتى بعضها عن قريب وقوله تعالى ثم استوى الى السماء اى قصد اليها بارادته او استولى عليها وهو فى اللغة طلب السواء وهو لا يليق فى حقه تعالى فحمل على ما ذكرنا من المعنيين او جعل من المتشابهات فلا تمسك به للكرامية فى اثبات العلو والمكان له تعالى كما صرح به الامام الزاهد والمعنى الاول اوفق للفاء فى فسوّٰهن اذ على المعنى الثانى كانت العبارة محمولة على القلب لا يقال ان الاية تدل على تقديم خلق الارض على السماء وانه يناقض قوله تعالى والارض بعد ذلك دحٰها لان كلمة ثم للتراخى فى الفصل دون الوقت فى هذه الاية او كلمة بعد بمعنى مع او خلقة الارض مقدمة على السماء ودحوها مؤخر منهما ونحو ذلك. والضمير فى فسوّٰهن مبهم يفسره قوله تعالى سبع سمٰوٰت وما فى الارض ان اريد بها جهات السفل يتناول نفس الارض ايضا كما ان السماء يجوز ان يراد بها جهات العلو وان اريد بها الاجرام المخصوصة فكون الارض سبعة يعلم من اية واحدة اعنى قوله تعالى اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ بخلاف كون السماء سبعة فانه مما تواتر فى القران مرارا وللحكماء فى تعددها قول يخالف قولنا وتفصيله لا يليق ههنا فى مسئلة فرضية الصلوة والزكوة والركوع ووجوب الجماعة قوله تعالى وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ اعلم ان هذا خطاب لاهل الكتاب باقامة الصلوة وايتاء الزكوة والركوع فى الصلوة فقد دل لكونه امرا على وجوبها وحاصل الخطاب امرهم باتباع المسلمين باداء صلوة المسلمين اى الى الكعبة وزكوتهم وركوعهم فى الصلوة كركوع المسلمين لان اليهود لم يكن لهم ركوع وسجود بل مجرد القيام وكان على ذلك نبينا عليه السلام سنين ثم زاد الركوع والسجود بقوله تعالى فى سورة الحج يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا على ما يأتيك فى سورة

سلم اشار اليه المؤلف ۱۲ كشاف ... يعنى اقيموا الصلوٰة والزكوٰة ... وجميع اركانها ... الزكوٰة اى ادوا ... المفروضة عليكم ... واركعوا مع الراكعين اى صلوا مع المصلين ... صلى الله عليه وسلم واصحابه

له قوله تعالى ثم استوى الى السماء۔ الاستواء الاعتدال والاستقامة يقال استوى العود وغيره اذا قام واعتدل ثم قيل استوى اليه كالسهم المرسل اذا قصده قصدا مستويا من غير ان يلوى على شئ ومنه استعير قوله ثم استوى الى السماء اى قصد اليها بارادته ومشيته بعد خلق ما فى الارض من غير ان يريد فيما بين ذالك خلق شئ اخر۔ وقال ابن عباس (استوى) ارتفع وفى رواية عنه صعد قال الازهرى معناه صعد امره وكذا ذكره صاحب المحكم وذلك ان الله تعالى خلق الارض اولا ثم عمد الى خلق السماء والمراد بالسماء جهات العلو كانه قيل ثم استوى الى فوق ۱۲ ملخصا من الكشاف والخازن والمدارك

سلم قوله ودحوها مؤخر منها كما روى عن الحسن خلق الله الارض فى موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم اصعد الدخان وخلق منه السموٰت وامسك الفهر فى موضعها وبسط منها الارض فذالك قوله تعالى كانتا رتقا وهو الالتزاق ۱۲ كشاف

سلم قوله مبهم يفسره وقيل الضمير راجع الى السماء والسماء فى معنى الجنس وقيل فى معنى سماءة والوجه العربى هو الذى

... الصلوة ... مع المصلين ... ۱۲ خازن

منه وعبر عن الصلوة بالركوع لانه ركن من اركانها وهذا الخطاب لليهود لان صلوتهم ليس فيها ركوع فكانه قال لهم صلوا صلاة ذات ركوع فلهذا اعاده بعد قوله واقيموا الصلوة لان الاول خطاب للكافة والثانى خطاب قوم مخصوصين

Dhaka University Institutional Repository

(ii) নূরুল-আনওয়ার ফী শারহীল্ মানারঃ

এটাই গ্রন্থকার কর্তৃক তথা আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন কর্তৃক রাখা নাম।[৭৫] মাওলানা ইউসুফ আলইয়ান সারকীস এর নাম উল্লেখ করেছেন- 'নূরুল্ আন্ওয়ার ফী শারহীল্ আবসার'; যার ভাষা হুবহু 'নূরুল্-আনওয়ার' এর ভাষার ন্যায়।[৭৬] আর যা 'কাশ্ফুল আস্রার শারহে আলাল মানার' এর সাথে মুদ্রিত।[৭৭] এর কারণেই হয়তো 'মু'জামুল মুয়াল্লিফীন' গ্রন্থকার এটাকে ভিন্ন একটি সংকলনরূপে গণনা করেছেন।[৭৮]

মূলতঃ এটা একই গ্রন্থ, এবং এটি 'নূরুল্-আন্ওয়ার ফী শারহে মানারুল্ আন্ওয়ার' নামেও পরিচিত।[৭৯] প্রকৃতপক্ষে এগুলো 'নূরুল্-আন্ওয়ার ফী শারহীল্ মানার' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। আল্লামা মুল্লজীউন ঐগুলোর লেখক না। মূলতঃ 'নূরুল-আন্ওয়ার' হলো 'আল-মানার' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আর ঐগুলো হলো 'নূরুল্- আন্ওয়ার' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলী।

উৎস ও সময়কালঃ

এই কালজয়ী ও অমর গ্রন্থটি হিজরী একাদশ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ করা হয়।[৮০] এটি লেখার উৎস ও সময়কাল সম্পর্কে লেখক আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন নিজেই উল্লেখ করেছেন যে-

"ইবনে আহ্মাদ আন্-নাসাফী (মৃঃ ৭১০ হিঃ) এর রচিত 'আল-মানার' গ্রন্থখানা 'উসূলে ফিক্হ' এর কিতাবগুলোর মধ্যে ভাষা ও বক্তব্যের দিক দিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত অথচ উপকারী এবং সুক্ষ্মদর্শিতা ও বাস্তবতার বোধগম্যের বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিলো; কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী কোনো ব্যাখ্যাকার এর কোনো স্বার্থক ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেননি। আর যাঁরা এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছেন, তারাও ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকতে পারেননি। কেননা

---

[৭৫]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, *কামরুল আক্মার শারহে নূরুল-আন্ওয়ার (আরবী)*, মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৮৩, পৃ. ৫।

[৭৬]. *মু'জামুল মাতবু'আতুল আরাবিয়্যাহ্* গ্রন্থে মাওলানা ইউসুফ সারকীস এ মতটি ব্যক্ত করেছেন।

[৭৭]. ইউসুফ আলইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবু'আতুল আরাবিয়্যাহ্*, সারকীস মুদ্রণালয়, মিসরঃ ১৯২৮, পৃ. ১১৬৫।

[৭৮]. ওমর রেজা কাহ্হালা, *মুজামুল মু'আল্লিফীন*, ১ম খন্ড, তারাজিমু মুসান্নিফিল কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ্, বৈরুত, লেবাননঃ ১৯৫৭, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

[৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[৮০]. এ কালজয়ী গ্রন্থটি মুল্লাজীউন মাত্র ৭৩ দিনের মধ্যে সংকলন করেন। তাঁর কাছে কোনো তথ্যপঞ্জীও তখন ছিলো না।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮)।

Dhaka University Institutional Repository

এদের কোনো কোনোটি অত্যধিক সংক্ষিপ্ত হওয়াতে উদ্দেশ্য অনুধাবনে অসুবিধাজনক হয়েছে। [যেমন, মূল গ্রন্থকার (নাসাফী) কর্তৃক শরাহ্ 'কাশফুল আসরার ফী শারহীল মানার'।] আবার কোনো কোনোটি অতি দীর্ঘ হওয়ার দরুন উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে বিরক্তিজনক হয়েছে।

তাই বহু পূর্বেই আমার মনে এই সংকল্পের উদয় হয়েছিলো যে, আমি এর (আল-মানার) এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করবো, যাতে এর সমস্ত জটিল মাস্‌আলাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। আর এর কঠিন কঠিন আলোচনাগুলো সুস্পষ্ট ও সহজ-বোধগম্য হবে।

অথচ না কোনোরূপ অভিযোগ উত্থাপন ও খন্ডনের চেষ্টা করবো, আর না সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আলোচনার প্রয়াস পাবো; যা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারগণ হতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নানাবিধ কাজের চাপ আর সময়ের স্বল্পতার দরুন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এটা লেখার সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি।[৮১]

যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে যখন আমি পবিত্র মক্কা-মুয়াজ্জমাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলাম, তখন হেরেম শরীফ ও মসজিদে নববী শরীফের আমার কতিপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রগণ উল্লেখিত কিতাবখানা (আল্-মানার) আমার নিকট পাঠ করে শোনালেন। তাঁরা আমাকে এর একটি শরাহ্ (ব্যাখ্যা-গ্রন্থ) লেখার মহৎ কাজটি সম্পাদনের অনুরোধ জানালেন। এমনকি আমাকে এমনভাবে বাধ্য করলেন যে, এ ব্যাপারে আমার কোনো ওজর-আপত্তিই তাঁরা শুনলেন না।

সুতরাং সে অবস্থায়ই কোনোরূপ সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে স্মৃতিপটে যা ছিলো তা দিয়েই তাঁদের প্রয়োজনীয় ও আকঙ্ক্ষিত কাজটি সম্পাদনে মনোনিবেশ করলাম। আর আমি এর নাম রাখলাম- 'নূরুল-আন্ওয়ার ফী শারহীল্ মানার' হিসেবে।"[৮২]

উল্লেখ যে, এটা ছিলো আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের মক্কা-মদীনায় প্রথম সফর। তখন তাঁর বয়স ছিলো ৫৮ বছর। এ কিতাবটি লেখা শুরু করেছিলেন (১১০৫ হিঃ/১৬৯৩ খ্রিঃ)

---

[৮১]. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি আহ্ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

[৮২]. (i) মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল আহাদ আল-কাসেমী ও মাওলানা উবাঈদুল হক আল-জালালাবাদী সংকলিত, *নূরুল্ আন্ওয়ার মা'আ আয্হারুল আয্হার*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯৭৬, পৃ. ১-২ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।
(ii) খাদিম হুসাইন, *সুবহ-ই-বাহার* (উর্দু পান্ডুলিপি), (তা. বি.), পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

সনের রবিউল আউয়াল মাসে, আর শেষ করেছিলেন ৭ই জুমাদিউল্ উলায়। সময় লেগেছিলো মাত্র ২মাস ৭ দিন মতান্তরে ১২ দিন।[৮৩]

যা রীতিমতো বিস্ময়করও বটে। যদিও এটি (নূরুল্-আন্ওয়ার) একটি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ (শরাহ্); তথাপি তা স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বে ভাস্বর।

নামকরণের স্বার্থকতাঃ

আলোচ্য গ্রন্থটির নাম কেনো 'নূরুল-আন্ওয়ার' রাখা হয়েছে, তা সহজেই বোধগম্য। 'নূর' আরবী ভাষার একবচনের শব্দ, যার অর্থ- আলো। আর 'আন্ওয়ার' শব্দটিও অনুরূপ 'নূর' শব্দের বহুবচন। অর্থ হলো- আলো সমূহ। এখন 'নূরুল-আন্ওয়ার' এর সম্মিলিত অর্থ দাঁড়ায়- 'আলো সমূহের আলো' (Light of Lights)।[৮৪]

অর্থাৎ- ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর সেই শাস্ত্রের একটি আলোক রশ্মি হলো এই 'নূরুল্-আন্ওয়ার' গ্রন্থটি। তাই এদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য গ্রন্থটির (নূরুল-আনওয়ার) নামকরণ যথার্থ ও স্বার্থক হয়েছে।[৮৫]

ভাষারূপ ও বৈশিষ্ট্যঃ

'নূরুল্-আন্ওয়ার' মূল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লিখিত। পাঠকগণের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য তিনি প্রথমে শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন। তারপর কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের কথা-কাজ ও সাল্ফে সালেহীনদের মতামত উপস্থাপন করেছেন। মূল গ্রন্থের (আল-মানার) সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছেন। ভাষার মাধুর্যতা ও অলংকারিত্ব ও প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট।[৮৬]

---

[৮৩]. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়িরাতু মা'আরিফল ইসলামিয়্যাহ্*, (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ৭ম খন্ড, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৭১, পৃ. ৬০৬।

[৮৪]. মাওলানা সাইয়্যিদ আব্দুল আহাদ কাসেমী ও মাওলানা উবাইদুল হক জালালাবাদী সংকলিত, *নূরুল্ আন্ওয়ার মা'আ আয্হারুল আয্হার* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[৮৫]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, *কামরুল আক্মার শারহু নূরিল্ আন্ওয়ার (আরবী)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮-৩২৪।

[৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন 'আল-মানার' এর ভাষ্য লিখেছেন। তারপর কোনো উহ্য প্রশ্ন থাকলে, তা তুলে ধরেছেন। এরপর কোন্ ইমাম কী বলেছেন, তা স্পষ্ট করেছেন। অতঃপর প্রত্যেক ইমামের জবাব হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে দিয়েছেন। ইমাম তাহাভীকে যদি হানাফী মাযহাবের 'Advocate' বলা যায়, তাহলে আল্লামা শায়খ মুল্লাজীউনকেও 'উসূলে-ফিক্‌হ' এর 'Advocate' বলা অত্যুক্তি হবে না। আল্লামা ইমাম যামাখ্‌শারী যেমন প্রশ্নোত্তর আকারে 'তাফসীরে কাশ্‌শাফ' লিখে জটিল বিষয়কে সহজ করে দিয়েছেন; মুল্লাজীউনও তেমনি 'উসূল-নীতির' দূর্বোধ্য বিষয়গুলোকে বোধগম্য করে সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন।[৮৭]

গ্রন্থ শুরু করেছেন- "আল্ হাম্‌দু লিল্লাহ্ আল্লাযী জা'আলা উসূলা'ল্
ফিক্‌হী মাব্‌নিয়ান্ লিশ্ শারায়ি",

আর শেষ করেছেন-

"রাব্বানাফ্‌তাহ বায়নানা ওয়া বায়না কাওমিনা বিল-হাক্কে
ওয়া আন্‌তা খাইরু'ল ফাতিহীন বাক্য দ্বারা।"[৮৮]

আলোচ্য বিষয়ঃ

'নূরুল্-আন্‌ওয়ার' গ্রন্থটিতে 'ইল্‌মে উসূলুল্ ফিক্‌হ' এর আলোচ্য বিষয় দলীল চতুষ্টয় তথা 'কিতাবুল্লাহ্,' 'সুন্নাতে রাসূল (সা.),' 'ইজ্‌মায়ে উম্মাত' ও 'ক্বিয়াস' এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। গ্রন্থকার আল্লামা শায়খ আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ভূমিকাসহ প্রায় ৮৮টি অধ্যায়ের মাধ্যমে দলীল চতুষ্টয়ের শ্রেণী, শ্রেণী বিভাগসহ উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছেন।[৮৯]

'নূরুল্-আন্‌ওয়ার' কালজয়ী অমর গ্রন্থ হলো কী করে, তার একটি খতিয়ান এবং প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্যঃ

'ফিক্‌হ' শাস্ত্রের মূলনীতির উপর কালজয়ী অমর গ্রন্থ 'নূরুল-আন্‌ওয়ার' এর পূর্বে ও পরে অসংখ্য গ্রন্থ আজ অবধি লেখা হয়েছে; কিন্তু কোনো গ্রন্থই 'নূরুল-আন্‌ওয়ার' এর মতো এতো সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি এবং দীর্ঘদিনব্যাপী সকল বিদ্যাপীঠে (কাওমী, আলীয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়) পাঠ্য তালিকাভূক্তও হতে পারেনি।[৯০]

---

৮৭. আযাদ বিলগ্রামী, *সুবহাতুল মারজান,* মাতবাউল কাসেমী, বোম্বে, ভারত ১৩০৩ হি./ ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ৯২৭।
৮৮. মাওলানা রফীক আহ্‌মাদ, *ইরশাদুত্তালিবীন ফী আহ্‌ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন,* আশ্‌রাফিয়া লাইব্রেরী, পটিয়া, চট্টগ্রামঃ ১৩৯৯ হিজরী, পৃ. ৬৭৯।
৮৯. মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল আহাদ আল-কাসেমী ও মাওলানা উবাইদুল হক জালালাবাদী সংকলিত, *নূরুল আন্‌ওয়ার মা'আ আয্‌হারুল আয্‌হার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

'নূরুল-আন্ওয়ার' লেখার পূর্বে 'আল-মানার' গ্রন্থটি বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্রাসা (পরে বিশ্ববিদ্যালয়-১০৬৫-৬৭ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠার পর হতে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকাভূক্ত ছিলো।[৯১] কিন্তু পরবর্তীতে 'নূরুল-আন্ওয়ার' গ্রন্থটি লেখার পর 'আল-মানার' গ্রন্থের সেই যশ, খ্যাতি ও আলোড়ন অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়।

'নূরুল্-আন্ওয়ার' গ্রন্থটি যদিও সর্বপ্রথম ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু তার অনেক আগেই হাতে লেখা বহু কপি মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলো।[৯২] কেননা রেকর্ড সূত্রে জানা যায়, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই এ অমর ও কালজয়ী গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইংরেজরা সিলেবাসভূক্ত করেছিলো।[৯৩] যা আজ অবধি চলে আসছে। অতএব, 'নূরুল-আন্ওয়ার' গ্রন্থটি মূদ্রণের পূর্বেই বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসভূক্ত ছিলো।

---

[৯১]. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৬, পৃ. ৪৫।

[৯২]. মাওলানা ইউসুফ আলইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবু'আতু'ল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আররাবা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮৩।

[৯৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

'নূরুল্-আনুওয়ার' এর পূর্বে যে সব গ্রন্থাবলী পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিলোঃ

১। আল-মানার	আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (মৃঃ ৭১০ হিঃ)
২। কাশ্ফুল আস্রার ফী শারহীল মানার	আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (মৃঃ ৭১০ হিঃ)
৩। উসূলু'শ্ শাশী সমরকন্দী	আল্লামা নিযামুদ্দীন (মৃঃ ৯৩৭ খ্রিঃ/৩২৫ হিঃ)
৪। মুসাল্লামুস্ সুবু'ত	আল্লামা কাজী মুহিব্বুল্লাহ্ (মৃঃ ১১১৯ হিঃ)
৫। হুস্সামী	আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ্ হুস্সামী (মৃঃ ৬৪৪ হিঃ)[৯৪]
৬। তালভীহ্	আল্লামা সাঈদ উদ্দীন তাফতাযানী (মৃঃ ৭৯২ হিঃ)
৭। তাওহীদ	আল্লামা সদ্রুশ্ শারীয়াহ্ (মৃঃ ৭৪৭ হিঃ)
৮। উসূলে শামসুল আইম্মা	আল্লামা সারাখ্সী (মৃঃ ৭৯৮)

'নূরুল-আনুওয়ার' এর পরে যে সব গ্রন্থাবলী লেখা হয়, কিন্তু পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়নিঃ

৯। সাহ্লুল ভু'সূল ইলা 'ইলমি'ল উসূল উপরোক্ত গ্রন্থটি 'নূরুল্-আন্ওয়ার' এর সারগ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয় না।[৯৫]	আল্লামা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী (মৃঃ ১৯৩৮ খ্রিঃ)
১০। লুব্বু'ল্ উসূল	আল্লামা মুফ্তী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (১৯১১-১৯৭৪ খ্রিঃ)
১১। মা-লা- বুন্দা লিল্ ফাকীহ্	আল্লামা মুফ্তী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (১৯১১-১৯৭৪ খ্রিঃ)
১২। আত্-তামবীহ্ লি'ল ফাকীহ্	আল্লামা মুফ্তী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (১৯১১-১৯৭৪ খ্রিঃ)
১৩। আদাবুল্ মুফ্তী	আল্লামা মুফ্তী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান (১৯১১-১৯৭৪ খ্রিঃ)

[৯৪]. (i) মাওলানা আবুল হাসান আলী নদ্ভী, *হিন্দুস্তান কী-কাদীম দরসগাঁহে,* মা'আরিফ প্রেস, আযমগড়, ভারতঃ ১৯৩৬, পৃ. ৯৫-৯৭।

(ii) মাওলানা শিব্লী নু'মানী, *মাকালাতুশ্ শিবলী,* ৩য় খন্ড, মা'আরিফ প্রেস, আযমগড়, ভারতঃ ১৯৯২, পৃ. ১০০-১০১।

[৯৫]. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান বান্দুভী, *আশ্রাফু'ল আন্ওয়ার শারহে উর্দু নূরুল আন্ওয়ার,* মাক্তাবায়ে থানভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯২৯, পৃ. ১ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

এতে একজন মুফতীর যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় গুণাবলী আলোচিত হয়েছে।[৯৬]

এছাড়া আরও অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু সবগুলো একত্রে মিলিয়ে পড়লে মনে হয়, এগুলো 'নূরুল-আন্ওয়ার' এর সারগ্রন্থ অথবা কয়েকটি অধ্যায়ের বা পরিচ্ছেদের সার গ্রন্থ; স্বাতন্ত্রের কোনো দাবী রাখে না। এ কারণেই হয়তো উপরোক্ত গ্রন্থাবলী বিদ্যাপীঠগুলোতে পাঠ্য-তালিকাভূক্ত হয়নি।

আর 'নূরুল্-আন্ওয়ার' গ্রন্থটি সর্বজন সমাদৃত ও বিদিত হওয়ার কারণে প্রায় ৩০০ বছর যাবত মধ্য-এশিয়া তথা বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভূটান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান ও ইরাক ইত্যাদি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাপীঠগুলোতে পাঠ্য-সূচী হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়ে আসছে। পার্থক্য শুধু এতোটুকুই যে, কোনো কোনো দেশে 'মাধ্যমিক' শ্রেণীতে, আর কোনো কোনো দেশে 'সম্মান শ্রেণীতে' এ অমর গ্রন্থটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য-তালিকাভূক্ত হয়ে আছে।[৯৭]

অতএব, 'নূরুল্-আন্ওয়ার' গ্রন্থটি সকল গ্রন্থের সাথে প্রতিযোগিতা করে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে আসছে। সে কারণেই এটি একটি অমর ও কালজয়ী গ্রন্থ।

<u>মন্তব্যঃ</u>

প্রখ্যাত লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ এ,এম,জি, যুবাইয়েদ বলেনঃ

'Nurul- Anwar is a commentary on' 'Al-Manar', Which is
a well-known text-book on Usul-al-Fiah."[৯৮]

মিসরের কায়রোতে অবস্থিত বিশ্ব-বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ 'জামিউল আযহার' বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা আলিমগণ 'নূরুল-আন্ওয়ার' এর ভূঁয়সী প্রশংসা করে বলেনঃ

---

[৯৬]. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২।

[৯৭]. (i) সৈয়দ মানাযির আহসান গিলানী, *হিন্দুস্তান-মে-মুসলমানু-কা-নিযাম-এ-তা'লীম ওয়া তারবিয়াত*, ২য় খন্ড, মাতবা-এ-ইনতেযামী, হায়দারাবাদ, ভারতঃ ১৯৪৩, পৃ. ৮।
(ii) Educatioon system of Bangladesh, *Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics* (BANBEIS), Ministry of Education, Dhaka: 1992, pp. 23-26.
(iii) ঐ কয়েকবটি দেশের দূতাবাস থেকে তাদের দেশের শিক্ষা-সিলেবাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

[৯৮]. M.G. Zubaid Ahmad: Contribution of India to Arabic Literature, Alahabad, India: 1946, p. 21.

Dhaka University Institutional Repository

"এটি (নূরুল-আন্ওয়ার) হানাফী মাযহাবের উসূল নীতির একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। যা পূর্বাপার কেউ আজ অবধি লেখেননি।"[৯৯]

প্রখ্যাত লেখক ও ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা শিবলী নোমানী 'নূরুল-আন্ওয়ার' গ্রন্থটির ব্যাপারে বলেনঃ

> "ভারতের জ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে 'দর্সে নিযামিয়া' সবচেয়ে গৌরবময় একটি অধ্যায়। বর্তমান ভারতে কলকাতা থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত জ্ঞান-চর্চার যে সব ধারা প্রবাহমান রয়েছে, সে সবই এ উৎস থেকে উৎসারিত। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ না করা হলে কোনো ব্যক্তিকে 'আলিম' বলে গণ্য করা চলে না। সেই 'দর্সে নিযামিয়া' এর পাঠ্য-তালিকার প্রথম সারিতে এ বইটির নাম লিখিত।"[১০০]

আল্লামা শিবলী নোমানী এ প্রসঙ্গে আরও বলেনঃ

> "মেকি টাকাকে যেমন টাকা বলা যায় না, অনুরূপভাবে 'নূরুল্-আন্ওয়ার' পড়া ব্যতীত তাকে হানাফী মাযহাবের আলেম বলা যায় না।"[১০১]

আর বর্তমানেও আলেম সমাজের মাঝে এ কথাটির প্রচলন আছে।

'নূরুল-আন্ওয়ার' গ্রন্থটির প্রতি মুগ্ধ হয়ে বহু পন্ডিত ব্যক্তি এর ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মোধ্যে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাকারগণের নাম ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ উল্লেখযোগ্য।

---

[৯৯]. এটি সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী কর্তৃক আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সেমিনার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, উর্দু বক্তৃতা থেকে প্রবন্ধাকারে অনুবাদ করেন- মাওলানা ওবায়দুর রহমান খান নদ্ভী। তার আংশিক ২৩শে জানুয়ারী ১৯৯৪ তারিখে সংগ্রাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। পৃ. ৪-৫।

[১০০]. খাদিম হুসাইন, *সুবহ-ই-বাহার* (উর্দু পান্ডুলিপি) (তা. বি.), পৃ. ২১৭।

[১০১]. মাওলানা শিবলী নু'মানী, *মাকালাতুশ্ শিবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষ্যকারগণের নাম	ভাষ্য গ্রন্থ সমূহের নাম
(i) মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম (মৃঃ ১২৮৫ হিঃ)[১০২]	(i) 'কামরুল আকমার' শারহু নূরিল আনওয়ার (আরবী)
(ii) মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল আহাদ কাসেমী মঙ্গীরী (ভারত) এবং মাওলানা উবাঈদুল হক জালালাবাদী।[১০৩]	(ii) 'আয্হারুল আযহার' শরহে নূরুল আন্ওয়ার (উর্দু)
(iii) মাওলানা জামীল আহ্মাদ দেওবন্দী।[১০৪]	(iii) 'কু'তুল আখ্ইয়ার' শরহে নূরুল আন্ওয়ার দুই খন্ড (উর্দু)।
(iv) মাওলানা মুহাম্মদ হাসান বান্দুভী (ভারত)[১০৫]	(iv) 'আশ্রাফুল আন্ওয়ার' শারহে নূরুল আন্ওয়ার। (উর্দু)।
(v) মাওলানা বদিউল আলম ও মাওলানা আব্দুল্লাহ্	(v) 'ইযাহুল্ আস্রার' ফী শার্হে নূ'রুল আন্ওয়ার (বঙ্গানুবাদ)।[১০৬]
(vi) আবুল বারাকাত নাসাফী (মৃঃ ৭১০ হিঃ) ও আহ্মাদ মুল্লাজীউন।[১০৭]	(vi) কাশ্ফুল আস্রার আলাল মানার।[১০৮] ২য় খন্ড।
(vii) [১০৯]	(vii) মিশ্কাতুল আন্ওয়ার[১১০]।

---

[১০২]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, *কামরুল আক্মার শারহু নূরিল আন্ওয়ার (আরবী)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮-৩২০। (তিনি মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভীর পিতা)।

[১০৩]. মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল আহাদ কাসেমী ও মাওলানা উবাঈদুল হক জালালাবাদী সংকলিত, *নূরুল-আনওয়ার মা'আ আয্হারুল আয্হার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।

[১০৪]. মাওলানা জামীল আহমাদ, *কু'তুল আখইয়ার শারহে নূরুল আনওয়ার*, ১ম খন্ড, মাকতাবাতুল বালাগ, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৮৯, পৃ. ১ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

[১০৫]. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান বান্দুভী, *আশ্রাফুল আন্ওয়ার শারহে নূরুল আনওয়ার (উর্দু)*, মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৭৮, পৃ. ১ (মলাট দ্রষ্টব্য)।

[১০৬]. মাওলানা বদিউল আলম ও মাওলানা আব্দুল্লাহ্ অনূদিত, *ইযাহুল আসরার ফী শারহে নূরুল আনওয়ার, (আরবী-বাংলা)*, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ১ (ভূমিকা ও মলাট দ্রষ্টব্য)।

[১০৭]. *'আল-মানার'* গ্রন্থটি অতি সংক্ষিপ্ত ও দূর্বোধ্য হওয়ায় আল্লামা নাসাফী নিজেই এর একটি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ লেখেন। যার নাম দেন - *'কাশ্ফুল আস্রার আলাল মানার'*। এটিও মানুষের বোধগম্য না হওয়ায় আল্লামা মুল্লাজীউন এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখেন; যার নাম দেন- *'নূরুল-আন্ওয়ার'*। মানারের ব্যাখ্যা দু'টি গ্রন্থ একসাথে দুই খন্ডে ভারত থেকে প্রকাশিত। তাই উহার লেখক প্রাগুক্ত দু'জন।

[১০৮]. ফাহরাস্তে কুতুব, *সা'উদিয়া কুতুবখানা*, চকবাজার, ঢাকাঃ ১৯৯৫, পৃ. ৮।

[১০৯]. লেখকের নাম সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি।

[১১০]. *নূরুল আন্ওয়ার মা'আ হাশিয়াহ্ কামরু'ল্ আক্মার*, মাকতাবাতে থানভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৮৩, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অসীম কৃপায় গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত হলো। তাঁর অপার মেহেরবানী ব্যতীত এ কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা মোটেও সম্ভবপর হতো না। এজন্য তাঁর আলীশান দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

এই নশ্বর পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁরা নিজেদের শ্রম-সাধনা দিয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন। এর ফলে তাঁরা মানুষের হৃদয়ে চির অমর হয়ে আছেন, থাকবেন আজীবন। যাঁদের কাছে পৃথিবী ও মানুষ ঋণী, যাঁদের অবদান শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রীক নয়; বরং ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র তথা ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনে।[১১১]

যাঁদের অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভার বিকশিত আলো ইসলামী শরীয়াতের গন্ডীর মধ্যে থেকে যুগ-সমস্যার সমাধান দিয়েছে এবং উন্মোচন করেছে ধর্মের নতুন সোনালী দিগন্ত; আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন তাঁদেরই একজন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় যাঁর ছিলো অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ।[১১২]

আল্লামা শায়খ আহ্মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন ঐ শ্রেণীর মানুষ, যাঁর সম্পর্কে ফরাসী চিন্তানায়ক Carrade Vaux এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। যেমন তিনি বলেছেনঃ

> "তাঁরা সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা ছিলেন যুক্তিতে বিশ্বাসী, যাঁরা তর্কশাস্ত্রের বিধান মেনে আলোচনা করতেন, প্রত্যেক সমস্যার সবরকম সম্ভাব্য অনুমান চিন্তা কতেন এবং তাঁরা জানতেন যে- সত্য চিরন্তন। তাঁদের চিত্ত ছিলো উদার ও প্রশস্ত এবং যুক্তিবাদকে সসীম জেনেও তাঁরা তার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়েই পারদর্শী হওয়ার স্পর্ধাও রাখতেন।"[১১৩]

আহ্মাদ মুল্লাজীউনের বলিষ্ঠ পদচারণা ছিলো জ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন সে যুগের ভারতবাসীর জন্য এক জীবন্ত মডেল। যে সব মণীষীদের অবদানে মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে, যাঁদের

---

[১১১]. সৈয়দ আব্দুস্ সুলতান, *বড় মানুষদের ছোটকালের কথা,* রুনা প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ঢাকাঃ ১৯৯৩, পৃ. ১৭।
[১১২]. আল্লামা ইউসুফ আলইয়ান সারকীস, *মু'জামু'ল মাতবু'আতুল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আররাবা,* ২য় খন্ড, সারকীস মুদ্রণালয়, কায়রো, মিশরঃ ১৯২৮, পৃ. ১১৫৭।
[১১৩]. *নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র,* ৭ম খন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়, ঢাকাঃ ১৯৯২, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা-ভাবনার সাথে সাথে সমাজ-জীবন ও আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে; আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[১১৪]

আল্লামা আহ্‌মাদ মুল্লাজীউন তাঁর জীবনকালেই ছিলেন বিকশিত ব্যক্তিত্বের এক প্রতিচ্ছবি। তিনি ঊর্ধ্বাধ (Vertical) মেরুদন্ডের মানুষ ছিলেন। মানবীয় চিন্তা ও মননশক্তির বিচিত্র ধারার বিকাশের পথে মুসলিম জ্ঞান-সাধক আল্লামা মুল্লাজীউন ষষ্ঠদশ-সপ্তদশ শতকে যে অমর অবদান রেখে গেছেন, তার সম্যক সমোঝদারী সহজসাধ্য নয়। যে কারণে আজও তিনি আমাদের নিকট এক বিস্ময়কর মণীষীরূপে অমর হয়ে আছেন এবং ইতিহাসের পাতায় আজও তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রয়েছে।[১১৫] তাইতো কবিতাসুরে আমরা গেয়ে উঠতে পারি-

"জীওয়ান অর্থ প্রাণ
পুষ্পসম তোমার ঘ্রাণ।
সারা দুনিয়া ছেয়ে গেছে
তোমার সে নামের সুঘ্রাণ॥

বিস্ময়কর নামটি
বিস্ময়কর খ্যাতি।
চিরদিন স্মরণ করবে, তোমায় জাতি
চিরদিন থাকবে, তোমার অম্লান খ্যাতি॥

মরেও তুমি মৃত নও
রেখে গিয়েছো স্মৃতি।
স্বার্থক তোমার নাম
স্মরণ করবে জাতি॥

সত্যিই (জীওয়ান) প্রাণ
তুমি আজো মোদের প্রাণের প্রাণ।
এক মুহূর্তের তরে, ভুলিতে নাহি পারে
একটি প্রাণকে, শত-শত প্রাণ॥"[১১৬]

---

[১১৪]. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, *যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি আহ্‌ওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ৪৭৫।
[১১৫]. *The Islamic University Studies*, Vol-i, op. cit., pp. 42-47.
[১১৬]. স্বরচিত।

Dhaka University Institutional Repository

এ মহামণীষী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একদিকে ছিলেন শিক্ষাবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ (Religious Doctorine), সরলমনা সূফী-সাধক, ঝানু ইসলামী আইনবিদ ও ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূলনীতির যুগ-স্রষ্টা। অপরদিকে রাষ্ট্রনীতিতে এরিস্টোটল, ইবনে সীনা ও ইবনে খালদুনের ন্যায় একজন সুপরামর্শক। তবে তিনি আমাদের নিকট 'তাফ্সীরে আহ্মাদী' ও 'নূরুল-আন্ওয়ার' এর গ্রন্থকার রূপেই বেশী পরিচিত। এ দু'টি মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি নতুন একটি দিক উন্মোচন করেছিলেন; যার জন্যে আজও তিনি এ উপমহাদেশের আলেম সমাজের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয়।

সুতরাং এ মহামণীষী ও জ্ঞান-তাপস আমাদের উজ্জীবন শক্তি, ভবিষ্যত চলার পথের দিশা এবং অনুপ্রেরণার আঁধার। যেমন কবি বলেনঃ

"ফুলের সৌরভ কুলের গৌরব
থাকেনা চিরদিন।
হে জ্ঞান সাধক!
তোমার স্মৃতি তোমার গৌরব
চিরদিন রবে অমলিন
আমীন! ছুম্মা আমীন!!"[১১৭]

পরিশেষে কিছু কথা বলে আমি এই অভিসন্দর্ভের উপসংহারের সমাপ্তি টানছি। ইসলামী আইন শাস্ত্র প্রণয়ন করে আল্লামা শায়খ আহ্মাদ ইবনে আবু সাঈদ মুল্লাজীউন মুসলিম বিশ্বে সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা আজ অবধি হয়নি। তাই এ মহামণীষীর জীবন ও ফিক্হ (ইসলামী আইন) চর্চা নিয়ে আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মুল্লাজীউনের জীবনের প্রতিটি দিক, তাঁর সাধনার পদ্ধতি, জীবন ধারণ প্রণালী, ইসলামী আইন চর্চা ইত্যাদি যথার্থভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ও জ্ঞান চর্চার আদর্শ যেন আমাদের বর্তমান প্রজন্মের মাঝে রেখাপাত করে, সেজন্য এই অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

[১১৭]. মাহ্যুযা হক, *ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ঃ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে*, ১ম প্রকাশ, (প্রকাশনায়ঃ মাহ্যুযা হক), ঢাকাঃ ১৯৯১, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

মহামণীষীগণের জীবন ও কর্ম আমাদের জীবন চলার পাথেয়। কিন্তু তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়ার যথার্থ উপকরণ আমাদের সমাজে অপ্রতুল। ইসলামী আইনের মূলনীতি প্রণয়নে আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউন যে অপরিসীম অবদান রেখে গিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমাদের মুসলিম সমাজ যথার্থভাবে অবগত নয়। বর্ণিত শিরোনামে বর্তমান প্রজন্মকে আহ্মাদ মুল্লাজীউন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামী শরীয়াতের বিধান বিশ্লেষণ পূর্বক গ্রহণযোগ্য বিধান প্রণয়নে মুল্লাজীউন যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তা এই অভিসন্দর্ভে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর কর্মময় জীবনের সাফল্য গাঁথা ইতিহাস ও ইসলামী আইন শাস্ত্রে তাঁর কালজয়ী অবদান এই অভিসন্দর্ভের আলোচনা পরিধিতে বিশেষ স্থান দখল করেছে।

কোনো বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজন নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য তথ্য উপস্থাপন। নির্ভুল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে আহ্মাদ মুল্লাজীউন সম্পর্কে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত লেখকগণের বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী। এই গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল গ্রন্থাবলীই হয়েছে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের অন্যতম আঁধার।

এছাড়া আল্লামা আহ্মাদ মুল্লাজীউনের রচিত যথাসম্ভব সকল গ্রন্থ ও পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে তা থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। উপস্থাপিত তথ্যের অনুকূলে যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ বিস্তারিত তথ্যসূত্র এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে কারো মনে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

বিশেষ ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এ সম্পর্কিত নিবন্ধ থেকেও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। অধিকন্তু তথ্য প্রবাহের বিশাল বাহন Internet ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল ও ম্যাগাজিন থেকেও আল্লামা শায়খ্ আহ্মাদ ইবনে আবু সাঈদ মুল্লাজীউন সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে আমি আশা করবো, এই অভিসন্দর্ভটি আল্লামা শায়খ্ আহ্মাদ মুল্লাজীউনের বিশাল কর্মবহুল ও বৈচিত্রময় জীবনের উপর আরও একাধিক গবেষণার দ্বার খুলে দিবে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১. বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও আরবী গ্রন্থাবলীঃ

আল-কুরআন

- অধ্যাপক আব্দুল করিম সম্পাদিত ঃ *ইসলামী ঐতিহ্য,* বায়তুশ্ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান (চট্টগ্রাম) ঃ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন-১৯৮৫।
- আল-আককাদ, আব্বাস মাহমুদ ঃ *আবু বকর সিদ্দীক (রা.),* মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকাঃ (তা.বি)।
- আমীন আহমাদ ঃ *হাফ্ত ইক্লিম,* ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডনঃ (তা.বি)।
- আব্দুল আলিম, এ,কে,এম, ঃ *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস,* ২য় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ডিসেম্বর-১৯৭৩।
- আযাদ, আবুল কালাম ঃ *তাযকিরাহ্,* ২য় খন্ড, নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, ভারতঃ (তা.বি.)।
- আহমাদ খান, অধ্যাপক ড. মুঈন উদ্দীন ঃ *ভবিষ্যত রাজনীতির গতিধারা,* বায়তুশ্ শরফ্ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান (চট্টগ্রাম)ঃ ১৯৯৫ খ্রি.।
- আল-হাসানী, আব্দুল হাই ঃ *নুযহাতুল খাওয়াতির,* ৬ষ্ঠ খন্ড, ২য় সংস্করণ, হায়দারাবাদঃ ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.।
- আহমাদ মুল্লাজীউন, আল্লামা শায়খ ঃ *আত্-তাফ্সীরাতুল আহমাদিয়্যাহ্ ফী বায়ানিল আয়াতিশ্ শারইয়্যাহ্,* মাতবা'আ কারিমিয়্যাহ্, বোম্বেঃ ১৩২৭ হি./১৯০৬ খ্রি.।
  - " ঃ *মানাকিবুল আউলিয়া,* মাতবা'আ কারিমিয়্যাহ্, ভারতঃ (তা.বি.)।
  - " ঃ *আস্-সাফ্রু,* মাক্তাবাতে থান্ভী, ভারতঃ ১৯৬২ খ্রি.।
  - " ঃ *আদাব-ই-আহ্মাদী,* নওয়াল কিশোর প্রেস, ভারতঃ (তা.বি.)।
  - " ঃ *জিমাউল্ ইল্ম,* মাক্তাবাতুল বালাগ, দেওবন্দঃ (তা.বি.)।
  - " ঃ *আন্ওয়ারুল্ ফুরকান,* আসরারে করিমী প্রেস, লক্ষ্মৌঃ (তা.বি.)।
  - " ঃ *মুজ্দাওয়াজাহ্,* আল্-মাক্তাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্, মদীনাঃ (তা.বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

” : *দেওয়ানে শে'র,* আল্‌-মাতবাউল কাসেমী, ভারতঃ (তা.বি.)।

- আবুল হাসান মানিকপুরী, আল্লামা শাহ্ সাইয়্যেদ : *সাহেবে আয়ানাহ্,* ১ম খন্ড, নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৪১৪ হি. ১৯৯৩ খ্রি.।
- আল-বাদায়ূনী, আব্দুল কাদির : *মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ,* ৩য় খন্ড, আশ্‌রাফিয়া বুক হাউজ, কলকাতাঃ ১৯৬৯ খ্রি.।
- আল-গাযালী, ইমাম : *আত্‌তিবরুল মাস্‌বুক (সত্যিকারের সম্পদ),* (মোঃ এমদাদ উল্লাহ অনূদিত), ঢাকাঃ ১৯৭৫ খ্রি.।
- আব্দুল্লাহ্, খাজা : *মাবলিগুর রিজাল,* নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, লাহোরঃ ১৯৫৭ খ্রি.।
- আবুল ফজল : *মহা-ভারতের ভূমিকা,* নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯৮৬ খ্রি.।

  ” : *রুক্'আতে আবুল ফজল,* ১ম খন্ড, মাক্‌তাবাতু মাজিদিয়্যাহ্, পাকিস্তান ঃ ১৯৮৩ খ্রি.।

  ” : *আইন-ই-আকবরী,* ২য় খন্ড, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতঃ ১৯৭৮ খ্রি.।
- আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী, নদ্‌ভী : *হিন্দুস্তান কী কাদীম দরসগাঁহে,* মা'আরিফ প্রেস, আযমগড়ঃ ১৯৩৬ খ্রি.।

  ” : *মা'আরিফ,* খন্ড-২৭, মাকতাবাতে থান্‌ভী, দেওবন্দঃ ১৯৮৪ খ্রি.।

  ” : *তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত ;* ৪র্থ খন্ড, মাকতাবাতে থান্‌ভী, দেওবন্দঃ (তা.বি.)।

  ” : *জীবন পথের দিশা,* (মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩ খ্রি.।
- আল-মুআল্লিম বাতরুস আল-বুস্তানী সংকলিত : *দায়িরাতু'ল মা'আরিফ,* ২য় খন্ড, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন ঃ ১৯৩৭ খ্রি.।
- আযাদ বিলগ্রামী : *সুবহাতুল মারজান,* আল-মাত্‌বাউল কাসেমী, বোম্বেঃ ১৩০৩ হি./১৮৮৫ খ্রি.।

  ” : *মা'আসিরুল কিরাম,* ইদারা-ই- আদাবিয়্যাত, আগ্রাঃ ১৩২৮ হি./১৯১০ খ্রি.।
- আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ : *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

" : *ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি,* সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৬ খ্রি.।

- আল-নাজজার, মুহাম্মদ আলী : *তাকরীবুত তাহ্যীব,* আল-মাক্তাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্, মদীনাঃ ১৩৮০ হিজরী।
- আল-বাগদাদী (রহ.) : *হাদ্ইয়াতুল আরেফীন,* ১ম খন্ড, আল-মাকতাবাতুস্ সালাফিয়্যাহ্, মিশরঃ ১৯৮৫ খ্রি.।

" : *ঈযাহুল মাকনুন,* ২য় খন্ড, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ্, মিশরঃ ১৯৭৯ খ্রি.।

- আব্দুল জব্বার, মাওলানা মুহাম্মদ : *রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব,* বায়তুশ্ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান (চট্টগ্রাম)ঃ ১৯৮২ খ্রি.।
- আব্দুল্লাহ্, ড. মুহাম্মদ : *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৬ খ্রি.।
- আব্দুর রহীম হাজারী, মাওলানা : *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা,* নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৮ খ্রি.।
- আব্দুল করিম, ড. : *চট্টগ্রামে ইসলাম,* ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রামঃ ১৯৮০ খ্রি.।
- আব্দুল মওদূদ : *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপান্তর,* সাহিত্য সংসদ, ঢাকাঃ ১৯৬৮ খ্রি.।

" : *মুসলিম মণীষী,* নওরোজ কিতাবখানা, ঢাকাঃ ১৯৭০ খ্রি.।

- আলিম কে. দাওয়ায়ী, ড. : *হিন্দুস্তানী মুফাস্সিরীন আওর উন্কী আরবী তাফসীরেঁ,* মাকতাবাতু জামি'আ লিমিটেড, নতুন দিল্লীঃ ১৯৭৩ খ্রি.।
- আব্দুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ : *মিফ্তাহুল উলুম ওয়াল্ ফুনুন,* মাদ্রাসা-ই দারুল উলুম, সিলেটঃ (তা.বি.)।
- আব্দুল হালিম, মাওলানা মুহাম্মদ : *কামরুল আকমার শারহু নূরিল আনওয়ার (আরবী),* মাকতাবায়ে থান্‌ভী, দেওবন্দঃ ১৯৮৩ খ্রি.।
- আব্দুল বাতিন : *সীরাত-এ-কারামাত আলী জৌনপুরী,* আসরারে করিমী প্রেস, এলাহাবাদঃ ১৩৬৮ হি.।
- আহমদ, নিজামুদ্দীন : *তা'রীখে আল্ফী,* ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডনঃ (তা.বি.)।
- আখুন্দ দরযূজা : *ইরশাদুত্ তালেবীন,* হানিফ বুক ডিপো, দিল্লীঃ ১৮৮৮ খ্রি.।
- আসলাম, মুহাম্মদ : *দ্বীনে ইলাহী আওর উস্‌কা পাস্ মান্যার,* নদ্ওয়াতুল মুসান্নিফীন, লাহোরঃ ১৯৬৯ খ্রি.।

- আব্দুস্ সুলতান, সৈয়দ : *বড় মানুষদের ছোটকালের কথা,* ৫ম সংস্করণ,রুনা প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৯৩ খ্রি.।
- আমীমুল ইহসান, সাইয়্যেদ মুহাম্মদ : *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ,* আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দঃ ১৯৯১ খ্রি.।
- আব্দুল হক, হযরত মাওলানা : *তা'রীখে ইল্‌মে তাফসীর,* সৌদিয়া কুতুবখানা, ঢাকাঃ ১৯৯৪ খ্রি.।
- ইবনে ফায়েজ, মহব্বত : *আখবারে মহব্বত,* ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডনঃ ১৯৭৯ খ্রি.।
- কাহ্‌হালা, ওমর রেযা : *মুজামুল মুআল্লিফীন-তারাজিমু মুসান্নিফিল কুতুব আল- আরাবিয়্যাহ্,* ১ম খন্ড, দারুস্ সাদির, বৈরুতঃ ১৯৫৭।
- কে, আলী : *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস,* আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকাঃ ১৯৭৬ খ্রি.।
- কিউল রাম : *তায্‌কিরায়ে উমারা,* ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডনঃ ১৯৬৭ খ্রি.।
- খান, সিদ্দীক হাসান : *আবজাদু'ল উলুম,* মাতবা'উ নিযামী, ভূপালঃ ১৯২৫ খ্রি.।
  - " : *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৩৭১ হি.।
- খান, শাহ্ নাওয়ায : *মা'আসিরুল উমারা,* ৩য় খন্ড, আসরারে করিমী প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯৭৩ খ্রি.।
- খাদিম হুসাইন : *তারীখ্ কাসাবা-ই-আমেথী,* নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯৭৮ খ্রি.।
- খুরশীদ উদ্দীন, মাওলানা : *মুসলমানদের উত্থান ও পতন,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯ খ্রি.।
- খান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মু'তামাদ : *তা'রীখ-ই-মুহাম্মাদী,* ৬ষ্ঠ খন্ড, ২য় সংস্করণ, আসাহুল মাতাবেয়ু, হায়দারাবাদঃ ১৩৯৮ হি./১৯৭৮খ্রি.।
- গোলাম সারওয়ার : *খাযীনাতুল আস্‌ফিয়া,* নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯০২ খ্রি.।
- গোলাম সাকলায়েন, ড. : *একের ভেতর পাঁচ,* বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ঢাকাঃ ১৯৮৫ খ্রি.।
- গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত : *আল্-মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন,* ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৮১ খ্রি.।
- ছানাউল্লাহ, অধ্যাপক মুহাম্মদ : *তাযকিরা-ই-উলামা-ই-জৌনপুর,* ২য় সংস্করণ, মাকতাবাতুল কুদ্‌সী, কলিকাতাঃ ১৯৬২ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

- জামীল আহ্মাদ, মাওলানা ঃ *কুতু'ল আখ্ইয়ার শারহু নূরিল আন্ওয়ার,* মাকতাবাতুল বালাগ, ১ম খন্ড, দেওবন্দঃ ১৯৮৯ খ্রি.।
- জৌনপুরী, আব্দুল আউয়াল ঃ *মুফীদুল মুফ্তী,* নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯৩৭ খ্রি.।
- তোফায়েল, মুহাম্মদ ঃ *নুকূশে লাহোর,* মাক্তাবাতে মাজিদিয়্যাহ্, লাহোরঃ ১৯৬২ খ্রি.।
- তোবারক হোসেন ঃ *তা'রীখে ফিরিশ্তা,* মাক্তাবায়ে রাশিদিয়া, দিল্লীঃ (তা.বি.)।
- নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক মুহাম্মদ ঃ *ইসলামের ইতিহাস,* জম্জম্ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৮ খ্রি.।
- নিলুফার আক্তার ঃ *নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্,* ২য় সংস্করণ, পূর্ব-পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকাঃ ১৯৬৭ খ্রি.।
- নিযামী, খালিদ আহ্মাদ ঃ *তারীখে মাশায়িখ্ চিশ্ত,* ইদারা-ই-আদাবিয়্যাত, দিল্লীঃ ১৯৮০ খ্রি.।
- নিযাম, মাওলানা শায়খ ঃ *আল-ফাতওয়া আল-আলাম-গীরিয়্যাহ্,* ২য় সংস্করণ, মাকতাবাতু মাজিদিয়্যাহ, পাকিস্তানঃ ১৯৮৩ খ্রি.।
- প্রমথ চৌধুরী ঃ *বই কেনা,* (বাংলা সাহিত্য সংকলন, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্স্টবুক বোর্ড, ঢাকাঃ ১৯৮৮ খ্রি.।
- ফকীর মুহাম্মদ ঃ *হাদায়িকুল হানাফিয়্যাহ্,* ৩য় সংস্করণ, রশিদিয়া কুতুবখানা, লক্ষ্ণৌঃ ১৩২৪ হি./১৯০৬ খ্রি.।
- ফয়জী সিরহিন্দী ঃ *আকবর নামা,* ১ম খন্ড, আশরাফী বুক ডিপো, কলিকাতাঃ ১৯৬৩ খ্রি.।
- ফানী, মুহসিন ঃ *দাবিস্তানে মাযাহিব,* দারুল কুতুবিল আলামিয়্যাহ, বৈরুতঃ ১৪১৪ হি.।
- বাবর, যহীর উদ্দীন ঃ *তুযুকে বাবরী,* আসাহুল মাতাবেয়্যু, বোম্বেঃ (তা.বি.)।
- বাদায়ূনী, আব্দুল কাদির ঃ *মুন্তাখাবুত্ তাওয়ারীখ,* ২য় খন্ড, নিজামীয়া লাইব্রেরী, কলকাতাঃ ১৯৮১ খ্রি.।
- বাক্বী বিল্লাহ, খাজা ঃ *মাকতূবাতে খাজা বাক্বী বিল্লাহ্,* মাতবা'উ মুজ্তাবায়ী, দিল্লীঃ ১৮৯৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

- বদিউল আলম, এডভোকেট ঃ *উপমহাদেশ বিভক্তি ও আজকের বাংলাদেশ,* ১ম সংখ্যা, (প্রকাশকঃ আলহাজ্জ্ব এ,এফ,এম,হাসান), বাগ-ই-নূর প্রকাশনী, চট্টগ্রামঃ ১৯৯৫ ।
- বিনয় ঘোষ ঃ *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৭৯ খ্রি. ।
- ভবেশ রায় ঃ *শত মণীষীর কথা,* ৩য় সংস্করণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ঃ ১৯১১ ।
- মুহাম্মদ মিঞা, মাওলানা ঃ *আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য,* ১ম খন্ড, (মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯ খ্রি. ।
- মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন শর্মা অনূদিত ঃ *ভারতবর্ষের ইতিহাস,* ২য় সংস্করণ, প্রগতি প্রকাশনী, মস্কোঃ ১৯৮৬ খ্রি. ।
- মহাজাতক ঃ *কোয়ান্টাম মেথড,* ৫ম সংস্করণ, প্রজাপতি প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৯৪ খ্রি.
- মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী অনূদিত ঃ *তাফসীরে আহ্কামুল কুরআন,* মদীনা শরীফ পারফিউমারী হাউজ, ঢাকাঃ ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি. ।
- মোবাশ্বের আহ্মাদ ঃ *বাংলা ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর প্রকাশিত প্রকাশনার গ্রন্থপঞ্জী,* থিসিস- গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৮৫ খ্রি. ।
- মুহাদ্দিস দেহলভী, শায়খ আব্দুল হকঃ *আখ্বারুল আখ্ইয়ার,* মাতবা'উ মুজ্তাবায়ী, দিল্লীঃ ১৩৩২ হিজরী ।
  ” ঃ *আশ্'আতুল লুম'আত,* নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৩০২ হিজরী ।
- মুহাদ্দিস দেহলভী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ঃ *আন্ফাসুল আরেফীন,* আমিন কোম্পানী, দিল্লীঃ ১৮৯৮ খ্রি. ।
  ” ঃ *শরহে রিসালাহ্,* ১ম খন্ড, মাকতাবাতে থান্ভী, দেওবন্দঃ ১৮৯৭ খ্রি. ।
- মাওলানা আব্দুল আহাদ আল কাসিমী ও মাওলানা উবাইদুল হক ঃ *নূরুল আন্ওয়ার মা'আ আযহারুল আযহার,* এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯৭৬ খ্রি. ।
- মুন্শী, ইস্কানদার ঃ *তারীখে 'আলম আরাই আব্বাসী,* ২য় খন্ড, আসাহুল মাতারেয়ু, তেহরান, ইরানঃ (তা.বি.) ।

Dhaka University Institutional Repository

- মান্‌যুর নু'মানী, মাওলানা ঃ *তাযকিরায়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.),* দায়েরাতুল মা'আরিফিন নিযামিয়্যাহ্, হায়দারাবাদঃ ১৩৩৭ হি.।
- মিয়া, সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ঃ *'উলামায়ে হিন্দ্ কা শান্‌দার মাযী,* আমিন কোম্পানী, দিল্লীঃ ১৯৩১ খ্রি.।
- রফীক, রফীক আহ্‌মাদ ঃ *ইরশাদুত্তালিবীন ফী আহ্‌ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন,* আশ্‌রাফিয়া লাইব্রেরী, পটিয়া, চট্টগ্রামঃ ১৩৯৯ হি.।
- রহমান আলী ঃ *তাযকিরা-ই-উলামা-ই-হিন্দ,* ২য় সংস্করণ, নওয়াল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৯১৪ খ্রি.।
- রেজা-ই-করীম, মুহাম্মদ ঃ *আরব জাতির ইতিহাস,* ৪র্থ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৯৩ খ্রি.।
- লক্ষ্ণৌভী, মুহাম্মদ আব্দুল হাই ঃ *নুয্‌হাতুল খাওয়াতির,* দায়েরাতুল মা'আরিফিন নিযামিয়্যাহ্, হায়দারাবাদঃ ১৩৭৬ হি./১৯৫৭ খ্রি.।
- লাহোরী, আব্দুল হামিদ ঃ *বাদশাহ্-নামা,* ১ম খন্ড, মাক্‌তাবায়ে মাজিদিয়্যাহ, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৩৫ খ্রি.।
- শায়খ আহ্‌মাদ, মাওলানা ঃ *তান্‌যীমুল মাখ্‌যুন,* হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রামঃ ১৪১৪ হি.।
- শিবলী নু'মানী, আল্লামা ঃ *সীরাতুন্নবী (সা.),* আযমগড়ঃ ১৯৪৭ খ্রি.।
- শাকির আখতার ঃ *ইযাহুল মাকনুন,* ২য় খন্ড, মাক্‌তাবাতুল ইসতিকামাহ, কায়রো, মিশরঃ ১৯৩৯ খ্রি.।
- শিরাজী, রফিউদ্দিন ঃ *তায্‌কিরাতুল মুলূক,* রশিদিয়া কুতুবখানা, ভারতঃ (তা.বি.)।
- সামাদ এম, এ ঃ *ইংরেজী শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি,* ৪৫ তম সংস্করণ, (রচনা অধ্যায়), গ্রীন বুক হাউজ, বগুড়াঃ ১৯৮৫ খ্রি.।
- সারকীস, ইউসুফ আল্‌ইয়ান ঃ *মু'জামুল মাতবুআতু'ল আরাবিয়্যাহ্,* ২য় খন্ড, সারকীস মুদ্রণালয়, মিশরঃ ১৯২৮ খ্রি.।
- সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ১ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩ খ্রি.।
- সিরহিন্দী, শায়খ আহ্‌মাদ ঃ *মাক্‌তূবাতে ইমামে রাব্বানী,* ১ম খন্ড, আসরারে করিমী প্রেস, লক্ষ্ণৌঃ ১৮৭৭ খ্রি.।
- হানীফ গাংগুহী, মুহাম্মদ ঃ *যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বি আহ্‌ওয়ালিল্ মুসান্নিফীন,* মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচীঃ ১৯৮৬ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

- হুমায়ুন আযাদ, মুহাম্মদ ঃ *দরবারে আকবরী,* মাক্তাবাতে মাজিদিয়্যাহ, লাহোর, পাকিস্তানঃ ১৯৪৭ খ্রি. ।
- হাসান বান্দুভী, মাওলানা মুহাম্মদ ঃ *আশ্‌রাফুল আন্‌ওয়ার শারহে উর্দু নূরুল-আন্‌ওয়ার,* মাকতাবাতে থানভী, দেওবন্দ, ভারতঃ ১৯৫৮ খ্রি. ।

পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, প্রবন্ধ ও সাময়িকীঃ

- অগ্রপথিক ঃ ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৭ খ্রি. ।
- আত্‌-তাযকীরা ঃ মাদ্রাসা-ই-উস্তাদ আলমগীর মুল্লাজীউন, (স্মরণিকা বার্ষিকী), আমেথী, ভারতঃ ১৯৮৬ খ্রি. ।
- আল-ফুরকান (উর্দু মাসিক পত্রিকা) ঃ মানযুর নু'মানী কর্তৃক সম্পাদিত, ৩২ তম সংখ্যা, আযমগড়ঃ ১৯৩৫ খ্রি. ।
- বুরহান (উর্দু মাসিক পত্রিকা) ঃ মাওলানা আহ্‌মাদ সাঈদ সম্পাদিত, ৮ম সংখ্যা, দিল্লীঃ ১৯৩৫ খ্রি. ।
- নিবন্ধমালা ঃ উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ৮ম খন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৯৪ খ্রি. ।

অভিধান, বিশ্বকোষ ও অন্যান্যঃ

- আল-বা'লাবাক্কী, মুনীর ঃ *আল-মাওরিদ,* দারুল্‌ ইল্‌ম লিল সালায়ীন, বৈরুতঃ ১৯৮৮ খ্রি. ।
- ইব্রাহীম মুস্তফা ও মুহাম্মদ আলী আল-নাজ্জার কর্তৃক সংকলিত ঃ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত,* মাজমাউল লুগাতুল আরাবিয়্যাহ, ইস্তাম্বুল, তুর্কীঃ ১৯৮০ খ্রি. ।
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১১শ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২ খ্রি. ।
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১২শ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯২ খ্রি. ।
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ *দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ,* (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ৭ম খন্ড, লাহোরঃ ১৯৭১ খ্রি. ।

Dhaka University Institutional Repository

- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ *দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্,* (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ), ১৫ তম খন্ড, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোরঃ ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.।
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলিকাতাঃ ১৯৮৬ খ্রি.।
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ঃ *ফাহ্রাসুত্ তাইসুরিয়্যাহ্,* ১ম খন্ড, দারুল কুতুবিল আরাবী, বাগদাদঃ ১৯৬৮ খ্রি.।

অন্যান্যঃ

- আন্ওয়ারে মোহাম্মাদী ঃ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ কমিটি, মীরবাড়ী, চট্টগ্রামঃ ১৯৬৫ খ্রি.।
- আরবী সাহিত্য ঃ (আলিম শ্রেণী), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকাঃ ১৯৮৮।
- জাওয়াহিরুল উর্দু ঃ (৭ম শ্রেণী), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাঃ ১৯৮৩ খ্রি.।
- সাহিত্য সওগাত ঃ ৫ম শ্রেণী, (ওস্তাদের কদরঃ কাজী কাদের নেওয়াজ), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাঃ ১৯৯৪ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী গ্রন্থাবলীঃ

- Abdul Aziz : *Mansabdari System and The Mughal,* India Office Library, London : 1958.
  " : The Discovery of Pakistan, Civil Steam Press, Lahore: 1968.
- Abdul Ghani, Dr. : *A History of Persian Language and Literature at the Mughal Court,* Matba' Nawalkishor, Lucknow: 1983.
- Abdul Karim : *Dacca the Mughal Capital,* Vikash Publications, Hyderabad: 1964.
  " : *Murshid Quli Khan and His Time,* Irshadut Talebin, Delhi: 1963.
- Ashraf, K.M. : *Social and Political condition in Medieval India,* British Museum, London: 1979.
- Akram, S.M : *History of Muslim civilization in India,* Delhi: 1964.
- Badauni : *Muntakhabut Tawarikh,* Maktaba Salfia, Calcutta: 1915.
- Chowdhury, M.L. Ray : *An Advanced History of India,* Princeton University Press, New Jersey: 1963.
  " : *Religious Policy of the Mughal,* Matba Mujtaba i Delhi, India: 1318 A.H.
- Dojerok : *Akbar and the Jesuits,* Darul Kutubul Ilmiya, Beirut, Lebanon: (N.D.).
- Edward Makligon : *The Jesuits and the Great Mughal,* London: 1932.
- Edwards and Garret : *Mughal Rule in India,* Cambridge University Press, New York: 1988.
- Erskine, W : *History of India under Babur and Humayun,* Oxford University Press, London: 1951.
- Encyclopedia of Religion and Ethics : Vol-Viii, Seribners, Edited by James Hastings, New York: 1976.

Dhaka University Institutional Repository

- Francois Bernier : *Travels in Mughal Empire,* Macmillan and Co. Ltd. London: 1937.
- Fergusson, J : *History of India and Eastern Architectures,* Lund Humphries, London: 1971.
- Habibullah, A.B.M : *The Foundation of Muslim Rule in India,* Kutob Khana Rashida, Delhi: 1962.
- Habib and Nizame : *A comprehensive History of India,* Vol-V, Bombay: 1935.
- Ibn Hasan : *The Central Structure of the Mughal Empire,* India Office Library, London: 1973.
- Ishwari Prasad : *A short History of Muslim Rule in India,* Allahabad: 1939.
  " : *The Mughal Empire,* Agra: 1974.
- Ishwari Topa : *History of Bengal,* Vol-iv, Delhi: 1958.
  " : *History of Aurangzeb Alamgir,* Nawal Kishor Press, Lucknow: 1967.
- Ishaq, Dr. Mohammad : *India's Contribution to the study of Hadith Literature,* Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka: 1976.
- Jaffar, S.M. : *The Mughal Empire,* British Colombia Publications, Toronto, Canada: 1974.
- John Wortabet and Harvey Porter : *Arabic-English Dictionary,* Libratiredu Liban Library, Paris: 1978.
- Keith, A.B. : *A Constitutional History of India,* Macdonal Evans Ltd, London: 1980.
- Keene, H.G. : *The Fall of the Mughal Empire,* Cambridge University Press, New York: 1988.
- Maududi : *A short History of the Revivalist Movement in Islam,* India Office Library, Lahore: 1963.
- Majumder and Dutta: *History of India,* Progoti Prokashoni, Calcutta: 1936.
- Mehdi Hussain, Aga: *Rise and Fall of the Mughal Empire,* Karachi, Pakistan: 1973.

Dhaka University Institutional Repository

- Majumder, R.C. : *An Advanced History of India,* 3rd Edition, Macmillan S.T. Martings Press, London: 1949.
- Mujibur Rahman : *Self- Development,* Siga Bangladesh, Dhaka: 1995
- Nawas Aengar, Sree : *The Teachings of Sree Ramanuja Achariya,* Delhi: 1969.
- Noman, Mohammad : *Muslim India,* Islamic Publications Limited, Lahore: 1987.
- Roberts, P.E. : *History of British India,* Oxford University Press, London: 1984.
- Rahim, M.A. : *Social and Cultural History of Bengal,* Hyderabad: 1972.
- Rahman, Dr. M.M. : *An Introduction of Al-Maturidi's Tawilat,* Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka: 1981.
- R.P. Tripathy, Dr. : *Rise and Fall of the Mughal Empire,* 5th Edition, Mollika Publications, Delhi, India: 1979.
- Smith, V.A. : *Akbar the Great Mughal,* Delhi: 1962.
- Sree Istawa, Dr. A.L. : *Akbar the Great,* Vol-1, Calcutta: 1877.
- Saksena, B.P. : *History of Shah Jahan,* Madras: 1979.

  " : *History of Jahangir,* Nawal Kishor Press, Lucknow: 1947.
- Sarkar, J.N. : *Mughal Administration,* Kanpur: 1946.

  " : *Fall of the Mughal Empire,* Civil Steam Press, Lahore: 1971.

  " : *History of Aurangzeb,* Vol- V, Bombay: 1967.

  " : *History of India,* Nawal Kishore Press, Lucknow: (N.D.).
- Saran, P : *The Provincial Government of Mughals,* 2nd Edition, Bombay: 1973.
- Sinha and Banerjee : *Medieval India,* Jay Durga Library, Calcutta: 1989.

Dhaka University Institutional Repository

- Tara Chand : *Influence of Islam on Indian Culture,* Bani Shilpa Prokashoni, Calcutta: 1987.
- The Islamic University Studies : Vol-1, Published by the Registrar, Islamic University, Kushtia: 1990.
- The Oxford School Atlas : 28th Revised Edition, Delhi University Press, Delhi: 1993.
- Tavernier : *Travels in India,* Eureka Publications Ltd, London: 1973.
- Wolsely Haig, Sir : *The Cambridge History of India,* Vol-iv, Edited by Sir Richard Burn, Chand and Company, New Delhi: 1971.
- Wairvine, Sir : *Later Mughals,* Danforth University Press, London: 1912.
- William Haunter, Sir: *The Indian Musalmans,* 3rd Edition, Translated by Abdul Maudud, Lekha Chitra Prokashoni, Dhaka: 1989.
- Yousuf Hussain, Dr.: *Glimpses of the Medieval Indian Culture,* Cambridge University Press, New York: 1964.